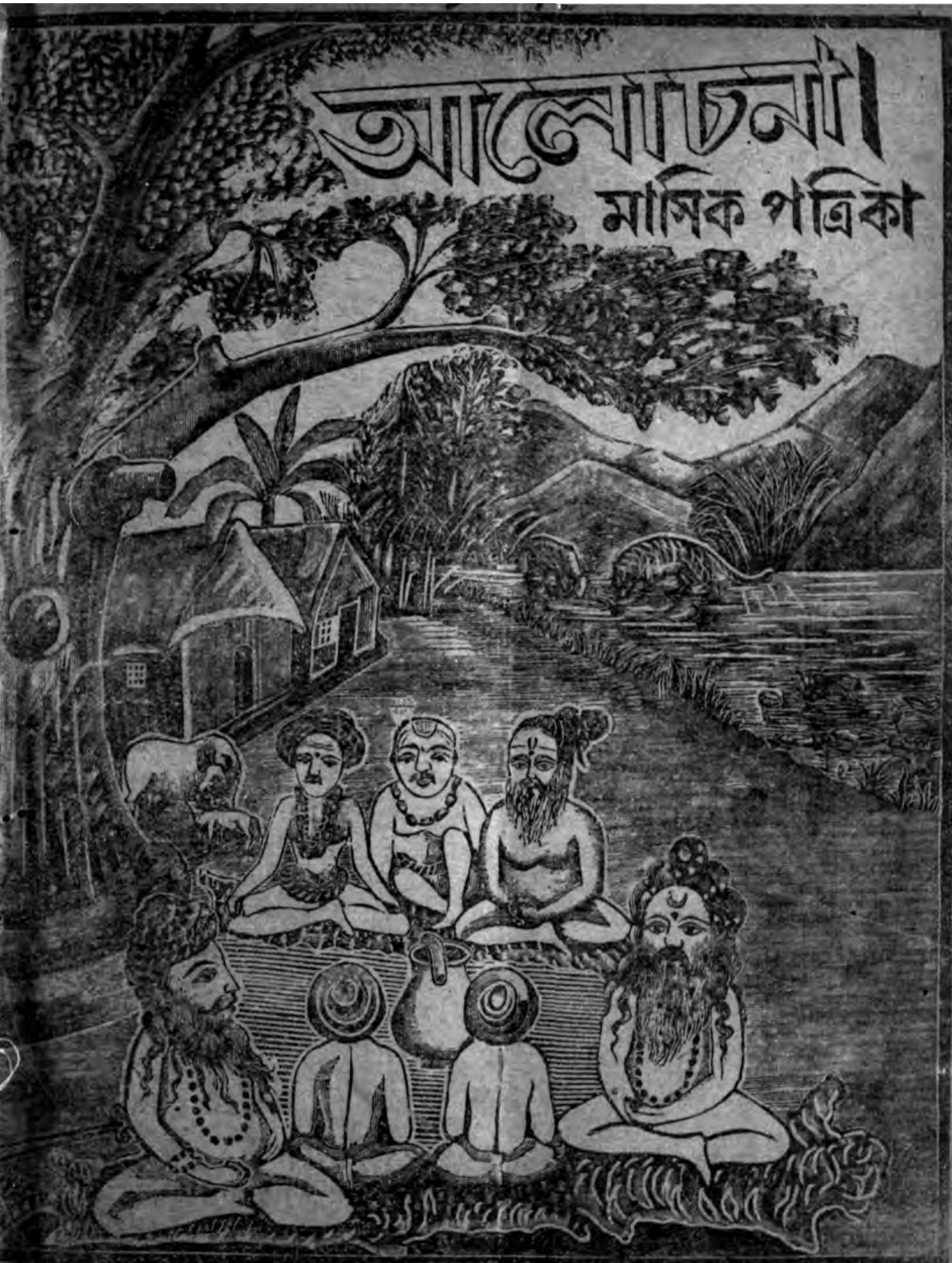


সম্পাদক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সূচী পত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা।

—০—

সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পঞ্চবিংশ বর্ষ।

—০—

ম্যানেজার ও সত্বাধিকারী—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

—০—

হাওড়া, ৪নং তেলকলঘাট রোড, "কর্ম্মযোগ প্রেস" হইতে

শ্রীযুগলকিশোর সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ২।৵০ সাল।

সন ১৩২৮ সালের সূচীপত্র।

সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকালীকায়ৈ নমঃ।

আলোচনা।

"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।"

পঞ্চবিংশতি বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩২৮ সাল। [প্রথম সংখ্যা।

আবাহন।

(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ)

তোমার গৌরবে গৌরব-মণ্ডিত
ভারতী-মন্দির ভারতে
আবারো তোমার মঙ্গল শঙ্খ
বাজিয়া উঠুক্ আচম্বিতে।
বাজায়ে সত্যের বিজয় বিষাণ,
তুলিয়া পুণ্যের বিশাল নিশান,
আবারো ছুটুক্ ভারত সন্তান,
তোমার মহিমা ঘোষিতে।
তুমি যা'রে কৃপা কর দয়াময়,
পঙ্গু হয়ে গিরি, সেজন লঙ্ঘয়,
কর তুমি প্রভো, মূকেরে বাচাল,
তোমার মহিমা ঘোষিতে।
প্রলয় মথিয়া কর সত্যোদ্ধার,
আপন গৌরব দেখাও আবার,
নীরব করহ মুখর মিথ্যারে
মঙ্গল ভৈরব গর্জ্জিতে।
হে দেবাদিদেব বিশাল বিরাট,
হে রাজাধিরাজ, স্বরাট্, সম্রাট্,
এসো ফিরে এসো, শূন্য সিংহাসনে,
তোমার মন্দির ভারতে।

নিবেদন।

নববর্ষে—নববর্ষের কিছু একটা মঙ্গলাচরণ কর্ত্তে হয়, কিন্তু এবার আর আমাদের তা হলো না। কারণ নূতন বন্দোবস্তের জন্য "আলোচনা" দুই মাস বাকী পড়ে গেছে; এখন আর নূতন সুরে বাঁধা বাঁশী এতদূরে আসিয়া বাজাইলে ভালই বা লাগিবে কেন—আর শুনিবেই বা কে? তাই সে বিষয়ে বিরত রহিলাম। মঙ্গলময়ী মহামায়ার নাম স্মরণই আমাদের কাজের মঙ্গলাচরণ—তাঁহার নাম করিয়া অগ্রসর হওয়াই আমাদের কাজের উদ্যম-উদ্দীপনা। আজ ভক্তিভরে তাঁহারই পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আমরা আবার নব উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম। উৎসাহ আমাদের, সিদ্ধি-ঋদ্ধি তাঁরই মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ।

১৩২৮ সালে "আলোচনা" পঞ্চবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। গত বৎসর পত্রিকা পরিচালনে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক হইয়েছে; কিন্তু স্বইচ্ছায় তাহা করি নাই। নানা প্রকার দৈব দুর্ব্বিপাকে—দুরন্ত বেরিবেরীর প্রকোপে পড়িয়া "আলোচনার" ঠিকমত সেবা করিতে পারি নাই। পুত্র-কলত্রের পীড়া, নিজের মৃতকল্প অবস্থাই ইহার প্রধান কারণ। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য আমরা গ্রাহক-বর্গের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

এবার "কর্ম্মযোগ বৈদ্যুতিক মেসিন যন্ত্রে" "আলোচনা" ছাপা আরম্ভ হইল। কাগজের অঙ্গ-সৌষ্ঠবও সময় অনুসারে যথাসম্ভব পরিপুষ্ট করা হইল। এক্ষণে আপনারা (গ্রাহকগণ) পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের প্রতি সমভাবে সদয় থাকিলে কার্য্যে আর কোন বাধা-বিঘ্ন ঘটিবে না। কর্ম্মযোগ প্রেসের সুদক্ষ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ মহাশয় ইহার পরিচালনের ভার লইয়াছেন বলিয়া আশা হয় অচিরেই ইহার ক্রমোন্নতি

সাধিত হইবে। এক্ষণে আসুন, মায়ের নামে আবার আপনাদের আদরের "আলোচনাকে" আদর-আপ্যায়নে আপ্যায়িত করিয়া ক্রোড়ে গ্রহণ করুন। অলমিতি।

সম্পাদক।

সভ্য জাতির সমর-নরমেধ

অর্থাৎ

মহাত্মা টলস্টয়ের লিখিত—যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রবন্ধ চতুষ্টয়।

(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ)

(১)

ট্রান্স্‌ভাল যুদ্ধের কারণ।

অমুক রাষ্ট্রনায়কের দোষেই বর্ত্তমান যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, এইরূপ যাহারা বলে, তাহাদের মতে আমি মত দিতে পারি না।

মদের আড্ডায় দুই মাতাল মদ খাইয়া তাস খেলিতে খেলিতে যদি মারামারি করে, তাহাদিগের মধ্যে কে দোষী এবং কে নির্দ্দোষী, ইহার বিচার করিতে হইলে, আমার মনে হয়, উভয়ের দোষই সমান। মদের আড্ডায় যাওয়া, মদ খাওয়া, মাত্‌লামী করা এবং তাস খেলা—এই সকলই দোষেরকার্য্য, এবং ইহাই উহাদিগের কলহের কারণ।

ঠিক সেইরূপ, যখন কোন যুদ্ধ বাধে, যাহারা বলে, 'অমুকের দোষেই এই যুদ্ধ বাধিল, অমুকই ইহার জন্য দায়ী, তাহাদের সহিত আমার মতের ঐক্যতা নাই। একথা স্বীকার্য্য, একপক্ষের অপরাধ গুরুতর, এবং অপর পক্ষের প্রতি উহার আচরণ অধিকতর গর্হিত হইতে পারে; কিন্তু পক্ষবিশেষের দোষের এইরূপ তারতম্যের বিচার দ্বারা যুদ্ধের প্রকৃত কারণ

কখনও স্থির করা যায় না। যে কারণে জগতে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর এবং অমানুষিক ঘটনার অনুষ্ঠান হয়, তাহার মূল স্বতন্ত্র স্থানে।

নেহাৎ চক্ষু বুজিয়া না থাকিলে, বর্ত্তমান ট্রান্সভাল যুদ্ধের কারণ, কিম্বা আর যে সকল যুদ্ধ সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, তাহার কারণ, খুব স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিবিধ কারণ হইতে এই সকল যুদ্ধের সংঘটন হয়ঃ—প্রথম কারণ, ধন সম্পত্তি বিভাগের অসামঞ্জস্য, অর্থাৎ মনুষ্য সমাজের এক শ্রেণীর উপার্জ্জিত অর্থ, অপব একশ্রেণীর লোক সর্ব্বদাই লুণ্ঠন করিয়া খাইতেছে।

দ্বিতীয় কারণ, সমাজের মধ্যে একদল যোদ্ধার আবির্ভাব। ইহারা মনুষ্যহত্যা করিবার নিমিত্তই সুশিক্ষিত হইয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া আছে।

তৃতীয় কারণ, কপট ধর্ম্ম-শিক্ষা অর্থাৎ আমাদের খৃষ্টীয় যুবকগণের প্রতি কুতর্ক এবং মিথ্যা পরিপূর্ণ ধর্ম্মোপদেশ। যথা, এই যুদ্ধ না করিলেই নয়, মনুষ্যজাতির জন্য, খৃষ্ট ধর্ম্মের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য, দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য, দুষ্টদমনের জন্য আমরা এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছি, ইহাতে আমাদের কোনরূপ স্বার্থই নাই, ইত্যাদি মিথ্যা হেতুবাদ।

অতএব চেম্বারলেন্ কিম্বা উইলিয়ম প্রমুখ রাষ্ট্রনায়কগণ যে এই সকল যুদ্ধের কারণ, তাহা আমার মনে হয় না। ইহারা কেবল নিমিত্তমাত্র। যুদ্ধের যাহা প্রকৃত কারণ, যাহা খুজিতে অধিক দূরে যাইতে হয় না এবং যাহার সহিত আমরাও বিজড়িত তাহা গোপন করিয়া, এই অসাব নিমিত্ত গুলিতে আমরা দোষারোপ করিয়া থাকি; চেম্বারলেন্ অথবা উইলিয়মগণের প্রতি যতই ক্রুদ্ধ হই না কেন, উহাদিগকে যতই গালিগালাজ করিনা কেন, উহাতে আমাদের অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না; উহাতে কেবল আমাদের নিজেদের মধ্যেই দ্বেষ বৃদ্ধি পায়; বস্তুতঃ ঘটনার স্রোত কিছুমাত্রই পরিবর্ত্তিত হয় না।

কারণ, চেম্বারলেন্ বা উইলিয়মগণ প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায়। ইহাদের পশ্চাতে.

স্বতন্ত্র শক্তি ক্রিয়া করে।*এবং ইহারা সেই শক্তির বশে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। এই শক্তির বিরুদ্ধে ইহারা কিছুতেই দাঁড়াইতে পারে না। ট্রান্সভাল্ যুদ্ধ যেমন এইরূপ কারণ পরম্পরার ফল, ইতিহাসের অতীত যুদ্ধের ঘটনাগুলিও ঠিক সেইরূপ। অতএব যখন আমরা বুঝিতে পারি, যে আমরাই প্রকারান্তরে যুদ্ধের উল্লিখিত ত্রিবিধ কারণের সহিত কোন না কোন প্রকারে জড়িত আছি, এবং কোন না কোন প্রকারে এই নরহত্যা কার্য্যে সহায়তা করি, এবং এই রাষ্ট্রনায়কগণ আমাদেরই হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় কার্য্য করে, তখন আর ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া, বা তাহাকে ভর্ৎসনা করা, সম্পূর্ণ নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।

প্রথমতঃ শুধু টাকার দৌলতে আমরা যতদিন বড়মানুষী করিতে থাকিব, এবং ধনী বলিয়া, ব্যবসায়ের লভ্যের অধিকাংশ ভাগ, যতদিন আমরা ছলে, বলে বা কৌশলে,যে কোন প্রকারেই হোক্, নিরক্ষর শ্রমজীবিদিগকে বঞ্চনা করিয়া আত্মসাৎ করিব এবং শ্রমজীবিগণ আমাদের কল কারখানায়, কিম্বা কারবারে, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত শুধু পরিশ্রম করিয়া মরিবে, ততদিন পৃথিবীতে এইরূপ যুদ্ধ ঘটিবে। ব্যবসায় বাণিজ্য হাটবাজার একচেটিয়া করিবার জন্য নিত্যই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইবে; যুদ্ধ করিয়া বসুন্ধরার ধন-রত্নাদি নিজের করতলে রাখিবার চেষ্টা সর্ব্বদাই বৃদ্ধি পাইবে। পৃথিবীর হাটবাজার গুলি হাতে রাখিতে হইবে; সোণার খনিগুলিও আমাদের দরকার হইবে। কারণ ঐগুলি নেহাৎ দরকার; না হইলেই আমাদের চলিতে পারে না, সম্মান বজায় থাকে না, মূল ধনের পরিমাণ কমিয়া যায়; অর্থবল কমিয়া গেলে, লোকবল চিরকাল পদতলে রাখিয়া বড়মানুষী করাটা অসম্ভব হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়তঃ, যতদিন আমরা এই সামরিক বিভাগে কার্য্য করিতে থাকিব এবং আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সহানুভূতি দ্বারা ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পরিপুষ্ট করিয়া রাখিব; ভাই হইয়া, ভাইয়ের বুকে

ছোরা মারিয়া, অমুক জেনারেল, কমাণ্ডার বা রাজা মহারাজার জয় জগতে ঘোষণা করিয়া, নরক গুলজার করিয়া তুলিব, দশ, বিশ, পঁচিশ মুদ্রা বেতনের জন্য ভাইয়ের বুকে গুলি মারিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিব না, যাহাদের বুকে গুলি মারিতেছি, সেই বেতন তাহাদেরই কিম্বা, আমাদেরই উপার্জ্জিত অর্থ—আমরাই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া ঐ অর্থ রাজস্ব বা শুল্কস্বরূপে, অপরের হস্তে তুলিয়া দেই এবং পুনরায় তাহারই নিকট হইতে বেতন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, অমুকের নুণ খাই বলিয়া, ভাইয়ের বুকে গুলি মারি; —কেন মারি? কারণ আমরা নকর সাজিয়াছি। কোন একটা অত্যাচারী দস্যু বা শাসন-সম্প্রদায়ের 'ফৌজ' হইয়াছি। কিসের জন্য? ভাইয়ের বুকে গুলি মারিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিব, সেইজন্য। আমিও যে মানুষ, যাহাকে মারিব, সেও সেই মানুষ। জীবনের মায়া, সুখদুঃখ, ইহপরকাল, আমারও যেমন, তাহারও তেমন। আমি যেমন মরিতে চাই না, বাঁচিয়া থাকি, এই ইচ্ছা করি; সেও সেইরূপ করে। তথাপি, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, নীতি ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে, জগৎপিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিব,—এই আমাদের শিক্ষা, ইহাই আমাদের সভ্যতা, এই শিক্ষার জন্য আমরা কত লালায়িত,—এই সভ্যতার ক্রোড়ে আমরা লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত বলিয়া পৃথিবী-প্রথিত! ধন্য শিক্ষা! ধন্য সভ্যতা!

এই সমর বিভাগের সমস্ত উপাদানই আমরা যোগাই। ইহাকে উৎপাটিত না করিয়া, যতদিন আমরা এই ব্যবসায়টাকে পরিপুষ্ট করিয়া রাখিব, ততদিন যুদ্ধ অনিবার্য্য, ততদিন জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে, এই লোমহর্ষণ নরহত্যারূপ সমর-ক্রীড়া চলিতে থাকিবে।

আমরাই সৈনিকের কার্য্য করি। এই কার্য্য যে কেবল প্রয়োজনীয় তাহা নহে, অতীব প্রশংসনীয়ও মনে করিয়া থাকি। পরে, যখন কোন যুদ্ধ বাধে, এবং জগৎ-জোড়া অনর্থ আরম্ভ হয়, তখন চেম্বারলেন

কিংবা অন্য কোন রাষ্ট্রসচিবকে অপরাধী সাব্যস্ত করি।

মোটের উপর, জগতে ততদিন যুদ্ধ থাকিবে, যতদিন আমরা এই বিকৃত ধর্ম্মের উপাসনা করিব। যাহার নাম বর্ত্তমান "খৃষ্টান চার্চ্চ"—যে চার্চ্চের অনুমোদিত এই সকল বিশাল সামরিক বাহিনী,—যে সকল বাহিনী প্রেমাবতার যীশু খৃষ্টের প্রিয় শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়,—যে সৈন্যসংঘ যীশু খৃষ্টকে অত্যন্ত ভালবাসে বলিয়া জগতে প্রচার করে,—প্রকৃত পক্ষে বন্দুক কামানই যাহাদের আরাধ্য দেবতা এবং এই সকল ভয়াবহ আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যেই যাহারা খৃষ্টের পবিত্র ধর্ম্মযুদ্ধের ছলনায়, জগৎ জয় করিয়া বেড়ায় এবং আত্মেন্দ্রিয় চরিতার্থ করে। এই সকল যতদিন আমরা সমাজে থাকিতে দিব, ততদিন জগতে যুদ্ধের অবসান হইবে না। আমরা নিজেরাও এই আসুরিক ধর্ম্মের যাজক এবং আমাদের সন্তান সন্ততিকেও এই ধর্ম্ম উপদেশ দেই। পরে যখন যুদ্ধ বাধিয়া ভীষণ নরহত্যা আরম্ভ হয়, তখন চেম্বারলেন্ বা ক্রুগার, কিংবা অপর কাহাকেও অপরাধী স্থির করিয়া শাস্তি দিতে উদ্যত হই।

এই সকল কারণেই—যাহা উল্লিখিত হইল,—আমি সাধারণের সঙ্গে, যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে একমত হইতে পারি না। চেম্বারলেন্, উইলিয়াম্ বা ক্রুগার প্রভৃতি এই মহা অনর্থের অন্ধযন্ত্র বা নিমিত্তগুলিকে দোষারূপ করিতে পারি না। যখনই যুদ্ধের বিষয় চিন্তা করি, তখনই ইহার কারণ সকল, সর্ব্বদাই এইরূপ স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। আমরাই যাহার কারণ এবং ইচ্ছা করিলেই যদি সেই কারণগুলিকে বৃদ্ধি বা অপসারিত করিতে পারি, তাহা হইলে আর কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর দোষারোপ করিয়া কি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায়?

লোকহত্যাকারী ভয়ানক যুদ্ধ বিগ্রহের প্রতি যাঁহাদের আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা, যাঁহারা সত্য সত্যই জগতে সত্য ও ধর্ম্মের সেবা করিতে চাহেন, তাঁহাদের তিনটী কর্ত্তব্য আছে:—

(১) জগতের সকল মনুষ্যকেই সহোদর

স্থানে, বিষয় সম্পত্তি বা অর্থের সমান ভাগ করিয়া দিতে হইবে। ভাগ্যবলে আমি যে বেশী সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছি অতএব আমি বেশী ভোগ করিব, এই লোভ ছাড়িতে হইবে।

(২) সামরিক বিভাগে, যে কোনরূপ কার্য্য করা হইতে আমাদিগকে বিরত হইতে হইবে এবং এই কার্য্য যে প্রশংসনীয়, লোকের যে এইরূপ মোহ বা ভ্রান্ত ধারণা, তাহা দূর করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে ইহারা যে ভাড়াটীয়া বা বেতনভোগী ঘাতক, ইহাই সকলকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।

(৩) খৃষ্টের যাহা পবিত্র এবং উদার ধর্ম্ম, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। যে বিকৃত ধর্ম্মের অনুসরণে যুবকগণকে বাধ্য করা হয়, ধর্ম্মযাজকগণের সেই ভণ্ডামি একবারে নষ্ট করিতে হইবে।

তাঁরে যদি পেতে চাও।

(উপেন্দ্রনাথ)

হৃদয় কহিছে ডাকি'
তাঁরে যদি পেতে চাও।
যাহা কিছু আছে তব,
সব দেও, সব দেও।

আপনি পুড়িয়া ধূপ
গন্ধ করে সবে দান।
সেইরূপ বিলাইয়া
দেও আপনার প্রাণ।

পতঙ্গ পাবকে যথা—
দেয় আত্ম-বিসর্জ্জন।
দিতে হবে সেইরূপ
তাঁরে দেহ প্রাণ-মন।

বাসনার শেষ আর
পিপাসার অবসান
মুক্ত মান অপমান
সেই হৃদে তাঁর স্থান।

শিমুল তত্ত্ব।

(শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।)

সাধারণের চক্ষে শিমুল নগণ্য পদার্থ। কারণ আমরা শিমুলের তুলা ব্যতীত শিমুল গাছের অন্য ব্যবহার আদৌ অবগত নহি। এই জন্য নির্গুণ কোন কিছুর সহিত তুলনা দিতে হইলে আমরা শিমুল ফুল এবং মাকাল ফল প্রভৃতির সহিত তুলনা দিয়া থাকি। ইহার গাছ বেশ প্রকাণ্ড হয়; কিন্তু কাষ্ঠ ততদূর কার্য্যোপযোগী নহে। ফুলগুলিও দেখিতে খুব লালবর্ণ, দর্শনের শোভা ব্যতীত কোন গুণ নাই, এমন কি একটু গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। শিমুলের ফলগুলিও বেশ সুন্দর, কিন্তু মনুষ্য দূরে থাকুক পক্ষীতেও ইহা স্পর্শ করে না।

আমাদের নিকট শিমুল নগণ্য পদার্থ বটে; কিন্তু আমাদের প্রাচীনকালের ঋষিরা ইহার অশেষবিধ গুণের কথা লিখিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে শিমুলের নিম্নলিখিত গুণগুলি বর্ণিত আছে :—

নাম :—

"শাল্মলিস্তু ভবেন্মোচা পিচ্ছিলা পুরণীতি চ
রক্তপুষ্পা স্থিরায়ুশ্চ কণ্টকাঢ্যা চ তুলিনী॥"

অর্থ—

শাল্মলি, মোচা, পিচ্ছিলা, পূরণী, রক্তপুষ্পা, স্থিরায়ুঃ, কণ্টকাঢ্যা ও তুলিনী এই কয়েকটী শিমুলের নাম।

গুণ :—

"শাল্মলী শীতলা স্বাদ্বী রসে পাকে রসায়নী।
শ্লেষ্মলা পিত্তবাতাস্রহারিণী রক্তপিত্তজিৎ।

অর্থ—

শিমুল—শীতবীর্য্য, মধুর রস, মধুর বিপাক, রসায়ন, কফকারক এবং পিত্ত, বাতরক্ত ও রক্তপিত্তনাশক।

শিমুলের আঠা :—গাছ কাটিলে জলবৎ এক প্রকার রস নির্গত হয়, ইহাকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে "মোচ রস" বলে।

মোচরসের নাম ও গুণ :—

"নির্য্যাসঃ শাল্মলেঃ পিচ্ছা শাল্মলীবেষ্ট-
কোঽপি চ।

মোচাস্রাবো মোচরসো মোচনির্য্যাস ইত্যপি
মোচাস্রাবো হিমো গ্রাহী স্নিগ্ধো বৃষ্যঃ
কষায়কঃ।
প্রবাহিকাতিসারামকফপিত্তাস্রদাহনুৎ ॥”

অর্থ—

শাল্মলীর নির্য্যাসকে মোচরস বলে। পিচ্ছা, শাল্মলীবেষ্টক, মোচাস্রাব, মোচরস ও মোচনির্য্যাস এই কয়েকটী উহার পর্য্যায়। মোচরস—শীতবীর্য্য, ধারক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস এবং প্রবাহিকা অতিসার, আমদোষ, কফ, পিত্তরক্ত ও দাহনাশক।

শিমুলের ছাল ঃ—শিমুল গাছের ছালের উপর যে কাঁটা হয়, তাহার মধ্যে নরম নরম দেখিয়া দুই তিনটী তুলিয়া জলে বাটিয়া ফোড়ার উপর প্রলেপ দিলে সহজে ফাটিয়া যায়।

শিমুল ফুল ঃ—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, তাজা শিমুল ফুল, ঘৃত ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে পাক করিয়া সেবন করিলে স্ত্রীলোকদিগের দুরারোগ্য প্রদর ব্যাধি নিশ্চয়ই দূরীভূত হয়। এতদ্ভিন্ন শিমুল ফুল হইতে এক প্রকার উৎকৃষ্ট লাল রং প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শিমুল কাষ্ঠ ঃ—শিমুল গাছ অতিশয় প্রকাণ্ড হয়, এজন্য ইহার তক্তাও বেশ প্রশস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অল্প দিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়, এ কারণ কেহ ইহা হইতে তক্তা প্রস্তুত করে না। কেহ কেহ বলেন যদি চূণের জলের সহিত ইহার তক্তা ভিজাইয়া রাখিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া পরে বাক্স, জানালা, দরজা প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে বেশ মজবুত হয়। ইহা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না।

শিমুল বীজ ঃ—জার্ম্মাণী ও অন্যান্য দেশে শিমুলের বীজ হইতে এক প্রকার ঈষৎ পীতবর্ণ তৈল প্রস্তুত হইয়াছে। এই তৈল ‘সুইট অয়েলের’ পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয়। এই তৈল প্রস্তুত করা কঠিন নহে, ঘানি দ্বারা যেরূপে সরিষা রেড়ী প্রভৃতি হইতে তৈল বাহির হয়, ইহাও সেইরূপ করিলে হইতে পারে। ইহার প্রথা এদেশে নাই, কিন্তু এক্ষণে এই

তৈল বাহির করিতে পারিলে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়। কারণ এ দেশে সর্ব্বত্রই প্রচুর শিমুল গাছ আছে, এবং ইহার বীজও যথেষ্ট অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। অধিকন্তু যুদ্ধের জন্য রেড়ীর তৈল প্রভৃতির দরও অত্যন্ত মহার্ঘ হইয়াছে, এই সময় ইহার তৈল বাহির করা বিশেষ আবশ্যক।

শ্বেত শিমুল ঃ—ইহার কোমল শিকড় গুলি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া দারুচিনি, ছোট এলাচ প্রভৃতির সহিত চূর্ণ করিয়া পানের সহিত সেবন করিলে পুংশক্তি অত্যধিক বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা রাত্রিকালে বার বার প্রস্রাব করেন, তাঁহারা যদি প্রাতঃকালে আফুলা গাছের কচি শিকড় ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া চিনির সহিত চিবাইয়া খান, তাহা হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ উপকার পাইবেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা রাত্রিতে অনেকবার প্রস্রাব করে, তাহাদিগকে এই ঔষধ ব্যবহার করাইলে শীঘ্র উপকার দর্শে। ইহা খাইতেও বেশ মুখরোচক।

সুতরাং এই সমস্ত দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে শিমুল আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় সামগ্রী। একটা প্রবাদ আছে "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পেতে পার অমূল্য রতন।"

দেবতা।

(কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।)

(১)

দেবতা আমার জন্মভূমি,
স্নিগ্ধ শীতল বক্ষ যাঁর,
প্রাণ বাঁচায় দিয়ে সদাই
অমিয় মধুর শস্য-ভার।
মধুর সলিল মধুর অনিল
চির মধুর অনন্ত সম্ভার,
প্রাণ দেবতা সেই'ত আমার—
স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ সার॥

(২)

দেবতা আমার মাতা পিতা,
স্নেহপূর্ণ হৃদয় যাঁর,
সুখে-দুঃখে শান্তি নিলয়,
কিবা সুখের পারাবার।
বর্ষে যাঁদের পূত দয়া
আশীষরূপে অনিবার,
তাঁরাইত মোর জাগ্রত দেবতা
করুণার অবতার॥

(৩)

দেবতা আমার স্বদেশ-ভক্ত,
আকুল যাঁহার সদা প্রাণ,
দেশের লোকের কিসে হবে
সুখ-সুবিধা উন্নতি-উত্থান।
আপন স্বার্থ পদে দলি
পরের চিন্তায় অনিবার
মগ্ন থাকি যে জন সুখী,
সেই'ত দেবতা এ ধরার॥

(৪)

দেবতা আমার প্রেমিক-ভক্ত,
কাঁদে যাঁহার সরল প্রাণ,
হেরিবারে বিশ্বনাথে,
বিশ্বরূপ যাঁর সদা ধ্যান।
চূর্ণ করি বৈভব গর্ব্ব
ত্যাগের মন্ত্র প্রাণে যাঁর,
প্রাণ দেবতা সেই ত আমার
সে রাজর্ষি এ ধরার॥

(৫)

দেবতা আমার বিশ্ব-প্রেমিক,
বিশাল হৃদি বিশাল মন,
বিশ্বপ্রাণী প্রাণের চেয়ে
যাঁহার সদা আপন জন।
পরের মাতা যাঁহার মাতা,
পরের পুত্র পুত্র যাঁর,
জাগ্রত দেবতা সেই ত আমার
মাণিক রতন বসুধার॥

স্ত্রী-শক্তি সাধনা।

(শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন।)

প্রায় পুরুষ মাত্রেই স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে অনেকে স্ত্রী-শক্তির আদর করেন না। পরন্তু তাহার দ্বারা সংসারে সকল কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াও তাহার অবমাননা করিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছাড়িয়া দিলে, স্থূল দৃষ্টিতেও দেখা যায়, সংসারে স্ত্রীশক্তি প্রায় সমস্ত কার্য্যে সাহায্য করে। সেই জন্য স্ত্রী গৃহিণী গৃহলক্ষ্মী। আধ্যাত্মিক ভাবে স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গী ও সহধর্ম্মিণী। যে নিজের অঙ্গকে অধিকার করে,—ধর্ম্ম উপার্জ্জনে অর্দ্ধাংশ-ভাগিনী; সে স্ত্রী কত আদরের কত গৌরবের তাহা কি এক মুখে বলা যায়? ইহার উপর স্ত্রীর অভাবে পুরুষ জীবন্মৃত হয়;—সংসার শ্মশান হয়। এ দৃশ্য নিত্যই চক্ষুর উপর খেলা করে।

মানুষের সুখের একজন প্রেরক আছেন, তিনি ঈশ্বর—তাঁহার উদ্দেশ্য বা আদেশ পালন করিতে তাঁহার ক্রীড়ণক রূপে মানুষের জন্ম—ইহাই সৃষ্টি। এই সৃষ্টিরক্ষার জন্যই ঐশ নিয়মে বিবাহ পদ্ধতি অর্থাৎ পুরুষের সহিত স্ত্রীর মিলন। এই স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন ও তাহাদের ক্রীড়া প্রত্যক্ষ ব্যাপার হইলেও সৃষ্টিরক্ষাই পরোক্ষ ব্যাপার অর্থাৎ পরমেশ্বরের সৃষ্টি-ক্রীড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। মানুষ ইচ্ছা করিয়া সে ক্রীড়া রক্ষায় মন না দিতেও পারে, এই নিমিত্ত সর্ব্বসিদ্ধিময় সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন পরমেশ্বর স্ত্রী-পুরুষের হৃদয়ে এমন কৌশলে আসঙ্গলিপ্সা ও তজ্জনিত কামক্রীড়ার সৃষ্টি করিয়াছেন;—যে মানুষ সৃষ্টিরক্ষা ভুলিয়া গেলেও—তাহার আত্ম-সুখ-সাধনের ক্ষেত্রেই সময়ে সৃষ্টিরক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইবেই—মানুষ তাহা জানিতেও পারিবেনা। এই জন্যই স্ত্রী প্রকৃতি,—পুরুষ চৈতন্য। এই প্রকৃতি সহিত চৈতন্যের অধ্যাস ঘটিলেই জীবের সৃষ্টি হয়। যদি তাহাই হয়, তবে স্ত্রী

মাত্রেই যে কত আদরের তাহা সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

স্ত্রী পুরুষ পরোক্ষ ভাবে ক্রীড়াচার, একের অভাবে অপরে নিষ্ক্রিয়; তথাপি সকল ধর্ম্মবাদিগণই স্ত্রী-শক্তিকে অত্যধিক সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। লোকে বলে স্ত্রীর শক্তি নাই, সে কথা সংসার ক্ষেত্রে ঘটিলেও আর একটু উর্দ্ধতর ব্যাপারে স্ত্রী-শক্তির প্রাচুর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। শিক্ষায় স্ত্রীশক্তি একদিন ভারতে যুগান্ত আনয়ন করিয়াছিল। বাক্ খণা লীলাবতী প্রভৃতি বরারোহাগণের নাম এখনও লোকসমাজে লোমাঞ্চ আনিয়া ফেলে। মণ্ডন মিশ্রের পত্নী উভয় ভারতী একদিন শঙ্করাংশ ভরতজয়ী শঙ্করাচার্য্যের সহিত অদ্বৈতবাদ খণ্ডনে বিচারাসনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ শক্তি স্ত্রীর পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের নয়। শুধু ইহাও নয় দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবস্ত্রীগুলি সর্ব্বশক্তি দান করায় হিন্দু মাত্রেরই সাধ্যা।

শিব-শিষ্য অপ্সরগণ শিববরে অজেয়, কিন্তু মহাশক্তি দুর্গার করে তাহারা পরাজিত ও নিহত। কেন এরূপ হয়?—স্থূল চক্ষে দেখায় যেন পত্নী শক্তির নিকট শিব অপমানিত। কিন্তু যে শক্তি একদিন শিবনিন্দাশ্রবণে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি কি শিব-শিষ্যগণকে ধ্বংস করিয়া তাঁহার অবমাননা করিতে পারেন? ইহা তাহা নয়,—ইহার ভিতরের কথা শিব-শক্তির উৎকর্ষ সাধন। কেন না পূর্ব্বেই বলা হইযাছে—স্ত্রী প্রকৃতি,—পুরুষ চৈতন্য। প্রকৃতি ত জড়,—চৈতন্যের যোগে তাহার শক্তি! শিবসংযোগে সেই প্রকৃতি এত দূর ক্রীড়াবতী, এত দূর শক্তিশালিনী যে, সেই শক্তিতে তাঁহার (শিবের) শক্তিকেও নিষ্প্রভ করিতে সমর্থ। একের গৌরবে বা শক্তিতে অপরে গৌরবাত্মক বা শক্তিশালী হইলে, সে গৌরব গৌরবদাতারই হইয়া থাকে। এই জন্যই শক্তির পদতলে শিব অর্থাৎ মঙ্গল লুণ্ঠিত হইয়া, মঙ্গল যে শক্তির অধীন তাহাই প্রদর্শন করিতেছে। সেই জন্যই সরস্বতী স্বরূপ জয়দেবের বেশে নটবর কৃষ্ণ জয়দেবের গীতগোবিন্দে

'দেহি পদপল্লবমুদারম্' শ্লোকাংশ লিখিয়া, স্ত্রী শক্তির প্রাচুর্য্য রক্ষা করিয়াছেন। এই জন্য শুক শারিকার বিবাদে—শুক বলে 'আমার কৃষ্ণ গিরি ধ'রেছিল'—সারী বলে 'আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল'—এই বাক্যে সাধক আত্মহারা হইয়া—স্ত্রী শক্তিকে শীর্ষ স্থানে রাখিয়াছেন।

এদিকে ঈশ্বরের অবতার রামচন্দ্র ইচ্ছা করিলে, শত রাবণকে ধ্বংস করিতে পারিতেন, কিন্তু তবু তিনি স্ত্রী শক্তির প্রাধান্য ও সম্মান রক্ষার জন্য শক্তির আরাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সীতা শক্তিই অসিতারূপিনী মহাশক্তি; সেই শক্তিই রামচন্দ্রের শবমুখে বসিয়া ত্রিলোক-জয়ী রাবণের শক্তিকে ধ্বংস মুখে বসাইয়াছিল।

স্ত্রী শক্তির এইরূপ প্রাবল্য ও প্রাধান্য হেতুই শিবোক্ত তন্ত্রে স্ত্রীর সহিত শব-সাধনা বা শক্তিলাভের ব্যবস্থা আছে। এই জন্যই শিব নিজ মস্তকে গঙ্গাকে ধরিয়া তাঁহার বিশ্ব ধ্বংসকারিণী শক্তিকে, নিজ শক্তিতে মিলাইয়া গঙ্গাধর নামে অভিহিত ও পূজ্য। বৃন্দাবন-বিহারী কৃষ্ণ রাধিকার কুঞ্জে দ্বারী ও সময়ে তাঁহার স্কন্ধে রাধিকা! এ সকল প্রেমের খেলা ধরিলেও, সে প্রেম মানবিক কলুষিত প্রেম নয়, কামগন্ধশূন্য পবিত্র সৃষ্টিরক্ষার প্রধান উপকরণ বা মাধুর্য্য রস।

এই মাধুর্য্যরসই পতিপত্নীর অমল প্রেমের নিদর্শন। শুধু ইহাই নয়, স্ত্রী-শক্তিতে বাৎসল্য সখ্য দাস্য প্রভৃতি রস বা ভাব গুলি দেদীপ্যমান, এই নিমিত্তই স্ত্রীশক্তিতে এত শক্তি বর্ত্তমান। এই নিমিত্তই উর্ব্বরমস্তিষ্ক ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণ স্ত্রী-শক্তির সাধন পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যসমাজে এই পদ্ধতিই বরাবর চলিয়া আসিয়াছিল। সমস্ত শাস্ত্র ও নীতি পুস্তকও স্ত্রী-শক্তির সম্মানের পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু জানিনা কেন আজকাল অনেক স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। স্ত্রী যেন কেবল শয্যাসঙ্গিনী ও কামলিপ্সা চরিতার্থ সাধনের যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়!

নারীর একটি নাম 'অবলা',—এ শব্দ

যে অর্থে ব্যবহৃত, তাহা না বুঝিয়া অনেকে প্রকৃতই তাহার 'বল' বা 'শক্তি' নাই—ইহা ধরিয়া তাহার প্রতি সংসারে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'অবলা'র অর্থ যথার্থই 'বলশূন্যা'—সেটা স্বামীর নিকট; ইহা পতিপ্রাণার জীবনে স্বামীর গৌরব রক্ষা। আর আধ্যাত্মিক ভাবেও প্রকৃতি জড়,—পুরুষ চৈতন্য,—চৈতন্যের যোগে প্রকৃতি ক্রীড়াবতী—তাহা হইলে স্ত্রী স্বামীর নিকটই অবলা; তা' বলিয়া তাহার যে বল বা শক্তি নাই ইহা মনে করিলে, সত্যের অপলাপ জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। মহাদেবী সাবিত্রীর শক্তি কে না জানে? সেই কিশোর অবস্থায় পতিপ্রাণা পতিদেবতা মানবী সাবিত্রী স্বামীর আদরে উৎফুল্লা ও স্বামিপ্রদত্ত সম্মানে গৌরবান্বিতা হইয়া যমের নিকট হইতে মৃত স্বামীর জীবন লইতে সমর্থা। পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে স্বামিসঙ্গিনী দ্রৌপদী অচিন্ত্য শক্তিতে, শূন্য পাকস্থালী হস্তে, অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে ষষ্ঠি সহস্র শিষ্য সহ চিরোগ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসার অতিথিসৎকার করিয়াছিলেন। দক্ষকন্যা সতীর নিকট একটি উষ্ণনিঃশ্বাসে—এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রুপাতে, পিতা হইলেও, দেবস্তুত হইলেও, প্রজাপতি দক্ষের ছাগমুণ্ড! ইত্যাদি চরিত্রাখ্যানে স্ত্রীশক্তির সামান্য মাহাত্ম্য বলিয়া বোধ হয় না।

আধুনিক যুগেও পুণ্যবতী অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রভৃতি নারীজীবন কি শক্তিতে শত্রুদমন করিয়া বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন? একবার ইউরোপের দিকে তাকাইয়া দেখিলে, কত নারী কত দিকে কত কার্য্য সাধনে ব্যাপৃতা থাকিয়া পুরুষ শক্তিকেও হারাইয়া দিতেছেন, তাহার উপলব্ধি হয়। ভারতের কত নারী পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্ভারে কৃতিত্ব দেখাইয়া কার্য্যক্ষেত্রে সামান্য বুদ্ধিগত 'অবলা' নামকে 'সবলা' করিতেছেন। ইহা কি স্ত্রী-শক্তির সম্মান নয়? প্রাবল্য বা প্রাধান্য নয়?

যদি স্ত্রী-শক্তির এত সম্মান, তবে কেন তাহা সাধ্যা নয়? তাহার সম্মান রক্ষাই সাধনা—স্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলেই

সে স্বামীর নিকট মাতৃসম্মান লাভ করে। অতএব সংসারে সুখ ও পরে শান্তির প্রত্যাশী হইতে হইলে, স্ত্রী-শক্তিকে মানিয়া তাহার সম্মানরক্ষার সাধ্যমত চেষ্টা করা প্রত্যেক মানবেরই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাহার যোগে ঐ শক্তি, শত শক্তিতে বাধা বিঘ্ন দূর করিবে—উন্নতির মুখ প্রশস্ত করিবে। সংসার যে অসুরের নিরয়—জ্বালাময়ী শিখার সঞ্জাত স্থান ইহা আর কাহারও মুখে ধ্বনিত হইয়া তাহার কণ্ঠ দূষিত করিবে না। এখন সেই সংসারে পুত্র কন্যা লইয়া তাহাকে প্রকৃতই প্রকৃতির লীলাস্থান সুখের কুঞ্জ বলিয়া বোধ হইবে। তাই বলি স্ত্রীকে শয্যাসঙ্গিনী বা সেবাদাসী মনে করিও না;—স্থূল চক্ষে উহা দেখিলেও তুমি জ্ঞানবিবেকসম্পন্ন মানব—তোমার ত শুধু স্থূল দৃষ্টি নয়,—সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখ, নতুবা প্রত্যবায় আছে। দেখিলে জানিবে স্ত্রী-শক্তিই তোমার সর্ব্ববিধ ও সার্ব্বজনীন শক্তি। ঐ দেখ ঐ শক্তির রূপ দশমহাবিদ্যার নিকট শিবগীত। এ ভয় কি জান? ইহা স্ত্রীর নিকট স্বামীর ভয় নয়,—স্ত্রী-শক্তির নিকট বিশ্ব পরাস্ত—সর্ব্ববিধ মণ্ডলের উৎপত্তি বা ধ্বংস—ইহারই প্রদর্শন। এই প্রদর্শনেই স্ত্রী বিশ্বমাতৃকা—বিশ্বস্তত—বিশ্বপ্রেমে গড়া ইহাই জানিতে পারা যায়। সেই জন্যই সমস্ত শক্তি বিধেয়—বরদা—অভয়া। তাহার সাধনাতেই এ সকল পাওয়া যায়। তুমিও তোমার স্ত্রীকে বা স্ত্রী-শক্তিকে সেই সম্মান দাও—দেখিবে আপনি সাধনা আসিবে, তখন বীরাসনে বসিয়া, আপনাদের স্ত্রী-পুরুষকে প্রকৃতি-পুরুষ ভাবিয়া আত্মহারা হইবে। ইহকালের সংসারোন্নতি ও পরকালের পাথেয় স্বরূপ কর্ম্ম ও ধর্ম্মগতি সহজলভ্য হইয়া তোমাদের স্ত্রী-পুরুষকে এক অভিনব শান্তি রাজ্য দান করিবে। তাহার ক্ষয় নাই—পরন্তু অক্ষয় বটফল তাহার মধ্যে অব্যক্তভাবে থাকিয়া নিত্য সুফল দানে উন্মুখ; সেই ফল জীবিত কালে নির্ম্মল যশঃ,—তাহার পর অমল কীর্ত্তি। সসীম মানব-জীবনে মানব আর কি চাও?

এই ত গেল স্ত্রীসম্মান রক্ষায় ও স্ত্রী-শক্তির বিকাশে মানবের বৈশিষ্ট্য লাভ।

আবার এদিকে স্ত্রীর অসম্মানে—স্ত্রীশক্তির অবিশ্বাসে পুণ্যের রঙ্গমঞ্চে পাপের পূর্ণ অভিনয় দেখিলে অবাক্ হইতে হইবে। যমজয়ী হইলেও রাবণ সীতাশক্তির অবমাননায় বনবাসী সহায়শূন্য রামের দ্বারা বংশের সহিত ধ্বংস। ভীষ্মদ্রোণ মহারথিগণের মধ্যগত থাকিলেও দ্রৌপদী শক্তির অবমাননায় ভ্রাতৃগণ সহ দুর্য্যোধন কালকবলিত। যদি স্ত্রীশক্তি সম্বন্ধশূন্য অপর পুরুষশক্তিকে এরূপভাবে নষ্ট করিতে সমর্থা,—তাহা হইলে যে পুরুষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জীবনে দেব দ্বিজ সম্মুখে আর্য্য বৈদিক মন্ত্রে যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রতি সেই পুরুষের অন্যায় ব্যবহার, ব্যভিচার দোষে কলুষিত হৃদয়ে তাহার সরল হৃদয়ে ব্যথা দেওয়া কি অল্প ধৃষ্টতা না অল্প পাপার্জ্জন। তার ফল কি? সেই স্ত্রীশক্তি ইচ্ছা না করিলেও—ভগবানের ইচ্ছায় ধ্বংস শক্তিতে যে চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধরিবে তাহার বৈচিত্র্য কি? তাই ত এই পাপে কত সংসার, কত শিক্ষিত হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে, কত সাধের হাট ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, কত কোরক অবস্থায় কুসুমে কীট ধরিতেছে।

দেখিলে, বিবাহ পদ্ধতিতে পতি-পত্নীর মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য? দেখিলে স্ত্রী-শক্তিতে আত্মশক্তি-সম্মিলনে জীবন সিন্ধু মন্থনে যে সুধার উৎপত্তি হয়, তাহার স্বাদ ও অমরত্ব দেখিলে স্ত্রীশক্তিকে ভুলিয়া পাপ পথে যাইলে তাহার অধোগতি ও ধ্বংসাভিনয়। তাই বলি, স্ত্রীশক্তির অবমাননা করিও না। তাহাকে মহাশক্তি ভাবিয়া বিশ্বজনয়িত্রী ভাবিয়া,—বরেণ্য ও সাধ্য ভাবিয়া পূজা কর। সেই সঙ্গে বিবাহের মন্ত্রগুলি স্মরণ কর, তাহা হইলেই আর তোমার মনে দ্বিধার উৎপত্তি হইবে না। কর্ত্তব্য সাধনে পুণ্যসঞ্চয় করিবে—সৃষ্টির সম্মান রাখিবে—ভগবানের অমল আশীর্ব্বাদ পাইবে; তখন সর্ব্বদা মনে উঠিবে—মুখে গাইবে,—অপর সাধারণকে মাতাইবে—'স্ত্রী-শক্তিও সাধনা'।

ভেদাভেদবাদ।

(লেখক শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী)

অদ্বৈতবাদে শঙ্করাচার্য্য, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে রামানুজাচার্য্য. দ্বৈতবাদে মাধবাচার্য্য, আর ভেদাভেদবাদে নিম্বার্কাচার্য্য। ব্রহ্মসূত্রকার "প্রতিজ্ঞা সিদ্ধেলিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ" বলিয়া এই ভেদাভেদবাদ মতটির উল্লেখ করিয়াছেন। এই মতের প্রবর্ত্তক সনকাদি ঋষি ও নারদ। উপনিষৎ-কামধেনু হইতে অনেকেই দুগ্ধ দোহন করিয়া অনেক রকম দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। দুগ্ধ কেহ জল মিশ্রিত ভালবাসেন, কেহ নির্জ্জলা খাঁটী খাইতে চাহেন, কাহারও শর্করা মিশ্র ঘন ভিন্ন মুখে রোচে না, আবার কাহাকে রাবড়ী, ক্ষীর, খোয়া খাইতেও দেখা যায়। দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত তক্র, দধি, নবনী, ছানা, মাখন, ঘৃত কত রকম সুখাদ্যই প্রস্তুত হয়। সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি বহু উপাদেয় মিষ্টান্নও দুগ্ধ হইতেই জন্মে। আমাদের দার্শনিক মতগুলিও এইরূপ। একই উপনিষৎ কামধেনুর দুগ্ধধারা হইতে প্রস্তুত। প্রবৃত্তিভেদে, রুচিভেদে, প্রয়োজনানুসারে নানা মতের সৃষ্টি। কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি অবিকৃত, কোন্‌টি উপকারক সে সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। মূলানুসারী বলিয়া আপন আপন মতের প্রাধান্য রক্ষা করিতে সকলেই বদ্ধপরিকর। বৌদ্ধ-বিপ্লব-নাশকারী শঙ্করাচার্য্য অসামান্য লিপিকুশলী এবং বড় রকমের তার্কিক বলিয়া অদ্বৈতবাদকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিতে পারিয়াছিলেন।

ভেদাভেদবাদের আর একটি নাম দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। ভেদাভেদমতে ভেদও সত্য, অভেদও সত্য। ব্রহ্ম ও জীবে ভেদও আছে, অভেদও আছে। জীবত্বে ভেদ, ব্রহ্মত্বে অভেদ। যেমন কুণ্ডলাকার সর্প, কুণ্ডলত্বে ভেদ, সর্পত্বে অভেদ। ইহাই অহিকুণ্ডল ন্যায়।

এই মতে জীব ব্রহ্মেরই একদেশ। অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ, সমুদ্র হইতে

তরঙ্গ, বৃক্ষ হইতে শাখা—তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জীব। অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ এক নহে, আবার সম্পূর্ণ পৃথক্‌ও নহে। সমুদ্র ও তরঙ্গ অভিন্ন নহে, আবার অত্যন্ত ভিন্নও নহে। বৃক্ষ ও শাখা এক ও পৃথক্ দুইই বলা যাইতে পারে। অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ সমুদ্র ও তরঙ্গ, বৃক্ষ ও শাখা যদি এক হইত, তবে নাম ভেদ হইত না। বৃক্ষেরই পর্য্যায় শব্দ শাখা হইত, সমুদ্র ও তরঙ্গ একার্থ বোধকই হইত। কিন্তু তাহা যখন নহে, তখন ব্রহ্ম ও জীব অত্যন্ত অভিন্নও নহে।

সূর্য্য ও সূর্য্যপ্রভা দুইই এক জিনিষ। আবার প্রভার আশ্রয় সূর্য্য বলিয়া প্রভা আধেয় সূর্য্য আধার; অথবা প্রভা গুণ, সূর্য্য দ্রব্য। গুণ ও দ্রব্য এক জিনিষ নহে। আবার অত্যন্ত ভিন্ন বলা যায় না। তেজস্বে সূর্য্য ও সূর্য্যপ্রভার বিশেষত্ব নাই।

এই মতে জীব ব্রহ্ম হইতে জগৎ, বিশ্বও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত জীব-জগৎ উৎপন্ন। বিশ্ব ব্রহ্ম হইতেই জাত—

যথাগ্নেৰ্বিস্ফুলিঙ্গ সমগ্রাঃ
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতহি বিশ্বং।

পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম পরমাত্মা, জীব—জীবাত্মা। আত্মত্বে উভয়ই অভিন্ন আত্মত্ব জাতি উপাধি ধর্ম্ম যাহাই বল—তাহাতে ঐ একত্ব বর্ত্তমান। আবার জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে। এই বিভিন্নতার পরিপোষক প্রমাণ উপনিষদে যথেষ্ট।

"ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানং"
ধ্যাতৃধ্যেয় ভেদ।
"পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতিদিব্যং"
এখানে গন্তৃ গন্তব্য ভেদ।
"সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি"
এস্থলে নিয়ন্তৃ নিয়ন্ত্যভেদ।

"ব্রহ্ম ও জীব ভিন্ন" এই সম্বন্ধে দ্বৈত-বাদীর সহিত ভেদাভেদবাদীর ঐক্য আছে। আবার জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদীর সহিত একতা আছে।

শ্রুতি উপনিষদে অদ্বৈতমত পরিপোষক প্রমাণ বহুতর বিদ্যমান। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" "অহং ব্রহ্মাস্মি" এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ "আত্মা বৈ ব্রহ্ম" "ব্রহ্মৈবেদং

সর্ব্ব'' ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মের ভৎত্তি'' নামরূপে ব্যাকরবাণি'' ইত্যাদি।

তবেই যখন দ্বৈতমতবোধক ও অদ্বৈত-মতবোধক শ্রুতি প্রমাণ দুইই সত্য, দুইই অনুপেক্ষণীয়। তখন দ্বৈতবাদের অনুরোধে অদ্বৈতমত পোষক শ্রুতিগুলিকে নিষ্কাষিত বা বিকৃতার্থ করা সঙ্গত নহে; আবার অদ্বৈতবাদের অনুরোধেও দ্বৈতবাদ মতানুকূল শ্রুতিসমূহকে সপ্রমাণ করাও যায় না। যাহা সত্য তাহা দ্বৈত হউক অদ্বৈত হউক দ্বৈতাদ্বৈত হউক তাহাই প্রকাশ করিতে হইবে। শ্রুতি যখন দ্বৈত অদ্বৈত উভয় মতানুকূল, তখন দ্বৈতও সত্য অদ্বৈতও সত্য বলিতে হইবে। দুটানায় পড়িয়া দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদানুকূল শ্রুতি-গুলির কি দুর্দ্দশা না হইয়াছে। আর তাহা দেখিলে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের উপর শ্রদ্ধা জন্মে না। উপরন্তু আমাদের এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদকে গ্রহণীয় করিতে হয়।

এই মতে জীব পরমাত্মার বিকার। ''বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং'' নামরূপা-ত্মক তাবৎ পদার্থই বিকার। বিকার বলিয়াই জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলা চলে না। দুগ্ধ বিকার—দধি দুগ্ধ হইতে অত্যন্ত অভিন্ন নহে। চৈতন্য এক ব্যতীত বহু নহে—অতএব চৈতন্যরূপত্বে পরমাত্মা ও জীব অত্যন্ত ভিন্ন নহে। অত্যন্ত ভিন্ন হইলে জীবের চৈতন্যাভাব হইয়া পড়ে। চেতন পদার্থ স্বতন্ত্রভাবে অনেক—ইহা শ্রুতিসিদ্ধ নহে, অনুভূতি-বিরুদ্ধ। জীব ব্রহ্মের অংশ মাত্র। বৃক্ষ হইতে শাখা পত্র পুষ্প যেমন বৃক্ষেরই অংশ, জীবও তদ্রূপ পরমাত্মার অংশ। ব্রহ্ম—অংশী, *জীব—অংশ। ব্রহ্ম—অবয়বী, জীব—*অবয়ব।

প্রীতির দেবতা ও পীরিতের নাগর।

(শ্রীগিরিশচন্দ্র আচার্য্য কাব্যবিনোদ।)

আজকাল "পীরিতি" না হইলে ঘর করা চলে না। সাধারণ ঘর সংসারের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ধর্ম্মের আধুনিক সংস্কারে এ শব্দটির একান্ত আধিপত্য এবং দুর্লঙ্ঘ্য প্রতাপ। জিনিষটা ভারি অপূর্ব্ব, ওটি কি? তা' যাদের হয়েছে—তারাও নাকি বল্‌তে পারে না—আর যাদের হয় নেই—তাদের কথাই নেই।

ওটা হলে আর ঘর সংসারে মন থাকে না, আপনার জন ভাল লাগে না, প্রাণটা উদাস হয়ে যায়—গা ঝিম্ ঝিম্ করে, বুকের ভেতর সুখ না দুঃখ কি একটা হতে থাকে, চক্ষু সর্ব্বদা জলপূর্ণ হয়—নাসিকায় ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়তে থাকে, আর কিছুক্ষণ বাদে এমন অসহ্য হয়ে ওঠে যে, সংসার ছেড়ে কুলমান ভাসিয়ে দিয়ে মানুষ ঝাঁ করে বেরিয়ে পড়ে, কুলের বাহির হয়। যাঁর জন্যে বেরিয়ে পড়া—তাঁকে পেলে কি না পেলে সে খবর সেই বল্‌তে পারে, অন্যে নয়।

আর একটা লক্ষণ নাকি এর আছে—সেটা সবাইকে নাকি মেয়ে মানুষ হয়ে যেতে হয়। একমাত্র পুরুষ তিনি আর সব তাঁর প্রকৃতি কি না; কিন্তু সেটাও আমরা মনে রাখি না—আপনারাই সর্ব্বদা কর্ত্তৃত্বাভিমানে পুরুষ সেজে বসে থাকি—কিন্তু "পীরিত" আবির্ভূত হলে—সেই পুরুষত্বটা উড়ে যায় আর জীব তাঁর সত্যকার প্রকৃতি হয়ে যায়। কিন্তু সে প্রকৃতি হওয়াটা এমন মাত্রায় নাকি চাই যে, সেই পীরিতগ্রস্তের হাব ভাব চাল চলন আচার ব্যবহার সবটা মেয়ে মানুষের মত হয়ে যাবে। মায়—ফিট্!

যাক্ এই "পীরিত" রূপ স্বর্গ-দুর্লভ সুধা কোথায় উৎপন্ন ও উহার পরিচয়টুকু কি সেইটি আমরা একটু দেখবার চেষ্টা করব।

"প্রীতি" শব্দ থেকে পীরিতি শব্দের—তেমনি আবার প্রীতি থেকে পীরিতেরও

উৎপত্তি। খেজুর রস খেতে ভারি মিষ্টি, সুস্বাদ তৃষা-নিবারক—কিন্তু গেঁজে গেলে হয়, তার প্রধান ধর্ম্ম মত্ততা নিয়ে আসা। তেমনি প্রীতি-রস উৎসৃজিত হয়ে উঠ্‌লে—তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম ছেড়ে—অস্বাভাবিক মত্ততাজনক ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। আর সেটা খেলে তার তাল সাম্‌লান অস্থির ব্যাপার।

তা "ভগবৎ-প্রীতি" যে কি—সেটা না জানলেও সাধারণ প্রীতিটা যখন আমরা একটু আধ্‌টু নিত্য লাভ করি, তখন "ভগবৎ-প্রীতি" জিনিষটি কতকটা আন্দাজ করে নিতে বোধ হয় পারি। এখন কথা হচ্চে, সেই ভগবৎপ্রীতি কেমন করে গেঁজে গিয়ে "পীরিতি" হয়ে প'ড়ে মানুষকেও অমন অস্থির করে তোলে—সেইটী দেখা।

রস যেমন উৎসৃজিত রসের কলসীতে ঢেলে দিলে সে রসও উৎসৃজিত হয়ে যায়—তেমনই আমাদের মত কলসীতে "ভগবৎপ্রীতি" কোন রকমে প্রবিষ্ট হ'য়ে সেটা উৎসৃজিত হয়ে গেঁজে ওঠে এক ছটাক রসও ফেঁপে ফেনা হয়ে কলসী উপ্‌ছে পড়তে থাকে আর তাতে নেশা কত—আর সেই রসে রসময় হয়ে প্রীতির দেবতাকে যখন বরণ করতে যাই, তখন তাকে পীরিতের নাগর করে—বাপরে বাপ—কি কাণ্ডই না করে বসি।

কলসীটা পুড়িয়ে নিতে হবে। কলসীতে যদি সে প্রীতিরস রাখতে চাও তবে কলসীটা বেশ করে পুড়িয়ে নিয়ে—তাতে রস রাখতে পার, নইলে সব ওই রকম গেঁজে উঠবে। ছটাক রসেই ফেনা উথলে কলসী ভর্ত্তি হয়ে যাবে। রসের তৃপ্তি ভোগ করে নিত্যতৃপ্ত স্থিরযুক্ত হতে না পেরে—শুধু নেশা আর নেশায় তৃষা!

এই কলসী পোড়াবার ব্যবস্থাটা ধর্ম্মের আধুনিক সংস্কারে বড় উপেক্ষিত; নেই বললেই হয়। তাই রস পেয়েও ওই "টডি" লাভ হয় মাত্র। পা টলে আর ভাঁড়ে কিছু থাকে না—ফেনিয়ে ওঠে—মেলা বক্তৃতা—লেখা—ঢলাঢলি—মার্ মার্ ব্যাপার। কত কি!

শুধু তাই নয়, ভগবানকে ডাকাই সাব্যস্ত হবে না ততক্ষণ, যতক্ষণ না প্রীতিটা

গেঁজে ভাব-ফেনিল হয়—শুধু ফেনিল বললে ভুল হয়—ফেনপ্রধান হয়। আবার যদি তোমাদের ভাণ্ড রসশূন্য হয়, তবু নিদেন একটু ভাবের ফেনা কপালে লাগাতেই হবে—নইলে নাগরের দেখা পাওয়া ভার।

ঋষিরা বলে গিয়েছেন "সোবৈ রসঃ।" তিনি রসস্বরূপ—আর পাই তাকে ওই ফেনিল রস স্বরূপে। ঋষিদের প্রীতি রসের দেবতা, কিছুকাল ধরে "পীরিতি" রসের নাগর হয়ে কুলমান আর রাখছেন না। তা ঢলাঢলিটা সত্যই সুখের হত যদি নাগর সত্যি সত্যি ধরা দিত। তা' নয় তাঁর শুধু উঁকি মারা—মুচ্‌কে হাসা—আঁচল টানা—আর সরে যাওয়া—আর বিরহের প্রচণ্ড দাপট হা-হা হু হু এই বিরহই আবার নাকি চূড়ান্ত ব্যাপার।

ঋষিরা কিন্তু রস যাতে গেঁজে না যায়, তারই নাকি ব্যবস্থা করতেন। আর শান্ত শিষ্ট গৃহস্থ, স্বামী, স্ত্রীর মত তাঁকে নিয়ে ঘর সংসার কর্তেন। বিরহ তারা বুঝতেন না, মোট কথা, তখন স্বামী, স্বামীর মতই ছিলেন—নাগর হন্‌নি। সতী-স্ত্রীর ধর্ম্ম তখন আদর্শ ছিল, উপপতি উপপত্নীর মাদকরস তখন ধর্ম্মরাজ্যে স্থানই পেত না। যাতে রস না গাঁজে সেইজন্য কলসীটা তারা শম দম ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি সাধনা দ্বারা বেশ করে পুড়িয়ে নিয়ে, তবে তাতে রস ধরবার ব্যবস্থা করতেন, নইলে বিষয়-মাদক-তামস এ তাড়ির ভাঁড়ে রস রাখ্‌লে সেটা বস্তুতঃ নেশা ছাড়া কোন কাজে আসে না—এটা বড় জোর করে ধরে থাকতেন।

হ্যাগা পীরিতির নাগর? আমরা কি ফেনিল রস পান করেই—আর বিরহের বুক চাপড়ানি নিয়েই দিন কাটাব? প্রীতির আস্বাদ কি পাব না? তুমি কি আর একবার দেশে প্রীতির দেবতা হয়ে, শুদ্ধ শান্ত বুদ্ধ হয়ে দেশ থেকে এ কাঙ্গাল প্রেমের গন্ধ সরিয়ে তোমার প্রীতির পুণ্যগন্ধ আমাদের পেতে দেবে না?

ওগো ঋষিদের প্রীতির দেবতা? তুমি দয়া করে সংসারী হও নাগরগিরি ছাড় ঠাকুর।

নন্-কো অপারেশন।

(প্রকৃত ঘটনা।)

(শ্রীমোহিত গোপাল লাহিড়ী কর্ত্তৃক লিখিত)

মহিম বাবু সবজজ্ ছিলেন। চিরকালটাই তিনি প্রায় বিদেশে থাকিতেন। পুত্র-পরিবার সঙ্গেই থাকিত। চিন্তা এবং সুখ-দুঃখ যেমন মানুষের নিত্যসঙ্গী, অবস্থাপন্ন বড় কর্ম্মচারীদের পুত্র-পরিবারও সেইরূপ, দেশে-বিদেশে চিরসাথী হইয়া থাকে। ইহা আধুনিক নিয়ম।

মহিম বাবু ব্রাহ্মণ ও ধার্ম্মিক। তাঁহার সাধ্বী গৃহিণীও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী ছিলেন। বড় নামজাদা হাকিম হইলেও, তাঁহার গৃহে অভুক্ত অন্ন পাইত, সাধু-সন্ন্যাসী আশ্রয় পাইত, অভাবগ্রস্তের আবেদন তাঁর কাছে পৌঁছিতে পারিত। উচ্চ পদস্থ হইয়াও তাঁহার ব্যবহার ভদ্রোচিত ছিল।

প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে, তিনি পূজা-আহ্নিক না সারিয়া জলগ্রহণ করিতেন না এবং তাঁহার গৃহিণীও হিন্দুর ঘরের ছোট খাট ব্রত নিয়মগুলি যথাসাধ্য পালন করিতেন। স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করিতেন না। এখনকার শিক্ষার দোষে, এই সকল কার্য্যগুলিকে একটা ভয়ানক কুসংস্কার ও লজ্জাস্কর বলিয়া অনেকের মনে হয়। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে ইহা কর্ত্তব্যমধ্যেই পরিগণিত ছিল।

যাহাহউক রাজকার্য্যের গুরুতর দায়িত্বের মধ্যেও, তিনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ নিভৃত কক্ষে বসিয়া পূজা-আহ্নিকে নিরত থাকিতেন। সে সময় তাঁহার নিকট সাংসারিক কর্ম্মের কোন কোলাহলই পৌঁছিতে পারিত না। নিত্য অভ্যাস দ্বারা তিনি কিছুক্ষণের জন্য তন্ময় হইয়া থাকিতে পারিতেন। কখনও কখনও তিনি পূজা-গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়াও পূজায় মনোনিবেশ করিতেন। সকলের উপর আদেশ ছিল, কেহ যেন এ সময় তাঁহাকে বিরক্ত না করে।

(২)

সেদিন রবিবার, ছুটীর দিন। প্রাতঃকাল হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। লোকজনের আনা-গোনা বড় একটা নাই। বেহারা-আর্দ্দালীর দৌড়ঝাপও অনেকটা কমিয়াছে। বালক বালিকারা বাংলোর বারান্দায় ছুটাছুটি করিতেছে। দেশী কুকুরটা জড়সড় হইয়া বারান্দার এক কোণে শুইয়া সজাগে ঘুমাইতেছে। বাংলোর সম্মুখে ফুলের বাগান। পূজারী ব্রাহ্মণ ভিজা কাপড়ে ভিজা গামছা মাথায় দিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া বাগানে ফুল তুলিতেছে। মহিম বাবুর পত্নী কাত্যায়নী দেবী, প্রাতঃস্নানান্তে গরদের চেলী পরিয়া স্বামীর পূজার আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। আর মহিম বাবু অদ্যকার মত গোলামী-চিন্তাবর্জ্জিত মস্তিষ্কে, একবার সদরে, একবার অন্দরে ঘুরিয়া, নিঃসঙ্গ মনের মৌনভাব দূর করিবার অবসর খুজিতেছেন।

গৃহিণীকে বিশেষ ব্যস্ত দেখিয়া রহস্যচ্ছলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ যে তোমার পূজার বড় ঘটা দেখ্‌চি! প্রসাদ পাবার লোক কিন্তু একটিও আজ আর আস্‌চে না।"

পত্নী কাত্যায়ণী দেবী, সদ্যস্নাতঃ আলুলায়িত কেশরাশির উপর একটুখানি ঘোমটা টানিয়া দিয়া কহিলেন,—"সেটা আমাদের বরাত! এমন দেশে বদলি হয়ে এসেছি যে, এ দেশের দুটো ভিখরী-বৈষ্ণবও আমাদের দ্বারে ভিক্ষা করতে আসে না।"

কর্ত্তা।—তুমি ঠিক বলেছ। দুটো ভিখারী-বৈষ্ণবও দ্বারে এসে ভিক্ষা করতে সাহস পায় না। বলিহারী আমার চাকরী! মনে হয়—এমন হাকিমী না করাই ভাল! যাইহোক তোমার পূজার আয়োজনের ঘটা দেখে, ইচ্ছা হচ্চে একবার ভণ্ডামী করেও দেখি! আজ তো আর গোলামীর তাড়া নাই; জজ-সাহেবকে সেলাম বাজাতেও যেতে হবে না।

গৃহিণী।—কি করবে! ছেলে দুটো মানুষ না হওয়া পর্য্যন্ত সবই সইতে হবে। এখন তুমি স্নান করে আহ্নিক-পূজায় বস'। সব যোগাড় হয়েছে।

কর্ত্তা।—তাই হোক্। এই বলিয়া

বাহিরে গেলেন, মনে মনে ভাবিলেন,—"দেখি মায়ের আজ দেখা পাই কি না।"

প্রত্যহ স্নানের পর, পূজার জন্য মহিম বাবু এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ব্যয় করেন। কাছারী যাইতে একটু বেলাও হয়। সকলেই জানে, পূজা-আহ্নিক না সেরে মহিমবাবু কিছুতেই রাজকার্য্য করবেন না। উপরওয়ালা সাহেব তা জানেন। মহিম বাবুকে শুদ্ধহৃদয় ও ধার্ম্মিক বলিয়া, সে সময় কেহ তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিতেন না।

(৩)

যথাকালে দ্বার বন্ধ করিয়া মহিমবাবু পূজায় বসিলেন। ধূপ-ধূণা ও গুগ্‌গুলের গন্ধে গৃহ পরিপূর্ণ। তাম্রপাত্রে সচন্দন পুষ্প-সকল দেবোদ্দেশে রক্ষিত হইয়াছে। একখানি গালিচার আসনে বসিয়া উপবীত-হস্তে তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। এমন গৃহে, এত আয়োজনের মধ্যে, এত নিভৃতে বসিয়া চেষ্টা করিলে মনের একাগ্রতা আসিতে বিলম্ব হয় না। একাগ্রতায় মা মা বলিয়া ডাকিলেন। গৃহপ্রাচীরে দশমহাবিদ্যার ছবি ছিল। মহিম বাবু স্তিমিতনেত্রে একে একে মায়ের রূপগুলি হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

তিনি মনে মনে গদগদভাবে কতই কল্পনা করিলেন,—'আহা, মায়ের আমার কতই রূপ! মা আমার কখন শ্যামা, কখনও গৌরাঙ্গী কখনও বৃদ্ধা, কখনও যুবতী। কখনও কঠোর—ভীমা ভৈরবী, কখনও কোমল—বরাভয় প্রদায়িনী সন্তান-বৎসলা জননী। আহা, মা আমার কখনও ভিখারিণী—কখনও ভুবনেশ্বরী, কখনও অন্নপূর্ণা। কখনও শত্রুদলনী, কখনও ভক্তিমুক্তি-প্রদায়িনী।"

মহিম বাবু ভাবিলেন,—"মায়ের আমার কিবা অপরূপ রূপ! মা আমার রাজরাজেশ্বরী ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী জগদ্ধাত্রিরূপিণী, সিংহাসুরবিমর্দ্দিনী! এত রূপ, এত ঐশ্বর্য্য, এত শক্তি যে মায়ের—সে মায়ের মনের মত সন্তান হই না কেন? সে মায়ের স্নেহ পাবার উপযুক্ত হই না কেন? মা—মা।"

ভাবিতে ভাবিতে মহিমবাবু তন্ময় হইয়া গেলেন। মনে ভাবিলেন—'একবার

দেখা দে মা। আজ দেখা না পেলে, এ আসন ত্যাগ করব না। এ ঘরের দ্বার খুলব না। দেখি, আস কি না মা। তোর অপূর্ব্ব জ্যোতিতে এ ঘর পূর্ণ হয়ে উঠল মা।—মহিমবাবু আবার সাধনায় বসিলেন। এমন নিত্যই বসেন কিন্তু নিত্যই হতাশ হন। কাছারীর ভাবনাই তাঁকে উঠাইয়া দেয়। আজ আর তাঁর সে ভাবনা নাই। তাই তিনি মনকে দৃঢ়তর করিয়া আবার বসিলেন। বাহ্যজ্ঞান দূর করিয়া স্থির-সংকল্পে আবার ধ্যান করিলেন।

হঠাৎ তাঁহার কর্ণে এক বিকট স্বর পৌঁছিল। জজ সাহেবের চাপরাশী খোদাবক্স ডাকিতেছে—“হুজুর, সাহেব সেলাম ভেজা হায়।” তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। পথের ধারে খোলা জানালার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন,—সরকারী পোষাক-আঁটা পাগড়ী-মাথায় সেই পরিচিত খোদাবক্স চীৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিল—“হুজুর, সাহেব আবি সেলাম ভেজা হায়।” চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল। মহিমবাবু বিরক্তির সঙ্গে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। মনে মনে কহিলেন,—“কত প্রতিবন্ধক। এক দণ্ডও স্থির হয়ে ডাকতে দেয় না। বৃথা এ চেষ্টা।”

(৪)

মহিমবাবু তাড়াতাড়ি সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। সাহেব তাঁহাকে অসময়ে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। মহিম বাবু কহিলেন—“এই যে খোদাবক্স আমায় ডাকিতে গিয়েছিল।” সাহেব কহিলেন,—“কই আমি ত আপনাকে ডাকতে পাঠাই নাই। আর খোদাবক্সও এখানে নাই। কাল রাত্রে খোদাবক্স ছুটী নিয়ে দেশে গিয়েছে।”

মহিমবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন—সাহেব বুঝি রহস্য করিলেন। তিনি যথাযথ সকল কথা সাহেবকে বলিলেন। সাহেব তখন সকল চাপরাসীকে ডাকিলেন। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহিমবাবুকে কেহ ডাকিতে গিয়াছিল কি না। সকলেই প্রমাণ দিল, বৃষ্টিতে কেহ বাহিরে যায় নাই। মহিম বাবু স্তব্ধ

হইয়া রহিলেন। সাহেব রহস্য করিয়া কহিলেন,—"আপনি স্বপ্ন দেখেছেন!"

মহিম বাবু কহিলেন,—"যথার্থ স্বপ্নই দেখেছি! আর কিছুক্ষণ সময় পেলে স্বপ্নটা সত্য হ'ত। যাহোক্ আজ থেকে আমার চাকরী শেষ। আর গোলামী করব না সাহেব। আমি ইস্তফা দিচ্চি।"

সাহেব রহস্য করিয়া কহিলেন,—"কেন, কারণ কি? আপনি কি নন্‌-কো-অপারেশনের দলভুক্ত হয়েছেন।"

মহিম বাবু স্থির গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"সাহেব সত্যই আমি আর চাকরী করব না। সত্যই আজ থেকে আমি নন্‌-কো-অপারেটার। দেখ সাহেব, একবার বুঝে দেখ! আমি তন্ময় হয়ে আধ ঘণ্টা মাত্র 'মাকে' ডেকেছিলাম, সে সেই আধ ঘণ্টার ডাকে সাড়া দিয়েছে। সে আজ তোমার চাপরাসী সেজে দেখা দিয়ে আমার ধ্যানভঙ্গ করেছে। তুমি ত চাপরাসী পাঠাও নাই, তুমি ত আমায় স্মরণ কর নাই, কেউ ত আমায় ডাকিতে যায় নাই। ভেবে দেখ,—সে কে? আমি চিরকালটা চাকরী করে, তোমায় ভাবি, তোমার চাপরাসী ভাবি, তোমার কাছারীর কাজ ভাবি। সদাই মনে শঙ্কা থাকে—ঐ বুঝি তোমার চাপরাসী আমায় ডাক্‌চে, ঐ বুঝি তুমি অসন্তুষ্ট হচ্চ, ঐ বুঝি বেলা হয়ে গেল। যা ভাবি, তাই দেখেছি। তোমায় না ভেবে, তোমার চাপরাসীকে না ভেবে, তোমার কাছারীকে না ভেবে, যদি তাঁকে ভাব্‌তে পারতাম—যাঁর করুণায় এ বিশ্ব চল্‌চে; যাঁর করুণা পেলে, আর কারও করুণার দরকার হয় না—যদি এতদিন তাঁকে ডাক্‌তাম, তাঁকে ভজ্‌তাম—আমায় আর গোলামী কর্‌তে হতো না!

সাহেব।—কি বল্‌চেন মহিম বাবু?

মহিম বাবু।—আমি ঠিক বলছি সাহেব। জীবনের এখনও কয়টা দিন অবশিষ্ট আছে। এখনও সময় আছে। এখনও চেষ্টা করে দেখ্‌ব। এই আমার ইস্তফা গ্রহণ করুন। এই আমার নন্‌-কো-অপারেশন!

সাহেব মহিমবাবুকে কত বুঝাইলেন।

মহিমবাবু শুনিলেন না। কর্ম্মস্থান ত্যাগ করিয়া, একদিন তিনি পরিবারাদি সহ কোথায় কোন তীর্থস্থানে চলিয়া গেলেন। আর দেখা হইল না। সকলে বলিল—"মহিম বাবুই প্রকৃত নন্-কো-অপারেশন করেছেন! এমন কয়জন পারে?"

মানবজাতি।

বিভিন্ন জাতি ও রাজ্যাধিকারে ভিন্ন ভিন্ন

পরিবার।

বিশ্ব-মানব বিশ্ব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য না হওয়ায় বিশ্ব-তন্ত্র লাভ করিতে পারে নাই। অতীত ইতিহাসখণ্ড রাজ্যও মানব-জাতির খণ্ড বিশেষ পরিচালিত তন্ত্র সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুতরাং গণ-নীতি সাধারণ তন্ত্র খণ্ড রাজ্যের অনুশীলনে ও রাজ্য-জাতির (nation) সহিত মানবতা ও রাজ্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণে নিবদ্ধ থাকিবে।

সম্প্রদায়-বিহীন ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে মানব-পরিবারের একত্ব পরিকল্পনা অপরিহার্য্য। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সকল মনুষ্যকেই ভগবানের পুত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুসভ্য রাজ্য-তন্ত্রেও মানব জাতির একত্ব পরিকল্পিত হয় এবং অতি অসভ্য জাতি ও সম্প্রদায় মধ্যেও একটী সাধারণ মনুষ্য-প্রকৃতি স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু রাজ্য ও গণ-নীতির অনুভূতি জাতিগত বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। কারণ, রাজ্যে মনুষ্য সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং শৃঙ্খলা বা নিয়ম বা তন্ত্র বিভিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা ব্যতিরেকে ধারণা-যোগ্য নহে।

মানব জাতির মূল-বিভাগ সম্বন্ধে গূঢ়-তত্ত্ব অবধারণে বিজ্ঞান এতাবৎকাল বিফল-মনোরথ হইয়াছে। বাস্তবিক বিভিন্ন জাতিসমূহ কি সৃষ্টি রচনায় বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ? কিম্বা এক আদিম প্রসূতি জাতি হইতেই বিভিন্ন জাতি সমূহের উদ্ভব

হইয়াছে ? এবং যদি তাহাই হয়, তবে এই বিভিন্নতা সম্পাদনে বিভিন্ন প্রচেষ্টারই বা স্বরূপ কি ? আমরা এখনও তাহা পরিজ্ঞাত নহি। কিন্তু আমরা মানব-অভ্যুত্থান ইতি-হাসের প্রারম্ভ হইতেই, অবশ্য আমরা যত দূর জানি, প্রধান প্রধান জাতি সমূহের মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধি দেহ ও বর্ণ বিষয়ে বৈষম্য লক্ষ্য করি এবং সে বৈষম্য আবহমান-কাল প্রধানতঃ একই ভাবে অটুট রহিয়াছে।

ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে কোনও জাতিই একেবারে আদিম ভাবাপন্ন অবস্থায় বর্ত্তমান নাই। আদিম জাতি সমূহের বহুসংখ্যক ব্যক্তিই তাহাদের স্বজন সম্পর্ক বিচ্যুত হইয়া দূর-দূরান্তরে প্রয়াণ করিয়াছে এবং অনেকেই এক এক সম্পূর্ণ নূতন জাতি গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু জাতীয় অভ্যুত্থান—ইতিহাসের সর্ব্বত্রই আমরা শুভ্র, কৃষ্ণ, পীত ও লোহিত বর্ণ জাতির মধ্যে বিশেষ বৈষম্য দেখিতে পাই এবং এই বৈষম্য প্রায়শঃ ভিত্তি হীন বর্ণ-বৈষম্যের বাহিরেও বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

অনেক চিন্তাশীল লোকই ন্যায়তঃ বিভিন্ন জাতির মধ্যে মানষিক বৈষম্য অস্বীকার করেন—কিন্তু কার্য্যতঃ অস্বীকার করিতে প্রায় কাহাকেও দেখা যায় না। বস্তুতঃ সমগ্র জগদিতিহাসেই, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার ও ভিন্ন ভিন্ন প্রচেস্টাজনিত বিভিন্ন শক্তি সামর্থ্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

ইহা সম্ভব যে কৃষ্ণবর্ণ ইথিওপিয়ান্ জাতি—কেবাস যাহাদিগকে নেসানস অফ্ দি নাইট (নৈশ জাতি) আখ্যাদান করিয়া-ছেন—সেই ইথিওপিয়ান জাতি যে এককালে তাহাদের নিজ ভূভাগ আফ্রি-কাই অধিকার করিয়াছিল তাহা নহে, তাহারা এসিয়ার দক্ষিণাংশ এবং ইউরোপের দক্ষিণভাগও অধিকার করিয়াছিল এবং এই প্রাচীনতম জাতির প্রাচীনত্ব বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। কিন্তু এই জাতি কোন স্থানে বা কোন কালে ব্যবহার-নীতি বা রাষ্ট্র-নীতি বিষয়ে কথঞ্চিত ব্যুৎপত্তি লাভ করে নাই। ইহাদের প্রকৃত ইতিহাস নাই। শুভ্র জাতি বা

মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধে ইহারা প্রতিবারই পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। উদ্দাম কল্পনা ও অসংযত চিত্তবৃত্তির সহিত অপরিপক্ক বুদ্ধি ও মানসিক দৌর্ব্বল্যের সংমিশ্রণে ইহাদের শিশু প্রকৃতি বলীয়ান জাতি কর্ত্তৃক নিয়মিত ও শাসিত হইবার জন্যই নিয়ন্ত্রিত ছিল।

পুরাকালে ভারতীয় ও ইজিপ্টের কৃষ্ণবর্ণ জাতিরাও শুভ্রবর্ণ আর্য্য জাতি ও সেমিটি জাতি দ্বারা শাসিত হইত। বর্ত্তমানে আফ্রিকার প্রাচীন নিগ্রো রাজ-তন্ত্র-সমূহও প্রকৃত রাজ্য আখ্যা পাইতে পারে না। ইহারা স্বেচ্ছাচার মূলক খামখেয়ালী শাসন-তন্ত্র। এই সমস্ত জাতি মুসলমান ধর্ম্ম ও সভ্যতার আমলে আসিয়া উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য সাউদান রাজ্যে অবস্থান কালে কথঞ্চিত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। হায়টি ও লাইবেরিয়া নিগ্রোদের ফরাসী সাম্রাজ্য ও যুক্ত প্রদেশের শাসন তন্ত্রের অনুকরণ প্রচেষ্টা রাজ্য জাতির জীবনের একটা মহা রহস্যজনক অভিনয় ব্যতীত আর কিছুই নয়।

'বাঙ্গালা আমার'

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি. এ।

বাঙ্গালা আমার
স্বর্ণ কণ্ঠ-হার,
বাঙ্গালা আমার
অতি আপনার।

বাঙ্গালা আমার
সুধার ভাণ্ডার
বাঙ্গালা আমার
স্বরগের দ্বার।

বাঙ্গালা আমার
হৃৎপিণ্ডের মাটী,
বাঙ্গালা আমার
আঁখি তারা দুটী।

বাঙ্গালা আমার
সৌন্দর্য্যের রাণী,
বাঙ্গালা আমার
মুকুটের মণি,

বাঙ্গালার জল
বাঙ্গালার ফল,
বাঙ্গালীর বুকে
একমাত্র বল।

গোলাভরা ধান
মাঠভরা চাষ,
শস্যভরা বৃক্ষ
তাঁ'র বারমাস।

স্নেহ-ভরা বুক
ঢালে মা আমার,
মধুর পীযূষ
নদ নদী তাঁর।

জলে শতদল
ফুটে বারো মাস।
হাসে ঘাট মাঠ
ঘন নীলাকাশ।

গরজে সাগর
দক্ষিণ দুয়ারে,
জাগে হিমাচল
উত্তর শিয়রে।

পূরব পশ্চিমে
চন্দ্র সূর্য্য তারা,
দিন রাত ঘুরে
দিতেছে পাহারা।

কলকণ্ঠ পাখী
কুঞ্জে কুঞ্জে বসি
করে স্তুতি তাঁ'র
কত দিবা নিশি।

বাঙ্গালার পিক
করিলে ঝঙ্কার
নাচে না রে বল
পরাণ কাহার ?

এমন কঠিন
পরাণ কাহারা,
বাঙ্গালী ডাকিলে
দেয় নারে সাড়া ?

বাঙ্গালীর কণ্ঠে
মধুমাখা বাণী,
বাঙ্গালীর কণ্ঠে
অমৃতের খনি।

বাঙ্গালীর ভাষা
বাঙ্গালীর আশা,
আর ভাষে আশ
মিটে নারে তার।

বাঙ্গালীর কণ্ঠে
বন্দে মাতরম্।
বাঙ্গালীর বুকে
সিংহের বিক্রম।

এক শক্তি জাগে
অন্তরে অন্তরে,
এক শঙ্খ বাজে,
মন্দিরে মন্দিরে।

কণ্ঠে কণ্ঠে ফুটে
ব্রহ্মময়ী বাণী
শূন্যে শূন্যে ছুটে
তার প্রতিধ্বনি।

গৃহে গৃহে উঠে
মধুর ঝঙ্কার,
পুষ্পে পুষ্পে ফুটে
সৌন্দর্য্য সম্ভার।

নাচে রে শোণিত
হৃদয়ে হৃদয়ে,
এক ফল জলে
তুলে যে গড়িয়ে।

কণ্ঠে এক ভাষা
এক বেশ ভূষা,
বঙ্গে বাঙ্গালীর
বাঙ্গালী ভরসা।

পিতা মাতা যাঁরা
যে যথায় থাকো,
এক লক্ষ্য প্রতি,
সদা দৃষ্টি রেখো।

এক ভাবে ঢেলে
দেরে সব প্রাণ,
এক ছাঁচে গড়ে
তুলরে সন্তান।

মাতা স্তন্য কালে
শিশুরে পিয়াও,
বাঙ্গালীরে ভালো
বাসিতে শিখাও।

বাঙ্গালীর সম
বন্ধু কেহ নাই
বাঙ্গালী আমার
সহোদর ভাই।

মুখ চন্দ্র তা'র
করি দরশন,
হৃদয় পুলকে
হয় রে মগন।

এক গর্ভে জন্ম
সাত সহোদর,
এক পথে গতি
মরণের পর।

এক বক্ষে বাস
করি বারো মাস,
এক স্তন্য পান
এক অন্ন গ্রাস।

জলে ফলে ঝরে
অমৃত নির্ঝর,
সুখ শক্তি শান্তি
ঢালে নিরন্তর।

বাঙ্গালা আমার
সুধার ভাণ্ডার,
বাঙ্গালা আমার
স্বরগের দ্বার।

বাঙ্গালা আমার
স্বর্ণ কণ্ঠ-হার
বাঙ্গালা আমার
অতি আপনার॥

সভ্যজাতির সমর-নরমেধ

অর্থাৎ

মহাত্মা টলষ্টয়-কৃত যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রবন্ধ চতুষ্টয়।

(২) "দুইটী সংগ্রাম"

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ।

খৃষ্টান্ জগতে দুইটা সংগ্রাম চলিতেছে। একটির সম্প্রতি অবসান হইয়াছে; অপরটা এখনও চলিতেছে; দুইটাই সমসাময়িক;—তুলনায় একটা অপরটা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

প্রথমটী স্পেনিস্-আমেরিকান যুদ্ধ, অসভ্য-বর্ব্বরোচিত মূর্খ মূঢ়ের যুদ্ধ,—একদল লোককে হত্যা করিয়া, অপর এক দলের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করা। অর্থাৎ একটা বিজাতীয় গবর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করিয়া, সেইস্থানে অপর একটা বিজাতীয় শাসন ও প্রভুত্ব স্থাপন করাই ইহার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টা এখনও চলিতেছে এবং যতদিন জগৎ হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহের শেষ না হইবে, ততদিন চলিতে থাকিবে। এইটী ধর্ম্ম যুদ্ধ—স্বার্থত্যাগের সংগ্রাম; প্রেম ইহার ভিত্তি। বহুপূর্ব্বেই, খৃষ্টান্ জগতের মধ্যে, যাঁহারা সদাশয় ও মহাপ্রাণ,

তাঁহারাই, সমাজের মধ্যে নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর স্বভাব লোক যাহারা—তাহাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ককাশাস্ রাজ্যের ডুকুহোবার নামক মুষ্টিমেয় খৃষ্টান্ প্রবল প্রতাপ রাশিয়ান্ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

জোসি গোল্ড্‌উইন্ নামক আমেরিকার কলোরেডোবাসী এক ভদ্রলোকের নিকট হইতে আমি একখানি পত্র পাইয়াছি। ইনি আমেরিকান্ জাতির এই মহৎকার্য্যে ইহাদের সৈন্য ও নাবিকগণের বীরত্ব সম্বন্ধে আমার মতামত কি, তাহা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। এই ভদ্রলোকের বিশ্বাস, শুধু ইহার কেন, আমেরিকার জনসাধারণের মনেরও এইরূপ ভাব যে, বিগত যুদ্ধে, সহস্র সহস্র নিরস্ত্র স্পেনিয়ার্ডদিগকে হত্যা করিয়া—আমেরিকাণগণের তুলনায় স্পেনিয়ার্ডদিগকে নিরস্ত্রই বলিতে হইবে। আমেরিকানগণ সত্য সত্যই একটা মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তাহার আরও বিশ্বাস যে, বহুসহস্র সহোদরপ্রতিম মানবের জীবন নাশ করিয়াও আমেরিকানগণের অনেকেই নিরাপদ আছে এবং বীর বলিয়া জগতে যশোলাভ করিয়াছে।

স্পেনিয়ার্ড ও আমেরিকানগণের এই যুদ্ধ.—স্পেনিয়াডগণ কিউবাতে যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, সেইহেতুই এই যুদ্ধ—এই যে কপট হেতুবাদ—একথা অবান্তর—এই যুদ্ধটী কিরূপ তাহা এই দৃষ্টান্তে সুন্দররূপে স্ফুট হইবে। জরাগ্রস্ত, খিট্‌খিটে, ভীমরতিগ্রস্ত একটী বৃদ্ধ, বাপ্-দাদা এককালে খুব বড় ছিলেন,—এই অভিমানেই স্ফীত, কোন কারণে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ এক যুবককে মল্ল যুদ্ধে আহ্বান করে—স্থবির বৃদ্ধের সহিত যুবকের এই কুস্তি কতদূর সঙ্গত, তাহা আর বলিতে হইবে না—যুবকের এই দ্বন্দ্ব হইতে বিরত থাকাই উচিত। কিন্তু যুবক তাহা না করিয়া, লৌহ-বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক, সেই স্থবিরের উপর পতিত হইল—এবং লাথি মারিয়া বৃদ্ধের শিথিল দন্ত কয়টী উৎপাটন করিয়া ফেলিল। এবং তাহার পাঁজ্‌রার হাড় কয়খানি ভাঙ্গিয়া দিল। অবশেষে উক্ত

মস্তিষ্ক বদ্ধ যুবকগণকে ডাকিয়া তাহাদের সমক্ষে অতি আহ্লাদ সহকারে সেই বীরত্বের কাহিনী বলা হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দের সীমা রহিল না। বৃদ্ধের দম্ভ ভগ্নকারী বীর যুবকের প্রশংসা করিতে করিতে তাহারা চলিয়া গেল !!

স্পেনিস্-আমেরিকান্ যুদ্ধটী, ঠিক ইহারই মত—যুবক ও বৃদ্ধের সংগ্রামের ন্যায়। সমস্ত খৃষ্টান্ জগৎ এই যুদ্ধের কথা লইয়াই ব্যস্ত। দ্বিতীয় যুদ্ধটীর কথা কেহই বলে না। এই সম্বন্ধে কেহ কোন খবরই রাখে না।

দ্বিতীয় যুদ্ধটী কি? তাহা এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে—সকল দেশ ও সকল জাতির লোকদিগকেই তাহাদের শাসনকর্ত্তাগণ এইরূপ বুঝাইয়া প্রতারিত করে যে,—"তোমাদিগকে যে আমরা শাসন করি, তাহা যদি না করিতাম, তাহা হইলে, অন্য জাতি বা অন্য গবর্ণমেণ্ট আসিয়া তোমাদিগের দেশ কাড়িয়া লইত, তোমাদিগকে পরাভূত করিত। তোমরা যাহাতে সুখে ও নিরাপদে থাক, তোমাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, আমরা সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিতেছি। সেইজন্য বৎসর বৎসর আমাদের যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে, তাহা তোমাদেরই অর্থ, তোমাদের কার্য্যেই ব্যয় হয়। তরবারি, কামান, বন্দুক, বারুদ, জাহাজ প্রভৃতি যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম্—এই সকল কিনিতেই সেই অর্থ যায়—এই সমস্ত আস্‌বাব্ তোমাদের রক্ষার জন্যই প্রয়োজন, অতএব অর্থরাশি তোমাদিগকে দিতে হইবে; তোমাদের নিকটেই এই অর্থ চাই। আরও চাই যে, আমরা যে সকল স্কুল্ কলেজ, আফিস্, কল কারখানা স্থাপন করিয়াছি এবং যে ফৌজ বা যুদ্ধবাহিনী সৃজন করিয়াছি; তাহাতে তোমরা প্রবেশ করিয়া কর্ম্ম কর—এই সকল বাহিনী একটা একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র বিশেষ—তোমরাও ইহার প্রাণহীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অংশ বিশেষ। এই সকল যন্ত্র সম্পূর্ণ আমাদের করতলে থাকিবে। কারণ, তোমরা এখনও ছেলে মানুষ—ইহা চালাইতে শেখ নাই। এই বাহিনীতে

প্রবেশমাত্র তোমাদের ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া বা স্বাধীনতা একেবারে রহিত হইবে। তখন আমরা যাহা ইচ্ছা করিব, তাহাই তোমরা করিতে থাকিবে। যন্ত্রের যেমন নিজের ইচ্ছা কিছুই নাই, তোমাদেরও সেইরূপ কোন ইচ্ছা থাকিবে না। তোমাদের সাহায্যে আমরা যাহা করিব, তাহাতে জগতে আমাদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব লাভ হইবে। যে উপায়ে এই প্রভুত্ব স্থাপন করিব, তাহা নরহত্যা এবং তোমাদিগকে আমরা যাহা করিতে শিক্ষা দিব, তাহাও এই নরহত্যা। এই হত্যাকার্য্যই তোমাদিগকে করিতে হইবে।

অপর কোন রাজশক্তি তোমাদিগকে কোন সময় আক্রমণ করিতে পারে, অতএব তোমাদিগকে রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই আমরা ব্যস্ত—আমরা সর্ব্বদাই "শান্তি" চাই—'যুদ্ধ বিগ্রহ চাই না'—এইরূপ যাহারা অপরকে বুঝায়—তাহারা নিজেরাই হয়ত কাহাকে আক্রমণ করিয়া, কখন কাহার রাজ্য কাড়িয়া নিবে, এই চেষ্টায় আছে, কিম্বা কে কখন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, সর্ব্বদা এই ভয়ে শশঙ্কিত আছে—এই সকল যুক্তি যে অত্যন্ত অসার, ইহা বুঝিতে পারিয়াও, সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রীতদাসের ন্যায় কার্য্য করিবার শত অবমাননা স্বীকার করিয়াও এবং তাহারা যে ভীষণ নিষ্ঠুর নরহত্যা কার্য্যে আহুত হইতেছে, তাহা জানিয়া শুনিয়াও, মানুষ এই শঠতার হস্ত হইতে নিস্তার পায় না; নিজেদের উপার্জ্জিত অর্থ, নিজেদের বন্ধনের জন্য, পরকে অর্পণ করে, আত্মবিক্রীত হয়, স্বাধীনতা হারায়, এবং অপরাপর জাতির স্বাধীনতা হরণের জন্য দস্যু-শাসন-সম্প্রদায়ের সহায়তা করিয়া বেড়ায়।

কিন্তু, হঠাৎ কোথা হইতে একদল লোকের আবির্ভাব হইল, তাহারা বলিতে লাগিল, "বটে, কি বল্‌ছো? আমাদের বিপদের কথা। তোমরা চলিয়া গেলে, আমাদের অপর শত্রুর হাতে পড়িতে হইবে এবং তোমরা সর্ব্বদা আমাদের রক্ষার চেষ্টায় আছে এই কথা—মিথ্যা শঠতা—ভণ্ডামি। সমস্ত গভর্ণমেণ্টই বলে,

আমরা শান্তি চাই—যুদ্ধ বিগ্রহ আমরা ইচ্ছা করি না; কিন্তু প্রত্যেকেই এই বলিয়া—একে অপরের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিযোগিতার সহিত অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইতেছে। এই রণসজ্জা কি শান্তি রক্ষার উপায়—ইহা কি শান্তি না অশান্তির লক্ষণ?

তারপর, তোমরা আরও বল যে, সকল মানুষই ভাই ভাই, এক ঈশ্বরের পুত্র—সে যে রাজ্যে যে দেশেই বাস করুক না কেন, সে আমাদের ভাই, ইহাই সত্য, ইহাই নীতি—এই নীতি তোমরাও মানিয়া থাক, তবে কেন বল, যদি অপর কোন জাতি বা রাজ্য আসিয়া তোমাদের আক্রমণ করে ইত্যাদি?

যদি তাহারা আমাদের ভাইই হইবে, তাহারা আমাদের আক্রমণ করিবে কেন? ভাই বলিয়া যদি তাহাদের হৃদয়ে ভালবাসা থাকে, তবে তাহারা আমাদিগকে কিছুতেই আক্রমণ করিতে পারে না। অতএব সে ভয় আমাদের নাই। এই মিথ্যা ভয় আমাদিগকে দেখাইও না। এবং তোমরা যে আমাদিগকে পররাজ্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছ, এইরূপ কথা আর বলিও না - উহা আমরা মিথ্যা মনে করি। অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ—কাহাকেও হিংসা করিও না—কাহাকেও হত্যা করিও না—কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করিও না—ইহাই ঈশ্বরের আদেশ—এই নীতি তোমরা—যাহারা আমাদিগকে হত্যা করিতে উপদেশ ও আদেশ দেও—সেই তোমরাও বলিয়া থাক, শুধু মুখের কথায় বল মাত্র—কিন্তু ইহার বিপরীত আচরণ কর—তোমাদের এই মিথ্যা ভণ্ডামিতে আর আমরা ভুলিব না। তোমাদের সামরিক বিভাগ মানুষ খুন করার প্রকাণ্ড একটা আড্ডা—উহাতে আর আমরা প্রবেশ করিব না—উহাতে কোনরূপ কার্য্য করিব না—এই ঘোরতর নৃশংস ও নিষ্ঠুর কার্য্যে আমাদের সাহায্য ও সহানুভূতি তোমরা পাইবে না। উহাতে আর আমরা অর্থ প্রদান করিব না। আমাদের বিবেক বুদ্ধি, চিত্ত-কলুষিত করিয়া, যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য

যে তোমরা সভাসমিতিতে আমাদিগকে ডাক—ঐ ডাকে আমরা যাইব না।

নিষ্ঠুর কসাইয়ের হাতের তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায়, তোমরা যে আমাদিগকে প্রাণহীন যন্ত্রবৎ করিয়া, মনুষ্যহত্যা কার্য্যের অনুষ্ঠান করাও, কোন মন্দবুদ্ধি নিষ্ঠুর সেনাপতি বা চালকের হস্তে যে আমাদিগকে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নৃত্য করিতে হয়, তাহা আর আমরা করিব না।

ইহাই দ্বিতীয় যুদ্ধের মর্ম্মকথা। ইহাই দেবাসুরের যুদ্ধ! জগতের দেবচরিত্র মানবগণের সহিত আসুরিক শক্তির এই সংগ্রাম দীর্ঘকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। এবং সম্প্রতি ককাশাস্ অঞ্চলের ডুকুহোবারগণের সহিত রাশিয়ান্ গভর্ণমেণ্টের এই যুদ্ধ ঘোরতর রূপে আরব্ধ হইয়াছে। রাশিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট, তাহার যত শক্তি ছিল, যথাসাধ্য প্রয়োগ করিয়াছে—পুলিশের দ্বারায় লোকগুলিকে ধরিয়া বন্দী করিয়াছে—কাহাকেও একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে দেয় নাই, পরস্পরের আলাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে—চিঠিপত্র সব হস্তগত করিয়াছে—সকলের পিছনেই গোয়েন্দা লাগাইয়াছে—সংবাদ পত্রে ডুকুহোবারদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ সংবাদ প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। উহাদিগের কুৎসা কাগজে প্রচার করিয়াছে—ঘুস, বেত্রাঘাত, কারাদণ্ড, নির্ব্বাসন ইত্যাদি অত্যাচারে শত শত পরিবার একবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

অপর পক্ষে ডুকুহোবারগণ এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কি অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছে, শোন! একমাত্র তাহাদের ধর্ম্মবল, প্রশান্ত বুদ্ধি, ধৈর্য্য এবং দৃঢ়তা। তাহাদের মন্ত্র এই—"আমরা ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়া, মনুষ্যের অপেক্ষা রাখি না। অতএব তুমি আমাদের প্রতি যতই অত্যাচার কর না কেন, আমরা তোমার কথা শুনিতে পারি না এবং শুনিব না।"

সভ্যজগতে স্পেনিস্ ও আমেরিকান্গণের বর্ব্বরোচিত এই যুদ্ধে যাহারা বীর বলিয়া খ্যাত হইয়াছে; তাহাদের প্রশংসা খুবই হইতেছে। শুনিতে পাই, এই বীরপুরুষগণ 'নামকাওয়াস্তে'—সুখ্যাতি ও পুর-

ষ্কারের লোভে, বহুসহস্র মনুষ্যকে হত্যা করিয়াছে বা হত্যা করিতে যাইয়া হত হইয়াছে—এই বর্ব্বর হৃদয় বীরগণের প্রশংসায় সভ্যজগত মুখরিত।

কিন্তু, যাঁহারা নরশোণিতলোলুপ ঈদৃশ নৃশংস যুদ্ধের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, যাহারা এই অদৃস্ট এবং অপরিজ্ঞাত অবস্থায়, অত্যাচারির দণ্ডের নিম্নে লক্ষ লক্ষ মস্তক অবনত করিতেছে, পূতিগন্ধময় অন্ধকার কারাকক্ষে, নির্ব্বাসনের দারুণ যন্ত্রণায় কাতর হইয়াও, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সত্য ও ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে, এবং দিতেছে, তাহাদের কথা কেহই বলে না, কিম্বা সে খবর কেহই রাখে না।

এই মহাব্রত ধারণের জন্য দশ জনের অধিক হইবে, অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে, এবং শতাধিক ব্যক্তি, এই সত্য গ্রহণের নিমিত্ত দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, এবং পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে,—ইহাদের সকলকেই আমরা জানি!

ড্রগিন্ নামে এক মহাপুরুষ কৃষকের শিক্ষক ছিলেন,—ইহাকে আমি জানিতাম। ইহাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে। ইসাইসেকো নামক এক মহাত্মা ড্রগিনের বন্ধু, ইহাকে কিছুদিন বন্দীভাবে রাখিয়া—পরে পৃথিবীর এক প্রান্তে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে।

অল্‌ফ্ হবিকফ্ নামে একটী কৃষক—ইনি সৈন্য বিভাগে কার্য্য করিতে অস্বীকার করায়—প্রথমে ইহাকে বন্দীরূপে রাখা হয়, পরে নির্ব্বাসনে প্রেরণ করা হয়। যে জাহাজে ইহাকে লইয়া যাইতেছিল, সেই জাহাজে সেরেদা নামক একজন সৈনিক পুরুষ উক্ত কৃষকবীরের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অল্‌ফ্ হবিকফ্ এই সৈনিককে তাহার মতে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। সে যে কি অন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত আছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া সৈনিক পুরুষ তাহার উর্দ্ধতম কর্ম্মচারীদিগের নিকট যাইয়া বলিল—"আমি অত্যাচারির দলে আর থাকিতে ইচ্ছা করি না, দেশ ও ধর্ম্মের জন্য যাহারা মরিতেছে, তাহাদিগের সঙ্গে

আমিও মরিব, আমি এই ইচ্ছা করি।”— এই বলিবামাত্র রাজপুরুষগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল এবং অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল ;— অবশেষে তাহাকে ইয়াকুটস্ক প্রদেশে নির্ব্বাসিত করিল।

সেদিন আমি একটী যুবক ডুকহোবারের পত্র পাইয়াছি। তাহাকে সমরখন্দের সৈন্য শ্রেণীতে একাকী প্রেরণ করা হইয়াছে এবং রাজপুরুষগণ তাহাকে নানামতে বুঝাইয়াছে, ভয় দেখাইয়াছে, সৈনিকরূপে কার্য্য করিতে উৎপীড়ন করিয়াছে। যুবক কিছুতেই স্বীকৃত হয় নাই এবং রাজপুরুষদিগের ব্যবহারে সে ঐ একই কথা বলিয়াছে—“ঈশ্বরের প্রতি আমার যাহা বিশ্বাস সেই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমি কোন কার্য্য করিতে পারি না।”

“তাহা হইলে তোমাকে আমরা অতিশয় যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলিব।”

“উহাই তোমাদের কার্য্য। তোমরা তোমাদের কার্য্য কর, এবং আমি আমার কার্য্য করি।”

বিংশ বৎসর বয়স্ক এই যুবক, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন হইতে অপসারিত হইয়া দূরে—অপরিচিত দেশে, ঘোরতর শত্রুসকলের মধ্যে, প্রবল প্রতাপ ধনী এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে, উহাকে বশীভূত করিবার জন্য ইহারা যথাসাধ্য যতই চেষ্টা করিতেছে, যুবক ততই অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং ধৈর্য্যের প্রভাবে, উহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বলিতেছে —“তোমাদের বশীভূত হইব না”— ইহাকে এত শক্তি কে দিল? মৃত্যু-যন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া এই নবীন যুবক কি করিয়া স্থির থাকিতে পারিল?

অনেকে বলেন, ইহাদিগকে নিরর্থক মারিয়া ফেলা হইতেছে—এইরূপ অত্যাচারে কোন ফলই ফলিবে না। কারণ, যে শক্তি জাতিতে জাগ্রত হইয়াছে তাহা কখনই বিনষ্ট হইবে না। আমারও বিশ্বাস একথা খুব সত্য। যীশুখৃষ্ট কিম্বা অন্যান্য মহাপুরুষগণ যাঁহারা সত্য ও ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্তই ইহার প্রমাণ।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত সম্প্রদায় এতই স্থূল মস্তিষ্ক যে, এই আধ্যাত্মিক-শক্তির যে কি অদ্ভুত প্রভাব, কিছুতেই ইহা তাহাদের স্থূল বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না। ৫০ পাউণ্ড ডিনামাইট বিস্ফোরকের একটা গোলা, একটা জনতার মধ্যে ছুড়িয়া মারিলে, কি ফল হয়, তাহা, বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু, সত্য ও ধর্ম্মের জন্য পর পর রাশি রাশি প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে, তাহার শক্তিতে কি অদ্ভুত অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে, ইহা এই শিক্ষিত শাসন-সম্প্রদায়ের স্থূল মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। একটা বড় রকমের শেলে, দশ হাজার মানুষ মারা যায়, অতএব শেলটার কি ভীষণ শক্তি—এইটা তাহারা বেশ বুঝে, কিন্তু সত্য যখন চিন্তাপথে উদিত হয়, সত্যের শক্তি যখন বুদ্ধিকে আশ্রয় করে, এবং জীবনের স্রোত ফিরাইয়া দেয়, মৃত্যুকে উপহাস করিয়া, যখন সত্যগ্রাহীগণ অবলীলা ক্রমে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়,—এবং এই শক্তি যে আজ রাশিয়াতে জাগ্রত হইয়া লক্ষ লক্ষকে অনুপ্রাণিত করিতেছে, ইহার তত্ত্ব এই শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মতে কিছুই নয়—ইহাতে কোন শক্তি নাই—কারণ ইহাতে প্রকাণ্ড একটা শেল্ কাটার মত ভয়ঙ্কর একটা আওয়াজ হয় না। যে রক্ত দর্শনে লোকের মূর্চ্ছা হয়, সেই রক্ত, গঙ্গা হইতে প্রবাহিত হয় না—ইহাতে হাড় ভাঙ্গিয়া গুড়া করিয়া দিতে পারে না, অতএব ইহার শক্তি কোথায়?

তথা কথিত শিক্ষিত ব্যক্তি যাহারা—অর্থাৎ অতিশিক্ষায় যাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, বিদ্যার ঝুড়ি লইয়া বসিয়া, এই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ যেমন দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, মানুষও তেমন। কিসে বেশ দুপয়সা লাভ করা যায় এই চিন্তা এবং চেষ্টাই মানুষের সর্ব্বস্ব; কিসে সুখ হয়, বেশী মজা পাওয়া যায়—এই জন্যই তাহার বুদ্ধি।

কিন্তু অন্য কোন শক্তিতে এই জগত শাসন করে, এবং কিসে এই মনুষ্য সমাজ ধারণ করিয়া আছে। তাহা, যাহারা

শাসন করে, তাহারা বেশ বুঝে। সুতরাং যখন তাহারা দেখে যে জাতির ভিতর আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হইতেছে—আর রক্ষা নাই—তখন তাহারা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। কারণ এই শক্তির বিকাশের উপরই তাহাদের অস্তিত্ব বা বিনাশ নির্ভর করে।

ডুকহোবারদিগের মধ্যে এই শক্তির বিকাশ দেখিয়াই, আমার মনে হয়, রাশিয়ান গবর্ণমেণ্টের সমস্ত চেষ্টা এই নবশক্তি বিনাশের জন্য কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, এবং এখন ও হইতেছে—উহাদিগকে নিরস্ত্র ও দেশান্তরে নির্ব্বাসিত করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিতে চাহিতেছে।

এত চেষ্টা সত্ত্বেও, ডুকহোবারগণের এই সংগ্রাম এবং মহান্ দৃষ্টান্ত লক্ষ লক্ষ লোকের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে।

আমি জানি, শত শত সৈনিক পুরুষগণ যুবক এবং বৃদ্ধ, সকলেই—নিরীহ পরিশ্রমী এবং ধর্ম্মপ্রাণ ডুকহোবারগণের প্রতি এই অমানুষিক অত্যাচারে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে- ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি অতিশয় সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছেন। অনেকের কথা বলিতে পারি, যাঁহারা জীবন কি, ইহার উদ্দেশ্য কি, —প্রকৃত ধর্ম্ম কি, এই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—এই ডুকহোবারদিগের জীবনের জলন্ত দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিয়া, বা শুনিয়া জীবনে প্রথম তাঁহাদিগের এই চিন্তার উন্মেষ হইয়াছে।

এবং গবর্ণমেণ্ট এইরূপ লক্ষ লক্ষ লোকের উপর অত্যাচার করিয়া, বেশ বুঝিতে পারিতেছে, নিরস্ত্রের এই তীক্ষ্ণ অস্ত্র উহার মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে।

দ্বিতীয় যুদ্ধটীর এই সার মর্ম্ম। এই যুদ্ধ বর্ত্তমানে চলিতেছে। এবং এই যুদ্ধের যে ফল ফলিতেছে তাহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে! ইহার ফলে কেবল যে রাশিয়ান্ গবর্ণমেণ্ট বিচলিত হইবে, তাহা নহে; যে সকল গবর্ণমেণ্ট অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সৈন্যশক্তির উপর নির্ভর করে, তাহারাই নিরস্ত্রের এই একাঘ্নীতে আহত হইয়াছে।

খৃষ্ট বলিয়াছিলেন, "আমি জগৎ জয় করিয়াছি।" সত্য সত্যই তিনি জগৎ

জয় করিয়া গিয়াছেন; যদি মানুষ এই একাত্মীয় শক্তি, যাহা সেই মহাপুরুষের দান—বুঝিতে পারে,—তাহা হইলে তাহার এই বাক্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

এই অস্ত্র কি? প্রত্যেক মানুষই তাহার নির্ম্মল বুদ্ধি ও বিবেকের বশে কার্য্য করিবে। এইরূপ করা অত্যন্ত সরল এবং সহজ; ইহা নিসংশয়, এবং অবশ্য করণীয়।

"তুমি আমাকে মানুষ মারিবার জন্য তোমার সঙ্গী করিতে চাও—সেইজন্য যে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহার নিমিত্ত তুমি আমার নিকট হইতে টাকা চাও, এবং এই কার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য তুমি আমাকে শিক্ষিত ঘাতকের দলভুক্ত হইতে বল,—বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে, যে অর্থলোভে তাহার বিবেক বুদ্ধি কলুষিত ও বিক্রয় করিয়া ফেলে নাই, সে বলিবে, তোমার যে ধর্ম্ম—তুমি বলিয়া থাক—আমারও সেই ধর্ম্ম—সে ধর্ম্মে ত কাহাকে হত্যা কর, কাহারও প্রতি শত্রুতা কর, একথা নাই—তবে কেন তুমি আমাকে হত্যা করিতে বলিতেছ; তুমি যখন এই-রূপ কার্য্যের প্রশ্রয় দেও, তখন তুমি নরহন্তা—তোমার কথা আমি শুনিব না।

এই সত্যাগ্রহই এক মাত্র অস্ত্র—ইহারই সাহায্যে জগৎ জয় করা যায়, সন্দেহ নাই।

অমিয় গীতা।

(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ বিরচিত)

অপরাধ—ক্ষমা প্রার্থনা।

ভূভার হরিতে হরি, যুগে যুগে অবতরি,
কবে কত লীলার প্রকাশ।১
কুরুক্ষেত্রে সেই লীলা, করি হরি চলে গেলা,
ব্রহ্ম শাপে বংশ করি নাশ।২
মধুর ব্রজের খেলা, কুরুক্ষেত্রে রুদ্র লীলা,
ক্ষত্রিয়ের সমূলে বিনাশ।৩
সেই রণ মহাসিন্ধু, আর্য্য শৌর্য্য বীর্য্য ইন্দু,
অকস্মাৎ করিল গরাস।৪

সেই রণ-ক্ষেত্রে গীতা, মুখপদ্ম বিনিঃসৃতা,
নাশিল পার্থের মোহ শোক।৫
হেন কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু, পার্থের প্রাণের বন্ধু,
কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি প্রেম যোগ।৬
শিখাইলা কত করে, যারে ভালবাসে তারে,
হাতে ধরি এমতি শিখায়।৭
সারথি সাজিয়া রথে, থাকে তার সাথে সাথে,
ভবসিন্ধু পার করে পায়।৮
সেই কৃষ্ণপদে মতি, অগতির একগতি,
পতিত পাবন কৃষ্ণ নাম।৯
সেই কৃষ্ণ নাম সত্য, জপ সেই নাম নিত্য,
ওরে মন, ছাড় অভিমান।১০
গীতার মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
সেই বাক্যে কৃষ্ণের প্রকাশ;১১
বৃথায় জনম গেল, তাহে মতি না হইল,
হায়, হায় আমি রে হতাশ।১২
লিখি পদ্যে সেই গীতা, নাহি মোর সে ক্ষমতা,
তথাপি লিখিতে করে সাধ।১০
মূর্খ মূঢ় দুরাচার, কিবা সাধ্য সে আমার,
কৃষ্ণ নামে শত অপরাধ।১৪
মূর্খ আমি অভিমানী, কোন তত্ত্ব নাহি জানি
প্রেম ভক্তি রস শূন্য প্রাণ।১৫
কৃষ্ণ নামে নাহি রুচি, লৌহ সম হয়ে আছি
পাপ কণ্ঠে ফুটে নারে নাম।১৬
অনাথের নাথ হরি, এই শক্তি কৃপাকরি,
দেও, মূঢ়-দীন হীন জনে!১৭
প্রেম ভক্তিরস মাখি', দেও শক্তি গীতা লিখি,
হরি-ভক্ত-চিত্ত বিনোদনে।১৮
মূকেরে বাচাল কর, পঙ্গু কর গিরি পার,
পাদ পোতে পাপী কর পার।১৯
মূর্খের কণ্ঠেতে বসি, কহ ভাষ্য রাশি রাশি,
কর জ্ঞান ভক্তির প্রচার।২০
মূক মূর্খ পঙ্গু আমি, তাহে ঘোর অভিমানী,
তাই কিহে বঞ্চিত কৃপায়।২১
তোমার কৃপার পাত্র, আর কেবা আছে কুত্র,
আমি ছাড়া, অধম ধরায়।২২

৩

অমিয় গীতা

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পদ্যে)

অর্জ্জুন বিষাদ-যোগ।

প্রথম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন :—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত রণে,
আমার তনয়গণ পাণ্ডবের সনে—
সেই পুণ্যক্ষেত্রে মতি ফিরিল কি কা'র
করিল কি, হে সঞ্জয়, কহ সমাচার ?

সঞ্জয় কহিলেন :—

পাণ্ডবের সুবিশাল বাহিনী হেরিয়া,
কহে রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যে গিয়া।
আচার্য্য, পাণ্ডবচমূ কর দরশন
করিয়াছে কি দুর্ভেদ্য ব্যূহ বিরচন !
তব শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন শক্র সেনাপতি
দ্রুপদের পুত্র বিচক্ষণ মহামতি।
মহাধনুর্দ্ধর পূর্ণ সপ্ত অক্ষৌহিনী
দুলিছে সাগর সম পাণ্ডব বাহিনী।২,৩।
ধৃষ্টকেতু চেকিতান, কাশিরাজ বীর্য্যবান্,
দ্রুপদ বিরাট যুযুধান।
পুরুজিৎ কুন্তী-ভোজা, যুধামন্যু উত্তমৌজা,
অভিমন্যু মহা বীর্য্যবান।
রণে ভীমার্জ্জুন সম, দ্রৌপদির পুত্রগণ,
নর শ্রেষ্ঠ শৈল্য মহাবীর ;
আরো বীর কহি কত, সকলেই মহারথ,
রণে কি মরণে, ধীর স্থির। ৪।৬
আমাদেরো পক্ষে যত, মহারথ সমাগত,
করি তার বিশেষ বাখান।
আপনি স্বয়ং ভীষ্ম, কর্ণ ভৃগুরাম-শিষ্য,
অশ্বত্থামা কৃপ বীর্য্যবান।
বিকর্ণ সমিতিঞ্জয়, ভূরিশ্রবা মহাশয়,
ইহাদের নাহিক সমান। ৭।৮
আরো কত মহারথ, সর্ব্ব যুদ্ধ বিশারদ,
অস্ত্রে শস্ত্রে বীর্য্যে বলবান।
যুঝিতে আমার তরে, সবে প্রাণ দিতে পারে,
নিতে পারে অরাতির মান। ৯

ভীষ্মের রক্ষিত সেনা, সংখ্যা নাহি যায় গণা,
যদিও ভীষ্মের সেনা কম।
তথাপিও হে আচার্য্য, জয় তার অনিবার্য্য,
যুদ্ধ কর, করি প্রাণপণ। ১০
যাঁর যাঁর স্থানে থাকি, বৃদ্ধ পিতামহে রাখি,
কর সবে মহা ঘোর রণ।
পাণ্ডবের পরাজয়, হবে গুরো সুনিশ্চয়,
যদি যুদ্ধ কর দিয়া মন। ১১
সহসা ভীষ্মের শঙ্খ, কাঁপায়ে গগন,
হৃষ্ট ক'রে দুর্য্যোধনে বাজিল তখন, ১২
অমনি অসংখ্য শঙ্খ পটহ মাদল,
বাজে ভেরী-তুরি-শিঙ্গা করি মহারোল।
কৌরবের রণবাদ্যে কাঁপিল সকল। ১৩
বাজাইলা পাঞ্চজন্য দেব নারায়ণ,
দেবদত্ত ধনঞ্জয় করিলা বাদন।
বসি শুভ্রবাহ রথে, দিব্য শঙ্খ লয়ে হাতে,
দুইজনে ছাড়ে সিংহনাদ ;
সেই সিংহনাদ চোটে, ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ফাটে,
কৌরবের জন্মায় বিষাদ। ১৪-১৫
পৌণ্ড্র মহাশঙ্খ ফুকে বৃকোদর বীর।
অনন্ত বিজয় শঙ্খ রাজা যুধিষ্ঠির।
মণিপুষ্প সহদেব, সুঘোষ নকুল,
দ্রুপদের শঙ্খনাদে অরাতি আকুল।
ধৃষ্টদ্যুম্ন মহারথ শিখণ্ডী বিরাট,
বাজায় পৃথক শঙ্খ কাশির সম্রাট ;
মহাবাহু অভিমন্যু পঞ্চ ভ্রাতা সহ,
করে শঙ্খনাদ ফাটে গগন কটাহ।
১৬—১৮
সে নাদে বিদরে ধার্ত্তরাষ্ট্রের হৃদয়,
আকাশ পৃথিবী ব্যাপী প্রতিধ্বনি হয়। ১৯
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ, করিবারে মহারণ,
সম্মুখে অচল সম করি দরশন,
বসি কপিধ্বজ রথে, গাণ্ডীব তুলিয়া হাতে,
শরনিক্ষেপের কালে কহিলা অর্জ্জুন। ২০
হে অচ্যুত রথ মোর রাখ মধ্যস্থলে
যাবৎ না দেখি আমি যুদ্ধার্থী সকলে। ২১
যুঝিতে মোদের সনে সমাগত রণে
আমি বা যুঝিব কা'র সহিত এখানে।
আনিল কাহারে টানি মরণ হেথায়
সুদুর্ব্বুদ্ধি কৌরবের প্রিয় চিকীর্ষায়।
২২—২৩।

সঞ্জয় কহিলেন :—
জিতনিদ্র অর্জ্জুনের এত কথা শুনি,
উভয় সেনার মধ্যে রথখানি আনি,—

হাস্যমুখে হৃষীকেশ কহিলা অর্জ্জুনে,
হের পার্থ, সমবেত কুরুগণ রণে,—
পিতৃকল্প পিতামহ আচার্য্য মাতুল,
ভ্রাতা পুত্র পৌত্র সখা শ্বশুরের কুল ;
সুহৃদ সকল এই আসন্ন আহবে—
উভয় সেনার মধ্যে উপস্থিত সবে।
দেখিয়া মৃত্যুর মুখে বান্ধব স্বজনে
কৌন্তেয় কহিলা কৃপা পরবশ মনে :—
২৫, ২৬, ২৭।

অর্জ্জুন কহিলেন :—

হে কৃষ্ণ, স্বজনগণ, হয়ে হিংসা-পরায়ণ,
উপস্থিত এই রণাঙ্গনে।
হেরি এই রণরঙ্গ, অবসন্ন মোর অঙ্গ,
বল রণ করিব কেমন ?
শুষ্কমুখ, একি হায়, গাণ্ডীব খসিয়া যায়,
শরীরে রোমাঞ্চ কম্প-জ্বালা,
বিঘূর্ণিত মোর মন, হেরি সব দুর্লক্ষণ,
হায় কৃষ্ণ, একি কর খেলা ?২৮,২৯,৩০
স্বজন নিধন করি, কি হইবে বল হরি,
নাই চাহি রাজ্য সুখ মান।৩১
রাজ্যে নাহি প্রয়োজন তুচ্ছ ভোগ এজীবন,
বধি, কৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ প্রাণ! ৩২
রাজ্য যাঁহাদের তরে, তাঁরা যদি যায় মরে,
সেই রাজ্য হইবে শ্মশান।
পিতামহ রণাচার্য্য, পিতৃকল্প যত আর্য্য,
পুত্র পৌত্র শ্বশুর শ্যালক ;
মাতুল কুটুম্বগণ, ধন প্রাণ করি পণ,
উপস্থিত যত রণে সেনানা নায়ক।
৩৩,৩৪।

"স্বেচ্ছাচার, কুলাচার নহে"

(স্মৃতিকণ্ঠ কবিরত্নোপাধিক কবিরাজ শ্রীচন্দ্রশেখর রায় (দাশ শর্ম্মণঃ) লিখিত)

আচার যে কি, তাহা আমরা জানি না, জানিবারও চেষ্টা করি না, পিতৃ পিতামহ যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহাই আমাদের কুলাচার—তাহাই আমাদের দেশাচার—তাহাকেই আমরা বেদ-বিশেষ বলিয়া মনে করি।

বাস্তবিক ইহা নহে ; যদি ঊর্দ্ধতম পুরুষের স্বেচ্ছাচার বা ভ্রষ্টাচারই কুলা-

চার হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রকারগণ নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে কোন না কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, স্বেচ্ছাচার কিম্বা ভ্রষ্টাচার কখনই কুলাচার হইতে পারে না।

মদ্যপায়ীর বংশে মদ্য পান করিয়া আসিতেছে বলিয়া তাহাই যে তাহার কুলাচার বা তাহাকে কিঞ্চিত মদ্য পান করিতেই হইবে এরূপ মনে করা মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যদি কোন ব্রাহ্মণবংশে বংশপরম্পরা চাষ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পুত্রকেও যে সেই চাষ করিতেই হইবে, হল ধরা না হইলে তাহার বংশমর্যাদা বা কুলাচার রক্ষা করা হইবে না; ইহা ভাবাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

দেখিতে গেলে অজ্ঞ পুরোহিতগণের অজ্ঞতা বা স্বার্থ সাধনই ইহার এক মাত্র কারণ বলিলেও বলা যাইতে পারে। স্থান বিশেষে দেখিতে পাই, কোন পুরোহিত মহাশয় বলিয়া বসিলেন "আচারোপিশাস্ত্রম্" আচার বা কুলাচার যে কি তাহা জ্ঞান না থাকিলেও আচারের দোহাই দিয়া থাকেন। কেহ বা বলিয়া বসেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" মহাজন—আপ্ত বা আর্য্যঋষি তাহা না ভাবিয়া পিতৃ পিতামহ জ্ঞানে তাহাই বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করেন, কাজেই নিরীহ যজমানগণ ভ্রান্তিবশে তাহাই করিতে বাধ্য হন।

কেবল ইহাই নহে। পাঠকগণ! আপনারা বোধ করি "বিড়াল চাপার" গল্প শুনিয়া থাকিবেন। এক ব্যক্তির একটী বিড়াল ছিল, একদিবস তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত, বিড়ালটা আসিয়া শ্রাদ্ধ-দ্রব্যাদি মুখ দিয়া নষ্ট করিতে থাকে, বারম্বার তাড়াইয়া দেওয়া সত্বেও পুনশ্চ আসিয়া নষ্ট করে; একারণ শ্রাদ্ধকর্ত্তা বিরক্ত হইয়া ঐ বিড়ালটাকে ঝোড়া চাপা দিয়া রাখেন, তৎকালীন তথায় বাটীর বালক বালিকাগণ যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা বিড়াল চাপার মর্ম্ম না বুঝিয়া, মনে করিল, বোধ করি আমাদের শ্রাদ্ধ করিবার সময় বিড়াল চাপা দিতে হয়, তদবধি বংশপরম্পরা ঐ

ভাবে বিড়াল চাপা চলিতে লাগিল, ইহাই হইল অজ্ঞানের কুলপ্রথা বা কুলাচার।

সুতরাং, এমত অবস্থায় কুলাচার বা দেশাচার কি? কোন স্থলে তাহা মানিয়া কার্য্য কলাপ করিতে হয় তাহা সকলেরই জানা আবশ্যক, নচেৎ অযথা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রবিধিতে অশ্রদ্ধা করতঃ ধর্ম্মে পতিত হওয়া কোনরূপেই ধর্ম্ম বা যুক্তি সঙ্গত নহে, তদুক্তং চরকে—

ধী ধৃতি স্মৃতি বিভ্রষ্টঃ কর্ম্মযঃ
কুরুতেঽশুভম্।
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বদোষ
প্রকোপনম্॥

ধী—প্রকৃতজ্ঞান, ধৃতি—ধারণাবতী বুদ্ধি বা আত্মোন্নতি ধর্ম্মবিশেষ, স্মৃতি—ধর্ম্ম সংহিতা পরিত্যাগ করিয়া যিনি অশুভ বা স্বেচ্ছাচারী কর্ম্ম করেন, তিনি প্রজ্ঞাপরাধ দোষে দোষী হন, অর্থাৎ জ্ঞানকৃত পাপে পাপী হইয়া থাকেন। অতএব, আর্য্যঋষি প্রণীত ধর্ম্মসংহিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমরা যে কতগুলি বিধি-বহির্ভূত কর্ম্ম করিয়া থাকি বা করিয়া আসিতেছি, তাহাতে জ্ঞানকৃত পাপই আশ্রয় করিতেছি মাত্র, অজ্ঞানকৃত পাপের খণ্ডন হইতে পারে কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপের খণ্ডন বিধি নাই। তথাচ গীতা—

যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি॥১৬

যিনি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচার কর্ম্ম করেন, তাহার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, তিনি কোন সুখ বা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং শাস্ত্র প্রমাণানুসারে কোনটী কার্য্য কোনটী বা অকার্য্য তাহা জানিয়া শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে যত্নবান হইবেন। অপিচ শিবসংহিতাও বলিতেছেন—

দ্বিবিধং কর্ম্ম কাণ্ডং স্যান্নিষেধ বিধিপূর্ব্বকম্।
নিষিদ্ধ কর্ম্ম করণে পাপং ভবতি নিশ্চিতম্।
বিধান কর্ম্ম করণে পুণ্যং ভবতি নিশ্চিতম্।
ত্রিবিধ বিধিকূটঃ স্যান্নিত্য নৈমিত্ত কাম্যতঃ।
নিত্যকৃতেহকিল্বিষং স্যাৎকামো নৈমিত্তিকে
ফলম্।

দ্বিবিধস্তু ফলং জ্ঞেয়ং স্বর্গ নরক মেবচ।
স্বর্গে নানাবিধশ্চৈব নরকে চ তথা ভবেৎ।
পুণ্যকর্ম্মাণি বৈ স্বর্গ নরকং পাপ কর্ম্মণি।
কর্ম্মবন্ধময়ী সৃষ্টি নান্যথা ভবতি ধ্রুবম্॥

কর্ম্মকাণ্ড দুইপ্রকার—নিষেধ ও বিধি-সঙ্গত। নিষিদ্ধ কর্ম্ম বা ক্রিয়া আচরণে পাপ সঞ্চয় হয়। বিধি বিহিত কর্ম্ম করিলে পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। বিধি বিহিত কর্ম্ম ত্রিবিধ, নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য, নিত্যকর্ম্মে দৈনিক পাতক নষ্ট হয়, এবং কাম্য ও নৈমিত্তিক কার্য্যে পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই কর্ম্মফল দ্বিবিধ, স্বর্গ ও নরক। স্বর্গে যেরূপ ভোগ হয়, নরকেও তদ্রূপ নানাবিধ ভোগ হইয়া থাকে। পুণ্যকার্য্যে স্বর্গলাভ ও পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে নরক ভোগ হয়। ইহ-জগৎ এই প্রকার কর্ম্মবন্ধময়। পাপ বা পুণ্য যাহা করিবে তাহার ফল নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে, ইহাতে অন্যথা নাই।

(ক্রমশঃ)

পতিতার কথা।

(লেখক শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।)

অনেকদিন অতীত হইল, আমি সুখ-শান্তিময়ী পল্লী-জননীর স্নেহ-কোল ছাড়িয়া সুদূর প্রবাসে চলিয়া আসিয়াছি। প্রবাসের ছায়ায় বসিয়া আমার বিরহ-ব্যথিত হৃদয় প্রতিনিয়তই নীরবে কাঁদিতেছে। হায়! কোথায় সেই সুদূর পল্লী—চারিদিকে স্নেহের করুণাস্পর্শ—মায়ার অপূর্ব্ব পুলক বন্ধন! অপত্য-মায়া-মুগ্ধা স্নেহময়ী জননীর প্রসারিত হস্ত,—প্রেমময়ী পত্নীর সলাজ-মধুর দৃষ্টি—তাহা কি ভুলিবার? হায় কর্ম্মক্ষেত্র! এখানে মিলন নাই, বাসনার পূরণ নাই;—কেবল অশ্রান্ত—অনন্ত অভিযান। এই স্বজন বন্ধু বান্ধবের স্নেহ-দৃষ্টির অন্তরালে আমার আর থাকিতে ইচ্ছা হইল না;—তাই এবার পূজার ছুটিতে বিরহ-ব্যথিত চিত্তে শান্তি লাভাশায় বাটীতে প্রত্যাগত হইলাম। সুশ্যামলা পল্লী-জননীর স্নেহ-সমীর ব্যজনে বিরহ-দগ্ধ,

হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা মুহূর্ত্তে জুড়াইয়া গেল! আহা, কি অনাবিল সুখ! কি অনন্ত শান্তি!

বাটীতে আসিয়া শুনিলাম—ব্রহ্মপুত্র-তীরে বটবৃক্ষ মূলে এক পাগলিনী আসিয়াছে, সে সারাদিন গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে এবং দিবা অবসানে বটবৃক্ষমূলে বসিয়া গান গাহে। এই অপরিচিতা পাগলিনীর কথা শুনিয়া, আমার অনিসন্ধিৎসু প্রাণ তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি আশৈশব পাগল বড় ভালবাসি।

সন্ধ্যার সময় সান্ধ্য ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ব্রহ্মপুত্র-তীরে উপনীত হইলাম। তখন শারদীয় শুক্লা-ষষ্ঠীর শশধর গগণপ্রান্তে বসিয়া ধরাবক্ষে ক্ষীণ রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছিল। সেই ক্ষীণ চন্দ্র-রশ্মি তরুশিরে পতিত হইয়া বড় সুন্দর দৃশ্যের বিকাশ করিতেছিল। সজ্যোৎস্না তরঙ্গমালা-বক্ষে ব্রহ্মপুত্র, জল-কল্লোল উত্থিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে বহিয়া যাইতেছিল। ব্রহ্মপুত্র তটবাহী ধীর সমীর বকুলবাস বুকে করিয়া দিক্ হইতে দিগন্তের পথে চলিয়া যাইতেছিল। আমি পুলকিত প্রাণে ব্রহ্মপুত্র-তীরে দাঁড়াইয়া প্রকৃতি রাণীর এই অনুপম সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেছি, এমন সময় সহসা আকাশ, বাতাস ভাসাইয়া একটী সুমধুর সঙ্গীত হিল্লোল ভাসিয়া আসিল—

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে গেল।"

বাঃ! বাঃ!! কি সুমিষ্ট সঙ্গীত মূর্চ্ছনা!!! এ যেন আমার "কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গিয়া, আকুল করিল মোর প্রাণ!"

এ গান যে বেদনাতুর হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক উচ্ছ্বাস;—এই কি সেই পাগলিনীর গান? আমি ধীরে ধীরে বটবৃক্ষতলে উপনীত হইলাম। পাগলিনী তখনও উদাস নেত্রে আকাশ পানে চাহিয়া অশ্রু-উচ্ছসিতকণ্ঠে গাহিতে লাগিল—

"সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে গেল;
পিপাসিত চিত, কাঁদিছে নিয়ত,
বহিছে নয়নে জল।

প্রাণে প্রাণে কত সুখ-সাধ-আশা,
না মিটিল কিছু—গেলনা তিয়াসা,
স্বপনে ছলিয়ে, গেল সে চলিয়ে,
(বুকে) স্মৃতির যাতনা রহিল।"

আমি সেই করুণ মর্ম্মস্পর্শী গান শুনিতে শুনিতে পাগলিনীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যে, সে কোন ভদ্র-ঘরের বৌ-ঝি,—অদৃষ্টের তাড়নায় আজ তাহার এই শোচনীয় দশা! হায় রে, মানবের প্রাক্তন! তাহার বয়স ২০।২২ বৎসরের বেশী হইবে না—গৌরবর্ণা, মুখখানি সুন্দর; কিন্তু সম্মুখের দুইটী দাঁত নাই—মাথার চুলগুলি উস্কো-খস্কোভাবে কাটা। একখানা ময়লা কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা।

পাগলিনী গান শেষ করিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ নেত্রে আমার পানে চাহিল। তাহার সেই অশ্রুসিক্ত পাণ্ডুর মুখখানি দেখিয়া আমার বোধ হইল, যেন তাহাতে কোন্ সুদূর অতীতের স্মৃতি, একটা তীব্র বেদনার আভাস থাকিয়া থাকিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল।...কি-জানি-কেন সেই বেদনা-ক্লিষ্ট ম্লানমুখখানি দেখিয়া তাহার ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা হইল। আমি স্নেহস্বরে পাগলিনীকে বলিলাম—"ওগো! তুমি কি জন্য এমন হইয়াছ;—তাহা আমায় বলিবে কি?"

"বাবু! আমি মহাপাপিনী—আমার পাপকথা—" বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল; সে প্রতপ্ত অশ্রুধারা তাহার দুই গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল।...কে ইহাকে পাগলিনী বলে?

আমি বলিলাম—"ওগো! বলিতে যদি কষ্ট হয়, তবে আমি শুনিতে চাহি না।"

"বাবু! আমি মহাপাপিনী—আমার পাপের অন্ত নাই, আমি নরকের কীট—আমার পাপ-কাহিনী শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন,—আমার এ পাপমুখে থুথু দিয়া উঠিয়া যাইবেন।"

আমি বলিলাম—"ওগো! তুমি যতই পাপ করিয়াছ; তোমার অনুতাপ-অশ্রু-জলে সমস্ত পাপ ধুইয়া গিয়াছে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত—অনুতাপ; তোমার যখন সে 'অনুতাপ' হইয়াছে, তখন তোমায় আর

বিন্দুমাত্র পাপ নাই! তুমি এখন অন্তরে-বাহিরে নিষ্পাপ!"

"নিষ্পাপ?" রমণী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"আমি নিষ্পাপ? না, না, বাবু! আপনি ভুল বুঝিয়াছেন! এমন মহাপাপ হইতে কেহ কি নিস্তার পাইতে পারে? এ বড় ভীষণ পাপ! এ পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই—এ পাপ আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে! আমি এ পাপে জীবন্তকাল পর্য্যন্ত অন্তরে অন্তরে নিরন্তর দগ্ধ হইয়া মরিব; অন্তে পূতিগন্ধময় অনন্ত নরকে ডুবিয়া পচিব।...তবে শুনুন—এ পতিতার পাপের কথা কাণ পাতিয়া শুনুন—

(২)

রমণী বলিতে লাগিল—"আমাদের বাড়ী নদীয়া জেলার শ্যামগ্রামে। আমার পিতামাতার অবস্থা ভাল ছিল না; অতি কষ্টে সংসার চলিত। আমি পিতামাতার একমাত্র সন্তান বলিয়া, তাঁহারা আমায় অত্যন্ত স্নেহাদর করিতেন। আমি দেখিতে সুন্দরী ছিলাম; তাই পিতামাতা আদর করিয়া আমার নাম রাখিয়াছিলেন—শোভা!

শুক্লা-শশীকলার ন্যায় আমি দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলাম; দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিলাম। আমাকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া, বাবা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পাত্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাত্র মিলিল না।...এই হৃদয়হীনের দেশে—এই পুত্র-বিক্রয়-বাজারে, বাঙ্গালীর ঘরে কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, প্রচুর অর্থ ঢালিয়া দিতে হয়। কিন্তু বাবার অর্থ নাই—তাই পাত্র জুটিল না। হায়, পোড়া বঙ্গ-সমাজ!

দিন যায়—থাকে না। যতই দিন যাইতে লাগিল, আমার বয়সও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার প্রতিবেশিনী সমবয়স্কা সঙ্গিনীগণের একে একে সকলেরই বিবাহ হইয়া গেল;—বাকী মাত্র আমি রহিলাম!

তাহার পর আরও এক বৎসর অতীত হইয়া গেল—তবু আমার বিবাহ হইল না। নবযৌবন সমাগমে আমার কমনীয় দেহের

লাবণ্য-বিভা ফুটিয়া উঠিল। ঘরের বাহির হইতে আমার লজ্জা করিতে লাগিল। ছিঃ! এমন প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে, বাপের ঘরে কি ভাল দেখায়? আমি লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইতে লাগিলাম। আর বাবা মা? তাঁহারা দিবারাত্রি বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন।...

অবশেষে বাবা, জাতি-কুলের দিকে চাহিয়া, আমার ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া দ্বিতীয় পক্ষের এক প্রৌঢ়ের সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। ভবিতব্য খণ্ডন করিবে কে? নির্দ্দিষ্ট দিনে আমার বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময় স্বামীর মুখ দেখিয়া আমার উদ্দাম-নবযৌবন-প্রমত্ত-হৃদয়ে দারুণ ঘৃণার সঞ্চার হইল। আমি মনে মনে ভাবিলাম—'আঃ! ছিঃ ছিঃ,—এই কি আমার স্বামী?—বানরের গলায় হেমহার!...আমার এ অনুপম লাবণ্য-জড়িত নবযৌবন-পরিপূর্ণ-হৃদয়ে অনন্ত সাধ, অনন্ত বাসনা, অনন্ত প্রেম-আকাঙ্ক্ষা—ওই সুপক্ককেশধারী দন্ত-বিহীন বৃদ্ধ মিটাইতে পারিবে কি? আঃ, ছিঃ ছিঃ! কি কাল' কদাকার চেহারা,—কি পোড়ার মুখ!...

হায়, পোড়ার চোখ! তখন কি সে রূপ ভাল করিয়া দেখিয়াছিল? সে রূপ দেখিবার মত তখন কি আমার চোখ ছিল? হায়, চোখের মাথা খাইয়া শীতল বলিয়া পতঙ্গের মত অনলে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, সুধা-ভ্রমে গরল খাইয়াছিলাম। সতীর স্বর্গ—পতিপদতল ছাড়িয়া ঘরের বাহির হইয়াছিলাম। হায়, আমার পোড়ার কপাল!

বিবাহান্তে আমি স্বামীর সঙ্গে স্বামী-ভবনে আসিলাম। আসিলাম বটে, কিন্তু নিয়তই আমার প্রাণ ছটফট্ করিতে লাগিল। নববিবাহিতা মেয়েরা স্বামী-ভবনে আসিয়া কাঁদে, কিন্তু স্বামীর অনাবিল প্রেম-সোহাগ লাভে চোখের জল মুছিয়া শান্ত হয়,—সুন্দর মুখে মন্দ হাসিয়া গৃহকর্ম্ম করে। হায়, আমি কোন্ আশায় কিসের বিনিময়ে সান্ত্বনা লাভ করিব?—প্রৌঢ় স্বামীর কাছে কি প্রেম-সোহাগ

লাভের আশা আছে? আমার পাপ-কলুষিত চিত্ত হইতে স্বামীর প্রতি কেবলই ঘৃণার সঞ্চার হইতে লাগিল। অভাগিনী—পাপিনী আমি—তখন বুঝি নাই, তখন জানি নাই—স্বামীই স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব!—স্বামী বৃদ্ধ, অন্ধ, আতুর যাহাই হউক, স্ত্রীলোকের তিনিই দেবতা,—তাঁহার চরণ তলই সতীর সুখের স্বর্গ—পদ রেণুই, সুশীতল সুধা!—"বলিতে বলিতে রমণী বস্ত্রপ্রান্তে চক্ষু ঢাকিল। অনন্তর চক্ষুজল মুছিয়া রমণী বলিতে লাগিল—

"কিছুদিন পর আমার স্বামী রোগ শয্যায় শায়িত হইল। আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে দৈনিক দুই একবার স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম, এইরূপে কয়েকদিন অতীত হইল। আমার মনে হইতে লাগিল—একি আপদ জুটিল,—মরেও না ছাড়েও না। আমার যৌবন-চাঞ্চল্য প্রাণ, বৃদ্ধ স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিতে রাজি হইল না। আমার এ ভরা যৌবনে কোথায় প্রিয়-সম্মিলনে-সুখে যৌবন সম্ভোগ করিব,—না কোথায় এক বৃদ্ধ আতুরের জন্য সাধের যৌবন বৃথায় নষ্ট করিতেছি। এই অনন্ত সুখ পরিপূর্ণ বিশ্ব-রাজ্যে, সুখ পিপাসু মানব সুখ ভোগ করিতে আসিয়াছে;—আমি সুখ ভোগ করি না কেন? এ নব যৌবনের, অনন্ত রূপের ডালি লইয়া শুধু—শূণ্যগৃহে, শূণ্য প্রাণে বসিয়া থাকি কেন? কুলে কালি দিয়া, লাজের বাঁধন ছিঁড়িয়া, জগতের নয়ন সমক্ষে রূপের ডালা মাথায় করিয়া দাঁড়াই না কেন?—রাজহংসীর মত বিলাস বাসনা প্রবাহে দেহ ভাসাইয়া দিয়া,—প্রেমের সাধ পূর্ণ করি না কেন?—এই কথাগুলি নিয়তই আমার পাপচিত্তে জাগিতে লাগিল। করিলামও তাই,—উঃ! সে কথা বলিতে বুক বিদীর্ণ হচ্ছে—হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, উঃ! সে কথা কি বলিবার?" বলিয়া রমণী নীরব হইল; তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। আমি নির্নিমেষ লোচনে রমণীর পানে তাকাইয়া রহিলাম। পরে বলিলাম—"সে কথা বলিতে যদি তোমার কষ্ট হয়, তবে আমি শুনিতে চাই না।"

রমণী বলিল—"না বাবু! সমস্তই বলিব—শুনুন!" রমণী বুকভাঙ্গা দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল—

(৩)

"একদিন গভীর রাত্রে,—রোগশয্যায় শায়িত পূজনীয় স্বামীকে ফেলিয়া—তাঁহার পুণ্য পদরজ মাখা সুখ নিকেতন ছাড়িয়া ঘরের বাহির হইলাম। পথে আসিয়া ভীতি বিহ্বল হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। একবার মনে হইল—ছিঃ! এ কি? গৃহে ফিরিয়া যাই। কিন্তু অতৃপ্ত প্রেম-প্রমত্ত হৃদয় সে কথা কি শুনে? চলিলাম—কোথা যাই অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দু কুলবধু আমি;—পথ চিনি না—কোথা যাই? সম্মুখে পথ, সেই পথ ধরিয়া চলিলাম!—অনেকক্ষণ চলিলাম। সহসা সেই নিশীথ যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, ধরিত্রীর তন্দ্রা-বিজড়িত প্রাণ কাঁপাইয়া শব্দ উঠিল—"হর হর শিব শঙ্কর।" আমার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম। একি! আমার সম্মুখে এক অপরূপ মূর্ত্তি! বামহাতে একটা জলন্ত মশাল, দক্ষিণ হাতে কমণ্ডলু, স্কন্ধে ঝুলি, গলে রুদ্রাক্ষের মালা—জটাজুটধারী এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ! তাঁহাকে দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আসিল;—আমি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলাম।

যখন আমার জ্ঞান সঞ্চার হইল, তখন দেখিলাম—পরিপূর্ণ প্রভাতের নির্ম্মল আলোকে ধরণী ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমি এক নিবিড় বনে পর্ণকুটীরে তৃণ শয্যায় শায়িতা;—পার্শ্বে সেই সন্ন্যাসী। আমি ভয়ে চক্ষু মুদিলাম। সন্ন্যাসী সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—'মা! ভয় নাই, তুমি গত রাত্রে কোথায় যাইতেছিলে—আমায় বল; আমি তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব।'—আমি সশঙ্কিত প্রাণে সন্ন্যাসীর নিকট আমার যাবতীয় সত্য ঘটনা বর্ণনা করিলাম। সন্ন্যাসী কিছু বলিলেন না, অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন; অনন্তর তাঁহার ঝুলি হইতে দুইটী সুপক্ক ফল বাহির করিয়া আমায় খাইতে দিলেন; আমি ফল দুইটী খাইয়া ফেলিলাম। তার-

পর কমণ্ডলুর কিছু শীতলবারি পান করিতে দিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন। সন্ন্যাসী অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আমি জলটুকু পান করিয়া ভয়ে ভয়ে তাঁহার পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। সন্ন্যাসী একটী পর্ণ কুটীরের সম্মুখে আসিয়া থামিলেন; অতঃপর সেই গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া এক কুষ্ঠব্যাধি প্রপীড়িতা রমণীকে দেখাইয়া বলিলেন।—

'এই যে স্ত্রীলোককে দেখিতেছ,—এও তোমার ন্যায় কুলত্যাগিনী হইয়াছিল;—যৌবনের উদ্দাম উত্তেজনায় এ অভাগিণী পরিণাম ভাবিয়া দেখে নাই। রূপের মোহে,—যৌবন মদে মত্ত হইয়া, তুচ্ছ দৈহিক সুখের নিমিত্ত অভাগিণী পর পুরুষ সংস্পর্শে দেহ কলুষিত করিয়াছে, অমূল্য সতীত্ব ধন বিসর্জ্জন দিয়াছে। দেখ মা! কুলত্যাগিনী অসতী রমণীর কি ভীষণ পরিণাম!—নারীর যৌবন পদ্মপত্রের জল বিন্দুর ন্যায় চঞ্চল;—সামান্য ব্যাধি-বাতায় যাহার অস্তিত্ব থাকে না, সেই চঞ্চল যৌবনের গর্ব্বে কত শত মহিলা কুলত্যাগিণী হয়। দেখ মা, দেখ,—কুল-ত্যাগিণীর কি ভয়াবহঃ পরিণাম! ইহার যৌবনাবস্থায় যাহারা ইহার প্রিয় সহচর ছিল তাহারাই অসময়ে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। ওই দেখ পাপের কি ভীষণ পরিণাম—সর্ব্ব অবয়বে কি ভীষণ ক্ষত, নাসিকা গলিত, বিকৃত, হস্তপদ অসাড়।

(ক্রমশঃ)

মা-না-রাক্ষসী?

(শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মণ লিখিত)

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা প্রলয়ের ঝঙ্কার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। একটা দুরন্ত কাল মেঘ সমগ্র আকাশটাকে ছেয়ে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিকাশ করছে—তুমুল গর্জ্জনে মেঘের রাশি দিক দিগন্তে ছুটছে—প্রভঞ্জন দেশকে দেশ, ফুৎকারে চূর্ণ বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দিচ্ছে। মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত—আর

বজ্রের মর্ম্মভেদী গর্জ্জন—চারিধারে "গেল, গেল," রব ! কোথায় কখন কি হয় !

কতকগুলি সাধক উদ্‌গ্রীব নেত্রে সোৎসাহে এ ঝটিকার দিকে চেয়ে আছে—তাঁরা এর প্রত্যেক প্রবাহ তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখে বলছে—মায়ের এ হুঙ্কার। মা আজ রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তি ধরে, খল খল বিকট হাস্য করছেন—থেই থেই নৃত্য করছে—ভীম অসি বিঘুর্ণিত করে দুষ্কৃতির বিনাশ ও সাধুর পরিত্রাণ করছেন। সাম্য ও স্বাধীনতামন্ত্রে সচেতন সাধকবৃন্দের সাধনায় পরিতুষ্টা হয়ে মা আজ পৃথিবীতে ভৈরবী বেশে অবতীর্ণা—জগতে সুদিনের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। এরা রাজসিক আর তামসিক সাধক।

ভারতের আকাশেও এ কাল মেঘ ঘুলিয়ে রয়েছে। ঘর দুয়ার এখনও ধ্বংস না করলেও বাগান বাগিচা প্রভঞ্জনে বিধ্বস্ত হচ্চে—ভীতিপ্রদ গর্জ্জন ও হুঙ্কার এখানেও বেশ শোনা যাচ্ছে। ভারতেরও কতকগুলি সাধক দুয়ার খুলে উঁকি মেরে সত্রাসে দেখ্‌ছ—কিসের এ হুঙ্কার। বড় ধীর স্থির গম্ভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে এরা বলছেন—এ অসুরনাশিনীর হুঙ্কার নয়, এ অসুরের অভ্যুত্থান।

সাম্য ও স্বাধীনতা মহামন্ত্রের অর্থ বিপর্য্যয় উহার মূল। সাম্য ও স্বাধীনতা মন্ত্র সচেতন করতে গিয়ে—মহামন্ত্রকে বিপরীত ভাবে নিয়ে সচেতন করেছে ও তাতে সিদ্ধিলাভ করেছে—অসুর। কল্প-তরু মা সাধনায় পরিতুষ্টা হয়ে সিদ্ধিবর ঢেলে দিয়েছেন, বিপরীত অর্থ নিয়ে মহামন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ মহা অসুর আজ মাতৃবর লাভে উদ্দপ্ত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড আলোড়িত করে তুলেছে। সত্যযুগে ইন্দ্রের সঙ্গে বিরোচন গুরুর নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রার্থী হয়ে উপস্থিত হয়েছিল। গুরু ব্রহ্ম-জ্ঞান যা দিয়েছিলেন তার যথার্থ অর্থ ইন্দ্র গ্রহণ করেছিল আর বিরোচন তার কদর্থ গ্রহণ করে "আমিই ঈশ্বর" বুঝে কার্য্যতঃ নাস্তিক হয়েছিল। প্রকৃত সাম্য ও স্বাধী-নতা কি তাহা হৃদয়ঙ্গম না করে "সাম্য ও স্বাধীনতা" মন্ত্রের সাধনা করে আজ মহাসুর মাতৃবরে দৃপ্ত বলীয়ান হয়েছে—ঠিক সেই-

রূপ; জগতকে কাঁপিয়ে তুলেছে।

সাম্য ও স্বাধীনতাবাদ পাশ্চাত্যদেশে যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় মাত্র। তারা সাম্য ও স্বাধীনতা বলতে যাহা উপলব্ধি করে, তাহা ব্যক্তিগত ও জাতিগত; জাগতিক ভোগলাভের প্রসার বর্দ্ধন মাত্র। ব্যক্তিগত ও সমাজগত লক্ষ্য উহাদের জড়ভোগ এবং তাহার সমান ও ন্যায্য বণ্টন ও ভোগাধিকার—ইহাই উহাদের "সাম্য ও স্বাধীনতার অর্থ"। ইহাই ও মহামন্ত্রের কদর্থ। এই মন্ত্রার্থকে সজীব করে তুলে—ইহারই সিদ্ধির আশায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তীব্র সাধনা করে—মায়ের মন্দিরে লক্ষ লক্ষ বলি দিয়ে—রক্তগঙ্গায় মায়ের চরণ ধৌত করে তারা সিদ্ধি লাভ করেছে। ছোট বড় একাকার করে স্ত্রী পুরুষ সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে—দম্ভে দর্পে দিক্‌বিদিক্ বিধ্বস্ত করে জয়োল্লাসে ছুটছে।

ভারতের ঋষি স্বাধীনতা অর্থে যথেচ্ছাচারিতার একেবারেই বোঝেন না। আত্মার অধীনতায় আত্মাকে নিয়ে আসাই প্রকৃত স্বাধীনতা। পাশ্চাত্য জগতের liberty, আর ভারতের ঋষির স্বাধীনতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতের ঋষির সাম্য অর্থে যে যে অধিকারের জীব তাহাকে সেই অধিকার সম্যকরূপে অনুশীলনের প্রসার দেওয়া এবং সে অধিকার ভগবৎকর্ত্তৃত্বানুষ্ঠিত, জন্মগত বা জাতিগত। পাশ্চাত্য Equity—সব ভেঙ্গে চুরে একাকার করা, ঋষির সাম্য স্ব স্ব ধর্ম্ম সম্যক পুষ্ট করা। এই দুয়েও প্রভেদ আকাশ পাতাল। পাশ্চাত্য স্বাধীনতা যথেচ্ছাচারিতা আর ঋষির স্বাধীনতা আত্মাধানে ব্যক্তিগত, সমাজগত ও জাতিগত শক্তিকে নিয়ে আসা। পাশ্চাত্য স্বাধীনতা প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তিচালিত জন সমাজের চরণে দাসখত লিখে দেওয়া মাত্র আর ঋষির স্বাধীনতা প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি চালিত জীবের দাসত্ব থেকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হওয়া। ব্যক্তিগত শক্তি আত্মায়ত্তীভূত হওয়াই ব্যক্তিগত মুক্তি—ঋষির অর্থ এই দিকে মানুষকে ও সমাজকে নিয়ে যায়—আর যথেচ্ছাচারিতা ব্যক্তিগত শক্তিকে গণশক্তির যূপকাষ্ঠে বা রুদ্ধমুখ জড় গহ্বরে

নিপতিত করে। ইহারই দৃষ্টান্ত দৃপ্ত অসুরের স্তব্ধতায়।

তাই দেখ আজ, ছুটতে ছুটতে অসুর এমন ক্ষেত্রে এসে পড়েছে যেখানে সমস্ত নর নারী একটা গণশক্তির ক্রীত দাস মাত্র—তাদের ব্যক্তিগত সাম্য ও স্বাধীনতা গণশক্তির নির্ম্মম শৃঙ্খলে চিরশৃঙ্খলিত হয়ে পড়েছে। মানুষের ভিতরকার পশু অংশ-টাকে স্বাধীন বিচরণের পথে উন্মুক্ত করে দিতে গিয়ে যথেচ্ছাচারিতার একান্ত প্রশ্রয় দিয়ে আজ সেই যথেচ্ছাচারিতাকেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেখে অসুর বিমূঢ়।

মানুষের পশুবৃত্তিগুলাকে স্বাধীনভাবে বিহারের সুযোগ ও প্রশ্রয় দিতে গিয়ে অসুর ভাবছে—স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করছে; কিন্তু ঋষিরা ওইটাকেই যথার্থ দাসত্ব বলে বোঝেন আর অই ক্রীত-দাসত্বের নিগড় থেকে ব্যক্তি সমাজ ও জাতিকে উন্মুক্ত করবার জন্য যে সমাজ বিভাগ রচনা করেছেন, তাকে ঠিক রাখতে পারলে—সব স্বাধীনতা গেলেও একান্ত অধীন হয়ে গেলেও, তার শক্তি অটুট থাকে। আর যদি সমাজের সর্ব্ববিভাগ ঋষির চিহ্নিত সাম্যে অবস্থান করে, তবে সর্ব্বাঙ্গীন সাম্যের বলে সে সমাজশক্তি সহজেই একটা জাতিশক্তি বা দেশ-শক্তিতে উজ্জীবিত ইচ্ছা করলেই পারে এবং সর্ব্বপ্রকার দাসত্বের দূরীকরণ তাহাদের করায়ত্ত হয় অর্থাৎ মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা লাভ করে।

আর পাশ্চাত্য সাম্য ও স্বাধীনতা দাসত্বেরই প্রসার বৃদ্ধি করে ও গণশক্তিকে দাস শক্তিতে পরিণত করে। অসুরের অভ্যুত্থান হয় শুধু মায়ের চরণতলে পিষ্ট হবার জন্য—নিত্য দাসত্বে বিক্রীত হবার জন্য।

সত্য যুগে মনুষ্য জগতে ব্রাহ্মণাধিকার ছিল। সত্যের অপসারণের ক্রমানুসারে ত্রেতায় ক্ষত্রিয়াধিকার, দ্বাপরে বৈশ্যাধিকার এবং কলিতে দাসাধিকার। জগতে এই দাসাধিকারের বন্যা প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে এবং হতে থাক্‌বে।

যদিও অসুর আজ আপনার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা গণশক্তির দুয়ারে ক্রীত দাসের

মত বিক্রীত হতে দেখে একটু চিন্তাশীল হয়েছে ; ওটা—ওর গতি এখন ফিরাতে পারবে না। ওদের এ সমস্যা মীমাংসিত হবে দুর্বৃত্ততায় ও দাসত্বে। গণশক্তি ব্যক্তিগত ওদের এ অধঃপতন ঢাকা দেবার জন্যে "বর্ণাধিকার" না দিলেও আগে আসবে শ্রেণী বিশেষের দাসত্ব ও শ্রেণী বিশেষের প্রভুত্ব। অথবা প্রদেশ বিশেষের দাসত্ব ও প্রদেশ বিশেষের প্রভুত্ব। পরস্পর ঐ বিভাগ তারপর দস্যুরযুগ—Knight এর যুগ। কেঁচে গণ্ডূষ। কিন্তু থাক দূর ভবিষ্যৎ ঋষির মুখে শুনে কাজ নেই।

ভারতের ঋষি বল্লেন এটা সিদ্ধ অসুরের অভ্যুত্থান। সুতরাং অসুরনাশিণী ও অসুর দুয়েরই অভ্যুদয় বলতে হবে। কেন না এ যে সাধনা-সিদ্ধ মাতৃবরপ্রাপ্ত অসুর, একে মেরেই এরই মেদে ভবিষ্যৎ মেদিনী গঠিত হবে। আর মায়ের রক্ত চরণে মুক্ত পুরুষের রক্ত জবা আবার শোভা পাবে। ভারতের গুরুর কাছে ইন্দ্রের মত বিরোচনও আবার ফিরে আসবে। সাম্য ও স্বাধীনতার মহামন্ত্রের যথার্থ অর্থ গ্রহণের জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে শিষ্য ও দাস হবে অসুর—আপনার মেদ দিয়ে গুরুর আসন রচনা করবে, কিন্তু সে কতদিনে মা—কতদিনে ? আজ যে আমাদের ঐ অসুরেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাম্য ও স্বাধীনতার বিপরীত অর্থগ্রহণ করে, অসুরের হুঙ্কারে হুঙ্কারে মিশাতে কে যেন আহ্বান করছে। অসুরের রক্ত ধ্বজার তলে শির নত করতে প্রলয় স্রোত দেশকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে কি শুধু অসুরের সঙ্গে নিষ্পেষিত হবার জন্য না অসুর বিঘাতনে তোমার আবির্ভাবে সহসা সচেতন হয়ে জয়োল্লাস করবার জন্য ; অসুরের উপর তোমার বর ও আশীষের বর্ষণ দেখে তোমার স্মৃতি বুকে কটাইয়া ভুলবার জন্য—না শুধু তোমার দিকে সভয়ে, সাকুল সোদগীব দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবার জন্য—ঋষি আজ অতি সন্তর্পণে অতি সাবধানে এ প্রলয়ের প্রভঞ্জনে পদক্ষেপ করবার জন্য ইঙ্গিত করছেন।

অসুর ও অসুরনাশিনী তুমিই মা। কিন্তু তবুও আমরা তোমার অসুর মূর্ত্তি দেখে ভীত হই। তোমার অসুরনাশিনী শিবামূর্ত্তি দেখবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকি। কতদিনে তুমি মঙ্গলময়ী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হয়ে জগতের প্রলয় বিপ্লবের শান্তি করিবে।

বর্ষায় পূর্ব্ববঙ্গশ্রী।

(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ)

(১)

পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা মেখলা
জন্মভূমি মোর পূরব বাঙ্গালা,
পুণ্যতোয়া কত শত স্রোতস্বতী
বক্ষে কক্ষে পৃষ্ঠে ছুটে দ্রুতগতি ;
হিমালয় হইতে সহস্র ধারায়
লুটাইয়া পড়ে বাঙ্গালার গায় ;
নেচে নেচে চলে কত তটভূমি,
চির হরিতের প্রিয় জন্মভূমি ;
সরল উর্ব্বর বক্ষে বার মাস
মধুর সুরভি শস্যের প্রকাশ,
রচিত খচিত পত্র পুষ্প ফলে
শ্যামল সুন্দর চঞ্চল অঞ্চলে,
ঢাকা রাশি রাশি স্বর্ণ শস্য ভার
অফুরন্ত যার ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার ;
হাটে ঘাটে পণ্য কত রে লুটায়
কাঠ বিনিময়ে কাঞ্চন বিকায়।
পণ্যবাহী তরী ছুটে সারি সারি,
কোথা কোন দেশে কেবা নেয় হরি!
উড়াইয়া পাল, গাহি ভাটীয়াল,
ছুটে দিক্ বিদিক্ নৌকার জাঙ্গাল।

(২)

মরি সে তরঙ্গ ভঙ্গে, নাচিয়া নাচিয়া রঙ্গে,
অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গে বেড়ায়।
ধবল পালের পাখা, উড়াইয়া চলে নৌকা,
'মন মাঝি' কত গাথা গায়।
গৌরাঙ্গ-কাণ্ডারী করি, কেহ ধরে দীর্ঘ পাড়ি,
মারে দাঁড়, গাহে ভাটীয়াল।
সে উদাস স্বর শুনি, মোর জীর্ণ তরী খানি,
সেই সাথে ছাড়েরে উড়াল।

পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, বুড়ী, মেঘনাদ ধলেশ্বরী,
সব গাঙ্গে সেই নাও ধায় ।
আমারে লইয়া সাথে, ছুটে চলে দ্রুত স্রোতে
কত ছবি আমারে দেখায় ।

(৩)

বিশাল সাগর পারা আধাবাঙ্গালার
অপূর্ব্ব বর্ষায় পূর্ব্ব বঙ্গশ্রী আমার ।
দিগন্ত প্লাবিত এক প্রবল বন্যায়,
হাট, ঘাট, মাঠ, পথ সব ডুবে যায় ।
ভাসে পদ্মপত্র সম উচ্চভদ্রাসন
শ্যামল শয্যায় সুপ্ত নীল নারায়ণ !
শত পথে ছুটে ধারা করিয়া গর্জ্জন,
শত ধারে ধৌত করি মায়ের প্রাঙ্গন !
স্নিগ্ধ করি রৌদ্র দগ্ধ বক্ষ বৈশাখের,
ছুটেছে উথলি বন্যা মুগ্ধ আমাদের ।

(৪)

গিরিদরি ভেদ করি, ধায় বেগে সেই বারি,
সাগর সন্ধানে বেগে ধায় ।
কত কলনাদ ছন্দে রূপ রস কত গন্ধে
তটে তটে কতরে লুটায় ।
হরিত মণ্ডিত তট, স্নিগ্ধ গাত্র ছায়া বট,
কত ঘাটে কৃষকের মেলা ।
গাভী বৎস বৃষ চরে, লম্ফে লম্ফে ঘুরে ফিরে,
কৃষক বালক করে খেলা ।
সেই ঘাটে গ্রাম্য-বধূ হেসে হেসে মৃদু মৃদু,
ভরে ঘড়া, ইতি উতি চায় ।
একটানে কাঁখে তুলে, টিপে টিপে পা'টী ফেলে,
এঁকে বেঁকে হেলে দুলে যায় ।
কেহ ননদির কথা, কহে ঘাটে ভাঙ্গি মাথা,
কলরোলে গগন কাঁপায় ।
কার স্বামী পরবশে, কারে স্বামী ভালবাসে,
কহি হেসে হেসে গলে যায় ।
কেহ বাহুপাশ দিয়ে, বাঁধে ঢেউ সাপুটীয়ে,
সেই ঢেউ পথ নাহি পায় ।
পীনোন্নত বক্ষঘাতে চূর্ণ হয়ে শত পথে,
আস্তে লাস্তে হাস্যেতে লুটায় ।
নবীন জলের মীন, ধৈরয ধরিবে কেন ?
ধৈরয যে নাই ধরা যায় ।
যৌবন জল তরঙ্গে, গাগরী লইয়া রঙ্গে
ভাসে ডুবে সাঁতার খেলায় ।
মরা গাঙ্গে এল বান, কাঁদে বিরহীর প্রাণ,
আকাশের ঘন-দরশনে ।
কৃষক, চাতক, কবি, সেই ঘন ঘটাচ্ছবি,
হেরি, হরষিত মনে মনে ।

(৫)

আকাশে উড়ায়ে কেশ জলদের-মালা,
কটাক্ষে বিজলী ছুটে, হাস্যে করে খেলা,

স্বর্ণ-চম্পকের ছটা, অঙ্গরুচি তার,
লুটায় অসীমে শ্যাম বসনের ভার,

হস্তে স্নিগ্ধ শস্যগুচ্ছ, কর্ণে কর্ণিকার,
পদনিম্নে ঊর্দ্ধমুখে কুমুদ কহ্লার!

চড়ি চপলার রথে, ছুটে রমা শূন্যপথে,
বরষার বঙ্গশ্রী আমার।

চঞ্চল অঞ্চল দোলে, নাচে নদী সে হিল্লোলে,
স্বেদ বিন্দু ধারা বরষার।

মরি কি রূপের ছটা, প্রাবৃটের ঘন ঘটা,
এ যে রূপ নহে তুলনার।

নমি পূর্ব্ব বঙ্গভূমি, জনমে জনমে তুমি,
মা হইও, ওগো মা আমার।

"সত্যের সন্ধানে"।

(শিবপুর সাহিত্য-সংসদে পঠিত।)

(শ্রীনীলরতন মিত্র, এম-এ)

মানুষের চিন্তাশক্তিই তাহাকে সৃস্ট-জীবের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছে। এই চিন্তাশক্তির প্রভাবেই মানব, প্রকৃতির বরপুত্র হইতে সক্ষম। ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানব্যাপী চিন্তাশক্তিই মানবের মনুষ্যত্বের লক্ষণ এবং ইহার সদ্ব্যবহারই তাহার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। এই বিশেষ অধিকার আছে বলিয়াই তাহার দায়িত্ব উন্নতির সম্ভাবনা ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অবনতির আশঙ্কাও যে বেশী তাহা বলা বাহুল্য।

যখন আমাদের জ্ঞানের উদয় বেশী হয় নাই, তখন বাহ্য-জগতের সম্যক্ জ্ঞান আমরা প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে করি। বাহ্য-জগতের জ্ঞান আমাদের মনকে জোর করিয়া অধিকার করিয়া বসে। পরে যখন আমাদের চিন্তাশক্তি একটু পরিপক্ক হয়, তখন বুঝিতে পারি, বাহ্য-জগতটার অস্তিত্বজ্ঞান আমরা

আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই পাই বটে—বাহ্য-জগতটার জ্ঞান ও আমাদের জ্ঞান পারস্পরিক বটে কিন্তু বাহ্য জগতের "সম্পূর্ণ" জ্ঞান আমাদের অনুমান সাপেক্ষ। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ মধ্যস্থ হইয়া বাহ্য-জগতের "বিশেষ" উপলব্ধি করায়। রামকে যখন শ্যাম ধাক্কা দেয়, ধাক্কা প্রাপ্তি মাত্রেই রাম বুঝিতে পারে যে অপর একটী শক্তি তাহার উপর ক্রিয়া করিয়াছে। কিন্তু শ্যাম কে, মানুষ না পশু ইত্যাদি—শ্যাম সম্বন্ধে আর আর অসংখ্য বিষয় রামের অনুমান সাপেক্ষ। কিন্তু ধাক্কার উপলব্ধি হইবামাত্র, রামের পক্ষে অপর একটী শক্তির অস্তিত্বের জ্ঞান ও ধাক্কার অনুভব পারস্পরিক।

একথা ধ্রুব সত্য, যে একটী শক্তি নানা ভাবে নানা পরিমাণে বাহ্য-জগতের ভিতর ক্রিয়া করিতেছে। সেই শক্তি জ্ঞাতার ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া নানারূপ অনুভব উৎপাদন করিলে, জ্ঞাতা সেই সকল অনুভবের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া নিজের বাহ্য-জগৎ সৃষ্টি করে। জ্ঞাতার অন্তর্নিহিত শক্তি এ এই দ্বিতীয় শক্তির উৎপত্তি স্থান এক না হইলে পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে কখনই পারে না। কোন কিছুর মিল ও সামঞ্জস্য না থাকিলে পারস্পরিক আকর্ষণ আদান প্রদান ও সম্বন্ধ অসম্ভব।

মানুষ তাহার ক্ষুদ্র গণ্ডি অনুযায়ী প্রকৃতিকে বুঝিতে পারে, তাহার কারণ প্রকৃতিও বুদ্ধি পরিচালিত। প্রকৃতি কতক গুলি স্বাধীন উশৃঙ্খল পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির খেলা হইলে, প্রকৃতি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে ইহার ক্রিয়া-কলাপের নিয়মাবলী বৈজ্ঞানিকগণের চিরকাল অজ্ঞাত থাকিত। প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অল্প ও অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রকৃতি দোষণীয় নয়। আমাদের যত দূর ক্ষমতা তাহাতেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। প্রকৃতির ভিতর যে শক্তি খেলা করিতেছে, তাহা আমাদেরই অন্তর্নিহিত শক্তির মত মানসিক শক্তি। উভয়েরই উৎপত্তি স্থান এক—সৃষ্টিকর্ত্তা একই অনন্ত মানসিক শক্তি তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

প্রকৃতি কতগুলি অন্ধ শক্তির খেলা ও আমরা সেই শক্তি সকলেরই আকস্মিক সৃষ্টি মাত্র ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রকৃতির স্বাভাবিক গুণই অন্ধকার, তাহা হইলে কি করিয়া আলো আসিতে পারে?

"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ
নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"

পুনশ্চ মন আছে বলিয়াই বিষয়ের জ্ঞান হয়, বিষয়ের অস্তিত্বের জ্ঞান, মন না থাকিলে কি করিয়া হইতে পারে? কোন কিছুর সত্তা মানিতে গেলেই, তার আগে মন যে আছে ইহা তৎসঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বিশ্বকর্ত্তা যে এক বিরাট মানসিকশক্তি, বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ ইহা মানিতে ইতস্ততঃ করিলেও ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না। এই অনন্ত শক্তিকেই বেদান্ত "জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটী একটী অনন্ত শক্তির খেলা, এটী একটী প্রকাণ্ড যন্ত্র বলিলে ঠিক তুলনা হয় না, কেননা যন্ত্র ও যন্ত্র-নির্ম্মাতা দুই পৃথক বস্তু, কিন্তু বিশ্ব ও বিশ্বচালক পৃথক বস্তু নয়। বিশ্বই বিশ্ব চালকের শক্তির প্রকাশ মাত্র। জ্ঞেয় না থাকিলে জ্ঞাতার যেমন কোন জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ এই বিরাট অনন্ত মানসিকশক্তি অর্থাৎ "ব্রহ্ম" তাঁহারও কোন জ্ঞান হইতে পারেনা যদি তাঁহার জ্ঞেয় কিছু না থাকে, জ্ঞান হইতে গেলেই জ্ঞাতা (subject) ও জ্ঞেয় (object) উভয় যুগপৎ বর্ত্তমান না থাকিলে হয় না। আমরা সান্ত, আমাদের জ্ঞেয় বস্তু আমাদের বহির্ভাগে অবস্থিত ও আমরা তদ্দ্বারা বদ্ধ, কিন্তু সেই পরম সত্য ব্রহ্মের পক্ষে যিনি অদ্বিতীয় যাঁহার বহির্ভাগে আর কিছুই নাই, তাঁহার পক্ষে জ্ঞেয় এইরূপ বহির্ভাগে অবস্থিত দ্বিতীয় শক্তির প্রকাশ নয়—তিনি নিজেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হইয়া অনন্ত বিশ্ব-লীলা অনন্ত কাল ধরিয়া অভিনয় করিতে-ছেন। অতএব বিশ্ব বিশ্বকর্ত্তার শক্তির প্রকাশ মাত্র। আমরা সাধারণ বুদ্ধির বোধগমনার্থ ইহার সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কল্পনা করিয়া থাকি।

বিশ্বের আদিও নাই অন্তও নাই! ইহা

চিরকাল প্রকাশমান। সূর্য্যের জ্যোতি, সূর্য্যের প্রকাশমাত্র—গুণ ও তাহার প্রকাশ একই, কেন না প্রকাশ না হইলে আমরা কি করিয়া গুণ জানিতে পারি ? সূর্য্যকে মেঘে ঢাকিতে পারে কিন্তু সমগ্র বিশ্ব যাঁহার অনন্তশক্তির বিন্দু প্রকাশমাত্র তাঁহাকে কোন মেঘে ঢাকিতে পারে ? তিনি অদ্বিতীয়। সূর্য্যের জ্যোতির অস্তিত্ব সূর্য্য ছাড়া থাকিতে পারে না,—সূর্য্যের জ্যোতির যদি কিছু স্বায়ত্তগুণ থাকে তাহা সূর্য্য হইতেই প্রাপ্ত। বিশ্ব ও বিশ্বকর্ত্তার পক্ষেও সেই নিয়ম। অতএব বিশ্বের যাহা কিছু সত্যতা আছে তাহা বিশ্বকর্ত্তা হইতেই যে প্রাপ্ত ইহা সুনিশ্চিত। বিশ্ব বহু হইয়াই এক, বিশ্বকর্ত্তা বহুভাবে নিজেকে প্রকাশ করিলেও তিনি ছাড়া প্রকৃত সত্য কিছুই নাই—আর যদি থাকে তাহা স্বায়ত্তাধীন পূর্ণ সত্য নয়—আংশিক মাত্র ও ঐ পূর্ণসত্যই তাহার আধার। স্থূল দৃষ্টিতে বিশ্বকে বহুখণ্ডে ভিন্ন বোধ হয়, কিন্তু ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। স্থূল দৃষ্টিতে যাহা অনৈক্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার ভিতর পূর্ণ ঐক্য বর্ত্তমান। পূর্ণ-জ্ঞান পরমব্রহ্মের স্বেচ্ছাকৃত অনৈক্যের ভিতর যে ঐক্য তাহাই প্রকৃত ঐক্য। যেমন কোন কিছুর মিল না থাকিলে জ্ঞান হয় না সেইরূপ জ্ঞান হইতে গেলে ঐক্যের ভিতর আবার অনৈক্যও চাই। পার্থক্য না থাকিলে দুইটা জিনিষের তুলনা করা চলে না। আর প্রকৃত ঐক্যও অনৈক্যের ভিতর দিয়া সাধিত হয়। অনৈক্যের ভিতর ঐক্যের অনুসন্ধানই দর্শন ও বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য—অনৈক্যের ভিতর ঐক্যই প্রকৃত সত্য ও সৌন্দর্য্য। অনৈক্য যত বেশী হইবে—অন্তর্নিহিত ঐক্যও তত পরিস্ফুট ও দৃঢ়ীভূত হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অনৈক্যের সৃষ্টিও অকারণ নয়। পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুই সতত পরিবর্ত্তনশীল। কুঁড়ি যেমন ফুল হইতে ব্যগ্র, তেমনি জগতের প্রত্যেক জিনিষই কি এক লক্ষ্যতে পৌঁছিবার জন্য সতত ব্যগ্র ; কুঁড়ির ফুল হইতে যে সময় লাগে—সেই সময়ের অবস্থাটীকে—কুঁড়িও বলা যাইতে পারে না—আর ফুলও বলা

যাইতে পারে না, এইটীকে ক্রমবিকাশের সময় বলা যাইতে পারে। এই ক্রমবিকাশই পৃথিবীর এক প্রধান নিয়ম। এই বিশ্বব্যাপী পরিবর্ত্তন ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় সকলেরই বর্ত্তমান অবস্থায় যেন কি এক অসম্পূর্ণতা আছে, পূর্ণতাপ্রাপ্তিই যেন বিশ্বের সমস্ত পরিবর্ত্তনের মহান্ উদ্দেশ্য। বিশ্ব যখন এক অনন্তশক্তির প্রকাশ তখন বিশ্বের ক্রমবিকাশও অনন্ত ও অসীম। কিন্তু তাই বলিয়া বিশ্ব যাঁহার প্রকাশ তিনি কোন অংশে অসম্পূর্ণ নহেন—তাঁহার "প্রকাশ" অফুরন্ত ও অসীম। জগতাতলে এই ক্রমবিকাশের প্রতিযোগিতায় লক্ষ্যের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আর এই লক্ষ্যের বাহ্য বিভিন্নতাই শত শত হিংসা দ্বেষ ও দ্বন্দ্বের কারণ। ঘরে বাহিরে, দেশে বিদেশে, জাতিতে জাতিতে আবহমান কাল ধরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। ইহাতে বুঝিতে হইবে কি যে এই পৃথিবী একটী অনন্ত সমরাঙ্গন? বিশ্বকর্ত্তা সচ্চিদানন্দের রাজ্যে দ্বন্দ্বই কি মুখ্য উদ্দেশ্য? না তাহা কখনই হইতে পারে না। একটী ঘড়ি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহার প্রত্যেক কাঁটা প্রত্যেককে আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু আবার ইহাদেরই সম্মিলনে একটী সাম্যতার সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। সেইরূপ প্রত্যেকের লক্ষ্য ভিন্ন থাক কোন ক্ষতি নাই, এই বিভিন্নতার ভিতর একটি এমন সাধারণ ও বিশ্বজনীন লক্ষ্য বর্ত্তমান যেখানে একতার সম্ভব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আর এই বাহ্যিক দ্বন্দ্বের ভিতর একতা ও সমন্বয়ের সম্ভাবনাই কারিকরের বাহাদুরী। অনৈক্য সত্ত্বেও বিশ্বের সকল বস্তু এক অন্তর্নিহিত দৃঢ় সূত্রে গাঁথা—এই ঐক্যের দৃঢ়বন্ধন ও লক্ষ্যের একতা বিশ্বকর্ত্তার পূর্ণ সত্যতার প্রমাণ দিতেছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নৈতিক হিসাবে আমরা আমাদের স্বাধীনতা যতই প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হই না কেন, সে স্বাধীনতার পরিধি অতীব সংকীর্ণ। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন সেই এক। বিজ্ঞান যতই জড়জগতকে বিশ্লেষণ করুক, দর্শন যতই বিশ্বসমুদ্রে ডুবুরির মত ডুব দিতে প্রয়াস

পাক্, সত্যের অনন্ত তথ্য চিরকাল মানবের অজ্ঞেয় থাকিবে। ক্ষুদ্র নদী কখনই বিশাল বারিধিকে গ্রাস করিতে পারে না। স্রোতস্বিনী বারিধিকে স্থান দিতে নাই পারুক, প্রবেশ লাভ করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারে ত? সেই জন্য নদীও বারিধি সঙ্গলাভের চেষ্টা হইতে বিরত থাকে না। আর এই প্রবেশই, এমন কি প্রবেশের চেষ্টাই কি গৌরবের বিষয় নয়?

উচ্ছৃঙ্খল হইলে চলিবে না—চাই অধ্যবসায়, সংযম ও সহিষ্ণুতা। লক্ষ্যের মহত্ব ও সাধনার লঘুত্ব বিকৃতমস্তিষ্কের কল্পনা। লক্ষ্য যদিই অলভ্য হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই—তবুও সিদ্ধির জন্য যথাবিধি পরিশ্রম কখনই দোষণীয় নয়। হাতে হাতে চেষ্টার ফল নাই পাওয়া যাক্—কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বরাজ্যে শক্তির অপব্যয় যে হয় না ইহা চিরসত্য!

ত্রিবেণী।

(উপন্যাস)

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এ লিখিত)

(১)

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ইন্দু বলিল, "ঠিক ব'লেচ সুরেশদা'; ন্যায় দণ্ড হাতে নিয়ে—কর্ত্তব্যের দিকে লক্ষ্য ক'রে—পরের জন্যে ত্যাগস্বীকার করাই যথার্থ মনুষ্যত্ব। তাই যদি না পাল্লুম তাহ'লে আমরা মানুষ কিসের?

সুরেশ উত্তর করিল, "শুধু পরের জন্যে কেন ইন্দু, অনেক সময়ে নিজের জন্যেও অনেক জিনিস্ ত্যাগ ক'র্ত্তে হয়।"

"নিজের জন্যে!'

"হ্যাঁ ইন্দু, নিজের জন্যে। নিজের মনে শান্তি পাবার জন্যে অনেক সময় নিজের অনেক ইচ্ছেকে; অনেক সাধ আহ্লাদকে ত্যাগ ক'র্ত্তে হয়।"

"ঐখানেই তোমার সঙ্গে আমার মেলে না সুরেশদা'; তুমি পরকে বাদ দিয়ে নিজের জন্যে বড্ড বেশী ভাব।" একটু হাসিয়া সুরেশ বলিল, "নিজেকে যদি একেবারে ভুলেই যাব, তাহ'লে পরকে ভাব্‌ব কি ক'রে ইন্দু? আর পরকে নিজের ক'রেই বা নেব কি ক'রে? আমি এ কথা ব'ল্‌চি না যে, নিজেকে ভাবতে হবে ব'লে স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দিতে হবে। 'আমিত্বের' শাঁসটুকু বজায় রেখে খোসাটাকে ফেলে দেওয়া চাই। এই খোসাটাই মানুষকে কানা ক'রে দেয়। স্বার্থপর করা দূরে থাক্, বরং এই 'আমিত্ব' ভাবটাই অনেক সময়ে আমাদের পথ চিনিয়ে দেয়।"

"আর ত্যাগের কথা কি ব'ল্‌ছিলে সুরেশদা'?"

"ঐ যে ব'ল্লুম ইন্দু, ত্যাগ পরের জন্যেও ক'র্ত্তে হয় আবার্ সময়ে নিজের জন্যেও ক'র্ত্তে হয়। যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বুঝ্‌তে পেরেচে, সেই নিজের জন্যে ত্যাগ ক'র্ত্তে পারে, আবার পরের জন্যেও পারে। তার আগে কারুর জন্যেও পারে না।"

টেবিলের উপর কনুয়ের ভর দিয়া ইন্দু বলিল, "তাহ'লে তুমি ব'ল্‌তে চাও, মানুষের নিজের জন্যে ত্যাগ ক'র্ত্তে শেখা উচিৎ আগে, তার পর পরের জন্যে?"

টেবিলের উপরে একটা সজোরে চড় মারিয়া সুরেশ বলিল, "তাতো নিশ্চয়ই ইন্দু। তাইতো তোকে সন্ধ্যাবেলা থেকে বোঝাতে চেষ্টা ক'রচি। যে নিজের জন্যে একটুও ত্যাগ ক'র্ত্তে পারে না, সে আবার পরের জন্যে কি ত্যাগ ক'রবে ইন্দু?"

"আচ্ছা সুরেশদা', পরের জন্যে ত্যাগ ক'ল্লে কি নিজের জন্যে ত্যাগ করা হ'ল না? পৃথিবীর সবাই তো আপনার।" একটু নড়িয়া চড়িয়া সোজা হ'য়া বসিয়া সুরেশ বলিল, "ঠিক কথা; কিন্তু সব সময়ে সকলকে আপনার ভাবা একটু কঠিন হ'য়ে পড়ে। আর আমি যে ত্যাগের কথা ব'ল্‌চি, তাতে শুধু নিজের জন্যেই ত্যাগ ক'র্ত্তে হয়। তার সঙ্গে পরের

কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের উচিৎ নিজের নিজের অবস্থা অনুযায়ী নিজেকে তৈরী ক'রে নেওয়া। কিন্তু এ ভাবে নিজেকে তৈরী ক'র্ত্তে গেলে অনেক সময়ে নিজের অনেক ইচ্ছেকে দমন ক'র্ত্তে হয়। তা যে না পারে শেষকালে সে অশান্তির তাড়নায় অস্থির হ'য়ে অধমতারণ ভগবানের ওজর আর পোড়া কপালের ওজোর ক'রে যত দোষ দেয়। তাই ব'ল্‌ছিলুম ইন্দু, নিজের মনে শান্তি পাবার জন্যে, নিজের অবস্থামত নিজেকে তৈরী ক'রে নেবার জন্যে আমাদের প্রত্যেককে অনেক সময়ে অনেক জিনিস্ ত্যাগ করা উচিৎ; সে ত্যাগের সঙ্গে পরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।"

"আজ তোরা তর্ক ক'রেই রাত কাটিয়ে দিবি সুরেশ?" বিন্দুবাসিনীর গলার স্বর শুনিয়া সুরেশ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কটা বেজেচে মা?" বিন্দ্‌বাসিনী কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এগারটা ত কখন বেজে গেছে। তোদের বুঝি আর রাত হয় না? দু'জনে একত্র হ'লেই কি তর্ক ক'র্‌বি?" ইন্দু হাসিয়া বলিল, "হ'লেই বা রাত জ্যাঠাইমা। আজ সুরেশদার সঙ্গে তর্ক ক'রে অনেক জিনিস্ শিখ্‌তে পাল্লুম। এখন কিন্তু শেষ হয়নি সুরেশদা', তা ব'লে দিচ্চি। আমার এখনও অনেক কথা জিগেস্ করবার আছে।" বিন্দ্‌বাসিনা বলিলেন, "আজ থাক্ মা; কাল আবার আরম্ভ করিস্। অনেক রাত্রি হ'য়ে গেছে। জামাই আস্‌বার কথা আছে, বোধ হয় সে অনেকক্ষণ এসেচে।"

সদা হাস্যময়ী ইন্দুর মুখখানি স্বামীর আগমন-বার্ত্তায় বর্ষাকালের আকাশের মত অন্ধকার ও কালো হইয়া গেল। সুরেশ এবং বিন্দুবাসিনী উভয়েই ইহা লক্ষ্য করিলেন।

ঘরের বাহিরে আসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া সুরেশ বলিল, "কি মেঘ ক'রেচে মা!" বিন্দুবাসিনী ইন্দুকে বলিলেন, "বাড়ী যা ইন্দু বড্ড বৃষ্টি আস্‌চে।"

"আজ কেন এখানে থাকি না, জ্যাঠাইমা। এ ঠাণ্ডায় আর বাইরে বেরুতে ইচ্ছে ক'রচে না।" ইহার অর্থ বুঝিতে পারিয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "তাকি হয় মা, জামাই যে রাগ ক'রবে।"

ইন্দু আর কিছু না বলিয়া বামা ঝিয়ের সহিত পাশ্বের বাড়ীতে চলিয়া গেল।

খাইতে খাইতে সুরেশ বলিল, "দেখ মা, ইন্দুর বাবা বেঁচে থাকলে, আমার বোধ হয়, বীরেনের মতন একজন লম্পট মাতালের সঙ্গে ইন্দুর কখনই বিয়ে হ'ত না।" বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "এখন তো আর সে কথা ভাবলে চ'লবে না। ঐ মাতালকে নিয়েই ইন্দুর ঘর কত্তে হবে।"

"তাতো হবেই। সেইজন্যই আজি ইন্দুকে বোঝাচ্ছিলুম যে, সকলের উচিৎ নিজের নিজের অবস্থা অনুযায়ী নিজেকে তৈরী ক'রে নেওয়া।" "ইন্দু যেদিন বীরেনকে আপনার ক'রে নিতে পারবে, যেদিন সে তাকে মানুষ ক'ত্তে পারবে সেইদিনই সে যথার্থই সুখী হবে, আর সেইদিনই বুঝবো মেয়ে মানুষ হ'য়ে জন্মান ইন্দুর সার্থক হয়েচে।"

লুচির আধখানি গলাধঃকরণ করিয়া সুরেশ বলিল, "আমার বিশ্বাস মা, একদিন ইন্দু যথার্থই বীরেনকে মানুষ ক'রে তুলবে।

উপর্য্যুপরি চারিটী পুত্রের মৃত্যুর পর হরিনগরের বিখ্যাত জমিদার মৃত্যুঞ্জয় বাবু কনিষ্ঠ পুত্র সুরেশকে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন সুরেশের বয়স মাত্র চারি বৎসর! স্বামীর মৃত্যুতে বিন্দুবাসিনী অকুল পাথারে পড়িলেন। তাঁহার পিতৃকুলের সকলে বহুপূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। স্বামীর কুলেও কেহ ছিল না। অনেক সময়ে অবস্থাই মানুষকে গড়িয়া তুলে। বিন্দুবাসিণীর পক্ষেও তাহাই হইল! ম্যানেজার যোগেশ বাবুর সাহায্যে তিনি নিজেই জমিদারী দেখিতে লাগিলেন এবং সুরেশকে মানুষ করিতে লাগিলেন।

গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সম্মানের সহিত সুরেশ উত্তীর্ণ হইলে তিনি জমিদারীর ভার ম্যানেজারের

হাতে দিয়া পুত্রকে লইয়া কলিকাতার বাটীতে আসিলেন। মাঝে মাঝে বাটী যাইতেন এবং জমিদারীর হাল চাল দেখিয়া আসিতেন। মাতার ইচ্ছা ছিল পুত্র ডাক্তার হইয়া গ্রামে আসিয়া বসিবে। তাহাতে জমিদারীও দেখা হইবে এবং গরীব দুঃখীকেও সাহায্য করা হইবে। কিন্তু সুরেশ ডাক্তারী পাশ করার পর একদিন জননীকে বলিল, "কিছুদিন এখানে প্র্যাক্‌টিশ ক'রে তারপর দেশে গিয়ে ব'সব।" বিন্দুবাসিনী ইহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। কর্ণধার যেরূপ স্রোতের মুখে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে এবং বিপথে নৌকা যাইলেই হাল ঘুরাইয়া তাহার গতি ঠিক রাখে, বিন্দুবাসিনীও তদ্রূপ সুরেশের কর্ণধার স্বরূপ ছিলেন। শোকসন্তপ্ত জননীর পৃথিবীতে একমাত্র সম্বল ছিল সুরেশ। কিন্তু পুত্রের ভাল মন্দ, ভবিষ্যৎ জীবন সমস্তই কেবল তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছে জানিয়া তিনি অনেক সময়ে নিজের অনেক স্নেহ ও মমতাকে কর্ত্তব্যের কঠিন আবরণে আবৃত করিয়া সুরেশকে তিরস্কার করিতেন। কোনদিন তিনি তাহার হৃদয়ের বেদনা, স্বামীহারা স্ত্রীর, পুত্রহারা জননীর শোক সুরেশকে বুঝিতে দেন নাই। পুত্রকে তিরস্কার করিয়া তিনি নির্জ্জনে কত রোদন করিয়াছেন। মৃত স্বামী ও পুত্রগণের স্মৃতি উদয় হইলে বিন্দুবাসিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিতেন না, পাছে সুরেশ তাহা শুনিতে পায়। বামুন চাকর থাকিলেও তিনি স্বহস্তে পাক্ করিয়া পুত্রকে খাওয়াইতেন এবং 'এটা খা' 'ওটা খা' করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। এক এক দিন সে বলিত, "এত জিনিষ্ কখন একটা মানুষে খেতে পারে মা?" মাঝে মাঝে তিনি উঠিয়া পুত্রের ঘরে গিয়া দেখিয়া আসিতেন সুরেশ ঘুমাইতেছে কি না। মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার সময় অনেক রাত্রি সুরেশ মড়ার হাড় লইয়া জাগিয়াই কাটাইয়া দিত। বিন্দুবাসিনীও সে ক'দিন পুত্রের পাশে বসিয়া রাত্রি কাটাইতেন।

সুরেশ মাতাকে ভয়ও যেমন করিত

ভালও তেমনি বাসিত। মাতা চোখ রাঙাইলে সুরেশ আর দ্বিতীয় কথাটী কহিত না। সকল বিষয়ে সে জননীর পরামর্শ লইত। চতুর্বিংশতি বৎসরের যুবক হইয়াও এখন সে জননীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া মাঝে মাঝে শুইয়া থাকে এবং শিশুর মত বাজে আবদার করিয়া তাঁহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া মারে। বিন্দুবাসিণীও হাসি মুখে সে সমস্ত সহ্য করেন।

কিন্তু বড় হওয়া সত্ত্বেও পুত্র কোন অপরাধ করিলে তিনি এখনও তাহাকে তিরস্কার করেন এবং সেও নত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকে, তিরস্কারের প্রতিবাদ করে না।

ইন্দুকে পোঁছাইয়া দিয়া আসিয়া বামা বলিল, "দিদিমণিকে ও বাড়ীর মা ঠাকরুণ কি মারটাই মাল্লেন।" সুরেশ একটু উত্তেজনার ভাব দেখাইয়া বলিল, "কেন?" বিন্দুবাসিণী বলিলেন, "জানিস্ তো, সুরেশ, বৌএর স্বভাব।" সুরেশ বলিল, "ঐটেই কাকিমার কেমন দোষ, উনি মনে করেন মাল্লেই বুঝি ওঁর মেয়ে বীবেনের মনের মতন হবে।" বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

"ওকি রে! উঠলি যে! এখন যে কিছুই খাওয়া হয় নি!" "না মা অনেক খেয়েচি।"

বিন্দুবাসিণী বামাকে বলিলেন, "ঠিক এই সময়েই তোর ও কথাটা না বল্লে চলছিল না ঝি। বাছার আমার খাওয়াই হ'লো না।" ক্রমশঃ।

শিবপুর-কাহিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম খণ্ড, শিবপুর "সাহিত্য-সংসদ" হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।)

১। আধুনিক শিবপুরের কথা।

শিবপুর নাম উৎপত্তির নানারূপ আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। ইহার কোন্‌টী ঠিক্—তাহা নির্ণয় করা এখন তেমন সহজ বলিয়া মনে হয় না। সে সকল কিংবদন্তী

গুলি এখানে লিখিত হইল।

(১) একটা প্রবাদ এইভাবে প্রচলিত আছে যে, চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে যখন যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্য নিম্নবঙ্গে ও সুন্দরবনে জল-দস্যু দমনে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন এখানে তিনি শিবপূজা করিয়া এই স্থানের নাম শিবপুর রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নৌ-বহর পরিচালক কাপ্তেন রডা (Rodda) ইহার সান্নিধ্যে থানা-দুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। এ সকল কথা প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।

এই প্রবাদের মূলে সত্য থাকিতে পারে—কিন্তু এতদঞ্চলে কোন প্রাচীন শিব-মন্দিরের অস্তিত্ব দেখা যায় না। তবে শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে নদীতীরে যেখানে লোকের বসবাস ছিল কালক্রমে পলি পড়িয়া সে সকল স্থান ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে! ইহার একটা প্রমাণ এই যে, এখন যেখানে শিবপুর রিজার্ভ পুলিশ ভবন আছে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে আমুটি কোম্পানীর বিস্কুটের কল-কারখানা ছিল। যখন ঐ কারখানা-বাটীর বুনিয়াদ খনন করা হয়, তখন মাটীর নীচে সান্-বাঁধানো কূপ প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল—(Howrah Past, & Present—C. N. Banerji)।

আরও একটি প্রবাদ শুনা যায় যে, সানাপাড়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর একটা পুষ্করিণী খনন কালে, ভূগর্ভে একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ঐ মন্দির গাত্রের কারুকার্য্য-খোদিত ইষ্টক, নিদর্শন রূপে জনৈক ব্রাহ্মণের ঠাকুরঘরে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

(২) অতীত কালে এই স্থানটি শৈব ও শাক্ত প্রধান ছিল। যে সকল প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশ এখানে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের ভূ-সম্পত্তির দলিল-পত্র দেখিলে এটুকু অবগত হওয়া যায় যে,ঐ সকল বিষয় "রত্নেশ্বর-শিব", "গঙ্গাধর-শিব", এইরূপ কোন না কোন শিবের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এই জন্য এই শিবময় পুরীকে "শিবপুর" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

এ প্রবাদটি সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহাই যে একমাত্র স্থির সিদ্ধান্ত এমন কথা

বলা যায় না। কারণ, প্রমাণরূপে যে সকল দলিল পত্র গ্রহণ করা হইয়াছে—সে গুলির মধ্যে কোন খানিই তিন শত বর্ষের অধিক নহে। বরং তৎপূর্ব্বে এই অঞ্চলে পাধান্য ও চণ্ডী-দেবীর পূজাদির কথা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। "বঙ্গসাহিত্যে" বেতোড় শীর্ষক অধ্যায়ে, সে সকল কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) তৃতীয় প্রবাদ এই যে শিবপুরে, গুরু শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন। সেই জন্য শিষ্যবর্গ এই স্থানকে মঙ্গলময় গুরুধাম বা শিবপূরী বলিয়া পরিচয় দিতেন সেই হইতে এই স্থানের নাম শিবপুর হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ এই শ্লোকটীও কেহ কেহ গৌরব সহকারে আবৃত্তি করিয়া থাকেন, যথা :—

"ইয়ং শিবপুরী ধন্যা
ধন্য পঞ্চানন স্বয়ং
অন্নদা কৃষ্ট সিদ্ধান্ত
কিশোর কাল ভৈরবঃ।"

গুরুধাম শিবপুরের গৌরব-ঘোষণায় ঘটকদিগের কারিকায় এই শ্লোক লিপিবদ্ধ আছে—এমন কথাও কোন কোন ভট্টাচার্য্যের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়।

এই প্রবাদটিকে কোন রূপেই মানিয়া লইতে পারা যায় না! কারণ, শিবপুরের গুরু ও পুরোহিত শ্রেণীর ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা আদিম অধিবাসী নহেন। ইঁহারা স্থানান্তর হইতে আসিয়া শিবপুরে বসবাস করিয়াছিলেন—সেও প্রায় আড়াইশত বৎসর কালের অধিক নহে। দ্বিতীয়তঃ ঐ শ্লোকটি একটি উদ্ভট শ্লোক মাত্র, ইহাতে প্রাচীনত্বের কিছুই নাই; বরং যে সকল ব্যক্তির উল্লেখ উহাতে আছে, তাঁহারা সকলেই ঐ ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। সে কথা পর অধ্যায়ে বলিব।

(৪) এইবার একটা অভিনব প্রবাদের কথা বলিব। সেটি এই যে যেমন কালী ঘাটে "নকুলেশ্বর ভৈরব" আছেন, সেই রূপ এই উপপীঠ বেতোড়ের গ্রাম্য দেবীর নাম শ্রীজয়ন্তী ও ভৈরবের নাম শ্রীশিবঃ। পরলোকগত তন্ত্র-সাধক পণ্ডিত শিবচন্দ্র

বিদ্যার্ণব মহাশয় বলিতেন যে এই রূপ বিবরণ "কঙ্কালমালিনী" তন্ত্রে লিখিত আছে। সেই তন্ত্রোক্ত ভৈরবের পুরীর নাম শিবপুর।

এই প্রবাদটি সমিচীন বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়। কারণ, এই প্রবাদে যে প্রাচীণত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আর অন্য প্রবাদ গুলির মধ্যে নাই।

কিন্তু কথা উঠিতে পারে যে, তাহা হইলে কোন প্রাচীন গ্রন্থে অথবা অন্যত্র শিবপুর নামের উল্লেখ নাই কেন? কথাটা যুক্তি যুক্ত বটে। ইহার মীমাংসা করিতে হইলে, আমরা যে কথা প্রথম খণ্ডে নানা প্রমাণ প্রয়োগে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি এখানে তাহারই প্রতিধ্বনি করিব। ইহা সত্য যে, প্রাচীন সাহিত্যে বেতোড়ের নাম আছে, তোড়মল্লের রাজস্ব চিটার বেতোড়ের হিস্যা নির্দ্দিস্ট আছে—কিন্তু কুত্রাপি শিবপুরের নাম নাই। প্রায় দুই শতাধিক বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরাতন দলিলে পরগণে পাইকান, বেতোড়ের অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে—এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তৎপরবর্ত্তীকালের দলিলে—"পরগণে পাইকান কিস্‌মত শিবপুর" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও দেখিতে পাই খৃঃ ১৫০০ সালের পর পর্ত্তুগীজ ব্যবসায়ীরা যে জনপদকে "বেতোড়" নামে নির্দ্দেশিত করিয়াছেন, দুইশত বৎসর পরে ইংরাজ বণিকগণ সেই স্থানটিকেই "শিবপুর" বলিয়া পরিচয় করিয়াছেন। ইহাতে এই- [illegible] যে, হিন্দু আমলে গঙ্গাতীরে [illegible] বা "বেত্র-চড়" মধ্যস্থ উপপীঠে শ্রীজয়ন্তি দেবী, সাগরগামী বণিক নৌ-বহর গুলিকে আশীর্ব্বাদ করিতেন মুসলমান যুগে যে গঙ্গাতীরস্থ বেতাই তলার সান্নিধ্যে কাজী বংশধরগণ ইউরোপীয় বাণিজ্য সংশ্রবের এবং ভারতের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের গতি-পরিণতি লক্ষ্য করিয়াছেন, ইংরাজী আমলে সেই গঙ্গাতীরে সেই "বেতাইতলা" ও বেতোড় বেস্টন করিয়া শিবপুর আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে!

গঙ্গাতীরে চর ভূমি ক্রমশঃ বাড়িয়াছে। বেত্র-চর এখন অনেকটা বাড়িয়াছে কাজেই বর্ত্তমান শিবপুরের অংশ-বিশেষ একেবারে

আধুনিক।

এই আধুনিক শিবপুরের কথা এই খণ্ডে আলোচিত হইবে। সেই আলোচনায় অন্য কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হউক আর নাই হউক জাতীয় সাহিত্য ধর্ম্ম, বা ইতিহাসের কোন কোন অধ্যায়ের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে।

কারণ, এখানে প্রথম ইংরেজী শিক্ষিতের দল, খৃষ্টীয় এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়, ইহাদের একটা রীতিমত আলোচনার কেন্দ্র ছিল। বহুভাষাবিদ বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় ছিলেন খৃস্টদলের অগ্রণী ব্রাহ্মদলের স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি এখানে বাস করিতেন; সময়ে সময়ে শ্রীকেশব সেন মহাশয়ও আসিতেন। এদিকে ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামে সনাতন ধর্ম্মের আলোচনায় রত ছিলই।

সাহিত্য আলোচনায়, নামজাদা ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিশোরী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন ও বর্ত্তমানে ভুবন বিখ্যাত শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে কথা অবতারণের বিষয়ীভূত হইবেন, তাহা অতি উপাদেয় হইবে বলিয়াই মনে হয়।

আধুনিক শিবপুরের এই সকল কথা আমরা পর্য্যায়ক্রমে, বিষয় নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন অধ্যায়ে ধারাবাহিক রূপে আলোচনা করিব।

জ্যোতিষ শাস্ত্র।

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবতোষ জ্যোতিষার্ণব)

জ্যোতিষ শাস্ত্র বেদের চক্ষুঃ স্বরূপ। সমস্ত ইন্দ্রিয় কার্য্যকর হইলেও চক্ষুঃ ব্যতীত যেমন সমস্তই বিফল, তদ্রূপ বেদের অন্যান্য পাঁচটী অঙ্গবিদ্যায় সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া জ্যোতিষানভিজ্ঞ ব্যক্তির বেদজ্ঞান সম্পূর্ণ নিষ্ফল। তাই জ্যোতিষকে বেদের চক্ষুঃ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত কাহারও পদমাত্র

নড়িবার শক্তি নাই। যাত্রা বিবাহাদি যাবতীয় শুভকর্ম্মে, মারণ বশীকরণাদি সমগ্র উগ্র কর্ম্মে জ্যোতিষের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। এমন কি সংসারী বা সংসার-ত্যাগী যিনি যে প্রকারের লোকই হউন না কেন, জ্যোতিষ শাস্ত্র সকলেরই পথ প্রদর্শক, সকলেরই সখা। অতএব জ্যোতিষকেই একমাত্র বেদের চক্ষুঃ (জ্যোতিষাময়নাং চক্ষুঃ) বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এরূপ জ্যোতিষ শাস্ত্র আজ মনুষ্য মাত্রেরই চক্ষে বিষবৎ প্রতীত হইতেছে। জ্যোতীষ সম্বন্ধীয় কথা উঠি-লেই কি জ্ঞানী কি মূর্খ ব্যক্তি মাত্রেই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করিতেছে। এ বিষয়ে দোষ কাহার, জ্যোতিষীর না জ্যোতিষের? দোষ—জ্যোতিষের নহে, জ্যোতিষীর। জ্যোতিষ চিরদিনই অকলঙ্ক। এরূপ ফল-প্রদ জ্যোতিষ শাস্ত্র যার আশ্রয়ে থাকিয়া মানুষ, ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ত্রিকালকে চক্ষে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, সেই ত্রিকাল-দর্শক জ্যোতিষ শাস্ত্র কি কখনও কলঙ্কময় হইতে পারে? যে শাস্ত্রের অপার মহিমা পদে পদে প্রত্যক্ষ করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন—"অন্যান্য শাস্ত্রেষু বিনোদ মাত্রং নতেষু কিঞ্চিদ্‌ ভুবি দৃষ্ট মস্তি। চিকিৎসিত জ্যোতিষতন্ত্র বাদাঃ পদে পদে প্রত্যয় মাবহন্তি॥" অর্থাৎ অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ একমাত্র আনন্দ প্রদানেই সমর্থ, কোন শাস্ত্রই প্রত্যক্ষ ফল দেখাইতে পারে না; কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র ও তন্ত্র-শাস্ত্র প্রত্যক্ষ ফল দেখাইয়া মানবের মনে, সর্ব্বদাই বিশ্বাস সমুৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, এরূপ চিরপ্রত্যক্ষ জ্যোতিষশাস্ত্রের দোষ কোন মতেই দিতে পারা যায় না। তাই বলি, দোষ জ্যোতিষীর। এক্ষণে জ্যোতিষীর অভাব নাই। অনন্ত জ্যোতিগ্রন্থোক্ত দুই একটী প্রমাণ মুখস্থ করিয়াই বা কোন প্রকারে কোষ্ঠী ঠিকুজী (ভুলই হউক আর যাই হউক) প্রস্তুত করিতে পারিলেই, হয় জ্যোতিভূষণ, না হয় জ্যোতিষার্ণব, জ্যোতিশ্চঞ্চু বা জ্যোতিরত্ন, যাহা হউক একটা কিছু হইয়া বসিলেন। আর দলে

দলে সরলপ্রাণ ব্যক্তিসকল আসিয়া মহাত্মার নিকট ভাগ্যফল স্থির করিতে লাগিলেন। ফল যে কিরূপ স্থিরীকৃত হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। হইবার মধ্যে এইটুকু হইল—যাহার প্রাণে জ্যোতিষের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বদ্ধমূল ছিল, তিনি একেবারে এই নিষ্কলঙ্ক শাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন। জ্যোতিষের নাম করিলে তিনি মারিতে আসেন। এ বিষয়ে একটী ঘটনা বেশ স্মরণ হয়। ঐরূপ কোন জ্যোতির্বিবদ পণ্ডিতের নিকট কোন ব্যক্তি একবার কোষ্ঠী দেখাইবার জন্য উপস্থিত হয়। জ্যোতিষী কোষ্ঠী দৃষ্টে বয়ঃক্রম স্থির করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার অষ্টোত্তরী দশা মতে শনিরদশা শেষ হইয়া ৬ মাস হইল বৃহস্পতির দশা আরম্ভ হইয়াছে। কোষ্ঠীর ফলে লিখা আছে—'রাজ্যাস্পদং তনয় বিত্ত বিলাসভোগান্' ইত্যাদি দেখিয়া সেই জ্যোতির্ব্বিৎ ফল কল্পনা করিলেন, মহাশয়! আপনার অতি সুসময় উপস্থিত। ধনলাভ পুত্র লাভ যশঃ খ্যাতি বৃদ্ধি বিলাস ইত্যাদি যতদূর শুভ হইবার ততদূর শুভ দশা পড়িয়াছে। আপনার কোনও ভাবনার কারণ নাই, এ দশাতে আপনি বহুবিধ শুভ ফল প্রাপ্ত হইবেন। ফল শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। সে কি মহাশয়! অদ্য ৩ মাস হইল, আমার একটী পুত্র মারা গিয়াছে। ৪।৫ মাস হইল পত্নী নানাবিধ জটীল রোগে মৃতকল্পা তাহার উপর ২ মাস হইল, একটা সম্পত্তি লইয়া জ্ঞাতিবিরোধ—ধূমধাম মোকর্দ্দমা চলিতেছে। আপনি কি বলিতেছেন, এরূপ শুভ ফল যদি আমি কিছুদিন পাই তাহা হইলে বোধ হয় আমার অস্তিত্বই থাকিবে না ইত্যাদি। তখন জ্যোতির্ব্বিৎ হালে পানি না পাইয়া চিরাভ্যস্ত প্রবঞ্চনাদির সাহায্যে খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করিলেন। ইহাতে জ্যোতিষের ও জ্যোতির্বিদের প্রতি সেই ব্যক্তির কতদূর যে ভক্তি বিশ্বাস বৰ্দ্ধিত হইল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্র অতিশয় জটিল ও অনন্ত এ শাস্ত্র-সমুদ্রের পার গমন আধুনিক মনুষ্যের অসম্ভব। তবে সদ্গুরু কৃপায় তীক্ষ্ণধীশক্তির সহায়তায় যিনি যতদূর

অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি ততদূর সুফল লাভ করিয়াছেন মাত্র। আবও এ শাস্ত্ররাশি মধ্যে নানামুনির নানামত বর্ত্তমান। একই বিষয়ে একমুনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, অন্যমুনি আবার ঠিক তাহার বিপরীত কল্পনা করিয়াছেন! মুনি প্রণীত সংহিতা সকল দেখিলে প্রায়ই এইরূপ মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল মতদ্বৈধের মীমাংসা করিতে হইলে শুধু গ্রন্থের সাহায্যে হয় না, সদগুরুর একান্ত প্রয়োজন। আজ-কালকার সদগুরুর দিনে জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন বিষয়ে সদগুরুর অতিশয় অভাব হইয়াছে। ছাত্র যদি কোনও গুরুর শরণাপন্ন হইয়া তাহার শীশক্তির সাহায্যে কোনও জটিল বিষয়ের প্রশ্ন করে, গুরু সে বিষয়ে পারগ হইয়াও প্রকৃত মীমাংসাকে গুহ্যাতি-গুহ্যরূপে রাখিয়া শিষ্যকে নানারূপ গোঁজা-মিল বুঝাইতে থাকেন। এই ক্রমে দিন দিন জ্যোতিষের গূঢ় রহস্যগুলি তাঁহাদের গুহ্য বাক্স মধ্যে থাকিয়া জগতের কোন উপকার সাধনে লাগিতেছেনা। পরন্তু তাঁহাদের অবসানে সেই জটীল রহস্য গুলিও দিন দিন লুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। অত-এব জ্যোতিষ শাস্ত্রের গুরুস্থানীয় মহাত্মা-দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন তাঁরা যেন শিষ্যবর্গের প্রতি সদয় হইয়া সরল ভাবে শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁরা যেন শাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এ বিষয়ে কার্পণ্য না করেন।

ডাক-হরকরা।

(শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ নিয়োগী)

ওগো, যন্ত্রে তোমার দিবানিশি,
নিত্য নবীন সুরটী বাজে,
যার দ্বারে যাও নিত্য তোমার,
উচ্চ আসন সদাই রাজে।

প্রবাস পথে পুত্র চলে,
কিন্তু আকুল জননী,
জুড়াও তুমি বিরহিনীর,
আকুল পথের চাহনি।

কোথাও তোমার আশার বাতাস,
আগুন জ্বালো কাহার ঘরে;
কারেও আবার আঁধার ক'রে,
আলোর শিখা দেখাও পরে।
গর্ব্ব তোমার নেইকো মোটে,
দীনের বেশে কাযে রত;
দেখ্‌ছো তুমি ভেল্কি দিয়ে,—
জোয়ার ভাটা অবিরত।
আলো আঁধার খেয়ার মাঝি,
দিচি তোমার নামটী তাই;
যারা তোমায় হীন ব'লে কয়,
ভুলেও আমি সেথায় নাই।

স্বেচ্ছাচার কুলাচার নহে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(স্মৃতিকণ্ঠ কবিরত্নোপাধিক কবিরাজ শ্রীচন্দ্রশেখর রায় (দাশ শর্ম্মণঃ) লিখিত)

কুল শব্দে সাধারণতঃ বৈয়াকরণীক যে অর্থ পাওয়া যায়, এ স্থলে তাহাই বুঝিতে হইবে। কু শব্দ পূর্ব্বক লী ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে ড প্রত্যয় করিয়া কুল শব্দ সিদ্ধ হয়। "কু কুৎসিতং কদাচারং বা লীয়তে যৎ তৎ কুলম্।" কুৎসিৎ বা কদাচারকে লীন করে যে, তাহাকেই কুল বলে। নতুবা স্বেচ্ছাচার কিম্বা মিথ্যাচার ভূয়িষ্ট কুল নহে। সুতরাং কুলাচার বলিতে গেলে কোন শিষ্টাচার অথবা শাস্ত্রাচারই বুঝিতে হইবে। যদাহ হরীন্দ্র-মিশ্রঃ:—

বংশাংশাভ্যাং কুলীনঃ বংশশ্চৌচ
তথাকুলম্।
কুলমূলং তথা জাতি তদ্ধীনে
হীনতাং গতঃ॥

কুলীন বংশজাত ও বংশের সদ্‌গুণতাই কুলীনত্বের হেতু। বংশের শিষ্টাচারই কুল, কুলই জাতির মূল; তাহা হীন হইলে বা স্বেচ্ছাচার প্রবেশ করিলে হীনতা ঘটে, সুতরাং জাতিগত মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যায়, এবং সকলেরই ঘৃণার পাত্র হইতে হয়। যদি জাতিগত মর্য্যাদা বা ধর্ম্ম রক্ষা করিতে

চাহেন, তাহা হইলে কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রাচার কিম্বা সদাচার বিশিষ্ট হউন।

তথাচোক্তং তন্ত্রে—

কুলাচারং বিনাযত্র নাস্ত্যপায়ঃ কুলেশ্বরি।
তত্রানৃত প্রবেশশ্চেৎ কুতোনিঃশ্রেয়সং ভবেৎ॥
সর্ব্বথা সর্ব্বপূতাত্মা সত্যখেরিতবর্ত্মনা।
সর্বং কর্ম্ম নরঃ কুর্য্যাৎ স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোদিতম্‌।

মহাঃ তন্ত্র, ৪র্থ উঃ।

হে কুলেশ্বরি! যে স্থলে বা যে কালে কুলাচার ভিন্ন উপায় নাই, সে স্থলে যদি মিথ্যাচার কিম্বা স্বেচ্ছাচার প্রবেশ করে, তাহা হইলে উহা মঙ্গলজনক হয় না। অতএব সর্ব্বতোভাবে সত্য দ্বারা পবিত্রাত্মা হইয়া মিথ্যাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৎকথিত উপায় অনুসারে মানবগণ স্বীয় স্বীয় বর্ণো-চিত আচারই পালন করিবেন।

মন্বাদি শাস্ত্রকারগণও লোকাচার বা স্বেচ্ছাচারকে কুলাচার বলেন নাই এবং ইহার উপর কোনরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াও যান নাই।

যদুক্তং মানবীয়ে—

আচার পরমোধর্ম্ম শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্তমেব চ।
তাস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যং

স্যাদাত্মবান্‌দ্বিজঃ।

১০৮।১ম অঃ।

মহর্ষি মনু বলেন—শ্রুতি (বেদ), স্মৃতি বা ধর্ম্ম সংহিতায় উক্ত আচারই পরম ধর্ম্ম অতএব আত্মাভিলাষী দ্বিজগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) বেদ ও স্মৃতিবিহিত আচারই আচরণ করিবেন।

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহকীর্ত্তিরবাপ্নোতি প্রেত্যচানুত্তমং সুখং॥

৯।২য় অঃ।

মনু আরও বলেন,—যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃতিতে উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান বা প্রতিপালন করেন, তিনি ইহলোকে ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত হন এবং পরলোকে উত্তম সুখ (স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট গতি) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তথাহি যাজ্ঞবল্ক্যে—

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যক নিত্যমাচরমাচরেৎ।

১৫৪।১ অঃ।

শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত আচারই সম্যক প্রকারে নিত্য আচরণ করিবে।

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধ যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌত প্রমাণন্তে তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥
ইতি ব্যাসসংহিতা ১ অঃ।

যেখানে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ দৃষ্ট হইবে, সেই স্থলে বেদের প্রমাণ এবং যে স্থলে স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ ঘটিবে সেই স্থলে স্মৃতির প্রমাণ মানিয়াই কার্য্য করিতে হইবে।

শ্রুতিস্মৃতি সদাচারো নির্ণেতব্যাশ্চসর্ব্বদা।
পরাশরসংহিতা।

শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত আচারই মানবগণ সর্ব্বদা নির্ণয় বা প্রতিপালন করিবে।

বৃদ্ধ বশিষ্ঠে নাপি এবমুক্তম্—

আচার পরমোধর্ম্মঃ সর্ব্বেবামিতিনিশ্চয়ঃ।
হীনাচার পরীতাত্মা প্রেত্যচেহবিনিশ্যতি॥
দুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিত॥
দুঃখভাগী চ সততঃ ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ॥
আচারাৎ ফলতে ধর্ম্মমাচারাৎ ফলতে ধনম্।
আচারাচ্ছিয়মাপ্নোতি আচারোহন্ত্য লক্ষণম্॥
সর্ব্ব লক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥
বঃ সং, ৬ অঃ।

বশিষ্ঠদেব বলেন—শাস্ত্রাচারই সকলের পরম ধর্ম্ম, ইহা সুনিশ্চিত। আচারভ্রষ্ট বা কদাচারীর ইহ-পরকাল নষ্ট হয়। দুরাচারী ব্যক্তি লোকসমাজে নিন্দিত, সতত দুঃখভাগী, রোগগ্রস্ত এবং অল্পায়ু হয়। আচারের ফল ধর্ম্ম, আচারের ফল ধন, আচার হইতে সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। আচার দুর্লক্ষণ বা দুষ্টগ্রহ বিনাশ করে। যে মানব সর্ব্ব লক্ষণ বর্জ্জিত হইয়াও আচারসম্পন্ন হয়েন এবং যিনি অসূয়া (হিংসা) পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান্ হয়েন, তিনি শত বর্ষ জীবিত থাকেন অর্থাৎ পূর্ণায়ুঃ লাভ করেন।

স্মৃতের্ব্বেদ বিরোধেতু পরিত্যাগ যথাভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতির্ব্বোধে
পরিত্যজেৎ॥
পরাশর ভাষ্য ১৮২ পৃং ও প্রয়োগ
পারিজাত ধৃত স্মৃতি।

স্মৃতি সম্বন্ধে বেদবিরোধ ঘটিলে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয়, তদ্রূপ স্মৃতি বাধক হইলে লোকাচার বা দেশাচার তদ্দণ্ডে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এই ত গেল তন্ত্র, স্মৃতি ও অপরাপর কথা; এক্ষণে পুরাণকার কি বলিতেছেন তাহা শুনুন—

ধর্ম্মজিজ্ঞাসমানানাং প্রধানং পরমং শ্রুতিঃ।
দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ তৃতীয়ঃ লোকসংগ্রহঃ॥
মহাঃ, অনুঃ পর্ব্ব।

যাঁহারা ধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে বেদই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, ধর্ম্মসংহিতা বা স্মৃতি দ্বিতীয় প্রমাণ, লোকাচার কিম্বা দেশাচার তৃতীয় প্রমাণ। সুতরাং লোকাচার প্রামাণ্য প্রমাণ হইতেছে না।

(ক্রমশঃ)

পতিতার কথা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

(শ্রীযোগেন্দ্র মোহন বিশ্বাস)

আমি সেই স্ত্রীলোকের অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম! উঃ! কি ভয়াবহ দৃশ্য!! পাপের কি ভীষণ পরিণাম!!!

আমি স্থির দৃষ্টিতে তাহার পাণে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম—'এ-নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ—ইহারই সুখের জন্য আজ কি কুকাজ করিলাম? যৌবন সুলভ মনশ্চাঞ্চল্যে গৃহের বাহির হইয়া যে পাপ অর্জ্জন করিয়াছি, তাহার ফল ভোগ ত আমায় ক'রিতেই হইবে। পাপকাজে আপাতত আনন্দ বটে, কিন্তু পরিণামে ওই রমণীর ন্যায় আমাকেও ত একদিন এইরূপ ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত ভোগ করিতে হইবে? হায়, হায়, আমার এ কলঙ্কিত জীবনের উপায় হইবে কি? আমার পাপ-প্রাণে অনুতাপানল প্রজ্জ্বলিত হইল, কৃত পাপ জনিত মনোকষ্টে চক্ষে জল আসিল।

সন্যাসী বলিলেন—'কুলত্যাগিণী অসতী রমণীর পরিণামত স্বচক্ষে দেখিলে? কুলের বাহির হইয়া তুমি এখনও নিষ্কলঙ্ক,—চরিত্র এখনও কলুষিত হয় নাই; যাও মা! গৃহে ফিরিয়া যাও, পূজনীয় পতি দেবতার পদ-সেবা করিয়া রমণীজন্ম সার্থক করগে। সংসারে স্বামীসেবা, স্বামীপূজাই রমণীর

মুখ্য ধর্ম্ম! শাস্ত্রে আছে—'পতিরেকো গুরু স্ত্রীণাং।' যাও মা গৃহে ফিরিয়া যাও, নারায়ণ-জ্ঞানে স্বামী-পূজা করগে, তাহাতেই আজীবন অনন্ত সুখে কাটাইতে পারিবে,—অন্তে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে। বলিয়া সন্ন্যাসী মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। আমি হতাশভাবে সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম।

(৪)

সেই স্থানে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলাম। একে একে পূজনীয় পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন সকলের মুখই চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া আমায় আকুল করিয়া তুলিল। স্বামীর কথা মনে হইতেই "উঃ! উঃঃ!"—বলিয়া রমণী আকুলভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে আচলে চক্ষু মুছিয়া বলিতে লাগিল —

"তারপর আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—এখন যাই কোথায়? আর কি স্বদেশে—স্বামীর সুখ-নিকেতনে ফিরিয়া যাইবার মুখ আছে? এ কালা মুখ সেখানে কেমন করিয়া দেখাইব? কুলের বাহির হইয়া নিষ্কলঙ্ক থাকিলেও এখন ত কেহ বিশ্বাস করিবে না? আমার এ কলঙ্কের কথা—ঘৃণার কথা, হয় ত ঘাটে-মাঠে, হাট-বাজারে হাজার মুখে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে—সারা সংসারময় বিরাট ঢি ঢি পড়িয়া গিয়াছে। আমার এ কলঙ্কিত দেহ লইয়া সেই স্বামীর পুণ্যপদরজঘেরা সুখনিকেতনে কি যাওয়া যায়?

তাহা হইলে যাই কোথায়?—তীর্থ—তীর্থ—তীর্থ! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, পাপী-তাপীর জুড়াইবার স্থান, পুণ্যভূমি তীর্থের কথা আমার মনে হইল! কিন্তু সেখানে কি আমার মত মহাপাপিনীর ঠাঁই হইবে? যদি হয়—যদি আশ্রয় দেন? গায়ের গহনাগুলি দূরে ফেলিয়া দিলাম, মাথার চুলগুলি কাটিলাম, সম্মুখের দাঁত দুইটী ভাঙ্গিলাম, গায়ে, মুখে ধূলা মাখিলাম,—কাপড়খানাও বেশ ধূলা মাখিয়া ময়লা করিয়া লইলাম। তীর্থে যাওয়ার অন্তরায় দূর হইল। তীর্থে চলিলাম! মানুষের ভাগ্যে বিধাতা যে কি লিখেছেন, তাহা

কে বলিতে পারিবে? সেই স্নেহময় পিতামাতার অতি আদরের মেয়ে—ধনাঢ্য স্বামীর সোহাগের পত্নী, অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ আমি,—ভিখারিণী সাজে ভিক্ষা মাগিতে মাগিতে বিপদসঙ্কুল দীর্ঘপথ পায়ে হাঁটিয়া কাশী রওনা হইলাম।

ভিখারিণী হইয়া বিশ্বেশ্বরের চরণে শরণ নিলাম; মনে মনে ভাবিয়াছিলাম—এ কলঙ্কিনীর প্রতি বাবা বিশ্বনাথের দয়া হইলেও হইতে পারে? কিন্তু হইল না, বাবা বিশ্বনাথের চেলা—গুণ্ডা পাণ্ডা ষণ্ডদের উপদ্রবে বিশ্বনাথের আশ্রয় ছাড়িয়া বৃন্দাবনে প্রেমের ঠাকুরের আশ্রয় লইলাম। ......স্থান যদি হইল, দয়া হইল কই? ভাবিয়াছিলাম—ভুলিয়া যাইব—গোবিন্দজীউর চরণ ছাড়া আর কিছুই ভাবিব না; —প্রসাদ খাই,—সারাদিন কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিয়া বেড়াই, ব্রজের রজ গায়ে মাখি, রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া গোবিন্দজীউর চরণে মন দিবার চেষ্টা করি;—কিন্তু কোথায় বা গোবিন্দ আর কোথায় বা তাঁহার চরণ? জ্বালা—জ্বালা;—আমার হৃদয়ে অহরহ পাপের প্রজ্বলিত অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে;—হৃদয় পুড়িয়া ছারখার হইতেছে। উঃ! সে কি ভীষণ জ্বালা!—সে জ্বালা নিভাইব কিসে?

মাঝে মাঝে মন আমাকে একটা প্রবোধ দিয়া রাখিত,—কেন, কিসের জন্য তোর এত ভাবনা,—এত অশান্তি? এমন কি করিয়াছিস্ যার জন্য আহার-নিদ্রা বন্ধ করিয়া হা-হুতাশ করিতেছিস্? মানুষ যে এর চেয়ে আরও কত কি করে? তুই এখনও সতী!—'সতী?' অমনি কে আমার কাণের কাছে ফোঁস করিয়া বলিল—'সতী'? এখনও সতীত্বের বড়াই? বুকে হাত দিয়া বল্ দেখি কলঙ্কিণি! স্বামীর পবিত্র শয্যার পার্শ্বে শুইয়া তুই পরপুরুষের মুখ চিন্তা করিয়াছিস কি না? পরপুরুষকে পাইবার জন্য পাপচিন্তা মনে স্থান দিয়াছিস্ কি না? শুধু কি তাই? অবশেষে রুগ্ন স্বামীকে ফেলিয়া, তাঁহার স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা পায়ে দলিয়া ঘরের বাহির হইয়াছিস্;—দেহ মন কলুষিত করিয়াছিস্! তোর সর্ব্বনাশের আর কি

বাকী আছে ?

বাকী নাই—সত্যই কি! হায়, গোবিন্দজী! হায়, পাপী-তাপী-পরিত্রাণ-কর্ত্তা অনাথনাথ নারায়ণ! আমার উপায় কি হইবে? কিসে আমি এ পাপ হইতে মুক্ত হইব? আমি দিবারাত্রি সেই ব্রজের পবিত্র রজে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দজীউর চরণে হৃদয়ের ব্যথা জানাইতে লাগিলাম—'হে পতিতপাবন! এ পতিতার গতি কি হইবে নাথ? শুনিয়াছি, তুমি জীবের পাপ হরণ কর,—তাই তোমার এক নাম হরি। ওহে পতিত পাবন হরি! এ পতিতার পাপ হরণ কর দয়াময়! তুমি মহাপাপী জগাই-মাধাইকে পাপ হইতে মুক্ত করিলে, অজামিলকে বৈকুণ্ঠে স্থান দিলে,—আমায় কি পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে না? ওহে নব-জলধরশ্যাম বংশীবাদন পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি! আমি অবোধ মনের বশবর্ত্তী হইয়া পাপপথে ছুটিয়াছিলাম। গোপীনাথ! গোপীনাথ!—জ্ঞানহীনা তনয়াকে ক্ষমা কর!' অনশন-ক্লিষ্ট, শ্রান্ত, অবসন্ন দেহে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কিন্তু বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এ অভাগিনীকে দয়া করিলেন না। তখন সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়িল।"—বলিয়া রমণী একটা বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। উঃ! সে নিশ্বাস-বাতাসে যেন বুকের বোঝা নামিয়া আসিল। আমি স্থির দৃষ্টিতে রমণীর মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম।

(৫)

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আমি বলিলাম —"তারপর?" রমণী বলিল—"তারপর, একদিন সহসা একমহাতীর্থের কথা আমার মনে হইল ;—সে কত পবিত্র উজ্জ্বল তীর্থ! সেখানের পদ্মপুকুরের পঙ্কিল-সলিলই যে নির্ম্মল স্বচ্ছ পূত গঙ্গাবারি!—সেখানে স্বামী-দেবতাই যে আমার নবঘন শ্যাম-সুন্দর! আহা! তাঁহার সে রূপ কি স্নিগ্ধ-জলদ-কান্তি! সে মুখই যে শত চন্দ্র ঝলমল। এ শ্যামসুন্দর নটবরের মুখ ত লাবণ্যবিহীন? আমার সেই মদন-মোহন শ্যামের শিরেই যে শিখিপুচ্ছ, করে মোহন বাঁশী, গলে বনফুলের মালা, গায়ের

নবজলধরবিলাঞ্ছিত শ্যামরঙ্গে জগত ডুবু ডুবু।

তবে যাই না? আমার মনে হইল—তবে যাই না—আমার সেই মহাপুণ্যতীর্থে গিয়া আমার সেই মদনমোহন স্বামী দেবতার রাতুল চরণ দর্শন করিয়া আসি? আর কি সেখানে যাওয়ার অধিকার আছে? আছে বৈকি—অস্পৃশ্যের কি ঠাকুর দর্শনে নিষেধ আছে? রাত্রিতে নিরালে দেখা করিব—তাহার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের পাপ নিজমুখে ব্যক্ত করিব, প্রাণ চৌচির হইয়া গেলেও তাহাকে ছুঁইব না। তিনি যেখানে বসিবেন, উঠিয়া গেলে— সেইখানে তাহার পায়ের ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া চলিয়া আসিব।—তাহার পায়ের ধুলায় প্রাণ ঠাণ্ডা হইবে নিশ্চয়। তাই যাই।

চলিলাম—সেই সাধের প্রমোদকাননে, সংসারের সুধাধার প্রাণাধিক স্বামী দেবতা দেখিবার জন্য চলিলাম। কমণ্ডলু হাতে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিতে মাগিতে পথ চলিতে লাগিলাম। এমনি করিয়া অনেক দিনের পর, যখন আমার মহাতীর্থ—আমার স্বামীর পুণ্যনিবাসে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর—চারিদিক্ নীরব নিথর; সমস্ত বিশ্ব সুপ্তিঘোরে মগ্ন!—আমি ভক্তি গদ্‌গদ হৃদয়ে গ্রামখানিকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমার বুক ঢুক ঢুক করিয়া কাঁপিতেছিল। সেই জমাটবাঁধা অন্ধকারে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছি—সহসা সেই সুপ্তিমগ্না ধরিত্রী বিকম্পিত করিয়া শব্দ উঠিল—'বোল হরিবোল।'

আমার প্রাণ ছ্যাঁত করিয়া উঠিল, কাহার সংসারের খেলা ফুরাইয়া গেল? এমন সময় শবদাহকারী শ্মশান বন্ধুগণ আবার সেই ভীতি সঞ্চার কারী 'বোল হরি, হরি বোল' ধ্বনি দিয়া আমার দিকে আসিতেছিল। তাহারা কাছে আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে মরেছে গা!" তাহারা উত্তরে যে নাম করিল, তাহা শুনিয়া আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না,—সেইখানে শুইয়া পড়িলাম। হায়, যাঁহার দণ্ডেকের দেখা পাইবার জন্য

বৃন্দাবন হইতে ভিক্ষা করিতে করিতে এতদূর চলিয়া আসিয়াছি—যাঁহার চরণের এককণা ধূলি পাইবার জন্য আমার সমস্ত দেহমন উন্মাদ ;—আমার সেই পরমদেবতা আর ইহধামে নাই। পাপিষ্ঠার দর্শনের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াই বুঝি তিনি অদর্শন হইলেন।—মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

আর বাড়ীর দিকে গেলাম না,—শ্মশান অভিমুখে চলিলাম। হায়, হায়। দেখা ত হইল না—চরণ ধূলি ত পাইলাম না। তাই মনে করিলাম শ্মশান ঘাটে গিয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিব ; আর সেই পবিত্র চিতাভস্ম গায়ে মাখিব। তারপর—তারপর অন্ধকার পারাবারে মিশিয়া যাইব।

শ্মশানে আসিয়া সেই পবিত্র চিতাভস্ম খুঁজিতে লাগিলাম। কৈ সে চিতাভস্ম? কৈ আমার পাপদগ্ধ প্রাণ জুড়াইবার একমাত্র অবলম্বন? কৈ জীবনের সান্ত্বনা স্বামীর পূতচিতাভস্ম? বুঝিলাম—আমি পাপিষ্ঠা, স্বামীর একবিন্দু চিতাভস্মেরও অধিকারিণী নহি।

আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, চোখে জল আসিল। আমি সেই শ্মশান ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, মনে নাই ; জাগিয়া দেখি—শ্মশানের একটা অৰ্দ্ধপোড়া কাঠের উপর মাথা দিয়া পড়িয়া আছি—সমস্ত দেহে শ্মশানের ছাই। রাত্রি তখন প্রায় অবসান—পূর্ব্বাকাশে শুকতারা উঠিয়াছে। আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া শ্মশানভূমি প্রণাম করতঃ উঠিয়া পড়িলাম। তারপর সেইখান হইতে দিন পনর হইল এইস্থানে আসিয়াছি। এই আমার কলঙ্কিত জীবনের পাপ কাহিনী। এখন বলুন দেখি, আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? রমণী ভাসা ভাসা চক্ষে আমার মুখের পানে চাহিল। আমি রমণীর আদ্যন্ত কথা শুনিয়া বুঝিলাম প্রকৃত বৈরাগ্যের সমুদয় লক্ষণ এই রমণীতে বৰ্ত্তমান। নিয়তই দুই নয়নে যমুনা সরস্বতী প্রবাহ বহিতেছে ; এ প্রবাহে উহার সমস্ত পাপ ধুইয়া বা জাহ্নবী স্রোতে

মিশিতেছে! উহার দেহে কি আর পাপ আছে।

আমি বলিলাম—"ওগো! তোমার অন্তর বাহিরে আর কোন পাপ নাই। কৃত পাপ জনিত অনবরত অনুতাপ অশ্রু-জল বিসর্জ্জনই পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। তুমি পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছ।"

রমণী আর কিছু বলিল না,—একদৃষ্টে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার দুইগণ্ড বহিয়া অজস্রধারে অশ্রু গড়াইতে লাগিল! তারপর সে অশ্রু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গান ধরিল—

"বঁধু গিয়েছে আমারে ছেড়ে;
মরমের ব্যথা মরমে আবরি রয়েছি
অভাগী প'ড়ে।"

গানের তালে তালে নাচিয়া ব্রহ্মপুত্র বহিয়া যাইতে লাগিল। সেই ব্যথিত হৃদয়ের করুণ উচ্ছ্বাস শুনিতে শুনিতে আমি বাটী ফিরিলাম।

পরদিন সকালে সেখানে গিয়া দেখিলাম—রমণী কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আমার নয়ন কোণে দুই ফোটা জল আসিল—সেই দিন হইতে আর কেহ তাহাকে সেখানে দেখিতে পায় নাই। বুকের ব্যথা বুকে লইয়া না জানি অভাগী কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

সভ্য জাতির সমর-নরমেধ।

অর্থাৎ মহাত্মা টলষ্টয়ের লিখিত যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রবন্ধ চতুষ্টয়।

(৩) কার্থেজ ধ্বংস করিতেই হইবে।

(শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ)

মিলাসের 'লা ভাইটা ইন্‌টারন্যাশনাল এবং পারিও রুসেল্‌সের 'লা হিউম্যানাইট্‌ লোবেন্‌ একটী অতি কঠিন সমস্যায় পতিত হইয়াছে। এই সমস্যাটী যেমন জটিল, তেমনি গম্ভীর ও প্রয়োজনীয়। সমস্ত জগতের সমক্ষে এই গুরুতর সমস্যা;

—ফ্রান্সও এই সমস্যায় জড়িত—সমস্যাটী এই বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সমর প্রবৃত্তির ও সমর সজ্জার অতি মাত্রা বৃদ্ধি সম্বন্ধে।

এই উদ্দেশ্যে আমরা ইউরোপের সকলের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি—যাঁহারা রাজনীতিবিদ্‌, বিজ্ঞান, কলাশিল্প, কিংবা শ্রমজীবি সমস্যার সমাধানই যাঁহাদের চিন্তার বিষয় এবং যাহারা যুদ্ধবিভাগে অতি উচ্চ পদ অধিকার করেন, তাঁহারা সকলেই যেন অনুগ্রহ করিয়া, নিম্নলিখিত লোকহিতকর প্রশ্ন কয়টীর উত্তর দিয়া বাধিত করেন।

প্রথম প্রশ্ন। সভ্য জাতিদিগের মধ্যে পরস্পরের যে যুদ্ধ তাহা ইতিহাস অথবা ধর্ম্ম কিম্বা নীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন। এই ক্ষাত্রভাব বা সমর প্রবৃত্তি ও সমর সজ্জার মানসিক, নৈতিক, শারীরিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক কোন ফল আছে কি না?

তৃতীয় প্রশ্ন। জগতের ভাবী কল্যাণ কল্পে, এই সমস্যার সমাধান কি হইতে পারে? এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহার সত্বর সমাধান হয়?

এই পত্র পাইয়া, আমার এত ঘৃণা, ক্রোধ ও বিরক্তির উদ্রেক হইয়াছিল যে তাহা আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিলাম না।

বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সদাশয় খৃষ্টানগণ—যাহারা জগতে প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বার্ত্তা প্রচার করিয়া বেড়ায়,—নরহত্যা মহাপাপ—এইরূপ যাহারা মনে করে,—এমন কি পশুহত্যা করিতেও যাহারা কুণ্ঠিত,—সেই সকল খৃষ্টান আজ কি না করিতেছে, কোন পাপ কর্ম্ম আজ তাহারা না করিতে পারে—এই সকল পাপকার্য্যগুলিকে বড় একটা নাম দিয়া, অর্থাৎ 'যুদ্ধ' বলিয়া যদি একবার ঘোষণা করা যায়,—তবেই তারা ইহার অন্তরালে ধ্বংস, লুণ্ঠন এবং নরহত্যা ইত্যাদি নৃশংস কার্য্য নিঃসঙ্কোচে করিতে পারে; দলে বলে, অস্ত্রে-শস্ত্রে, সুসজ্জিত হইয়া, ইহাতে যোগ দেয় এবং ঈদৃশ অনুষ্ঠানগুলিকে ন্যায় ও ধর্ম্মসম্মত মনে করে, এবং ইহাই করে বলিয়া অতিশয় গৌরব

বোধ করিয়া থাকে।

অধিকন্তু, একটা দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা এই:—মনুষ্যের মধ্যে সংখ্যায় যাহারা অধিক—তাহারা সকলেই শ্রমজীবি—তাহাদিগের দ্বারাই এই সকল লুণ্ঠন ও হত্যা ইত্যাদি নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করান হয়, এবং ইহারাই অবশেষে এই সকল অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়। কা'র পাপে কে মরে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে; অথবা এই সকল ফন্দীবাজির বিষয় কিছুই তাহারা জানে না, কিছুই করে না, বা করিতে ইচ্ছা করে না; তথাপি ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে এই কার্য্যে যোগদান করিতে হয়; কারণ তাহাদের এমনই অবস্থা এবং এরূপভাবে তাহাদিগকে এই কার্য্যে যোগ দিতে উসকান হয়, যে যদি তাহারা যুদ্ধে সৈন্য শ্রেণীতে যোগ না দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে আরও দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। অস্বীকার করিলে অধিকতর লাঞ্ছনা পাইতে হইবে, ইহাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু যে প্রবঞ্চকগণ এই লুণ্ঠন ও হত্যা ইত্যাদি কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী, যাহারা এই শ্রমজীবিদিগের দ্বারায় তাহাদিগের মতলব হাসিল করাইয়া লয়, সংখ্যায় তাহারা নিতান্ত কম এবং নগণ্য। ইহারা এই শ্রমজীবিদিগের উপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করে এবং বিলাসিতা ও অলসতায় জীবনাতিপাত করিয়া থাকে।

এই প্রবঞ্চনা দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে। অধুনা এই প্রবঞ্চকদিগের ঔদ্ধত্য অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমজীবিদিগের উপার্জ্জিত অর্থের বেশীর ভাগ তাহাদিগের নিকট হইতে অপহরণ করিয়া যুদ্ধরূপ লুণ্ঠন ও হত্যা ইত্যাদি নৃশংস কার্য্যে—যাহা জগতে 'যুদ্ধ' বলিয়া বিখ্যাত—তাহারই আয়োজনের নিমিত্ত ব্যয় করা হয়।

ক্রমশঃ—

ফিরে গেল।

(শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পদাম্বুজীথি)

(১)

অস্মিতার সিংহাসনে কল্পতরু হয়ে
করিলাম দুই হাতে অকুরন্ত দান ;
দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণ বিনা মাপে লয়ে
জনে জনে দিনু সুখে নাহি পরিমাণ!
মৃদু মৃদু তপ্ত শ্বাস মাঝে মাঝে কার—
পৃষ্ঠে আসি পরশিল বার-বার-বার ॥

(২)

সন্ধ্যা হল আধ আলো আধ অন্ধকার
কুহেলিকা দিক্‌ভরা শূন্য ধূমময়,—
নিঃস্ব আমি শ্রান্ত আঁখি মোহ ঘুমময়!
ধীর মৃদু তপ্ত শ্বাস পুনঃ আসি কার—
পৃষ্ঠে বাজে তপ্ত ব্যথা বড় বেদনার ॥

(৩)

"কেবা তুমি—কিবা চাহ-" আঁখি ফিরাইনু
জল সিক্ত স্নিগ্ধ আঁখি দুখানি দেখিনু!
—"কিছু নাহি ওগো তুমি কেন সন্ধ্যাকালে
বাড়াইলে কর? কেন দিবসে না এলে।

* * * * *

রিক্ত ত্যক্ত দীর্ঘ প্রাণ ধুলাতে লুটাল
দেওয়া যে হ'ল না কিছু—সে যে ফিরে গেল।

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ।)

[২]

ইন্দুর পিতা হরিনগরেই বাস করিতেন। মৃত্যুঞ্জয় বাবুর তিনি একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। শৈশব হইতেই সুরেশ, হরিশঙ্কর বাবুর বাড়ী যাওয়া আসা করিত এবং তাঁহার স্ত্রী ব্রজবালাকে

'কাকিমা' বলিয়া ডাকিত। ইন্দুও শৈশব অবস্থা হইতেই সুরেশকে 'দাদা' বলিত। ইন্দুকে অবিবাহিত রাখিয়াই হরিশঙ্কর বাবু ইহলোক ত্যাগ করেন। ব্রজবালা নিজ আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব কাহারও পরামর্শ না লইয়া বীরেনের সহিত ইন্দুর বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পর প্রকাশ পাইল বীরেনের স্বভাব চরিত্র ভাল নহে।

হিন্দু সমাজের স্বামী রত্ন। হিন্দুবালিকাকে তাহা মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। কিন্তু তেলে জলে যেমন মিশ খায় না, ইন্দুর সহিত বীরেনেরও তেমনি মিশ খাইল না। ইহার জন্য বেচারা ইন্দুর উপর ব্রজবালার যত রাগ হইল। তাঁহার বিশ্বাস, ইন্দু বুদ্ধিহীনতার দরুণ বীরেনকে বশ করিতে পারিতেছে না। কাজে কাজেই তিনি উঠিতে বসিতে ইন্দুকে বাক্য-যন্ত্রণা দিতেন এবং সময়ে সময়ে প্রহারও করিতেন। ফলে দাঁড়াইল এই যে, বেচারা একাই স্বামীর নিকট হইতেও লাঞ্ছিত হইতে লাগিল এবং মায়ের নিকটেও বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিল।

ইন্দুর সহিত বীরেনের সদ্ভাব না থাকিলেও বীরেন ঘন ঘন শ্বশুরালয় আসিত। ব্রজবালা ইহাতে কোনই আপত্তি করিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ঘন ঘন জামাই আসিলে মেয়ে জামায়ের মধ্যে একটা 'টান' হইতে পারে।

রাত্রি আটটা হইতে জামাই আসিয়া বসিয়া আছে, ইন্দুর দেখা নাই। সুরেশদের বাড়ী গিয়াছে; এখনও ফিরে নাই। নয়টা বাজিয়া গেল তবুও ইন্দু আসিল না দেখিয়া ব্রজবালা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। জামাই পছন্দ করে না—ইন্দু কোথাও যায় কিংবা কাহারও সহিত বেশী কথা কহে। সেই জন্যই ব্রজবালা ইন্দুকে সুরেশদের বাটী যাইতে বারণ করিতেন এবং আজ বীরেন আসিবে বলিয়া বিশেষ করিয়া বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দু তাঁহার কথা না শুনিয়াই চলিয়া গিয়াছিল।

এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইন্দুকে দেখিতে না

পাইয়া বীরেন একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলমাত্র। রান্নাঘরে শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবার ভাণ করিয়া সেখানকার রকের উপর যাইয়া উঠিল। ব্রজবালা ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "এস বাবা, এস" রান্নাঘরের ভিতর দিকটা একবার চাহিয়া লইয়া বীরেন শাশুড়ী-ঠাকুরুণকে প্রণাম করিল। জামায়ের মুখনিঃসৃত সুরার গন্ধে ব্রজবালা নাসিকা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ঘরে গিয়ে বস, বাবা।"

ইন্দুর ঘরে আসিয়া বীরেন শুধু বসিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। একটী টেবিলের উপর ইন্দুর অনেক খাতা ও পুস্তকাদি পড়িয়াছিল। সেইগুলি ঘাঁটিতে লাগিল। দুই একটী পুস্তক হাতে করিয়া দেখিল একটীর উপর লেখা রহিয়াছে "কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ" আর একটীর উপর লেখা আছে 'সাধনা ও সিদ্ধি'; একটু বিতৃষ্ণার ভাব দেখাইয়া বইগুলিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। হাতের লেখা খাতা গুলি উল্টা-ইয়া দেখিল কোনটাতে লেখা আছে 'ত্যাগ' কোনটাতে 'আত্মবলী' আবার কোনটাতে সীতার দু একটী শ্লোকের উপর মস্ত মস্ত প্রবন্ধ। "ধ্যোৎ" বলিয়া বীরেন খাতাগুলিকে মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া বালিশে ঠেস দিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িল। আশা করিয়াছিল, পুস্তক গুলি বুঝি বটতলার নভেল এবং খাতাগুলি প্রেমের গানে ভরা।

সুরেশদের বাড়ী যাইবার সময় ইন্দু নিজের হাত বাক্সটী খুলিয়াছিল কিন্তু তাড়া-তাড়ীতে বন্ধ করে নাই। বীরেনের হঠাৎ সেই দিকে লক্ষ্য পড়িল। তাড়াতাড়ী উঠিয়া বাক্সটীর ভিতরকার সমস্ত চিটিপত্র ঘাঁটিতে লাগিল; মনে করিল হয়তো ইন্দুর কোন গুপ্ত প্রণয়ের পত্রাদি দেখিতে পাইবে। অনেক অনুসন্ধানের পর কতক গুলি পত্র বাহির করিল। সেগুলি সুরেশ মুঙ্গের হইতে এক সময়ে ইন্দুকে লিখিয়া-ছিল। বাঞ্ছিত দ্রব্য খুঁজিয়া পাইলে যেরূপ আনন্দ এবং তৃপ্তি হয় পত্রগুলি পাইয়া বীরেনেরও তাহাই হইল। সে যেন এই-রূপ কতকগুলি পত্রই খুঁজিতেছিল। বাক্সর

ডালাটী বন্ধ করিয়া বিছানায় আসিয়া পত্রগুলি পড়িতে লাগিল। উপর্য্যুপরি দুই তিনখানি পত্র পড়িয়া বীরেন কোনই অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। বাহিরে শাশুড়ীর পদশব্দ শুনিয়া সেগুলিকে তাড়াতাড়ী কোটের ভিতরকার পকেটে রাখিয়া দিল।

ব্রজবালা আসিয়া বলিলেন, "ন'টা বেজে গ্যাছে বাবা, চল খেয়ে নেবে।" বীরেন আর দ্বিরুক্তি করিল না। ক্ষুধায় তখন তাহার জঠরানল জ্বলিতেছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে লুচী, পাঁঠা, পায়স, মিষ্টান্ন প্রভৃতি উদরস্থ করিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। ইচ্ছা হইলেও শাশুড়ীকে ইন্দুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। তাহার আশায় চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিল। তখনও নেশার ঝোঁক কাটে নাই। একটু পরেই সুউচ্চ নাসিকাধ্বনি আরম্ভ করিয়া দিল।

ইহাতে ব্রজবালা একটু নিশ্চিন্ত হইলেন বটে কিন্তু ইন্দুর বিলম্বহেতু মনে মনে তাহাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। এবং বলিলেন, "আজ আসুক হাড় হাবাতে ছুঁড়ি, শতেক খোয়ারী।" ক্রমে দশটা, সাড়ে দশটা, এগারটা বাজিয়া গেল। ব্রজবালা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। আজ ঝীও আসে নাই যে তাহাকে পাঠাইয়া পাশের বাড়ী হইতে ইন্দুকে ডাকাইয়া আনিবেন। যে খিড়কীর দ্বার দিয়া সুরেশের বাড়ী সহজে যাওয়া যায়, সে দ্বারও আজ উহাদের বাড়ীর ভিতর হইতে বন্ধ। নচেৎ ব্রজবালা না হয় নিজেই যাইয়া ডাকিয়া আনিতেন। রাগে গর্ গর্ করিয়া ব্রজবালা এই সব ভাবিতেছেন, এমন সময়ে বামা ঝায়ের সহিত ইন্দু আসিয়া উপস্থিত হইল। আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল! ব্রজবালা বলিয়া উঠিলেন, "হালা হারামজাদী এতক্ষণ ছিলি কোথায়?" মাতার উগ্র স্বভাব ইন্দুর অজ্ঞাত ছিল না। এবম্প্রকার গালাগালিতেও অভ্যস্ত ছিল। এরূপ সময়ে 'বোবার শত্রু নাই' মৌন অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া ইন্দু চুপ করিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। ব্রজবালা ইহাতে আরও রাগিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা হইতে সমস্ত একত্রীভূত ক্রোধ হঠাৎ বোমার ন্যায় ফাটিয়া গেল। রাগ সামলাইতে না পারিয়া ইন্দুর হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া ওদিকের ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া গেলেন। এবং ঠোনা ও চপেটাঘাতের বর্ষণ, বাহিরের মুষল ধারায় বৃষ্টির ন্যায় ইন্দুর পৃষ্ঠে এবং বদনে পড়িতে লাগিল।

বিবাহের পূর্ব্বে ইন্দুর এত লাঞ্ছনা ছিল না। বিবাহের পর হইতেই কন্যার উপর ব্রজবালার যত রাগ। ইন্দু কখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিত না। বড় বড় জলের ফোঁটা দুইটী গণ্ড বহিয়া অঞ্চল এবং মৃত্তিকা সিক্ত করিতে লাগিল মাত্র। বামা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল, "ওকে কেন মারচ গো মা ঠাক্‌রুণ? বেচারা এমন দোষই বা কি করেছে? না হয় আসতে একটু দেরী হ'য়েছে, এই তো?" ব্রজবালা হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন "থাম বাপু তোমার আর মোক্তারী কত্তে হবে না।" বামা কিছু আর না বলিয়া চলিয়া আসিল।

তাহার মুখ হইতে সমস্ত শুনিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে বিন্দুবাসিনী এ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ইন্দু দালানে বসিয়া কাঁদিতেছে এবং ব্রজবালা, ঝী না আসার দরুণ, নিজেই রান্নাঘর মুক্ত করিতেছেন। ইন্দুকে উঠাইয়া অঞ্চল দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া বলিলেন, "হ্যা লা বৌ, মেয়েটাকে কি মেরে ফেলবি? তোর আজকাল কি হ'য়েছে বলতো? উঠতে ব'সতে মেয়েটাকে অত কষ্ট দিস্ কেন?" তখন ব্রজবালার মেজাজ সবে সপ্তম হইতে একপর্দ্দা নামিয়া ছিল; উত্তরে বলিলেন,—"তোমরাইতো ওর মাথা খাচ্ছ দিদি। সন্ধ্যা থেকে জামাই এসে ব'সে আছে। মেয়ের আর দেখা নেই। এতই কি বেড়ানার সখ বাপু।"

"তা ব'লে এমনি ক'রেই খোয়ার করবি! জামাই না হয় এসেইছে, তাতে হ'য়েছে কি!" ব্রজবালার ক্রোধ ক্রমশঃই পর্দ্দায় পর্দ্দায় নামিয়া আসিতেছিল। রান্নাঘরের কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া

বলিলেন, "এই বৃষ্টিতে এত রাত্রে আসিবার কি দরকার ছিল দিদি ?" "দরকার আছে বৈ কি বৌ ; তা নাহ'লে আর এসেছি। ইন্দুর খাওয়া হ'য়েছে কি ?" রাগ করিয়া ব্রজবালা মেয়েকে খাইতে দেন নাই, বলিলেন."যেমন ঢ্যাটা মেয়ে। ঐ যে, একটু ব'কেছি অমনি মেয়ের রাগ হ'য়েছে। আজ আর খাবেন না।" ইহাও ইন্দুর অভ্যস্ত ছিল।

বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "ওমা সে কি ! ইন্দু এখন খায় নি ! ইন্দু বলিল, "আজ আমি খাবনা জেঠাইমা, আমার খিদে নেই।' বিন্দুবাসিনী ইন্দুর হাত ধরিয়া রান্নাঘরের দিকে লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "মার ওপোর কি রাগ ক'রে আছে মা।" ভারিগলায় ইন্দু বলিল, "মা আজকাল যখন তখন আমায় মারেন, বকেন্, যা তা বলেন, যেন আমারি সব দোষ। আমি কি করবো জ্যাঠাইমা, আমার কি দোষ ?" ইন্দুর মাথার গোটা কতক চুল কপালে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা সরাইয়া দিয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "তোর আর কি দোষ মা। ছিঃ কাঁদিস্‌নে। চাট্টি যা পারিস্ খেয়ে নে।"

ব্রজবালা কি একটা কাজের জন্য উপরে গিয়াছিলেন। নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "এ বৃষ্টিতে কি ক'রে যাবে দিদি ?"

"যেমন ক'রে এসেছিলুম তেমনি ক'রেই যাব বৌ। এসেছিলুম ভাগ্যিস্, তবু যা হোক্ মেয়েটার পেটে কিছু পড়্‌লো।"

সে সময়ে রাগের মাথায় ব্রজবালা মেয়েকে খাইতে দ্যান নাই বলিয়া যে সত্যসত্যই ইন্দুকে রাত্রে উপবাস করিয়া কাটাইতে হইত তাহা নহে। রাগ পড়িলেই তাহাকে খাইতে বলিতেন। কিন্তু মাঝখান হইতে আর একজন আসিয়া দরদ-দ্যাখাইয়া তাহাকে খাওয়াইয়া গেলেন এই অপমানেই হউক কিংবা অভিমানেই হউক ব্রজবালা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি খাবেনি বুঝি মা !"

"না। তুই খেয়ে ওঠ্ আমি এঁটো

পেড়ে নিচ্ছি! সব ভাতকটা খেয়েছিস্ তো?" ব্রজবালার মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দু দেখিল তাঁর চক্ষু দুটী জলে ভরা। ইন্দু জানিত ব্রজবালা তাহার প্রতি যেমন মারধোরও করিতেন তেমনি আবার নিজেও কাঁদিয়া মরিতেন। ইন্দু বলিল, "তুমি শোও গে যাও মা। অনেক রাত হ'য়ে গিয়েছে। আমিই এটুকু গোবর দিয়ে নিচ্ছি!"

ক্রমশঃ

নাম-গান।

(শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী)

(১)

আমারি ব্যাকুল চিত্তে মরুভু তৃষিত প্রাণে
জাগে নদী-কলরোল প্রভু তব নাম গানে
কি সুধা উথলি উঠে
পাষাণ নিগড় টুটে
দিকে দিকে যায় ছুটে ব্যাপি বাধা ব্যবধানে।

(২)

শোকার্ত্তের শান্তি কণা বিরহী-মিলন ধাম
মানবের মোক্ষদাতা তোমার পবিত্র নাম
ভকতের সুখে দুখে
প্রাণে প্রাণে বুকে মুখে
বিশ্বের মঙ্গল তরে ধ্বনি' উঠে অবিরাম।

(৩)

নদনদী তরুলতা পশু পাখী ফুল ফল
নামগানে নিমগন আকাশ বাতাস জল
প্রেমেতে পাগল ধরা
সকল সংশয়হরা
তব নাম সংকীর্ত্তনে স্থির লক্ষ্য অবিচল।

(৪)

কি মধুর মৃত্যুহারী নাম সুধা অমরার
নাম শুনে নর নারী তরে যায় এ সংসার
দিক্‌হারা লভে কুল
শুষ্ক বৃক্ষে শোভে ফুল
মুমূর্ষু পরাণ লভে মরু শান্তি পারাবার।

(৫)

লঙ্কায় জানকী স্মরি সেই নাম মনে মনে
ভক্ত ধ্রুব উচ্চৈঃস্বরে সেই নাম গাহি বনে
নারদ ব্যাকুল প্রাণে
তোমার মহিমা গানে
তোমারে লভিল ধ্যানে মানবের এ জীবনে।

(৬)

নামগান—প্রেমদান—কিবা শ্রেষ্ঠ অধিকার
দিয়াছ ধরার নরে কিবা আছে চাহিবার
ভক্ত রাধা গৌর সম
যেন ওগো প্রাণ মম
জীবনে তোমারে লভে প্রেমে ডাকি অনিবার

সভ্য জাতির সমর নরমেধ।

অর্থাৎ মহাত্মা টলস্টয়ের লিখিত যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রবন্ধ চতুষ্টয়।

(৩) কার্থেজ ধ্বংস করিতেই হইবে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ)

ইউরোপের রাজ্যসমূহে, সমস্ত শ্রমজীবিদিগকেই—এইরূপ যুদ্ধে অর্থাৎ লুণ্ঠন এবং নরমেধ যজ্ঞে যোগ দেওয়ার জন্য বাধ্য করাইয়া থাকে। এই সকল ধূর্ত্তগণের দুরভিসন্ধিতেই আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠে এবং কথায় কথায় যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হয়। শান্তিপূর্ণ দেশ সকলও বিনা কারণে আক্রান্ত এবং লুণ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বৎসরই কোন না কোন স্থানে এইরূপ হত্যা বা লুণ্ঠন হইতেছে এবং কে কখন কাহাকে মারিয়া ফেলে, কে কাহাকে লুঠিয়া নেয়, এই ভয়ে সকলেই সর্ব্বদা শশঙ্কিত অবস্থায় আছে। যখন এইরূপ কার্য্যের বিরাম না হইয়া, ইহার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান হইতেছে, ইহাতে এই বুঝা যায়, যে স্বল্পসংখ্যক ধূর্ত্তগণের পক্ষে এই সকল কার্য্য লাভজনক। উহারা প্রতারণা দ্বারা অধিকাংশ লোক-

দিগকে স্বার্থ-সাধনের জন্য আয়ত্তাধীনে রাখিয়াছে।

অতএব, প্রজাসমূহকে, এইরূপ প্রতারকের হস্ত হইতে নিস্তার করিতে হইলে, ইহাদিগকে পরস্পরের লুণ্ঠন ও হত্যা হইতে বিরত করিতে হইলে, প্রথমতঃ যে প্রতারণার বশে লক্ষ লক্ষ লোক অবশ হইয়া কার্য্য করিতেছে—উক্ত প্রবঞ্চক-দিগের সেই প্রতারণা, প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। কি প্রকারে এই শঠতার অনুষ্ঠান হয়, কি কি উপায়ের দ্বারা এই কার্য্যগুলি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, এবং কি উপায়ে ইহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়—তাহাও সকলের সমক্ষে প্রচার করিতে হইবে।

কিন্তু ইউরোপের যাহারা শিক্ষিত, তাহারা এদিকে মোটেই দাঁড়াইতে চাহেন না। শান্তিস্থাপনের অজুহাতে এক এক সময় তাঁহারা ইউরোপের এক এক সহরে একত্রিত হইয়া, টেবিল গুল্‌জার করিয়া বসিয়া, গম্ভীরভাবে চিন্তা ও চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন:—কি করিলে এই দস্যু-গুলি,—দস্যুতাই যাহাদের জীবিকা তাহারা,—দস্যুতা ছাড়িয়া, শান্তির সহিত ভদ্রভাবে জীবনযাপন করিতে পারে?

এই প্রশ্নের পর আরও জটিল অনেক প্রশ্ন উঠিয়া পড়ে:—

প্রথম প্রশ্ন:—ইতিহাসের দিক থেকেই হউক, ব্যবহার শাস্ত্রের দিক থেকেই হউক, আর মানবজাতির ক্রমোন্নতি বা সভ্যতার দিক থেকেই হউক;—যদি বিচার করা যায়—জগতে যুদ্ধের আরও প্রয়োজন আছে কি না—ইহারা মনে করেন, এই সকল দোহাই দিয়া,—মানব জীবনের মূল ন্যায়ধর্ম্ম ও নীতির শাসন হইতে ইহারা নিস্তার পাইতে পারেন—

দ্বিতীয় প্রশ্ন:—যুদ্ধের ফল কি—পরিণাম কি—উপকারিতা কি? ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল যে দারিদ্র্য ও নীচতা, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ—থাকিতে পারে? নচেৎ জগতে যুদ্ধ ঘটিবে কেন?

শেষ প্রশ্ন:—যুদ্ধ-বিষয়ক এই সকল সমস্যার কি করিয়া সমাধান হয়? যে

বিষয় আমরা পূর্ব্বে স্পষ্টভাবে বলিয়াছি, ইহাদিগের নিকটও যেন সেইরূপ কোন প্রশ্ন উপস্থিত। এই প্রতারিত লোক সমূহকে কি করিয়া যুদ্ধের এই মোহ হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়?

কি লোমহর্ষণ কাণ্ড! ঠিক যেন সেই মন্টিকার্লোর ভীষণ গুহা,—উহাতে প্রবেশ করিলে মানুষ যেমনটী যায় তেমনটী আর ফিরিয়া আসে না। এই রণবাহিনীগুলিও ঐরূপ এক একটী গুহা,—জুয়ারির প্রকাণ্ড আড্ডা। এই আড্ডা-গুলির যাহারা মালিক, তাহারাই উহাতে সর্ব্বপ্রকারে লাভবান্। যাহারা উহাতে খেলিতে যায়, তাহারা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া আসে। প্রতি বৎসরই দেখিতে পাওয়া যায়, সুস্থ সবল প্রফুল্ল এবং প্রশান্ত যুবক, দলে দলে ঐ গুহাতে প্রবেশ করে, কিন্তু ফিরি-বার সময় স্বাস্থ্য, শান্তি, সম্মান, সবই সেই স্থানে রাখিয়া আসে এবং এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত প্রায়শঃ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়।

ইহাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখ হয়! জুয়ারি যে লোভে পড়িয়া মারা যায়, ইহাদিগকেও সেইরূপ প্রলোভনের মুখে ফেলিয়া দেওয়া হয়। জুয়াখেলায় যেমন একজন সর্ব্বস্বান্ত হয়, আর একজন হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠে—সৌভাগ্য-পিশাচীর যে এইরূপ চঞ্চল নৃত্য ও হাস্য-বিলাস—ইহাতেও প্রলুব্ধচিত্তে যে ভীষণ মোহ জন্মাইয়া দেয়,—যদিও খেলোয়াড়দিগের অনেকেই সর্ব্বস্বান্ত হইবে—ইহা দেখিয়া শুনিয়া এবং বেশ বুঝিয়া শুঝিয়াও,—একবার হয়ত হঠাৎ এককাত মারিতে পারা যাইবে—আশায় এই দুরন্ত কুহকে এই কার্য্য আর ছাড়িতে পারে না। যুদ্ধ যে প্রকাণ্ড একটা জুয়াখেলা,—অসংখ্য অসংখ্য মানুষের ধন-প্রাণ লইয়া, এক এক দেশের এক এক দল জুয়ারী, যাহাদিগকে সর্ব্বভাষায় রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রসচিব বলে—অপর একদেশের অপর এক দলের সঙ্গে, সয়তানের কার্য্যক্ষেত্রে,—যাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র বলে—সেই ক্ষেত্রে মিলিত হয় এবং এই খেলা খেলিয়া থাকে; পরে খেলা ভাঙ্গিয়া গেলে, কে কি লইয়া ঘরে ফিরিয়া যায়, তাহা সকলেই

জানে। প্রচণ্ড ঝড়ের অবসানে, প্রকৃতি যেরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে, যুদ্ধের পরেও মানুষ সেইরূপ অবসাদ প্রাপ্ত হয়।

এই পাপ হইতে আমরা প্রজাসমূহকে বিরত করি না—তাহাদিগের নিকট এই ভীষণ ব্যসন যে অশেষ দোষের আকর, তাহা প্রকাশ করি না,—ইহা যে নীতি ও ধর্ম্ম-বিগর্হিত—তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া যে ইহাতে জড়িত করা হয়, একথা তাহাদিগকে জানিতে দেই না, এবং দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া একের বড়মানুষ হওয়ার চেষ্টাই যে এই ব্যসনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা গোপন রাখিয়া—আমরা যে ভাবে এই পাপ প্রশমনের চেষ্টা করি, তাহাতে আর কি ফল ফলিতে পারে? বড় বড় সভা ডাকিয়া তাহাতে গম্ভীরভাবে এই আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হই :—

কি করিলে, এই সকল জুয়ার আড্ডার মালিকগণ স্বেচ্ছায় তাহাদের দোকান পাট্টি গুটাইতে পারে? এখানেই যে ক্ষান্ত হই, তাহা নহে। এর পর আবার অনেক গ্রন্থ লিখিয়াও এই ব্যাধি প্রতীকারের উপায় চিন্তা করা হয়, এবং তাহাতে এই সকল প্রশ্নের বিচার এবং মীমাংসার চেষ্টা হইয়া থাকে ;—ইতিহাস, ব্যবহার শাস্ত্র কিম্বা ক্রমোন্নতি বা বিবর্ত্ত-বাদের নিগূঢ় তত্ত্ব, এই সকল জুয়ার আড্ডাগুলিতে যে অনুষ্ঠান হয়, তাহার ভিতর আছে কি না? এবং ইহার কোন-রূপ আর্থিক, মানসিক এবং নৈতিক উপ-কারিতা আছে কি না?

কোন ব্যক্তি মদ অভ্যাস করিয়াছে, তাহার ঐ অভ্যাস ছাড়িবারও শক্তি আছে। অতএব তাহাকে অবশ্য উহা ছাড়িতে হইবে—তাহাকে যদি এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে, সে এই কথানুযায়ী কার্য্য করিলেও করিতে পারে। কিন্তু, 'মদ্যপান একটা জটিল সমস্যা, কি করিলে উহার সমাধান হইবে, তাহা আমরা সভা করিয়া ঠিক করিয়া দিতেছি'—যদি এইরূপ তাহাকে বলা হয়, তাহা হইলে সে হয়ত নিশ্চিন্ত মনে, সভার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত, মনের সুখে পান করিতে থাকিবে, অভ্যাসও ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইবে, পরে

কিছুতেই সেই অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিবে না। যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করিবার জন্য যে সকল মিথ্যা সুসংস্কৃত, বাহ্যিক এবং বৈজ্ঞানিক উপায় সকল অবলম্বন করা হয়, তাহাও ঠিক এইরূপ সভা সমিতির ন্যায়—যথা, আন্তর্জাতিক ধর্ম্মাধিকরণ, সালিসী বিচার এবং ঈদৃশ অপরাপর অন্তঃসার-শূন্য কপট ও জটিল অনুষ্ঠান খুব আড়ম্বরের সহিতই হইয়া থাকে, কিন্তু যুদ্ধপ্রশমনের জন্য সে উপায় খুব সরল, সত্য স্বতঃসিদ্ধ এবং অব্যর্থ, সেগুলি চতুরতার সহিত বাদ দেওয়া হয়—এই সহজ সুগম পথ, যে পথ আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, সে পথ প্রভুরা মোটেই মাড়াইতে চাহেন না।

যাহারা যুদ্ধ করিতে চাহে না তাহাদের পক্ষে, আন্তর্জাতিক আইন, সালিস্ বিচার বা এই সকল সমস্যার সমাধান—ইহার কিছুরই আবশ্যক হয় না। একমাত্র প্রয়োজন এই যে, শঠের ঈদৃশ মোহ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিতে হইবে 'যুদ্ধ ভাল কার্য্য,—অতএব এস, আমাদের সঙ্গে যোগ দেও, এবং যুদ্ধ কর?—ইহাদের কথায় মুগ্ধ ও প্রতারিত জনসমূহ জাগিয়া উঠুক এবং এইরূপ মোহ বা যাদু হইতে মুক্ত হোক। পাপ হইতে বিরত থাকাই, পাপ-প্রতীকারের একমাত্র উপায়। যুদ্ধও পাপ; অতএব যুদ্ধ না করাই—যুদ্ধপ্রতিষেধের একমাত্র উপায়।

সৈনিক সাজিয়া সমরবিভাগে কার্য্য করা যে কি দোষ, কি মূর্খতা এবং কি গুরুতর পাপের কার্য্য, কত বড় অপরাধ—ডায়মণ্ড ও গ্যারিসন নামক মহাত্মাদ্বয় অতি স্পষ্টরূপে উহার সমস্ত গুহ্য রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন; বিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্যাল্লো এবং আমিও অনেক লিখিয়াছি। আমি যে উপায় অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্বেই অবলম্বিত হইয়াছে এবং অধুনা ঐ পন্থা অষ্ট্রীয়া, প্রুশিয়া, হলন্দ, সুইট্জারলাণ্ড এবং রুশিয়া প্রভৃতি দেশে কোন কোন ব্যক্তি অবলম্বন করিয়াছেন; কোয়েকার মেনোনাইট্স্, ন্যাজারিন্স্ এবং বর্ত্তমানে ককাশাস্ অঞ্চলের ডুক্হোবারগণ ইহ

অবলম্বন করিয়াছে। তিন বৎসর যাবৎ পনের হাজার ডুকুহোবার প্রবল প্রতাপ রাশিয়ান গভর্ণমেণ্টকে বাধা দিয়া আসিতেছে। সকল প্রকার অত্যাচার এবং কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও তাহারা রুষ গভর্ণমেণ্টের নিকট মস্তক অবনত করে নাই—গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই তাহাদিগকে সৈনিকের কার্য্যে যোগ দেওয়াইতে পারে নাই।

ক্রমশঃ।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানী।

(রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত)

ব্যবসাদার সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে আবার কিছুদিন হইল একটু ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত চক্ষে চসমা অলঙ্কৃত একদল নূতন "স্বামিজী মহারাজ" দেখা দিয়াছেন,—ইহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম লোপ করিবার জন্য আর এক নূতন ধরণের জাল বিস্তার করিয়াছেন। ইহারা সুযোগ পাইলেই রাজনীতির ময়ান দিয়া হিন্দুধর্ম্মের খাস্তা কচুরী প্রস্তুত করিয়া নবযুবকদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কোথাও বা স্বদেশী কলার পাতে, বিলাতী আমদানী ভাবের মসলা দ্বারা পাক করিয়া মিঠাই, কেক্, কটলেট, সেণ্ডুইজ ওম্‌লেট গরম গরম ঢালিয়া দিয়া লুব্ধ দর্শকের হৃদয় অধিকার করেন। ইহারা আহার-বিহারে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ ছাড়িয়া যথেচ্ছ আচরণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। জাতিভেদ ইহারা একেবারেই উড়াইয়া দিতে চাহেন। স্বাধীনতার নামে ইহারা একটা পাশব স্বেচ্ছাচারের তরঙ্গ এ দেশের ইংরাজি-শিক্ষিত হিন্দু সমাজমধ্যে উঠাইতে বসিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যাহারা অধিক ক্ষমতাশালী এবং বুদ্ধিমান তাহাদের মধ্যে কেহ বা "অধ্যাত্ম-আশ্রম" স্থাপন করিয়া, কেহ বা "গুপ্ত-গুম্ফা" নির্ম্মাণ করিয়া, কেহ বা "প্রেম-সাধন মণ্ডলী" প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে ক্ষুধিত শিষ্য শিষ্যার নিরাপদ নৈশ-সম্মেলন-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। এই কৌশলজালে অর্থোপার্জ্জন এবং শিষ্যশিষ্যা সংগ্রহ দুইই একযোগে যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে, পরন্তু ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মলোপ করিবার এরূপ চিত্তমুগ্ধকর যন্ত্র অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। এই শ্রেণীর ব্যবসাদার সাধু সন্ন্যাসী" এবং "রাজনৈতিক স্বামীজী মহারাজ"দের দ্বারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ইদানীং অতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম নিপাত কার্য্যের সহায়ক-স্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন - অনেক স্থানের তীর্থ-পাণ্ডাগণ। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, এই সকল তীর্থে যাইয়া কোথাও বা মৃত পিতামাতা প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের ঊর্দ্ধলোক-প্রাপ্তির জন্য, কোথাও বা তাঁহাদের নিজেদেরই মৃত্যুর পরে সদ্গতি লাভের জন্য এই সকল স্থানের পাণ্ডাগণের উপদেশানুসারে নানাপ্রকার অশাস্ত্রীয় আচরণ করিতে বাধ্য হন এবং পাণ্ডাগণের মুখ-নিঃসৃত 'সুফল" ক্রয় করিয়া লইবার জন্য যাহা কিছু পাথেয় সম্বল থাকে, ঢালিয়া দিয়া বিদেশে বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়েন। এই সকল ব্যাপার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মেরই অন্তর্ভূত মনে করিয়া এই সকল তীর্থ পাণ্ডার ব্যবহারে অনেকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন।

দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ব্যবসাদার গুরু-পুরোহিত, ব্যবসাদার সাধু-সন্ন্যাসী এবং তীর্থ-পাণ্ডাদের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ, কতকটা তাঁহাদের নিদারুণ অর্থাভাবজনিত দৌর্ব্বল্য হইতেও সমুদ্ভ

মনে করিতে পারা যায়। এই সময়ের এই দেশব্যাপী অর্থাভাব এবং তজ্জনিত কষ্ট এবং সেই কষ্ট দূরীকরণ জন্য যে কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহের একটা উৎকট চেষ্টা, হিন্দু-সমাজের প্রত্যেক স্তরের প্রায় প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অল্প বিস্তর ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বন্যার সহিত সমাগত কতকগুলি নূতনসৃষ্ট অভাব আর তাহারই সংস্রবে একটা কাল্পনিক কষ্টবোধ আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই নিত্য নূতন অভাব বিমোচনের জন্য নিত্যই এখন সকলেরই বহু অর্থের প্রয়োজন। এই কারণে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সাধু-সন্ন্যাসীরও অভাব এখন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাঁহাদের অর্থেরও প্রয়োজন অধিক হইয়াছে। বিশেষতঃ অর্থাভাবে এবং জীবিকাভাবেও এখন অনেকে বাধ্য হইয়া সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিতেছেন। কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধু-সন্ন্যাসী স্বামীজী মহারাজ যে আদালতের ডিক্রীজারীতে পলাতক হইয়া এবং কেহ বা কাপড়ের এবং জুতার দোকানে দেউলিয়া করিয়া অবশেষে গৈরিকবস্ত্রের আশ্রয় লইয়াছেন ইহাওত চক্ষের উপর দেখিতেছি। এরূপ শোচনীয় অবস্থাতে পতিত হইয়াই উহারা কুৎসিৎ আচরণ করে, সে জন্য উহাদের প্রতি রুষ্ট না হইয়া বরং উহাদিগকে কৃপাচক্ষে দেখিতে চেষ্টা করাই সঙ্গত। বিশেষতঃ রোগ যখন সর্ব্ব-ব্যাপী হইয়া উঠিতেছে, তখন কেবল এক শ্রেণীর হতভাগ্য সাধু-সন্ন্যাসীকে ঘৃণা করিলে চলিবে কেন? অর্থাভাব যেমন কতকগুলি মানুষকে ব্যবসাদার সাধু-সন্ন্যাসীতে বা ব্যবসাদার গুরু-পুরোহিতে পরিণত করিয়া উঠাইয়াছে, সেইরূপ এই দেশব্যাপী অর্থাভাবে হিন্দুসমাজের অন্যান্য শ্রেণীর অনেক স্ত্রী-পুরুষকেও কুকর্ম্মান্বিত করিয়া তুলিতেছে, অর্থাভাবজনিত কষ্ট, অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণের সদাচার রক্ষার পথেও প্রবল বাধাস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য এ সময়ের এই দেশব্যাপী অর্থাভাবকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সাক্ষাৎ শত্রু না বলিতে পারিলেও, পরোক্ষভাবের একটি প্রবল শত্রু বলিয়া আমরা এখানে অবশ্যই নির্দ্দেশ করিতে পারি। "অর্থাভাব" স্বয়ং চারি অক্ষরের ক্ষুদ্র নাম বিশিষ্ট একটি যোদ্ধা হইলেও ইহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়-কুটুম্ব, অনুচর প্রভৃতি অনেকগুলি আছে। "অন্ন-কষ্ট" "বস্ত্র-কষ্ট" প্রভৃতি নানা নামে তাহারা জগতে পরিচিত। "কন্যাদায়" নামে ইহার এক রাক্ষসস্বভাবাপন্ন ভ্রাতা আছে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের কণ্ঠস্থলে বিকট দুই পাটি দন্তে দংশন করিয়া অর্থাভাবের সহোদর এই ভীষণদর্শন "কন্যাদায়" রাক্ষস সদাই ঝুলিয়া রহিয়াছে এবং সেই অবস্থাতে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে অট্টহাস্য-বিমিশ্র হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছে।

সাত্ত্বিক-খাদ্যাভাব নামে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আর এক প্রবল শত্রু আসিয়া সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাভাব-জনিত কষ্টে, ব্রাহ্মণের স্বীয় ধর্ম্মপালন কার্য্যে সময়ে সময়ে যতই অসুবিধা ভোগ করিতে হউক না কেন, হৃদয়ে বল থাকিলে, যে সকল অসুবিধার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়াও ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু গব্য-ঘৃত এবং গব্য-দুগ্ধের অভাবে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য-সদাচার এবং ব্রাহ্মণ্য-অনুষ্ঠান রক্ষা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। পিতৃলোকের এবং দেবদেবীর উদ্দেশ্যে যাগ-যজ্ঞ পূজার্চ্চনা কার্য্যের উপকরণ সামগ্রী মধ্যে গব্য-ঘৃতই সর্ব্ব-প্রধান শত সুবর্ণ-মুদ্রা-পূর্ণ থলি হাতে লইয়া সমস্ত কলিকাতা সহর তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেও কোন দোকান হইতে অর্দ্ধতোলা বিশুদ্ধ গব্য-ঘৃত এখন ক্রয় করিয়া আনিতে পারা যায় না। ভারতের রাজধানী দিল্লি নগরীতেও গব্য-ঘৃত এইরূপ দুর্ল্লভ সামগ্রী। ভারতের দক্ষিণ-প্রান্তে সেতু-বন্ধে এক সময়ে শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়া, গব্য ঘৃত দূরে থাকুক, মহিষ ঘৃতও সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, আমাকে ঘৃতের অনুকল্পে নারিকেল তৈল, সজল নেত্রে, পিণ্ডোপরি সমর্পণ করিতে হইয়াছিল। যথোপযুক্ত অর্থ দিয়াও যখন গব্যঘৃত বাজারে সংগ্রহ করিতে পারা যায় না, তখন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, গব্যঘৃতের অভাব কেবল দেশের সাধারণ অর্থাভাব-সমুদ্ভূত নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ-মধ্যে অর্থ-পিপাসা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই দুর্দ্দম-নীয় অর্থ-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য অধিক লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠিয়াছে। অর্থ-সঞ্চয়ের এই রাক্ষসী আকাঙ্ক্ষা হইতেই সর্ব্ব প্রকার খাদ্যসামগ্রীর সহিত প্রচুর পরিমাণে অখাদ্য ভেজাল মিশাইবার কুপ্রথা দেশে নামিয়াছে। ইহারই ফলে, বিশুদ্ধ গব্যঘৃতাদি সাত্ত্বিক

খাদ্যসামগ্রীর ঘোর দুর্ভিক্ষ আজি এদেশে উপস্থিত। সাত্ত্বিক-খাদ্যসামগ্রীর অভাবে কুৎসিৎ খাদ্য বা অখাদ্য উদরস্থ করিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক সাত্ত্বিক-বৃত্তিগুলি হারাইতে বসিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে চিন্তা করিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে, অর্থাভাব অপেক্ষা ঘৃত দুগ্ধাদি পবিত্র খাদ্যসামগ্রীর অত্যন্তাভাব, এসময়ে আমাদের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম রক্ষার পথটিকে যে অধিক কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিতেছে, ইহা বলিতেই হইবে।

সাত্ত্বিক খাদ্যের অভাবে কেবলই যে আমরা সত্ত্বগুণ-বিচ্যুত হইয়া পাশব-প্রকৃতিতে নামিয়া পড়িতেছি তাহাই নহে, পরন্তু নানাবিধ পীড়ার আক্রমণে অল্পায়ুও হইতে বসিয়াছি। দেহের সত্ত্বগুণই পীড়ার আক্রমণের একটা প্রধান প্রতিরোধক-শক্তি। যাহার দেহে সত্ত্বগুণ যত অধিক থাকে, সে তত পরিমাণে নিজ-দেহে প্রবিষ্ট ম্যালেরিয়া জ্বর, কলেরা, বসন্ত, ইন্‌ফুলুয়েঞ্জা, প্লেগ প্রভৃতি উৎকট পীড়ার বিষকে সহজে নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে পরিণত করিতে সমর্থ হয়। সত্ত্বগুণ-বিচ্যুত হইয়াই যে আমরা সামান্য একটু পীড়ার স্পর্শেই এখন শয্যাশায়ী হইয়া পড়ি, এ প্রাকৃতিক তত্ত্ব এখনও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সুস্থ দেহীর সংখ্যা এখন এদেশে নিতান্তই বিরল। পীড়ার প্রাবল্য ও প্রাদুর্ভাব দিন দিনই দেশে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। জ্বর অতিসার, আমাশয় প্রভৃতি পুরাতন ব্যাধিগুলির সহিত বিলাতি নূতন আমদানি প্লেগ ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি পীড়ার প্রাবল্যও এখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাচরণ পথে সামান্য বাধা উপস্থিত করিতেছে না।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাচরণের প্রতি, পীড়া হইতেও প্রবল শত্রুতা সাধন করিতেছেন—এ সময়ের পীড়াশক্তিবর্দ্ধক একশ্রেণীর চিকিৎসক। ইহারা রোগীর বিপন্ন অবস্থায়—রোগীর আত্মীয়-স্বজনের দুঃসময়ে সুবিধা পাইয়া অনেকস্থলে কিছুমাত্র আবশ্যক না থাকিলেও বিলাতের আমদানী টিনের কৌটাপূর্ণ মুরগীর জুস্ ইত্যাদি অখাদ্য কুপথ্যের ব্যবস্থা করেন, কখনও বা এই অবসরে জেলখানায় প্রস্তুত বিস্কুট, পাঁউরুটি প্রভৃতি ব্রাহ্মণের অব্যবহার্য্য বস্তুগুলি, ব্রাহ্মণগৃহে প্রবেশ করাইয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। রোগীর রুগ্ন দেহের পুষ্টিসাধন অপেক্ষা সদাচার ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ আচার ব্যবহার নষ্ট করাই ইঁহাদের অধিকতর অভীষ্ট; নতুবা রোগীর পথ্য-ব্যবস্থা সময়ে, সদ্যঃ-প্রস্তুত ছাগাদির জুসের পরিবর্ত্তে বহুকালের আমদানি কৌটায় পচা বিলাতি 'চিকেন ব্রথে'র উপরে ইহাদের চিত্ত এতাদৃশ আকৃষ্ট হইয়া থাকে কেন? সকল ডাক্তার সম্বন্ধেই এরূপ গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিবার কারণ না থাকিলেও এ সময়ের অনেক অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং কুশিক্ষিত ডাক্তারকেই যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শত্রুশ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে, ইহাও সুনিশ্চিত।

চিত্ত-দৌর্ব্বল্য,—এ সময়ে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাচরণকে বিনষ্ট করিবার আর একটী প্রবল কারণ রূপে আসিয়া আমাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে। উপরি বর্ণিত অর্থাভাব, খাদ্যাভাব, পীড়ার প্রাবল্য, আমাদের চিত্ত দৌর্ব্বল্যের প্রবর্ত্তক হইলেও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী পরাধীনতাকেই উহার প্রধান কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। পরাধীনতাতে যেরূপ মানুষকে কাপুরুষে পরিণত করিতে পারে, এরূপ আর কিছুতেই সম্ভবে না। এদেশের এবং বিলাতের ইংরাজী লেখকগণ অনেক সময়ে আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন—"ভারতবাসী নৈতিক-বলের বড়ই কাঙ্গাল!" কিন্তু তাঁহারা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশের সময়ে একবারও ইহা চিন্তা করিয়া দেখেন না যে, পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত কোন স্থানে কোন জাতিকে দীর্ঘকাল পরাধীন অবস্থাতে থাকিবার পরে নৈতিক বলে বা চরিত্র বলে বলীয়ান্ থাকিতে দেখা গিয়াছে? নৈতিকবল, চরিত্রবল, চিত্তবল এ সমস্তেরই মূল উৎসস্থান স্বাবলম্বন। মূল উৎসমুখে পাথর চাপা দিয়া রাখিয়া "তোদের ঝরণাতে জল নাই" বলিয়া বিদ্রূপ করা স্বাবলম্বন-প্রিয় কোন জাতীয় লোকের মুখেই শোভনীয় হইতে পারে না। চিত্ত-বল হারাইয়া আমরা দৈহিক গঠনে পুরুষ থাকিয়াও আজ অবলা রমণী হইতেও বলহীন হইয়া পড়িয়াছি এবং চরিত্র হীন ও নৈতিক বলহীন জীব-শ্রেণী বলিয়া সুসভ্য সমাজের মানুষদের নিকটে উপেক্ষিত হইতেছি। সে উপেক্ষাতে দুঃখ নাই,—দুঃখ এই যে, চিত্ত-বলে দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে থাকায় আমরা সবল হৃদয়ের আরাধ্য-বস্তু ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারিতেছি না।

হৃদয়ের বল হারাইয়াছি বলিয়াই আমরা এখন আর আমাদের সামাজিক বন্ধনকে আঁটিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। সহর, নগর, গ্রাম, পল্লী, সকল স্থানেই সমাজ-বন্ধন দিন দিন নিতান্ত শিথিল হইয়া পড়িতেছে। এই শিথিলতার জন্য সহরবাসী এবং নিজ গ্রাম হইতে সুদূর-প্রবাসী ব্রাহ্মণ-যুবকগণ অনেক স্থলে ঘোর যথেচ্ছাচারী এবং উৎকট উচ্ছৃঙ্খল জীবে পরিণত হইয়া উঠিতেছেন। পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া নগর-বাসে জনসাধারণের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হইতে থাকাতে, একদিকে যেমন পল্লীর জীর্ণ দেব-মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইয়া পড়িতেছে, পল্লীগুলি ক্রমেই ঘোর জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তেমনি অন্য দিকে, সহরবাসীদের হৃদয় অনেক স্থানে উচ্ছৃঙ্খল-ভাবের এক একটা মালগুদামে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এজন্য একথা নিঃশঙ্ক চিত্তে বলা যাইতে পারে যে—সমাজবন্ধন শিথিলতা আজি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গকে বাতব্যাধিগ্রস্তের শরীর হইতেও অধিক অসাড় অবশ করিয়া দিতে বসিয়াছে।

অগ্নিমান্দ্যপীড়া-গ্রস্ত রোগীর দেহে যেমন উদরাময়, রক্তামাশয়, অতিসার প্রভৃতি রোগ সমূহ সহজে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, সেইরূপ হৃদয়-বল-বিচ্যুত ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নিহত করিবার জন্য নানা মূর্ত্তিতে নানা মহাশত্রু আসিয়া চারিপার্শ্বে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রেল ও ষ্টীমারে গমনাগমন একটি প্রধান। হৃদয়বলযুক্ত যাত্রি, রেলপথে গমনাগমন সময়ে ক্ষুধিত, পিপাসিত হইয়াও "পানিপাঁড়ে'র বালতীপূর্ণ জল এবং কালোযার মিঠাই-ওয়ালার চুবড়ীপূর্ণ কচুরি, পুরী, তরকারী অনায়াসেই উপেক্ষা-দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন। দুর্ব্বল হৃদয় ক্ষুধিত পিপাসিত ব্রাহ্মণ-যাত্রীর পক্ষে সেরূপ আচরণ অসম্ভব। তাঁহারা সহজেই ঐ সকলের লোভে আকৃষ্ট হইয়া রেলপথে যাতায়াত সময়ে আপন ব্রাহ্মণ সদাচারকে চির-তরে বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। কেহ বা পতন মার্গের আর এক সোপান নিম্ন দিকে অগ্রসর হইয়া রেল-ষ্টেশনের রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমে বিক্রীত—অথবা আরও সত্য চিত্র আঁকিতে হইলে, সাহেব ও বিবিদের ভুক্তাবশিষ্ট মদ্য মাংস তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিয়া জীবন ধন্য করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন রেলপথে যাতায়াত সময়ে ব্রাহ্মণের নিত্য-কর্ত্তব্য সন্ধ্যা-তর্পণকেও বিসর্জ্জন দিতে হয়। এই দৃষ্টিতে বিচার করিতে উপস্থিত হইলে রেলে ও ষ্টীমারে গমনাগমনকেও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাচরণের একটা প্রবল শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিতেই হইবে।

রেলে ষ্টীমারে যাতায়াত কালে কতকটা প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া, কতকটা বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মণকে যে সদাচার পরিত্যাগ করিতে হয়, আদালত ও ফৌজদারী কোর্টে পুনঃ পুনঃ "হাজির" হইতে হইলে অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন ব্রাহ্মণ যুবককে দোষী বা নির্দ্দোষী অবস্থায় জেলখানাতে এক দিনের জন্যও যাইতে হইলে সেই সদাচারকে অনেক সময়েই বিদায় দিতে হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উচ্চ-নাদে বলিয়া থাকেন,—"আমরা ভারতবাসীর ধর্ম্মে কখনই হস্ত-ক্ষেপ করি না", দুঃখের বিষয়—ভারতের জেলখানা সমূহে গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে ব্রাহ্মণের জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে, উচ্চরাজপুরুষগণের ঐরূপ গর্ব্বোক্তির মূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনুমিত হয়।

কেবল রেল বা জেল বলিয়া নহে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যশাসনপদ্ধতির প্রায় কোন স্থলেই ব্রাহ্মণ-প্রজাপুঞ্জের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম রক্ষার্থে যে—কোন বিশেষ সুবিধা বিধান করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। পক্ষান্তরে যদিও গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা-পত্রে আমরা পড়িয়া থাকি—গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যাপারে সর্ব্বদাই নির্লিপ্ত-নীতির নির্ম্মল-মার্গের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু কোন কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের আচরণ-স্থলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবের কার্য্যও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। যশোহর জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গার রাজা প্রমথভূষণ দেব রায়, তাঁহার নব যৌবনে, যে সময়ে তাঁহার অধিকার-মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথা চালাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন; সেই সময়ে তাৎকালিক বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণ, প্রমথ ভূষণকে রাজা উপাধি প্রদান উপলক্ষে পরিষ্কার ভাষাতে ইহা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে—"বিধবা বিবাহ প্রচলনের

সহায়তা করিতেছেন বলিয়াই তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দেওয়া হইল।" ইহাকে হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ বলিতে না চাহ, বলিও না, কিন্তু ইহাতে যে হিন্দু সমাজের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা হইল ইহা বলিতেই হইবে। জানিতে চাহিলে, এইরূপ শত শত ঘটনার বিবরণ নাম ও স্থানসহ উল্লেখ করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের স্থিরীকৃত নীতি যাহাই হউক, এদেশের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণের আচরণ অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষার অনুকূল পথ পরিহার করিয়া অন্য পথে ভীমবেগে চলিয়া থাকে। কাজেই অসহায় ব্রাহ্মণকে মর্ম্মান্তিক কষ্টানুভব করিতে হয়।

রেল লাইনের অসংখ্য আপ্ ও ডাউন ট্রেণের গত গতিতে, কিম্বা তদপেক্ষা আরও অধিক বেগগামী এদেশের এসময়ের অসংখ্য রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার প্রকাশ্য ও পরোক্ষ ঘাতপ্রতিঘাতে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের [illegible] কিয়ৎ পরিমাণে যে আঘাত লাগিতেছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা শত সহস্রগুণ অধিক আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে— আমাদের নিজেদেরই ভিতরের কুব্যবহারে। এই কুব্যবহার নানা স্থানে নানা মূর্ত্তি [illegible] সময়ে প্রকট হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ সমাজের সর্ব্বত্র আজি যে একটা সার্ব্বভৌম ব্যবসাদারী বা দোকানদারী ভাব বিপুলবেগে প্রসারিত হইতে চলিয়াছে, ইহাই দেশের ভবিষ্যৎ ভাবনায় দগ্ধচিত্ত ব্যক্তিদের নিকট আজি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আতঙ্কের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সুপবিত্র ব্রাহ্মণ্যাচরণকে আজি বৈশ্যবৃত্তির নিম্নতম স্তরের জঘন্য ব্যবসাদারী ভাবে একবারে রূপান্তরিত বা জীবান্তরিত করিতে বসিয়াছে। ইহারই ফলে— সমাজের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আজি বুভুক্ষিত সারমেয় হইতেও লোল জিহ্ব হইয়া, এক হাতে চারিটি পয়সা লইয়া, তাহারই বিনিময়ে, অন্য হাতে অর্থদাতার অভিলষিত ঘোর অশাস্ত্রীয় "ব্যবস্থাপত্র" স্বাক্ষর করিয়া দিতেছেন। কোথাও বা কেহ কিঞ্চিৎ প্রণামী পাইয়া কপিমূর্খকে "বেদান্তকেসরী" উপাধি দিতে বসিয়াছেন। ইহারই ফলে,—পুত্রের ধনবান্ পিতা, দরদস্তুর-কার্য্য কুশলা ধীবরপত্নীকেও চতুরালিতে পরাস্ত করিয়া, কন্যার দরিদ্র পিতার নিকট হইতে, বিবাহের পণ-যৌতুকের পরিমাণ স্থির করিবার সময়ে, কন্যার পিতার যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করিবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতেছেন। ইহারই ফলে—কতই সাধু সন্ন্যাসী, বৃদ্ধা বারবনিতাকেও লজ্জিতা করিয়া আপনার "আশ্রম"কে গণিকালয়ে পরিণত করিতে বসিয়াছেন। এই দোকানদারী স্রোতেরই বেগ সামলাইতে না পারিয়া কেহ বা আজি চারি বেদের উদ্ধারক, কেহ বা সপ্তম দর্শনের প্রবর্ত্তক, কেহ বা পুরাণের অনুবাদক, কেহ বা স্মৃতির সংগ্রহকার, কেহ বা তন্ত্রের টীকাকার এবং কেহ বা নবাবিষ্কৃত গণনামূলক পঞ্জিকার প্রকাশক সাজিয়া সংবাদের সুপ্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে অর্থার্জ্জনের নানা যন্ত্র হাতে লইয়া নানা মূর্ত্তি ধরিয়া নামিয়া পড়িতেছেন। ইহাদের সকলেরই মুখের কথা—হিন্দু জাতির মঙ্গল সাধন। ইহাদের হৃদয়ের অন্তস্তলের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা —দুটা পয়সা উপার্জ্জন। আর ইহাদের সকলেরই এই সকল কার্য্যের একমাত্র চরম ফল - ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নিষ্পেষণ। এই এক দোকানদারী ভাবের প্রাবল্যে এসময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের যত অনিষ্ট হইতেছে,—ছোট বড় আর সমস্ত শত্রুর সমষ্টি চেষ্টাতেও ততদূর করিয়া উঠিতে পারিতেছে কি না সন্দেহ। তবে এস্থলে ইহার উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ইউরোপীয় "সভ্যতার" দক্ষিণ হস্ত ধরিয়াই ইনি এদেশে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কেবল এক দোকানদারী ভাবের বন্যা বলিয়া নহে, এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রতিকূল শক্তির কথা আলোচনা করিলাম, ইহাদের প্রায় সকল গুলিই একে অন্যের সহিত বিজড়িত থাকিয়া, পরস্পরের শক্তি বহুগুণ প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। একগাছি সূত্র অতিক্ষীণ ও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু কতকগুলি সূত্র বা রজ্জু একগাছি অন্যের সহিত দৃঢ় ভাবে গ্রথিত হইয়া যখন 'জাল' নাম প্রাপ্ত হয়, তখন সে আর উপেক্ষার বস্তু থাকে না। তখন সেই জালে ব্যাঘ্র সিংহাদি ভীষণ হিংস্রজন্তুও সহজে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। সেইরূপ কেবল একা ইউরোপীয় সভ্যতা বা পাশ্চাত্য-শিক্ষা অথবা দোকানদারী ভাবের বিস্তার, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের

বিশেষ কিছু অনিষ্ট সাধন করিতে পারিত না, কিন্তু এই সকল প্রতিকূল শক্তি একে অন্যকে আশ্রয় করিয়া এবং একে অন্যের সহিত সহযোগিতাসূত্রে দৃঢ় সম্বন্ধযুক্ত থাকিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকে জালে বিজড়িত নিরুপায় সিংহের ন্যায় আজ অতিশয় বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। বহু প্রতিকূল শক্তি এক সময়ে চারিদিক হইতে প্রবল ভাবে কার্য্য করিতে থাকিলে আমরা—হিন্দু, ইহাতে কালের ক্রীড়া দেখিয়া থাকি। আকাশের এক পার্শ্বে একটু মেঘ অথবা তাহা হইতে শুধুই দুই ফোটা বৃষ্টি পড়িতে দেখিলে বিশেষ কোন ক্ষতির কারণ মনে করি না। বৃষ্টি, বাদল, ঝড় বিদ্যুৎ-বিকাশ, বজ্রপাত এবং সেই সঙ্গে যখন নদ নদীর জল ফুলিয়া উঠিতে থাকে, তখন আমরা বর্ষাকালের আবির্ভাব বুঝিয়া থাকি; অথবা বর্ষার আগমনেই ঐ সকলের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে বুঝি এবং বিনা চেষ্টায় বর্ষার ক্লেশ সহ্য করিতে থাকি। এ ক্ষেত্রেও সেই অবস্থা মনে করা যাইতে পারে। এই "কাল"ই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি অতিশয় প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। এই "কাল" আজকাল আসিয়া এ দেশে উপস্থিত হয় নাই। ইউরোপীয় কপট আচরণ বা পাশ্চাত্য-শিক্ষারও আবির্ভাবের বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে কলিযুগ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে এই কালপুরুষ ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, দুই হাতে হিন্দুয়ানীর আবর্জ্জনা চারিদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। তদবধি ঐ কার্য্য সমানভাবেই চলিয়াছে। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচরণের বিস্তার সাধনই ইহার প্রধান কার্য্য। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে জগৎ হইতে বিলুপ্ত করাই ইহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কলিকাল—হস্তপদবিহীন একটা অশরীরী শত্রু, কিন্তু এই কলিকালের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই অর্জ্জুন প্রভৃতি মহাপুরুষদেরও পুরুষকার শক্তি হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল,—পুরাণ এই মহাসত্য ঘোষণা করিতেছে। কলিকালই যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শত্রু, ইহা বলাই বাহুল্য। ঘোর কামাসক্ত রাক্ষস রাবণ যেমন এক সময়ে অসহায়া সীতাদেবীকে ক্রোড়ে চাপিয়া ধরিয়া লঙ্কাভিমুখে ছুটিয়াছিল, আজি সীতা হইতেও অধিক বিপন্ন—আমাদের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম, রাক্ষস রাবণ হইতেও ভীষণ দস্যু কলিকালের দুই বাহুর চাপের মধ্যে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতে বসিয়াছে। সীতাদেবীর রক্ষার জন্য জটায়ু-পক্ষী আত্ম-বলিদান করিয়াছিল; ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কাহাকেও কেশাগ্র পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত দেখিতেছি না। ঐ সময়ের ঐ ঘটনার সহিত এই সময়ের এই ঘটনার আর একদিক দিয়া আর একটি অপরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। রাবণকে পরাস্ত করিয়া যখন রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করেন এবং তৎপরে যে সময়ে তিনি সীতার অগ্নি-পরীক্ষার অনুষ্ঠান করেন, সেই সময়ে অগ্নি-কুণ্ড হইতে উত্থিত মূর্ত্তিমান্ অগ্নিদেব রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন —"বলপূর্ব্বক রাবণ সীতাদেবীকে ক্রোড়ে চাপিয়া ধরিয়া রাখিলেও সীতার সতীত্ব অক্ষত রহিয়াছে এবং সীতার পবিত্রতাও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; কারণ, সীতার দেহখানিমাত্র নিতান্ত অনিচ্ছায় রাবণের ক্রোড়ে ও তৎপরে তাহার কারাগারে সংস্থিত থাকিলেও তাঁহার চিত্ত সর্ব্বক্ষণের জন্য তোমাতেই সংলগ্ন ছিল।" * অগ্নিদেব, এই উক্তি দ্বারা দুর্ব্বলের পবিত্রতা রক্ষার প্রকৃষ্ট পথ হিন্দুজাতিকে দেখাইয়া দিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের হস্তপদাদি নাই—মূর্ত্তিও নাই। কেবল অবস্থা বুঝাইবার সুবিধার জন্যই স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকে হস্তপদাদি-বিশিষ্ট দেহধারীরূপে কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র। ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ভূমণ্ডলে বিরাজিত রহিয়াছে। আমরা—ব্রাহ্মণগণ, কালরূপ অসুরের কবলে নিষ্পেষিত হইতেছি। অসংখ্য প্রতিকূল শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভের

---

* 'রাবণেনাপনীতৈষা বীর্য্যোৎসিক্তেন রাক্ষসা।
তয়া বিরহিতা দীনা বিবশা নির্জ্জনে বনে।
রুদ্ধা চান্তঃপুরে গুপ্তা ত্বচ্চিত্তা ত্বৎপরায়ণা।
রক্ষিতা রাক্ষসীভিশ্চ ঘোরাভির্ঘোরবুদ্ধিভিঃ।
প্রলোভ্যমানা বিবিধং তর্জ্জ্যমানা চ মৈথিলী।
নাচিন্তয়ত তদ্রক্ষস্ত্বদ্গতেনান্তরাত্মনা।
বিশুদ্ধভাবাং নিষ্পাপাং প্রতিগৃহ্ণীষ্ব রাঘব।"
(বাল্মীকি রামায়ণ)

সামর্থ্য এ সময়ে আমাদের নাই। কদাচার, ভ্রষ্টাচার, অনার্য্যাচার হইতে এ সময়ে পরিত্রাণেরও কোনও উপায় চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কেবল আমাদের হৃদয়টি যদ্যপি এই সময়ে সীতাদেবীর হৃদয়ের ন্যায় কোনরূপে ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিতে পারে—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মণের হৃদয়ের অকপট অনুরাগ অক্ষুণ্ণ থাকে, তবেই আমরা আমাদের ভিতরের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিব, এবং কেবল এই একমাত্র উপায়েই এই ঘোর আপৎকালে কোনক্রমে ধ্বংস হইতে জগতে আত্ম-অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইব। নতুবা আর কিছুকাল পরে, ইজিপ্টের ভগ্ন পিরামিডস্থিত শুষ্ক নরদেহের ন্যায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের নাম, লুপ্ত-ইতিহাসের একটা আলোচ্য সামগ্রী হইয়া পড়িয়া থাকিবে মাত্র। ব্রহ্মণ্যদেব! সে শোচনীয় পরিণাম হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মণ্যদেব, ব্রাহ্মণের হৃদয়টিকেও অন্ততঃ ব্রাহ্মণ-ভাবাপন্ন রাখুন।

ত্রিশূল।

স্বেচ্ছাচার কুলাচার নহে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(স্মৃতিকণ্ঠকবিরত্নোপাধিক শ্রীচন্দ্রশেখর রায় লিখিত)

তথাহি স্কন্দে—

ন যত্র সাক্ষাদ্ বিধয়ো ন নিষেধা
শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচারলোকাচারৈ স্তত্র ধর্ম্মো
নিরূপ্যতে ॥

যেখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিধি নাই, শ্রুতি এবং স্মৃতি কোনরূপ বাধক হন নাই, সে স্থলে দেশাচার কিম্বা লোকাচার মানিয়া ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়।

অপিচ কূর্ম্মপুরাণও বলিতেছেন,—

"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যক্ কর্ম্মবর্ণাশ্রমাত্মকম্।
অধ্যাত্মজ্ঞানসহিতং মুক্তয়ে সততং কুরু ॥ ২০০
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তির্ভক্ত্যাঃ সম্পদ্যতে পরম্।
শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতো ধর্ম্মো যজ্ঞাদিকো মতঃ ॥ ২০১
নান্যতো জায়তে ধর্ম্মো বেদাদ্ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ।
তস্মাৎ মুমুক্ষুর্ধর্ম্মার্থী মদ্রূপং বেদমাশ্রয়েৎ ॥ ২০২
যে ন কুর্ব্বন্তি তদ্ধর্ম্মং তদর্থং ব্রহ্মনির্ম্মিতম্।
তেষামধস্তান্ নরকাংস্তামিস্রাদীন্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ২০৫
ন বেদাদৃতে কিঞ্চিৎ শাস্ত্রং ধর্ম্মাভিধায়কং।
যোহন্যত্র রমতে সোহসৌ ন সম্ভাষ্যো দ্বিজাতিভিঃ ॥ ২০৬
যানিশাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেহস্মিন বিবিধানিতু।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি তেষাং নিষ্ঠাহি তামসী ॥ ২০৭
কাপালং ভৈরবঞ্চৈব যামলং বামমার্হতম্।
কাপিলং পঞ্চরাত্রঞ্চ ডামরং মোহনাত্মকং।
এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানিতু ॥ ২০৮
যে কুশাস্ত্রাভিযোগেন মোহয়ন্তীহ মানবান্।
ময়া সৃষ্টানি শাস্ত্রাণি মোহায়ৈষাং ভবান্তরে।

২২৯ পূর্ব্বভাগ, ১২ অঃ।

মুমুক্ষু ও সদ্গতি ইচ্ছুকগণ সর্ব্বদা শ্রুতি এবং স্মৃতিতে উক্ত বর্ণাশ্রমাত্মক আধ্যাত্ম জ্ঞানযুক্ত কর্ম্ম সকল সম্যক্

প্রকারে আচরণ করিবে। ধর্ম্ম হইতে ভক্তি উৎপন্ন হয়। ভক্তি হইতে পরমাত্ম-তত্ত্ব লাভ হয়। বেদ এবং স্মৃতিতে যজ্ঞাদি কর্ম্মই ধর্ম্মজনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু বেদ হইতেই ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং মুমুক্ষু ও ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিগণ মৎস্বরূপ বেদকেই আশ্রয় করিবে। যে সকল ব্যক্তি বেদবিহিত ধর্ম্মসকল আচরণ না করে, তাহাদিগের নিমিত্ত অতি কষ্ট-দায়ক তামিস্র প্রভৃতি নরকসকল সৃষ্ট হইয়াছে। বেদ ভিন্ন ধর্ম্মজ্ঞান বা ধর্ম্ম-শিক্ষার অপর কোন উপায় নাই, এই শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যাহারা অন্য শাস্ত্র বা স্বেচ্ছাচারে রত হয়, তাহারা দ্বিজাতিগণের সম্ভাষ্য নহে। ইহজগতে শ্রুতি এবং স্মৃতি বিরুদ্ধ যে সকল শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিষ্ঠা-তামসী; অর্থাৎ তাহা তমোগুণ-বহুল বা আসুরিক। কাপাল, ভৈরব, যামল, বাম, আর্হত, কাপিল, পঞ্চরাত্র, ডামর ও মোহনাত্মক, এই সকল শাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্র অসুরদিগের মোহের নিমিত্ত মৎকর্ত্তৃক যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, ইহজগতে দুষ্টবুদ্ধি লোকসকল সেই সেই শাস্ত্রের দ্বারা মানবগণকে মোহিত করে।

আচারাদি নবগুণ বিশিষ্টই "কুল"। যাঁহার বংশে বা যাঁহাতে নবগুণ বর্ত্তমান, তিনিই কুলীন বলিয়া খ্যাত।

"আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

বৈদ্যবংশীয় * মহারাজ বল্লালসেন উক্ত নবগুণ গ্রহণ করিয়াই কৌলীন্যপ্রথা সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে কুলবিভাগ ত্রিবিধ—

"সিদ্ধং সাধ্যন্তথা কষ্টং ত্রিবিধং কুলমুচ্যতে"

যাঁহারা নবগুণবিশিষ্ট তাঁহারা সিদ্ধ (নৈকোষ্য বা মহাকুল) যাঁহারা তদপেক্ষা হীন বা যাঁহাদের ৫।৭টি গুণ আছে, তাঁহারা সাধ্য (মধ্য বা ভঙ্গ), আর যে বংশে ২।১টি গুণ ছিল বা আছে, তাঁহারা কষ্ট, অর্থাৎ তাহাদিগকেই কনিষ্ঠ কিম্বা বংশজ বলে। এবং যাঁহাদের কোন গুণই নাই, তাঁহারা

* পুরাবৈদ্যকুলোদ্ভূতো বল্লালেন মহীভুজা।
মধ্বাদীনাং কুলং তত্বং সমীক্ষ্যাচ বিচার্য্যচ॥
ক্রিয়তে যৎ কুলগ্রন্থঃ কুলপঞ্জিস্ত্যহুচ্যতে।
তৎসর্ব্বং ঘটকে দদ্যাৎ কুলজ্ঞৈরপি ভাষিতং॥

(ইতি কবিকণ্ঠহার ও আদিমঘটক-ভত্ত)

কুল বর্জ্জিত বা মৌলিক। সুতরাং এ কুলাচার কোনরূপে উর্দ্ধতন পুরুষের স্বেচ্ছাচার কিম্বা ভ্রষ্টাচার হইতে পারে না।

পাঠকগণ! অজ্ঞ বা স্বার্থান্ধদিগের কি সুন্দর ব্যবস্থা, তাহা কিঞ্চিৎ দেখাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সধবা-স্ত্রীলোকের পক্ষে ব্রত উপবাস ইত্যাদি করা ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও স্বার্থের মহিমায় ২।৩ পুরুষ যাবৎ কেমন আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এ বিষয় একবার ভাবিয়া দেখুন ও শাস্ত্র কি বলিতেছেন, তাহা শুনুন,—

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো নব্রতং
নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে চেত্তু তেন স্বর্গে
মহীয়তে॥" ১৫।১৫৫

'পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাস ব্রতংচরেৎ,
আয়ুষ্যা হরতে ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥"
১৬।১৫৬

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গংগচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥"
১৭।১৫৭—২৫ অঃ বিষ্ণুস্মৃতি, ৫ অঃ মনু।

স্বামীসহ ভিন্ন স্ত্রীলোকের পৃথক্ ভাবে যজ্ঞ, ব্রত উপবাস, প্রভৃতি কিছুই নাই। যে স্ত্রী পতি-সেবায় রত হন্ তিনি স্বর্গে গমন করেন। যে স্ত্রী পতি জীবিত থাকিতে উপবাস করিয়া ব্রতাদি আচরণ করেন, সেই স্ত্রী স্বামীর আয়ুঃকাল হরণ ও স্বয়ং নরকে গমন করে। স্বামীর মৃত্যুর পর সাধ্বী-স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী স্ত্রীর পুত্র না হইলেও তিনি আবাল্য ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গে গমন করেন।

অপিচ অত্রিও বলিতেছেন:—

"জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যামন্ত্রসাধনং।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্রপতনানি ষট্।১৩৫
জীবদ্ভর্ত্তরি যা নারী উপোষ্য ব্রতচারিণী।
আয়ুষ্যং হরতে ভর্ত্তুঃ সানারী নরকংব্রজেৎ॥
তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ
শঙ্করস্যাপি বিষ্ণোর্ব্বা প্রয়াতি পরমং পদম্॥
১৩৬।১৩৭।১ম অঃ অত্রিসংহিতা।

জপ তপ তীর্থ যাত্রা সন্ন্যাস (বাণপ্রস্থ) মন্ত্রসাধন এবং কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট দেবতার আরাধনা—এই ৬টি কার্য্য করিলে স্ত্রী ও শূদ্র জাতিকে পাপগ্রস্ত হইতে হয়।

স্বামী জীবিত থাকিতে যদি কোন স্ত্রীলোক উপবাস করিয়া ব্রতচারিণী হয়, বা ব্রত করেন তাহা হইলে সেই স্ত্রী স্বামীর আয়ুঃকাল হরণ করে ও তিনি নরকে গমন করিরা থাকেন। তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতির পাদোদক কিম্বা শঙ্কর ও বিষ্ণুর পাদোদক পান করিলে পরম গতি লাভ করেন।

"স্ত্রীণাস্তু ভর্তৃঃশুশ্রূষাধর্ম্মোনান্যইহেষ্যতে।"

৯৩।২০ অঃ কূর্ম্মপুরাণ।

ইহসংসারে স্বামীর শুশ্রূষা বা সেবা ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের অপর কোনও ধর্ম্ম নাই। যদিচ কতকগুলি কুশাস্ত্র বা অনার্য্য-গ্রন্থ, উপপুরাণ প্রভৃতিতে সধবার ব্রত-উপবাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত নহে। সুতরাং ভ্রান্তি-বশে বা স্বার্থান্ধের প্রলোভনে পড়িয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। যদুক্তং—

"অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃসা পার্থ তামসী॥"

৩২।১৮ অঃ গীতা।

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি তমসাবৃত, তাহারা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, এবং সমস্তকেই বিপরীত জ্ঞান করিয়া থাকে। এরূপ বুদ্ধিকে তামসী-বুদ্ধি বলিয়া জানিবে।

স্বামী দরিদ্রই হউন্ বা ঋণগ্রস্তই হউন্ অথবা লোকান্তরে গমন করুন তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যে প্রকারে হউক, পত্নীকে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে নচেৎ তিনি ভর্ত্তার অযোগ্যা।

গৃহলক্ষ্মীগণ! আপনারা একটুকু ভাবিয়া দেখুন, এদিকে যে শাস্ত্রবিধি অনুসারে নরকের ব্যবস্থা হইতেছে! তাহাতেই বলি, স্বার্থান্ধ বা দুষ্ট পুরোহিত-গণের প্রলোভনে পড়িয়া দুকূল নষ্ট করিবেন না। বলা বাহুল্য, স্মৃতি বা ধর্ম্ম-সংহিতা বাধক হইলেও যাহাতে পতিভক্তি বা পতিসেবা করা হয়, এরূপ ব্রত উপবাস নিষেধ নহে।

এখন বোধ হয়, সকলে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছাচারকে কুলাচার বলিয়া মনে করা কোনরূপেই ধর্ম্মসঙ্গত হইতে পারে না।

দেবীগণের ভারত ভ্রমণ।

(শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

(সূচনা)

দেবতারা একবার স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা অলক্ষ্যে আসিয়াছিলেন—অতি সাবধানে, পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসের ন্যায়—পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের ক্রিয়া-কলাপ ও গতি-বিধি কাহারও কাহারও চক্ষে পড়িয়াছিল। সে সকল দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন বারতা ৺দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উদ্যোগে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তা সে অনেক-দিনের কথা। তখন ও এখনকার সময়ের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এ পরিবর্ত্তন স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই ত্রিভুবনে ঘটিয়াছে। স্বর্গে তখন কোন গোলযোগ ছিল না—দেব-দেবীরা নিশ্চিন্ত-ভাবেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে-ছিলেন। পুরাকালে, যখন দানবেরা দেবতাদিগের উপর উৎপাত করিত—তখন স্বর্গরাজ্যে কি গোলযোগই না উপস্থিত হইত।। কেহ বা ব্রহ্মার নিকট কোন একটা "বর" লাভ করিয়া—বিষ্ণু বা শিবের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইত; কেহ বা শিবের নিকট আস্কারা পাইয়া ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিত। তখন দেবতারা যেমন বিপন্ন হইতেন, দেবীদিগকেও ততোধিক উদ্বিগ্ন হইতে হইত। কারণ দেবতারা যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, যখন বুদ্ধিতে, কৌশলে, সম্মুখ-সমরে দানবদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না, তখন শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবীর শরণা-পন্ন হইতেন।

তা, দেবতারা যখন মর্ত্ত্যে আসিয়া-ছিলেন, তখন স্বর্গে এ সব আপদ-বালাই কিছুই ছিল না। কারণ, তখন ভারতে—কেবল ভারতে কেন—অর্দ্ধেক জগতে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার

রাজত্ব। জগতের যত বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ তখন এক রকম মিটিয়া গিয়াছে. ভারতেও তখন ঘোর বিপ্লব-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে—মহারাণীর "মহা-ঘোষণা-বাণী" ভারতে শান্তি ও প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছে—ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার প্রাণে কি এক আশার আলোক জ্বালিয়া দিয়াছে। কি এক অভিনব গতিতে, নব-জীবনের নব-প্রবাহ ছুটাইয়া দিয়াছে—অর্থকরী পাশ্চাত্য-শিক্ষা—প্রাচ্য-দীক্ষা ও নীতি, সংসার ও সমাজ, ধ্যান ও ধারণার আদর্শকে কি যেন কি এক অবিদিতপূর্ব্ব মোহ-প্রভাবে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে।

এমনই সময়ে দেবগণ মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছিলেন। তখন ভারতের ভাগ্য-পরিচয় স্থিররূপে সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই স্বর্গে দেবতারাও নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। কারণ পূরাকালে—অর্থাৎ অনৈতিহাসিক কালে, আর্য্য অনার্য্যের লড়াই—এই ভারতেই হইয়াছিল—দেব-দানবের দ্বন্দ্ব—এই ভারতেই হইয়াছিল—তারপর, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ—যাহাতে স্বয়ং নারায়ণ লিপ্ত ছিলেন—তাহাও এই ভারতেই তো হইয়াছিল। তারপর—ভারতের উত্তরভাগে স্থলপথে—এলেকজাণ্ডার আসিলেন—হূণ-দস্যুরা আসিল. পারস্য-বীর, গান্ধার-বীর, সৌর-সেনীয় বীর এঁরা একে একে এই ভারতের দিকেই আসিলেন—ভারতের জমী দখল করিলেন—ভারতের তক্তায় বসিলেন। পূর্ব্বে দেবতারা, দানব ও অসুরদিগকে দলন করিয়া—ভারতে সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা পীঠ ও উপপীঠে তীর্থ ও সিদ্ধস্থানে প্রস্তর বা মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে নিশ্চিন্তভাবে বিরাজ করিতেছিলেন। এইবার তাঁহাদের আসন টলিল—বিগ্রহ ভাঙ্গিল—মন্দির টুটিল।

স্থল পথে আগত এই অভ্যাগত অতি-থির দল ভারতে অবস্থান করিতে করিতে, আর এক শ্রেণীর অতিথির দৃষ্টি ভারতের উপর পড়িল। পূর্ব্বে গ্রীক্, সিথিয়, পারসীক্ মোগল পাঠান, প্রভৃতি দেশ জয়ের উদ্দেশে, এই ভারতের দিকে ধাবমান হইয়াছিলেন—আর এবার ওলন্দাজ

পর্ত্তুগীজ, রোমক, জর্ম্মাণ, ফরাশী ও ইংরাজজাতীয়, বিভিন্নশ্রেণীর ইউরোপীয়গণ বাণিজ্যার্থে ভারতে পদার্পণ করিতে লাগিলেন। সমগ্র জগতের দৃষ্টি এই ভাবে ভারতের উপর পড়িল। ভারত যেন কামধেনু—আর জগৎবাসী যেন তাহা দোহন করিতেছেন।

তাই বলিতেছিলাম, ভারতের শান্তিতে, জগতের স্বাস্থ্য খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করে। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব কালে ভারতের সে শান্তির সূত্রপাত হইয়াছিল। মহারাণীর মহাঘোষণার মধ্যে ভারতবাসীর ধর্ম্ম-কর্ম্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না—এই অভয় বাণী প্রচারিত হওয়ায়, হিন্দু পুরোহিত ও মুসলমান মোল্লা, যত না আশ্বস্ত হইয়াছিছিলেন—স্বর্গের দেবতারা ততোধিক আনন্দিত হইয়াছিলেন। কারণ, কিছু হউক আর নাই হউক—অন্ততপক্ষে কালাপাহাড়ের আতঙ্ক হইতে দেবতারা এতদিনে অব্যাহিত পাইলেন।

তাই দেবতারা তখন নিঃশঙ্ক-চিত্তে মর্ত্ত্যে আসিয়াছিলেন। কেবল আসেনি—কৈলাস ছাড়িয়া স্বয়ং ভোলানাথ। তাঁহার না আসিবার একটা বড় কারণ এই ছিল যে, শ্রীদুর্গা প্রতি বৎসর শরৎকালে অন্তত তিন দিনের জন্য বঙ্গে আসিতেন। তাঁহারই মুখে, তিনি মর্ত্ত্যের বার্ত্তা পাইতেন। আর যখন তিনি আফিমের মাত্রা চড়াইয়া আল্‌বোলা টানিতেন, তখন নন্দী মহাশয়, পদসেবা করিতে করিতে তাঁহাকে মর্ত্ত্যের নানা কথা শুনাইতেন।

দেবতারা স্বর্গে ফিরিয়া গিয়া যখন মর্ত্ত্যের গল্প-গুজব করিতে লাগিলেন, তখন দেবীরা সেই সকল কাহিনী শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা ও ভারত-ভ্রমণে তাঁহাদের অতিশয় কৌতূহল জন্মিল! একথা ক্রমশঃ ব্রহ্মার কর্ণগোচর হইল।

লোক-পিতামহ ব্রহ্মার অমতে তাঁহার সৃষ্টির ভিতর যাওয়া ভাল দেখায় কি? তাই দেবতারা এ বিষয়ে ব্রহ্মার অনুমতি চাহিলেন। ব্রহ্মা, দেবগণের এ প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন—"দেখ! ভায়ারা,

আমরা বেটা ছেলে—পথে ঘাটে যেখানে সেখানে যাইতে পারি। কিন্তু ঘরের বৌ-ঝীকে যেখানে সেখানে পাঠাইতে হইলে—একটু বিবেচনা করিতে হয়। রেল-গাড়ীতে তীর্থ-স্থানে মেলা ও ভিড়ের মধ্যে মেয়েদের যে কি দুর্গতি হয়, তাহা তো চক্ষে দেখিয়া আসিলে। তবে তোমরা যখন বলিতেছ—তখন এবিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য কৈলাসে, দু এক দিনের মধ্যে একটা মিটিং করা হউক। সেখানে মর্ত্ত্যের মেয়ে দাক্ষায়ণী দুর্গা আছেন। তিনি তো বৎসর বৎসর বাপের বাড়ী যান্। সুতরাং তাঁর মতামত এবিষয়ে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

তৎক্ষণাৎ নোটিশ জারি হইল। কৈলাসের পঞ্চানন-সম্পাদিত "গায়ক" পত্রে যথারীতি ঐ নোটিশ মুদ্রিত হইল। এই মর্ম্মে নোটিশ দেওয়া হইল যে, তৎপর-দিবস অপরাহ্নে কৈলাসে সরকারী ও বে-সরকারী সদস্যদিগের একটি সভা হইবে।

আমাদের চক্ষে, এই দেড় দিনের "নোটীশের"—অর্থ মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা। অর্থাৎ যদি শনিবার প্রাতে এই নোটিশ বাহির হয়, তাহা হইলে পরদিন অর্থাৎ রবিবার সন্ধ্যার সময় মিটিং হইবে—এই রূপই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু দেবতাদের ঘড়ির সময় আলাদা। আমাদের প্রায় পঞ্চাশ বৎসরে তাঁহাদের এক অহোরাত্র হয়। অতএব তাঁহাদের দেড়দিন আমাদের প্রায় পঁচাত্তর বৎসর।

সুতরাং, কৈলাসে যে মিটিং হইবার নোটিশ দেওয়া হইল, উহা যদিও দেবগণ স্বর্গে ফিরিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই হইয়াছিল, এবং ঐ প্রস্তাবিত মিটিং যে সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে—এতত্ত্বটা একটু ভাল করিয়া মনে রাখিতে হইবে। নচেৎ দেব দেবীর আচার ব্যবহার চাল-চলন—এসব কিছুই চট্ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। ক্রমশঃ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।

লেখকঃ—শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য শিরোমণি (কথক)।

বৈশাখ মাস; মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। তথাপি মার্ত্তণ্ডদেব এখনও প্রচণ্ড কিরণ-বর্ষণে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করিতেছেন। পশু-পক্ষী সকলেই নীরব। নিবিড় তরুচ্ছায়ায় অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্র গো-বৎসগণ শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছে। তারা আহারের জন্য এখন আর চেষ্টা করে না, তৃণময় শ্যামল প্রান্তরে আর বিচরণ করেনা। পক্ষীকুল আর বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসে না,। তারা ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ পত্রের মধ্যে আত্মগোপন করে বসে আছে, কেহ কেহ নিশ্চিন্ত মনে চঞ্চুপুটে গাত্র কণ্ডুয়ন করিতেছে। কেহ কেহ কলরব-বর্জ্জিত হয়ে নিশ্চেষ্টভাবে নিদ্রা যাইতেছে। কেবলমাত্র চাতককুল আকুল প্রাণে জলধরের স্বচ্ছ-জল-প্রত্যাশায় চীৎকার করিতেছে। মনুষ্য গৃহের মধ্যে বসিয়া কৃত্রিম বায়ু প্রবাহে শান্তিলাভের চেষ্টা করিতেছে, কেহ কেহ বা জল-সিঞ্চনে শৈত্যলাভের প্রত্যাশায় লালায়িত হইয়াছেন। কেহ কেহ বা কথঞ্চিৎ শান্তি লাভে পূর্ব্ব রাত্রের অনিদ্রা-নিবন্ধন অবসন্নশরীর হইয়া নিদ্রার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছে। গৃহস্থের গৃহ সকল নীরব, বালক বালিকা চীৎকার করে না, অতিথি গৃহস্থের গৃহত্যাগ করে না, পান্থ পান্থশালায় শ্রান্তি দূর করিতেছে। পথের বালুকা প্রস্তর সুতপ্ত হইয়াছে। অতি দীন-হীন ক্ষুধাতুর ভিক্ষুকও এই সময় নিদারুণ জঠরানল সহ্য করিয়াও অনাবৃতচরণে কেবল মাত্র মস্তকে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডাচ্ছাদনে গৃহে গৃহে ভ্রমণ কষ্টকর বিবেচনায় কাল প্রতীক্ষা করিতেছে। সমস্ত প্রাণীই যেন বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্বরের অখণ্ড শাসন সহ্য করিতে করিতে শান্তিকামনায় দিবাকরের অস্তাগমন কামনা করিতেছিল। যেমন খলস্বভাব কুরুরাজ দুর্য্যোধনের ছলনায় মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নিদারুণ বনবাস ক্লেশের উপর আবার তৎকর্ত্তৃক ঘোষযাত্রার অপমান, দ্রৌপদী হরণ জন্য মর্ম্ম-বেদনা, দুর্ব্বাসা-পারণরূপ নিদারুণ ব্যবহারে সন্তপ্ত হইয়া কেবলমাত্র অনাথাশ্রয় শ্রীমধুসূদন স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞাবসান কালের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন অথবা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র গোষ্ঠে গমন করিবার পর কৃষ্ণপ্রেমিকা গোপিকাগণ যেমন বিরহ-তাপ-পীড়িতা হইয়া গোষ্ঠ হইতে তাঁর প্রত্যাগমন সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন—আজ তেমনি জীবগণ

নিদাঘপীড়িত হইয়া সুখময়ী সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় ক্ষণগণনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা গগন-মণ্ডলে জলধর গর্জ্জন শ্রুত হইল, প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘসকল পশ্চিমাকাশ হইতে ক্রমেই উত্থিত হইতে হইতে সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বারিদ-বন্ধু সমীরণ অমনি অকৃত্রিম প্রণয়-বশে প্রিয় পয়োধরসম্মিলন জন্য ধাবিত হইল। প্রভঞ্জনের প্রচণ্ড শাসন পাদপ-বৃন্দ হস্ত ও মস্তক সঞ্চালনে যেন শিরোধার্য্য করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। ইহাতেও তিনি শরণাগতকে ক্ষমা না করিয়াই ঘন ঘন কর্কর বর্ষণে কোমলা পুষ্প-ফলান্বিতা বল্লরীকুলের সহিত বনস্পতিকে শ্রীভ্রষ্ট ও বিধ্বস্ত করিতেও ক্রটী করিলেন না। অকৃত্রিম প্রগাঢ় প্রণয়-সূত্রাবদ্ধ একবৃন্তসন্নিবিষ্ট দুটী কুসুম স্বরূপ নল-দময়ন্তী যেমন কলির কঠোর কৌশলে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, আজ তেমনই কঠিন হৃদয় সমীরণ কোন কোন প্রগাঢ়-প্রণয়-বন্ধনাবদ্ধা কোমলা লতিকাকে শ্রীভ্রষ্ট করে বৃক্ষচ্যুতা ও ধূলি-ধূসরিতা করিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ মেঘাবৃত হওয়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। চপলা চঞ্চলা হইয়া জলধর-বক্ষঃ ভেদ করতঃ গগনমণ্ডলে ছুটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভয়ঙ্কর বাত্যার সহিত মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে বায়ুর প্রভাব, ক্রমে কমিয়া আসিল। বৃষ্টি অধিক হইতে লাগিল। পয়ঃপ্রণালী দিয়া জল ছুটিতে লাগিল। সুগভীর ঘনঘোষ বৃষ্টির সহিত মিলিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। পৃথিবী ঘন ঘন কম্পিতা হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির আবার অভিনব পট পরিবর্ত্তিত হইল—বৃষ্টি কমিল। ভেক-কুল উল্লাসে চীৎকার করিতে লাগিল। পৃথিবী শীতল হইল—জীবগণ শান্তিলাভ করিল। সংসাররূপ রণাঙ্গনের মেঘরূপ পট পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সহস্রকিরণ অংশুমালী সপ্তাশ্বযোজিত রথে প্রকাশিত হইয়া এবার আস্তে আস্তে অস্তাচলে গমন করিতে লাগিলেন। সকল প্রাণী অসঙ্কুচিত-চিত্তে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে লাগিল। পক্ষীকুল উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল এবং কেহ নৃত্য কেহ বা বিভুগুণ গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোন কোন পক্ষী এই দুর্দ্দিনে কুলায়স্থিত শাবকগণের কুশল দর্শনে আনন্দে ভগবানকে যেন ধন্য-বাদ দিতে লাগিল। গাভীগণ বৎসসহ শ্যামল ক্ষেত্রে পুনর্বিবচরণ পূর্ব্বক হাম্বা রবে গৃহে গমনোন্মুখ হইল। মনুষ্যগণ নিজ নিজ গন্তব্যপথে গমন করিতে লাগিল।

সহরতলীতে জাহ্নবীতীরস্থ একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এখানে অনেক শ্রমজীবি

মূর্খ ও শিক্ষিত লোক আছেন, গ্রামটীর পথ ঘাট উত্তম। গ্রামে ধনী ও দরিদ্র বহুসংখ্যক লোকের বাস। দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকাও অনেক আছে। আবার গোলপাতার ঘর ও খোলার ঘরও বিস্তর আছে। চাকুরী উপলক্ষ্যে অনেক বিদেশীয় জনগণ এখানে বাস করিয়া থাকেন। প্রশস্ত রাজপথের উপর একটী ভদ্রলোকের বহির্ভবন, সম্মুখে ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান। সেই ভবনের সম্মুখবর্ত্তী রাজপথ দিয়া একটী গৈরিক বস্ত্রধারী জটা-জাল-সমাচ্ছন্ন মস্তক, গুম্ফ-শ্মশ্রু সমন্বিত বৃহৎ মুখমণ্ডল, অঙ্গুলীতে বৃহৎ নখ বিদ্যমান, গলদেশে বৃহৎ রুদ্রাক্ষমালা, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড, বাম হস্তে কমণ্ডলু লইয়া কাষ্ঠপাদুকা যুগল ধারণ করিয়া এক সন্ন্যাসী কোথায় যাইতেছেন—সঙ্গে বৃদ্ধ ও যুবক অনেকগুলি লোক তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী গঙ্গাভিমুখে চলিলেন, সঙ্গের সেই সকল লোকও চলিল, তন্মধ্যে একটী বৃদ্ধ তাঁর হস্ত হইতে কমণ্ডলুটী লইয়া চলিল, তিনি কেবল দণ্ড মাত্র হস্তে জাহ্নবীতীরে উপনীত হইলেন। দিব্য চাঁদনী-ঘাট, গঙ্গায় সেই মাত্র ভাটা পড়িয়াছে। গঙ্গার অম্বুরাশি নীরবে ধীরে ধীরে সাগরাভিমুখে চলিয়াছে। কুলী ও মজুরসকল কর্ম্ম সমাপন করিয়া কেহ গাত্র ধৌত, কেহ হস্ত মুখ প্রক্ষালন, কেহ বা স্নান করিতেছে। সন্ন্যাসী একটী লোকের হস্তে তাঁর যষ্টি গাছটী প্রদান করিয়া বাঁধা ঘাটের সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া, পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী-জল স্পর্শ পূর্ব্বক হস্তপদ প্রক্ষালন করণানন্তর ভক্তিভরে ভাগীরথীকে প্রণাম করিয়া সোপানে চরণ লম্বিত করিয়া বসিলেন। মনে হইল, সন্ধ্যা-বন্দনার সময় উপস্থিত না হওয়ায় ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁর সঙ্গী-গণও সেই সুধৌত সোপান পূর্ণ করিয়া বামে ও পশ্চাতে বসিলেন। তাহাতে সেই সৌম্যমূর্ত্তি সাধু, নক্ষত্রবেষ্টিত শশধরের ন্যায় শোভান্বিত হইলেন। অতঃপর তিনি সেই ত্রিতাপহারিণী জাহ্নবীর দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরণী ভাসিয়া যাইতেছে, কোন কোন তরণী আবদ্ধ হইয়া স্থিরভাবে অবস্থিত। তদুপরিস্থ নাবিকগণ কেহ গান গাহিতেছে, কেহ বা রন্ধন করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্পীয় পোতসকল এ দিক ও দিক করিয়া গঙ্গা-জল ভেদ করতঃ ছুটাছুটী করিতেছে।

পূর্ব্বের ঝড়ে বহু বৃক্ষশাখা ভগ্ন হইয়া বায়ুপ্রবাহে তাহার ছিন্ন পত্রাদি গঙ্গাজলে পতিত হওয়ায় জাহ্নবীর জল-প্রবাহে বহু পত্র ও পল্লবাদি দর্শন করিয়া পূর্ব্ব ঝটিকার প্রভাব স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে। সেই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নির্জ্জীব ও সজীব পত্র ও শাখা প্রশাখার

মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পক্ষী ভাসিয়া আসিতেছিল। প্রায় সকলেরই দৃষ্টি তাহার দিকে পতিত হইল। পক্ষীটী গঙ্গা-তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে নিকটে আসিয়া স্রোতোবেগে আসিতে আসিতে তীরে আবদ্ধ একখানি তরণীর গাত্রে আসিয়া লাগিল। পক্ষীটী এক এক বার আপনি নড়িতেছে আর মৃত্যুর নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে থাকিয়া থাকিয়া ঊর্দ্ধদিকে মুখব্যাদান করিতেছে। সন্ন্যাসী তাকে তদবস্থায় দেখিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে বলিলেন—পক্ষীটী জলে পড়িয়াছে, ওকে উদ্ধার কর। আসন্ন-মৃত্যু পক্ষীর প্রাণ রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম লাভ কর। বলিবামাত্র সকলেই তাকে জল হইতে তুলিবার জন্য ব্যগ্রচিত্ত হইলেন, এমন সময়ে করুণস্বরে সেই পক্ষী বলিল—হে সাধো! আমায় জল হইতে উদ্ধার করিবেন না, তাহা হইলে আমি আর ক্ষণকালও বাঁচিব না। আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির এরূপ ইচ্ছা কখনও অসম্ভব হইতে পারে না। কারণ, নদী কখনও জলপানার্থ জল ধারণ করে না—বৃক্ষগণ কখন নিজে ফল ভোগের জন্য ফল প্রসব করে না—জলধর কখনও নিজের জন্য জল বর্ষণ করে না, পরোপকারই সন্তের বিভূতি। আমার জীবনরক্ষার জন্য আপনার মত যোগীজনের কৃতসৌহার্দ্য স্বভাবতই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমার আর বাঁচিবার উপায় নাই।

সন্ন্যাসী কহিলেন পক্ষি! তোমার জীবনের আশা নাই, ইহা কিরূপে স্থির করিয়াছ—শীঘ্র বল, আমরা শুনিবার জন্য বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

চাতক। প্রভো! ক্ষুদ্র পক্ষীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমার জীবনলাভের জন্য আপনার চেষ্টা বৃথা হইবে। জীবন লাভে কার না ইচ্ছা হয়? দীর্ঘকাল বাঁচিতে কে সাধ না করে, কিন্তু আমি বাঁচিব না, স্থির জানিবেন। কারণ, পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, শরীর অবসন্ন, শক্তিহীন, চরণ ও পক্ষ ভগ্ন হইয়াছে। যদি এসকলও কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে কিম্বা ভগবৎকৃপায় লাভ করি, তাহা হইলেও কিছুতেই বাঁচিব না—আমার সর্ব্ব শরীর দারুণ পিপাসার পীড়নে অবশ হইয়াছে।

সন্ন্যাসী। পক্ষী—তুমি জলের উপর থাকিয়াও এত পিপাসার যন্ত্রণা অনুভব করিতেছ কেন? যদি পক্ষ ও চরণ ভগ্ন হইয়া থাকে, শবীব অবশ হয়, তাহলে বাঁচিবার আশা নাই সত্য, কিন্তু ঊর্দ্ধদিকে পুনঃ পুনঃ মুখব্যাদান করিতেছ কেন? যতক্ষণ চক্ষুর শক্তি আছে, ততক্ষণ অশেষ পাপহারী জাহ্নবী-নীর পান করিয়া পিপাসা নিবারণ কর। মৃত্যুকালে তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে মরিতে পারিবে। মৃত্যু-যন্ত্রণা

নিবারণের উপায় নাই। শরীরীগণ এই মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে কেহই পরিত্রাণ পায় না। তুমি মৃত্যু ও পিপাসা দুটী যন্ত্রণায় নিতান্ত আকুল হইয়া বুদ্ধিহীন ও মোহ প্রাপ্ত হইয়াছ, জলপান দ্বারা একটী যন্ত্রণা নিবারণ হলেও অনেক শান্তিলাভ করিবে। এবং পরকালেও মোক্ষ লাভ করিবে।

চাতক কহিল,—"হে তাপসেন্দ্র! আমরা চাতকপক্ষী, স্বজাতি ধর্ম্মানুসারে চিরদিনই নবজলধরের স্বচ্ছ সলিল ঊর্দ্ধমুখে পান করিয়া থাকি। জাতি-ধর্ম্মানুসারে আমরা কখনও অধোমুখে জলপান করি না এবং করিবও না। যদি করিতাম, তাহা হইলে এতক্ষণে অনেক সুস্থ হইতে পারিতাম এবং এই জন্যই জল হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত আপনাকে নিষেধও করিয়াছিলাম। আপনি জল হইতে তুলিলেও আমার পিপাসার শান্তি হইবে না, অধিকন্তু জলে থাকিলে যতটা পরিমাণে জল শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া যতক্ষণ বাঁচাইয়া রাখে—সেই ভাল, ইহা ভাবিয়াই মরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি! আরও এক কথা—৮০ লক্ষ জন্ম গ্রহণের যদি এক জন্ম কমিয়া যায়, তাহাও আমার পক্ষে মন্দ হইবে না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"চাতক! পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবী-বক্ষে অবস্থান করিয়া মুখের নিকট এমন মোক্ষদায়ক অমৃতোপম জল বিদ্যমানে তাহা গ্রহণ না করিয়া বরং মরিবে এ সঙ্কল্প কি উত্তম বিবেচনা করিতেছ? শাস্ত্রে আছে—জীব যদি একগণ্ডুষ গঙ্গাজল পান করে, তবে সে অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন করে। তুমি পক্ষীজাতি, যতটুকু পরিমাণে পান করিবে, তাহাতেই তোমার ইহ-পরকালে মঙ্গললাভ করিতে পারিবে। কেন উপেক্ষা করিতেছ, বৃথা সময় নস্ট না করিয়া সত্বর জলপান কর।"

চাতক কহিল—"তপোধন! গঙ্গা বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা জানি, হরি-পদ-রজোবিহারিণী বলিয়া পঞ্চানন বন্দিত-মানসে সর্ব্বদা নিজ শিরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মা সংযতমানসে নিজ কমণ্ডলুতে রক্ষা করিয়াছেন। মহাত্মা কপিলের অভিশাপে ভস্মীভূত সগরবংশ উদ্ধারের জন্য সূর্য্যকুল-সম্ভূত মহারাজ ভগীরথ গঙ্গাকে অবনীতে আনয়ন করতঃ ব্রহ্মশাপমোচন পূর্ব্বক সগরবংশের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তাহাও জানি, কিন্তু আমার পূর্ব্ব পিতৃ-পিতামহগণ কখনও অধোমুখে জলপান করেন নাই, আজ যদি আমি সেই কার্য্য করি, তাহা হইলে আমায় স্বধর্ম্ম ত্যাগের জন্য অনন্ত নরকে গমন করিতে হইবে। অধিকন্তু মৃত্যুর পর পিতৃলোকে গমন করিলে, তাঁহারা আমায় কুলাঙ্গার বলিয়া ঘৃণা করিবেন এবং আমায় স্থান দান করি-

বেন না। জগতে স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া মোক্ষলাভ অপেক্ষা স্বধর্ম্মে মরণেও মঙ্গল—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আমরা নগণ্য ক্ষুদ্র পক্ষী-জাতি, আপনাকে আর কি উপদেশ দিব? নীতিশাস্ত্রবেত্তারা পিপীলিকার নিকট হইতেও পরিশ্রম ও সঞ্চয় শিক্ষা করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমাদের স্বধর্ম্ম পালনও তেমনি শ্লাঘ্য। যাহা হউক, আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য আমার শত শত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। লক্ষযোনি ভ্রমণের পর মনুষ্য-জন্ম লাভ হয়, আবার মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান। ইঁহারাই ধর্ম্ম-প্রচারক এবং শাস্ত্রের যথার্থ মর্য্যাদা ইঁহারাই জানেন। ব্রাহ্মণগণ যোগবলে অসাধ্য সাধন করেছেন। যখন দৈত্যগণ দিবাভাগে সমুদ্রে লুকাইয়া থাকিয়া, রাত্রিকালে ঋষিদিগকে ভক্ষণ করতঃ জগৎ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, দেবগণ তখন ভীত হইয়া মহামুনি অগস্ত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎকালে অগস্ত্য গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিয়া জগৎ রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ সেই দেবপূজ্য মুনি-গণের বংশধর, যাঁহাদের ধমনীতে সেই পবিত্র যোগ-বিশুদ্ধ রক্ত প্রবহমান, সেই ব্রাহ্মণগণ নির্ব্বিচারে একখণ্ড লুঙ্গী পরিধান করিয়া সমাজে স্থান পাইতেছে, ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? অথবা পূর্ব্বকালের বল্কলের পরিবর্ত্তে যুগধর্ম্মে লুঙ্গী কি সেই স্থল অধিকার করিল? আপনার মত স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ যদি সমাজের এই সকল কলঙ্ক দূরীভূত করিতে যত্নবান না হন, তাহা হইলে এ মনুষ্য সমাজ হইতে ধর্ম্ম ও শাস্ত্র কোথায় স্থান পাইবে? অণ্ডজ পক্ষীজাতির মধ্যে যেরূপ দৃঢ়তা আছে, সে গুলি আলোচনার দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া, অন্ধের চক্ষুদান স্বরূপ অধঃপতিত সমাজ পুনরুদ্ধার করুন, ইহাই প্রার্থনা। যুগধর্ম্মে আপনাদেরও মনোযোগ অল্প হওয়ায় সমাজের এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। এই পর্য্যন্ত বলিয়া চাতক প্রাণত্যাগ করিল।

ক্রমশঃ

আনন্দ-লহরী।

(নারদ ভক্তিসূত্র হইতে অনূদিত)

(শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম-এ,)

পূজার্চ্চনে অনুরাগ, কহে ব্যাস মহাভাগ
এই হয় ভক্তির লক্ষণ।
প্রেমভক্তি না হইলে, মোক্ষপদ নাহি মিলে
তাই বলি কর দেবার্চ্চন॥
ভগবৎ-কথামৃত, পান করে অবিরত
অনুরাগ শ্রবণ কীর্ত্তনে।
নামে রতি হয় যার, ভক্তির সঞ্চার তার
কহে মুনি গার্গ্য তপোধনে॥
ভক্তির লক্ষণ পুন, শাণ্ডিল্য কহেন শুন
অবহিত-চিত্তে একবার।
আত্মরতি যেই জন, বিষয়-বিরত মন
তার জেন ভক্তির সঞ্চার॥
দেবর্ষি নারদ বাণী, ভক্তিরাজ্যে ধন্য মানি
করিলেন ভক্তির লক্ষণ।

করি নারায়ণ সেবা, ভক্তিভরে করে যেবা
কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ॥
শ্রীহরির অদর্শনে, বিরহ-ব্যাকুল প্রাণে
সেবা ঝুরে নয়নের নীরে।
প্রেমের সঞ্চার তার, সংশয় নাহিক আর
শ্রীগোবিন্দে পায় সে অচিরে॥
জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তার, দেখ ব্রজ-গোপীকার
কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী প্রায়।
কুললাজ ভয় মান, বিসর্জ্জিয়ে অভিমান
নিশীথে নিবিড় বনে ধায়॥
কোথা কৃষ্ণ ভগবান, দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ
তব অদর্শনে প্রাণে মরি।
"হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" বলি, ভ্রমিতেছে বনস্থলী
বিরহ-বিধুরা গোপনারী॥

শ্রীকৃষ্ণই ভগবান, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য জ্ঞান
যদি না থাকিত গোপীকার,
নিষ্কলঙ্ক গোপী প্রেমে কলঙ্ক আরোপ ক্রমে
হইত গো দোষ ব্যভিচার॥
পবিত্র গোপীর প্রেম, নির্ম্মল বিশুদ্ধ হেম
নাহি তাহে ব্যভিচার দোষ।
আত্মসুখ নাহি গণে, সদা গোপী ভাবে মনে
কিসে হবে কৃষ্ণের সন্তোষ॥

(২)

অবিচ্ছিন্ন সেই প্রেম পূর্ণ অনুরাগ।
উপজে যাহার হৃদে সেই মহাভাগ॥
অমৃত স্বরূপ ভক্তি ভক্তবৃন্দে কয়।
ভক্তি উপজিলে হয় বাসনার ক্ষয়॥
এ হেন অমৃত যেবা করে আস্বাদন।
অবহেলে করে সেই বৈকুণ্ঠে গমন॥
ভক্তির মহিমা বল কেমনে প্রকাশি।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ভক্তি মুক্তি তার দাসী॥
শান্তিলাভ সিদ্ধিলাভ অমরতা আর।
সুলভ এ সব, হলে ভক্তির সঞ্চার॥
শোক তাপ দ্বেষ আর বিষয় বাসনা।
ভক্তির সঞ্চার হ'লে কিছুই থাকে না॥
না থাকে ভোগেতে রতি, না থাকে উদ্যম।
মনের আঁধার কাটে ঘুচে যায় ভ্রম॥
বিষ্ণুর পরমপদ লভে যেই জন।
বিঘ্ননাশ নহে তার বিচিত্র কখন॥
ভক্তিরসাপ্লুত হিয়া হ'য়েছে যাহার।
এ বিশ্ব সংসার মাঝে কি ভাবনা তার?
বিলাস বিভ্রমে সদা বিরহিত-কাম।
কভু মত্ত, কভু স্তব্ধ সদা আত্মারাম॥
কভু হাসে, কভু কাঁদে, কভু নাচে গায়।
কভু বা নির্ব্বাক হ'য়ে একদৃষ্টে চায়॥
ভকতি ইহার নাম, অহৈতুকী প্রেম।
মলা মাটি পরিশূন্য অপার্থিব হেম॥

(৩)

প্রেমের পিয়াসা যার, প্রেমোদয় হয় তার
প্রেমের স্বরূপ আহা কে করিবে বর্ণনা।
প্রেমিকের দশা হায়! অভাগা মূকের প্রায়
অন্তরেতে ওঠে ভাব মুখে কিন্তু ফোটে না॥
কোন রস আস্বাদন, করে যদি মূক জন
অম্ল কি মধুর তিক্ত বলিবে সে কেমনে।
প্রেমিক ভরিয়ে প্রাণ, প্রেমামৃত করে পান
অপূর্ব্ব প্রেমের কথা রাখে কিন্তু গোপনে॥
প্রেম যদি উথলয়, নাহি মানে লাজ ভয়
প্রেমের প্রবাহ ছোটে অন্তর হ'তে বাহিরে।

ভাবের প্রকাশ তাই, কখন দেখিতে পাই
প্রেমোন্মাদে মত্ত কোন প্রেমিকের শরীরে॥
কহেন নারদ ঋষি, প্রেমানন্দে সদা ভাসি
প্রেমার লক্ষণ—মাত্র অনুভবরূপিনী।
সত্ত্ব রজ তমাতীত, সর্ব্বকাম-বিরহিত
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর সর্ব্বানন্দদায়িনী॥
প্রতিক্ষণে বর্দ্ধমান, বিচ্ছেদের অবসান
জানিবে প্রেমের ধারা প্রবাহিত অবিরাম।
যেবা প্রেম অধিকারী, তার হৃদে জাগে হরি
জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে যেবা হইয়াছে নিষ্কাম॥
প্রেমের যে মহাজন, প্রেম তার মূলধন
প্রেমের হাটেতে প্রেম করে বেচাকেনা।
প্রেম মূর্ত্তি দরশন, প্রেম ধ্যান সংকীর্ত্তন
শ্রবণ প্রেমের গাথা, লভে প্রেম যে জনা॥

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এ।

"ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু বাড়ী আছেন? ডাক্তার বাবু।"

ভিতর হইতে কোনই প্রত্যুত্তর আসিল না। ইন্দুর বাটী হইতে ফিরিতে বিন্দুবাসিনীর বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সকলে একটু অধিক রাত্রে শয়ন করিয়াছিল। কাহারো ঘুম ভাঙ্গিল না। তাহার উপর এখনও বৃষ্টি পড়িতেছে। বৃষ্টির শব্দে বাহিরের আর কোন শব্দই ভিতরে পৌছিতেছে না। দেউড়িতে যে চাকরেরা শুইত, তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল কি না, বলা যায় না। একে শীতকাল তাহার উপর বৃষ্টি পড়িতেছে। এতদ্ অবস্থায় বড়লোকের বাড়ীর চাকর যে আবার সুনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া লেপের বাহিরে আসিবে, ইহা আশা করাই অন্যায়। যদিও বা ঘুম ভাঙ্গে এবং নেহাৎ যদি সে প্রভুর কর্ত্তব্যপরায়ণ ভৃত্য হয় তাহা হইলে হয়ত "কোন শালে হায়রে" বলিয়া এ পাশ ও পাশ করিয়া আবার নাক ডাকিতে

আরম্ভ করিবে। এইরূপ মধুর এবং প্রিয় সম্ভাষণই অভ্যাগত ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট।

"ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু বাড়ী আছেন? ডাক্তার বাবু!"

বিন্দুবাসিণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ী করিয়া উঠিয়া ডাকিলেন, "সুরেশ, সুরেশ, ও সুরেশ।" জননীর আহ্বানে সুরেশেরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, বলিল, "কেন মা, কি হ'য়েচে?" ইতিমধ্যে উভয়েই ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "শিগ্গীর বাইরে যা, কে তোকে ডাকচে।"

একটী ছাতা মাথায় দিয়া সুরেশ তাড়াতাড়ী করিয়া বারবাড়ীর ফটকের দিকে গেল। ফটকের পাশেই দ্বারবান রামটহল থাকিত। সেও প্রভুর পদশব্দে তাড়াতাড়ী ঘরের বাহিরে আসিল। সে যেন এতই সজাগ ছিল যে প্রভুর পদশব্দেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সত্যি কথা বলিতে গেলে তাহার ঘুম অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়াছিল। 'কে আর উঠে' এই ভাবিয়া আরামে শুইয়াছিল। প্রভুর পদশব্দে সজাগ-দ্বারবান নামে অভিহিত হইবার জন্য তাড়াতাড়ী ঘরের বাহিরে আসিয়া প্রভুর আজ্ঞায় ফটক খুলিয়া দিল।

মলিনবস্ত্র-পরিহিত একটী প্রায় ষাট্ বৎসরের বৃদ্ধ নগ্নদেহে ও খালি মাথায় জলে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছিল এবং শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সুরেশকে দেখিয়াই তাহার পা'দুটী জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"ডাক্তার বাবু, শিগ্গীর একবার চলুন; দিদিমণি বোধ হয় আর বাঁচে না।"

"কে দিদিমণি, কোথায় যেতে হবে? কতদূর?"

"এই টালার পোলটা পেরুলেই আমাদের বাড়ী। বৃষ্টিতে কোথাও একটা গাড়ী পেলুম না। নরেন ডাক্তারের বাড়ী ও আরও অনেক ডাক্তারের বাড়ী গিছ্‌লুম। কেউই ওপোর থেকে নাম্‌লেন না। বড় বিপদ বাবু। পায়ে পড়ি আপনি চলুন।" সুরেশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিন্দুবাসিনীও বহির্ব্বাটীতে আসিয়া-

ছিলেন। বৃদ্ধের কাতরোক্তি শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"যাবে বই কি বাবা, নিশ্চয়ই যাবে।" সুরেশকে বলিলেন,—"ওকে দালানে নিয়ে এসে বসা। আর তুই শিগ্‌গীর করে গরম কাপড় জামা পরে নে।"

মাতাপুত্রে বৃদ্ধকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ আশা করিয়াছিল, অন্যান্য ডাক্তারদের বাড়ীর মত এখান হইতেও তাহাকে নিরাশ-প্রাণে ফিরিয়া যাইতে হইবে কিন্তু বিপরীত ভাব দেখিয়া পুনঃ পুন ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে লাগিল।

একখানি শুক্‌নো কাপড় ও একখানি ওড়না লইয়া বিন্দুবাসিনী সুরেশের সহিত বহির্বাটীতে আসিয়া বৃদ্ধকে বলিলেন,—"ভিজে কাপড়টা ছেড়ে ফেল বাবা। এই কাপড়খানা পরে এখানা গায়ে দাও।"

বিন্দুবাসিনীর পা জড়াইয়া বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল,—"আশীর্ব্বাদ কর মা, দিদিমণি যেন আমার ভাল হয়।" কৃতজ্ঞতার তপ্ত অশ্রুজলে বিন্দুবাসিনীর পদদ্বয় সিক্ত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"কেন ভাল হবে না বাবা, দিদিমণি তোমার নিশ্চয়ই ভাল হবে। আমি বলছি—ভাল হবে।"

রামটহল বিন্দুবাসিনীর কথামত দুইটা ছাতা লইয়া প্রস্তুত ছিল, একটী নিজের জন্য ও অপর একটা বৃদ্ধের জন্য। সুরেশ নিজে একটী বর্ষাতি পরিয়া ও একটা ছাতা লইয়া উহাদের সহিত হাঁটিয়াই চলিয়া গেল। সরকারের নিকট খবর পাঠাইবার কথা বিন্দুবাসিনীর একবার মনে হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বিলম্ব হইয়া যাইবে বলিয়া সে কথা আর উত্থাপন করেন নাই। পদ-ব্রজেই পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

একটী পঞ্চদশ বৎসরের বালিকা অচেতন অবস্থায় শয্যায় শুইয়া আছে। কাছে বসিয়া তাহার মাতা তাহাকে বাতাস করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে ক্রন্দন-বিজ-ড়িত স্বরে "অশ্রু অশ্রু" বলিয়া ডাকিতে-ছেন। বাড়ীটাতে আর জনপ্রাণীও নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিধবাটী আবার ডাকিলেন, "অশ্রু! মা! কথা ক'। অমন ধারা কচ্ছিস্ কেন মা?" মাতার করুণ আর্ত্তনাদ ঘরের ভিতর প্রতি-

ধ্বনিত হইয়া বাহিবে বৃষ্টিধারার সহিত মিলাইয়া গেল। কথা কহিবে কে? কথার উত্তর দিবে কে? বিধবা জননীর একমাত্র কন্যা অশ্রু চক্ষু বুজিয়া নিশ্চল ও নিস্তব্ধভাবে অসাড় হইয়া শয্যায় পড়িয়া আছে।

রতন, কক্ষের ভিতর প্রবেশ কবিয়া বলিল, "মা, ডাক্তার বাবু এসেচেন।" কিরণময়ী রতনের দিকে চাহিয়া উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, "কৈ? কোথায়?" রতন সুরেশকে কক্ষের ভিতর লইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া কিরণময়ী বলিয়া উঠিলেন, "বাবা আমার অশ্রুকে বাঁচিয়ে দাও।"

সুরেশ আসিবার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অশ্রুর জ্ঞান হইল। চক্ষু মেলিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল,—মা! কিরণময়ী পাশেই বসিয়াছিলেন, বলিলেন—এই যে মা, আমি এখানেই আছি।" সম্মুখে সুরেশকে দেখিয়া অশ্রু প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিল না। একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী বলিলেন—"বাবা, কোন ভয়ের কারণ নেই ত?" সুরেশ বলিল,—"না, কোন ভয় নেই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই ঔষধটা খাওয়াবেন আর দেখবেন যেন সেবা সুশ্রুষার কোন ত্রুটী না হয়।"

যতদুর সাধ্য আমি ক'রবো বাবা। আর তো আমার কেউ নেই যে দেখবে। রতন না থাকলে আমি নিজেই আজ তোমার কাছে যেতুম।

সুরেশ চলিয়া আসিলে অশ্রু বলিল. ডাক্তার বাবু এসেছিলেন মা? কিরণময়ী বলিলেন, "হ্যাঁ।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, এই ঝড় জলে কি ক'রে এলেন মা? "কিরণময়ী ও কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "এখন ভাল আছিস্ মা?"

হ্যাঁ মা, আমি ভাল আছি। রতনদাকে আমার কাছে বসিয়ে তুমি একটু শোওগে যাও। কিরণময়ী চুপ করিয়া রহিলেন। শুইতে যাইবার কোন লক্ষণই দেখাইলেন না। খানিকক্ষণ পরে অশ্রু বলিল, বৃষ্টিটা ছেড়ে গেলে ডাক্তার বাবুকে যেতে দিলে

না কেন মা? আর কিছু না বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

ঔষধ পত্রাদির ব্যবস্থা করিয়া বাটী ফিরিতে সুরেশের বিলম্ব হইয়া গেল। সমস্ত পথটা সহায়হীনা বিধবা কিরণময়ীকে প্রভুভক্ত ভৃত্য রতনকে এবং নিজের রোগিণী অশ্রুকে ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি চার ঘটিকার সময়ে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দ থাকা সত্ত্বেও অশ্রুর সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর অনুক্ষণ তাহার কাণে বাজিতেছিল এবং তাহার কাতর দৃষ্টি যেন সুরেশের মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল।

ভিতর বাড়ীতে আসিয়া দেখিল বিন্দুবাসিনী ঘরের সামনে দালানে বসিয়া আছেন। সুরেশ বলিল, রাত দুটো থেকে এমনি করে বসে আছ মা? তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না দেখচি। পুত্রের আগমনে বিন্দুবাসিনীর অনেকটা চিন্তা দূর হইয়া গেল। এতক্ষণ তিনি একবার বারবাড়ীর ফটকের দিকে আর একবার জানালা খুলিয়া পথের দিকে পুত্রের প্রতীক্ষায় চাহিতেছিলেন। শীতের রাত্রে বৃষ্টিতে পুত্রকে বাহিরে পাঠাইয়া বিন্দুবাসিনী শুইতে পারেন নাই। ভগবানের নিকট পুত্রের শুভাগমন এবং বৃদ্ধের দিদিমণির আরোগ্য প্রার্থনা করিতেছিলেন।

সুরেশকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দেরী হ'ল কেন সুরো? কেমন দেখে এলি?"

বোধ হয় টাইফয়েড হ'য়েচে মা। কাল একবার ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'ত্তে হবে।

বিন্দুবাসিনীর একটী পুত্র এই রোগে মারা গিয়াছিল। সেইজন্য টাইফয়েডের নাম শুনিয়া তিনি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—টাইফয়েট হ'য়েচে? একটু অন্যমনস্কভাবে সুরেশ বলিল,—"হ্যাঁ মা, মেয়েটীর বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। ঐ একটী বৃদ্ধ চাকর আছে মাত্র"

কে দেখচে শুনচে তাহ'লে?

ওর মা-ই প্রাণপণে সেবা সুশ্রূষা ক'চ্চেন।

কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া ভিজিটের টাকা

কয়টী মায়ের হাতে দিয়া সুরেশ বলিল, "এই নাও মা রেখে দাও।" বিন্দুবাসিনী অবাক্ হইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"টাকা! কিসের টাকা?"

আসবার সময়ে রতন আমায় হাতে দিলে যে। আমি নেব না বল্লুম, কিছুতেই ছাড়লে না।

টাকা কয়টা সুরেশের হাতে ফেরৎ দিয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন,—"কালই এ টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসবি। আর ওষুধ পত্তর যা দরকার হবে, নিজের ডাক্তারখানা থেকে পাঠিয়ে দিস।"

(৪)

প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। মাথার কাছে বসিয়া রতন অশ্রুকে বাতাস করিতেছিল। কিরণময়ী পাশে বসিয়া অশ্রুর জন্য ফল ছাড়াইতে ছিলেন। তখন বেলা চারিটা।

রতন বলিল, "না, মা, কিছুতেই ডাক্তার বাবুর মা শুনলেন না, বল্লেন, ও কাপড়টা আর ওড়নাটা তোমাকেই দিলুম রতন; তুমি পোরো।, বড় ভাল মানুষ তিনি মা। দেখলেই ভক্তি ক'তে ইচ্ছে করে।

কিরণময়ী বলিলেন, "তা তাঁর ছেলেকে দিয়েই বোঝা যায় রতন। শীতকালের রাত্রিতে, তার ওপোর অমন বৃষ্টিতে কে আর আসে বল। অমন ছেলে—তাই এসেছিল।"

"কলকাতার ডাক্তারদের কথা আর বলো না মা। গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে পরিষ্কার আকাশ থাকলেও কেউ আসে না তো শীতকালে বৃষ্টির রাত্রিতে।

"সবাই কি আর সমান মানুষ হয় রতন। ছেলের রোগীর বাড়ীতে কে কবে আবার অমনি ফল পাঠিয়ে দেয়?"

"শুধু তাই নয় মা। এতদিন যা কিছু ওষুধ পত্তর আনুছি, ডাক্তার বাবু তার দাম নেন না।" অশ্রু চক্ষু মেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"অন্য ডাক্তারখানা থেকে নিয়ে এস না কেন রতন দা?"

তাই বা কৈ আনতে দেন দিদিমণি? অন্য কোথাও থেকে আনতে মা-ঠাকরুণ বারণ করে দিয়েছেন।

কিরণময়ীর হৃদয় এই অজ্ঞাত অপরিচিত নারীর আশাতীত ব্যবহারে কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। অশ্রুরও যে না হইয়াছিল তাহা নহে। তবু সে বলিল—"এমনি করে কেন মা তাঁরা আমাদিগকে ঋণী কচ্ছেন?"

কিরণময়ী বলিলেন—"কি করব মা, বারণ করতে ত পারিনি, সে দিন সুরেশকে এই কথা একবার বলায়, সে কত দুঃখ করতে লাগল।"

এমন সময়ে সুরেশ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার ব্যবহারে এবং তাহার মাতার করুণ-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া কিরণময়ীর মাতৃ-হৃদয় সুরেশের প্রতি সন্তান-বাৎসল্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল। অশ্রুর পার্শ্বে বসিয়া সুরেশ বলিল—"আজ জ্বর খুব বেড়েছিল কি?" কিরণময়ী বলিলেন—"না, বাবা, ১০৩এর বেশী হয় নাই। তবে আজ আর বেশী কথা কইতে পাচ্ছে না। একটুতেই যেন হাঁপিয়ে পড়ছে।" সুরেশ ধীরে ধীরে অশ্রুর বাঁ-হাতটী তুলিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সে ঘরে প্রবেশ করিবার পর অশ্রু চক্ষু মুদিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল। সে সুরেশকে অনেক কথা বলিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল, কিন্তু এখন কিছুই বলিতে পারিল না।

যাইবার সময়ে সুরেশ বলিয়া গেল যে, কাল সে বিন্দুবাসিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। তিনি এখানে আসিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

সন্ধ্যার পর অশ্রু বলিল, "ডাক্তার বাবুর মা কেন আসচেন মা?" কিরণময়ীর পরিবর্তে রতন বলিল, "আসাটাই ত স্বাভাবিক দিদিমণি।"

"আমরা যে বড্ড গরীব রতনদা? কোথায় তাকে ব'সতে দেবে? তুমি যে ব'লছিলে ওঁরা খুব বড়লোক।"

রতন বলিল, "গরীব জেনেই তো আসবেন দিদিমণি।"

কিরণময়ী কোনই কথা কহিলেন না। তিনি তখন অন্য অনেক বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। সুরেশদের সহিত ঘনিষ্ঠতা যতই দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছিল

তাঁহার চিন্তার ধারাও ততই বাড়িয়া উঠিতেছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর অশ্রু বলিল, "আমি সেরে উঠলে ভিজিটের টাকাগুলো একসঙ্গে ওঁদের বাড়ী পাঠিয়ে দিও মা।"

কিরণময়ী অন্য দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "তাই দেব।"

দরিদ্র হইলেও ডাক্তারকে ভিজিট দিবার মত সংস্থান তাঁহার ছিল। কিন্তু সুরেশ প্রথম দিন রাত্রের টাকা কটা সমস্তই ফিরাইয়া দিয়াছিল এবং আর কখনও লইবে না বলিয়াছিল।

অশ্রুর পীড়া ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সুরেশের উপর কিরণময়ীর অগাধ বিশ্বাস জন্মাইয়াছিল। নবীন চিকিৎসক হইলেও সেই তাঁহার কন্যাকে ভাল কবিবে, ঔষধে না হউক যত্নে এবং আন্তরিকতাতেও করিবে, এ বিশ্বাস তাঁহার দৃঢ় হইয়াছিল। একদিন তিনি স্পষ্টই সুরেশকে বলিয়াছিলেন, "তোমারই হাতে অশ্রুকে ছেড়ে দিয়েছি বাবা; বাঁচে তোমার হাতেই বাঁচবে আর যদি মরে তোমার হাতেই মরবে।"

সুরেশও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যেমন করিয়া হউক অশ্রুকে সে ভাল করিবেই। এ দায়িত্ব সে হাসিমুখেই বহন করিয়াছিল এবং একদিন না একদিন সে সফলকাম হইবে ইহাও তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কেন যে অশ্রুকে ভাল করিবার জন্য তাহার এত আগ্রহ, এত জিদ, তাহা সে মাঝে মাঝে ভাবিত কিন্তু ইহার কোনই কারণ নির্ণয় করিতে পারিত না। কিরণময়ীর ভরসা, বিন্দুবাসিনীর উৎসাহ, অশ্রুর বিশ্বাস এবং নিজের প্রতিজ্ঞা—এই কয়টিই তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছিল এবং অক্লান্ত ও অবিশ্রান্ত ভাবে অশ্রুকে চিকিৎসা করিতে তাহাকে সাহায্য করিত।

অশ্রুরও সুরেশের উপর অত্যন্ত বিশ্বাস জন্মাইয়া গিয়াছিল। তাহারও কেমন একটা মনের ধারণা হইয়াছিল যে সেই তাহাকে রোগ শয্যা হইতে টানিয়া তুলিতে পারিবে। প্রত্যহ নিয়মমত দুই বার করিয়া আনাগোনা করায় সুরেশ

এবং অশ্রুর ভিতর যা একটু অপরিচিত ভাবের একটা ব্যবধান ছিল তাহাও কাটিয়া গেল। ডাক্তারী করা হইয়া গেলেও সুরেশ অশ্রুর পাশে দুই এক ঘণ্টা করিয়া বসিয়া থাকিত। উভয়ে কত গল্প করিত, কত বিষয়ের আলোচনা করিত। সুরেশেরও তেমন উঠিতে ইচ্ছা করিত না। অশ্রুরও ছাড়িয়া দিতে প্রাণ চাহিত না। একদিন সে স্পষ্টই কিরণময়ীকে বলিয়াছিল, "ছাখ মা, ডাক্তার বাবু আমার গায়ে হাত দিলে কিংবা পাশে ব'সলে আমার অসুখ যেন অনেক সেরে যাচ্ছে ব'লে মনে হয়। আমি তাহ'লে নিশ্চয়ই ভাল হব মা—না?" কিরণময়ী বলিয়াছিলেন, "ভাল হবে বৈকী মা। সুরেশই তোমায় ভাল ক'রবে।"

অশ্রু চিরকালই সপ্রতিভ এবং সরল। সুরেশেরও স্বভাব এইরূপ। সেইজন্যই বোধ হয় উভয়ের মধ্যে এত শীঘ্র এত ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। উপরন্তু সুরেশের আপনার মত যত্ন তো আছেই। মানুষ মাত্রেই স্নেহের দাস। একটু যত্ন, একটু আদর, একটু স্নেহ, এইটুকুর জন্যে সকলেই লালায়িত হয়। যেখানে ইহার তৃপ্তি সেইখানেই আপনা হইতে অনুগত হইয়া পড়িতে হয়। তাই সুরেশ এবং তাহার মাতার নিকট অশ্রু ও কিরণময়ী এত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন॥ ক্রমশঃ।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব।)

জ্যোতিষ শাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত;— সিদ্ধান্ত, সংহিতা ও হোরা।

সিদ্ধান্তসংহিতাহোরারূপস্কন্ধত্রয়াত্মকং।
বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষুর্জ্যোতিঃশাস্ত্রমকল্মষং।

জ্যোতিঃশাস্ত্রমনেকভেদবিষয়ং স্কন্ধত্রয়াধিষ্ঠিতং,
তৎকার্ৎস্ন্যোপনয়স্য নাম মুনিভিঃ সঙ্কীর্ত্ত্যতে সংহিতা।
স্কন্ধেঽস্মিন্ গণিতেন যা গ্রহগতিস্তন্ত্রাভিধানস্ত্বসৌ;
হোরান্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়শ্চ কথিতঃ স্কন্ধস্তৃতীয়োঽপরঃ॥

সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ বলিতে সাধারণতঃ

গ্রহাদির গণনোপযোগী শাস্ত্রকে বুঝাইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রও আবার তিন অংশে সম্পূর্ণ ;—সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও করণ। যাহাতে ভূসৃষ্টি হইতে ইষ্টদিন পর্য্যন্ত দিন দ্বারা গ্রহগণের গণনার নিয়মাদি বিশদীকৃত, তাহাকে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ বলিয়া অভিহিত করা হয়। যাহাতে যুগের আদি হইতে ইষ্টদিন যাবৎ গণিতের দ্বারা গ্রহদিগের গতি নিরূপিত হইয়া থাকে, তাহার নাম তন্ত্র এবং যে শাস্ত্র সাহায্যে অভিলষিত শকাদি হইতে ইষ্টদিন পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের নিয়মানুসারে দিনবৃন্দ দ্বারা গ্রহ-গণনা সংসাধিত হয়, তাহাকে 'করণ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। যে শাস্ত্রে ত্রিস্কন্ধ জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় বিষয় বিবৃত আছে, মুনিগণ তাহাকেই 'সংহিতা' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে শাস্ত্রের দ্বারা জাতকাদির অভীষ্ট সময়ের গ্রহ সংস্থানাদি গণনা করিয়া ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালের শুভাশুভ নির্ণীত হইয়া থাকে, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'হোরা' বলিয়া থাকেন। অহোরাত্র শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের এবং পরবর্ত্তী ত্র বর্ণের লোপ করিয়া এই 'হোরা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। হোরা শব্দের অপর একটী নাম —কাল।

জ্যোতিষ সংহিতার প্রবর্ত্তক অষ্টাদশ মুনি। এই অষ্টাদশ মুনির নাম ;—ব্রহ্মা, সূর্য্য, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, লোমশ, পৌলিশ, ভৃগু, যবন, বৃহস্পতি এবং শৌনক। এই অষ্টাদশ জন ঋষির মধ্যে যে যবন নাম উক্ত হইয়াছে ইনি ম্লেচ্ছ নহেন; যবনাখ্য একজন ঋষি। ইহা ছাড়া ম্লেচ্ছ যবনাচার্য্যও একজন জ্যোতিষ সংহিতা রচয়িতা। সংস্কৃত ভাষাতে ইঁহার যবন-জাতক এবং তাজিক নামক গ্রন্থ পরিদৃষ্ট হয়। আমরা বর্ষপ্রবেশ গণনার স্থলে ইঁহার গ্রন্থ হইতে সঞ্জাত 'হায়ন-রত্ন' ও 'নীলকণ্ঠী তাজক' নামক দুইখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ ব্যবহার করিয়া থাকি। রোমক নামক একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন,—ব্রহ্মা যে জ্যোতিষ শাস্ত্র সূর্য্যদেবকে অধ্যয়ন করান, সূর্য্য তাহা যবনকে উপদেশ দিয়া-

ছিলেন। এই যবনই তাজিক জ্যোতিষের রচয়িতা। খত্থুত্ত, রোমক, হিল্লাজ, দিষণ ও দুর্ম্মখাচার্য্য—ইঁহারা যবন বলিয়া কথিত।

অনেকেরই ধারণা যে, ব্রাহ্মণজাতি জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়নাদি করিলে প্রত্যবায়ভাগী হয়েন। ইহা গ্রহাচার্য্যদেরই জ্ঞেয়। তাঁহাদিগের এই ভ্রম ধারণা অপনোদনের জন্য কয়েকটী বিষয় এস্থলে একান্ত উল্লেখ-যোগ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—জ্যোতিষ ষড়ঙ্গ বেদের একটী প্রধান অঙ্গ। যদি জ্যোতিষ বেদাঙ্গ হইল, তাহা হইলে এই বেদে কাহার অধিকার? এই বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিলে ব্রাহ্মণ প্রত্যবায়ী হইবেন না পূজ্য হইবেন? এ সম্বন্ধে কয়েকটী শাস্ত্রোক্তি এই;—

> গ্রন্থতশ্চার্থতশ্চৈব কৃৎস্নং জানাত্যসৌ দ্বিজঃ
> অগ্রভুক্ স ভবেচ্ছ্রাদ্ধে পূজিতঃ পঙ্‌ক্তিপাবনঃ॥

> অধ্যেতব্যং ব্রাহ্মণৈরেব তস্মাজ্জ্যোতিঃশাস্ত্রং পুণ্যমেতদ্রহস্যং।
> এতদ্বুদ্ধা সম্যগাপ্নোতি যস্মাদর্থং ধর্ম্মং মোক্ষমগ্র্যং যশশ্চ॥

> তস্মাদ্দ্বিজৈরধ্যয়নীয়মেবং, পুণ্যং রহস্যং পরমঞ্চ তত্ত্বং।
> যো জ্যোতিষং বেত্তি নরঃ স সম্যগ্, ধর্ম্মার্থমোক্ষান্ লভতে যশশ্চ।

> এবম্বিধঞ্চ শ্রুতিনেত্রশাস্ত্রং স্বরূপতস্তু খলু দর্শনং বৈ।
> নিহন্ত্যশেষং কলুষং জনানাং ষড়্‌ বর্গজং ধর্ম্মসুখাস্পদং স্যাৎ॥

> দশদিনকৃতপাপং হন্তি সিদ্ধান্তবেত্তা,
> ত্রিদিনজনিতদোষং তন্ত্রবিদ্দৃষ্ট এব।
> করণভগণবেত্তা হন্ত্যহোরাত্রদোষং,
> জনয়তি বহুদোষং হন্ত নক্ষত্রসূচী॥

> তিথ্যুৎপত্তিং ন জানন্তি গ্রহাণাং নৈব সাধনং,
> পরবাক্যেন বর্ত্তন্তে তে বৈ নক্ষত্রসূচকাঃ॥

যে দ্বিজ ব্যাখ্যা সহিত সমগ্র জ্যোতিষ শাস্ত্র অবগত হয়েন, তিনি সকল ব্যক্তির নিকট পূজিত, শ্রাদ্ধাগ্রভুক্ এবং পঙ্‌ক্তি পাবন হইয়া থাকেন॥ এই পুণ্য জ্যোতিষ রহস্য ব্রাহ্মণদিগেরই অধ্যেতব্য; যেহেতু ইহা অর্থকর, যশস্কর, ধর্ম্ম এবং মোক্ষকর॥ সিদ্ধান্তবিদ ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ব্বিৎকে দর্শন করিলে দশ দিন কৃত পাপ রাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। তন্ত্রবিৎ জ্যোতির্ব্বিদ তিন দিবস-কৃত পাপনাশে সমর্থ, এবং করণভগণবিদ জ্যোতির্ব্বিৎ একদিন সঞ্চিত পাপ নাশ করেন। কিন্তু, যিনি তিথ্যাদির উৎপত্তি ও গ্রহসাধনাদি না জানিয়া পরের কথাতে প্রবর্ত্তিত হয়েন এরূপ নক্ষত্র-সূচক জ্যোতির্ব্বিৎকে দেখিলে বহুপাপ শরীরে সঞ্জাত হইয়া থাকে।

জ্যোতির্ব্বিৎ ব্রাহ্মণের ইত্যাদি বহুবিধ স্তুতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে বলুন দেখি—জ্যোতিষে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কাহার অধিকার?

তবে নক্ষত্র-সূচী জ্যোতির্ব্বিদ্ না হইয়া ব্রাহ্মণমাত্রেই যাহাতে ত্রিকালদর্শী সিদ্ধান্তবিদ্ হইতে পারেন; তৎপক্ষে একান্ত প্রযত্নপর হওয়া উচিত। এই সিদ্ধান্তবিদ্ হইতে হইলে শুধু গ্রন্থ-সমুদ্র মন্থন করিলে চলিবে না, শুধু গুরুর শরণাগত থাকিয়া নিশ্চিন্ত হইলেও কিছু হইবে না, শুধু দর্ভগর্ভাগ্র বুদ্ধির সাহায্যে অঙ্কপাতও ফলদায়ক হইবে না। চাই অন্তর্দ্দৃষ্টি, চাই সাধনা। গ্রন্থ গুরু আদি বাহ্য উপাদানের সহিত কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভক্তি-তদ্‌গত-চিত্তে গহরূপী জনার্দ্দনকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাঁহার কৃপা ব্যতীত সিদ্ধান্তবিদ্ হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। আমাদের ত্রিকালদর্শী মুনি ঋষিরা কোন বলে বলীয়ান্ হইয়া অতীত অনাগত বর্ত্তমান ত্রিকালের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিলেন? তাই বলিতেছি, যিনি যতদূর সেই কালরূপী পরমাত্মার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তিনি ততদূরই কালাত্মক গ্রহোপগ্রহাদির উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। অতএব সকলেরই এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

এক্ষণে গ্রহাদির বিষয়ে ফলিত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিতে উদযুক্ত হইয়াছি। নানাবিধ ফলিত জ্যোতির্গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া ইহাতে ক্রমশঃ সঙ্কলিত হইবে। এই সকল প্রবন্ধ পাঠে জ্যোতির্জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিগণ যদি সামান্যও উপকৃত হয়েন, তাহা হইলে শ্রম সার্থক বলিয়া বিবেচনা করিব।

ক্রমশঃ।

শিবপুর কাহিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(শিবপুর "সাহিত্য সংসদে"র ইতিহাস শাখা হইতে শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত।)

২—শিবপুরের পরিচয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে, শিবপুরকে "বেতোড়" অপেক্ষা আধুনিক প্রসিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বেতোড়ের অংশ-বিশেষকেই যে শিবপুর বলা হইত—এমন প্রমাণও দলিল-পত্রে পাওয়া গিয়াছে। তা ছাড়া আরও একটা বড় প্রমাণ আছে। সে প্রমাণ অনুসারে ইহাই বুঝা যায় যে সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের "মঙ্গল"—কাব্য মধ্যে বেতোড় যেমন ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইয়াছিল; ঠিক সেই সময়ে না হইলেও উহার কিছু কাল পরেই "শিবপুর"—বঙ্গের সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান ভৌগলিক গ্রন্থে সমাজ-প্রসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, বাংলায় একখানি উপাদেয় ও প্রামাণিক ভূগোল-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহার নাম "দিগ্বিজয় প্রকাশ"। গ্রন্থখানি সংস্কৃতে লেখা। এই ভূগোলে, তদানীন্তন কালের প্রসিদ্ধ স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত আছে। এই গ্রন্থে শিবপুর সম্বন্ধে যে পরিচয় আছে তাহা এইরূপ—"শিবপুরং সমারভ্য বালুকোহি দ্বিজাস্পদঃ"।

অর্থাৎ গঙ্গাতীরে শিবপুর হইতে বালী পর্য্যন্ত গ্রাম গুলিতে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণের বাস।

ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেও, শিবপুর গ্রামের অস্তিত্ব ছিল এবং ব্রাহ্মণের বসবাসের জন্য উহা এইরূপ ভৌগলিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। "মোট কথা, প্রাচীন "বেতোড়ে" ছিল বণিক প্রাধান্য, আর প্রাচীন শিবপুরে ছিল—ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য। মধ্যে কেবল রাজনৈতিক

প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিবার জন্য "থানা-মাকুয়া'য় (থানামেগোরা) থানা দুর্গের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সুতরাং, "বেতোড় "থানা-মেগে" এবং "শিবপুর"—একই জনপদের বিভিন্ন অংশ। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রকারেও বিভিন্ন ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যখন যে নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে—অন্য গ্রামগুলিও তখন সেই নামের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। বর্ত্তমানে শিবপুরে প্রসিদ্ধি প্রতিপত্তি বেশী; সুতরাং বেতোড, বাকশড়া, শিবপুর, বাঁদা শিবপুর, শালিমার, বড় থানা-মাকুয়া (কোম্পানীর বাগান)—এ সমস্ত গ্রাম গুলিই—ঐ এক শিবপুর গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

ইংরাজের আমলে যখন, রাজস্ব-বিভাগ সর্ব্বপ্রথমে স্থাপিত হয়, তখন বঙ্গদেশের প্রাপ্ত গ্রামগুলির জমী জমার স্বত্ব-সাব্যস্তের একটা সারণী (Table) তৈয়ারী হইয়াছিল। পরে অর্থাৎ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রেভিনিউ বোর্ডের কর্ত্তা "কেরী সাহেব" ঐ তালিকা রীতিমতভাবে, লিপিবদ্ধ করেন ও তাঁহার নথীর সহিত মিলাইয়া দেখিবার জন্য আসল দলিল বা সনন্দপত্রগুলি সংগ্রহ করেন। তাঁহার বিবরণীতে, বর্ত্তমান শিবপুরের স্থান বিশেষকে "বেতোড" "থানা-মাখুয়া" ও "শিবপুর" বলিয়া বর্ণিত আছে। Land Recc ds—Sudder Revenue Board of Fort William. Compiled by E. Caery 1838)

এই সকল মূল সনন্দপত্রগুলি অবলম্বনে যে সকল ভূসম্পত্তির আদান-প্রদান হইয়াছিল এবং এপর্য্যন্তও হইতেছে তাহাতেও ঐ পূর্ব্বকার পাঠ লিখনের পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দু একখানা দলিলের দু এক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;—

(১)—"কস্য মোকররী মৌরশী খারিজ দাখিল পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে হাওড়ার অন্তর্গত শিবপুরের সামিল বোরো পরগণায় বেতোড় গ্রামে" ইত্যাদি। (ক)

(ক)—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রক্ষিত প্রাচীন দলিল হইতে।

(২)—কস্য খারিজ দাখিলী মৌরশী মোকররীপট্টকপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা হুগলীর অন্তর্গত—শিবপুরের সামিল আর্শা পরগণায় থানা-মাকুয়া গ্রামে…… ইত্যাদি! (খ)।

(৩)—"প্রাণাধিক রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় তোমার ভ্রাতা বর্গেষু লিখিতং শ্রীদুর্গারাম শর্ম্মণঃ অস্য ব্রহ্মত্র সনন্দপত্রমিদং কার্যঞ্চ আগে আমার নামীয় পরগণে পাইকান্, কিস্মত শিবপুর গ্রামে ৺অমর সিংহের বসত বাটী দান পত্র—ইত্যাদি (তারিখ ৬ই বৈশাখ ১১৮২ সাল।) (গ)

"বেতোড়" ও "থানা-মেকুয়ার" বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডে, আলোচিত হইয়াছে, ঐ গ্রামদ্বয়ের সহিত শিবপুরের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে, ইহাও বলা হইয়াছে। এক্ষণে বর্ত্তমান শিবপুরের প্রসিদ্ধি প্রতিপত্তির কথাই হইতেছে। তাহা, উপরি উদ্ধৃত শেষ দলিলের তারিখ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ১১৮২ সাল অর্থাৎ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে 'শিবপুর, নিজের নামেই আত্ম-পরিচয় দিয়াছে এবং "বেতোড়" ও "থানা মেকুয়া" উহারই সামিল হইয়া গিয়াছে।

অন্যান্য ঘটনা হইতে ইহাও প্রমাণ হয় যে, ঐ সময় হইতেই বর্ত্তমান বৃহত্তর শিবপুরের প্রসার প্রতিপত্তি ঘটিয়াছে। এক শ্রেণীর ইংরাজ লেখক বলেন যে—"Towards the end of the last century 1780–90 a small Island was formed north of Shallimar to which the name of Seebpore was given" (see quotation in C. N. Banerjee—Howrah past and present) অথাৎ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে, শালিমারের উত্তরে, গঙ্গা-তীরের চরভূমিতে যে দ্বীপ হইয়াছে—সেই দ্বীপই শিবপুর গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এই হিসাবে, শিবপুর গ্রামকে আধুনিক

(খ)—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রক্ষিত প্রাচীন দলিল হইতে।

(গ)—শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের রক্ষিত তাহার বাস্তু ভিটার দলিল হইতে।

বলিয়া অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু "দিগ্বিজয় প্রকাশের" উদ্ধৃত বচন হইতে এবং উল্লিখিত দলিলের বিবরণ হইতে আমরা ইহা অবাধে বলিতে পারি যে, ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও শিবপুরের অস্তিত্ব ছিল। ভারত গভর্ণমেণ্টের সঙ্কলিত "Imperial Gazatteer of India"নামক গেজেটীয়ার গ্রন্থে ৪৫৮ খৃষ্টাব্দে—আবার একথা লিখিত আছে যে—"The place has grown since the beginning of the present (nineteenth) century from a small village into a flourishing town inhabited chiefly by Government & other office clerks &c." এ সরকারী বিবরণী, শিবপুরকে একেবারেই ভুঁইফোঁড় করে নাই—তবে বলিয়াছে যে, ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে শিবপুর গণ্ড গ্রাম হইতে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে—এ সহরে সরকারী আফিসের কেরাণী কুলের আশ্রয় স্থল।

আমাদের সংগৃহীত প্রমাণ মতে, আরও কিছু কাল পূর্ব্বে যে শিবপুর আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহা লিখিত হইয়াছে। আর কেরাণী গৌরবে, শিবপুরের তদানীন্তন গৌরব বৃদ্ধি পায় নাই। ব্রাহ্মণ প্রাধান্যই—তখন শিবপুরকে নানা দেশে প্রসিদ্ধ পরিচিত করিয়া দিয়াছিল। তৎকালে শিবপুরের পণ্ডিত কৃতকর্ম্মা ভক্ত এবং জ্ঞানী গুরু, অধ্যাপক ও পুরোহিত—বঙ্গের নানা স্থানে নানা ভাবে সম্মানিত হইতেন—রাজা মহারাজার নিকট অধ্যাপনা ও অন্নদানের জন্য ব্রহ্মোত্তর ভূমির সনন্দ পাইতেন। কি করিয়া সেই প্রতিপত্তি প্রসিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত হইবে।

(ক্রমশঃ।)

সত্যপ্রতিষ্ঠা।

(শ্রীবিজয় কৃষ্ণ পদাম্বুজজীবী।)

আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সারা বিশ্বটা ব্রহ্মের যজ্ঞাগার, ঋষিরা একথা বার বার বলে গিয়েছেন। একটা ধূলিকণার সঞ্চালন থেকে সমগ্র বিশ্বের বিবর্ত্তন পর্য্যন্ত সবটাই যেন এ যজ্ঞকর্ম্মে ব্যস্ত। চেতনে অচেতনে যেখানে যা কিছু দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সবটাই একটা কর্ম্মের প্রবাহ—একটা বিরামহীন চাঞ্চল্য—অবিচ্ছিন্ন গতি। আর এ সকল চাঞ্চল্য গতি ব্রহ্মে আহুতি অর্পণ মাত্র। এ যজ্ঞ অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনন্তকাল ধরে চলে আস্‌ছে, আর অনন্তকাল চল্‌তে থাক্‌বে। ব্রহ্ম—অনন্ত, তার যজ্ঞও আদি-অন্তশূন্য। ব্রহ্মই এ যজ্ঞের হোতা, ব্রহ্মই হবিঃ, ব্রহ্মই অগ্নি এবং ব্রহ্মই অর্পণ। ঋষিরা এ কথা বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন এবং ভগবান নিজে অবতীর্ণ হয়ে এই কথাই বলেছেন।

এ যজ্ঞের কর্ত্তা কর্ম্ম করণ সম্প্রদান অধিকরণ ও সম্বোধন সকল বিভক্তিই ব্রহ্ম। তিনি আপনাকে নানা ভাবে নানা রূপে নানা নামে বিভক্ত করেছেন। এই রকম বিভক্ত করে নানা রকমের ভাবের হোমকুণ্ড জ্বালিয়ে দিয়েছেন মাত্র; আর সকল হোমকুণ্ডে একই অগ্নি সংস্থাপন করেছেন। সে অগ্নির নাম ভাব, কিন্তু তার শিখার নাম অভাব।

সত্য স্বরূপ ব্রহ্মের ইচ্ছারূপ তপস্যা বা তাপ, অভাবের শিখার আকার নিয়ে ধূ ধূ জ্বল্‌ছে। ধূলাতে ধূলিতে, জীবে জীবে, গ্রহে গ্রহে, ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে, শুধু অভাবের শিখা—অভাবের জ্বালা। ধূ ধূ ধূ তার বাহ্যমূর্ত্তি—হু হু হু তার তপ্তশ্বাস! ভাবের অগ্নি—অভাবের শিখা!

ভাবরূপা অগ্নিকে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম বলে যারা চিনে নিচ্ছে, তাদের যজ্ঞে পূর্ণাহুতি নিষ্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। তারা সত্য স্বরূপ ব্রহ্মে লিপ্ত হয়ে যজ্ঞের ভোক্তা হচ্ছে—যজ্ঞেশ্বর হচ্ছে। আর যারা তা

পারছে না, তাদের অভাবের শিখা আকাশ ফুঁড়ে শূন্য ছাপিয়ে দিক্ দিগন্তে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার কচ্ছে। ভাব না দেখলেই অ-ভাব।

ঋষির কথা গুরুবাক্য করে যারা অগ্নিকে চিন্‌ছে, চিন্‌তে সুরু করেছে, তাদের শিখা সংযত হয়ে আস্‌ছে—তাদের শিখা শুধু আলোক দীপ্তি বিকাশ ও জীবন প্রতিদান কচ্ছে তাদের উঠ্‌ছে, অমৃত। আর সেই অমৃতের উৎস পেয়ে অমর হয়ে আনন্দে নির্ব্বাণের দিকে চলেছে—তারা হল সুর। যারা চিন্‌ছে না—চিন্‌তে চেষ্টা কচ্ছে না—শুধু শিখাকে শিখা বলে, অভাব বলে বুঝেছে—সত্যের ইচ্ছারূপ তপস্যা বলে যারা ধরতে পাচ্ছে না তাদের শিখা শূন্যে শূন্যে ধক্ ধক্ জ্বল্‌ছে;—শূন্যের পর শূন্য জ্বালিয়ে দিচ্ছে—শূন্য বিস্তার কচ্ছে—অসংযত অদমিত উচ্ছৃঙ্খল অভাবের শিখায় তারা দিক্ দিগন্ত দগ্ধ কচ্ছে—আপনাদের পোড়াচ্ছে;—তাদের উঠ্‌ছে গরল, পাচ্ছে গরল, আর দিকে দিকে শুধু গরল উদ্গীর্ণ কচ্ছে;—তারা পাচ্ছে শুধু দহন, শুধু জ্বালা, শুধু ধূম;—তাদের নাম অসুর।

একজনরা, পেতে চায় পূর্ণ, পাচ্ছে পূর্ণতা, অন্যেও পেতে চায় পূর্ণতা, পাচ্ছে শূন্য। একজনরা আপনাদের পূর্ণ করতে চায়, পূর্ণের মুখ চেয়ে—তারা পূর্ণের পূর্ণত্বই দেখে। তারা পূর্ণের পূর্ণ অধিকার দেবার জন্য আপনাদের অধিকার পর্য্যন্ত আপনাদের খালি করে পূর্ণে যুক্ত করে দেয়—পূর্ণের অধিকার বিস্তৃত করে দেয়—আপনাদের অধিকার বজায় রেখে পূর্ণের অধিকার সসীম করে না,—অসীমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আপন আপন সত্তা হারিয়ে ফেলে, আপনার আসনে পূর্ণকে বসিয়ে দেয়। আর একজনরাও আপনাদের পূর্ণ করতে চায়, আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করে—অভাবের দৃষ্টি বাড়িয়ে অভাব আবিষ্কার করে—শূন্যের পর শূন্য রাজ্য তৈরি করে। আর এই রকমে শূন্য বিস্তার করে পূর্ণ হতে গিয়ে শূন্যেই তাদের পূর্ণের মরীচিকা তৈরি হয়—শূন্যেই লয় পায়। আপনাকে তারা পূর্ণের আসনে বসাতে চায়।

বলিছি—ভাবই এ যজ্ঞের অগ্নি—শিখা তার অভাব। সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম খেলার ইচ্ছায়, অনন্ত অনন্ত ব্যাপ্তি নিয়ে এক-দিকে আপনার পূর্ণতা দেখাচ্ছেন—আর এক দিকে দেখাচ্ছেন—শূন্য শূন্য শূন্য! যারা ভাব দেখে, তারা অভাব দেখে না :—যারা অভাব দেখে, তারা ভাব দেখতে পায় না। যারা অভাবদর্শী, তাদের শুধু জ্বালা—শিক্ষা—আর রব—ত্রাহি ত্রাহি।

রব ত্রাহি ত্রাহি—কিন্তু তাবে কে? ত্রাণকর্ত্তা কোথায়? কে আছ তারক—কে আছ পরিত্রাতা। শুধু কুণ্ডলীকৃত অগ্নিধূম! আঁধার অন্তহীন—নিষ্ফলতা প্রান্তহীন!—ধূ ধূ শূন্যের বিস্তার! দৃষ্টি ধূমাচ্ছন্ন—শ্বাস ধূমরুদ্ধ কণ্ঠ ধূমময়।

ত্রাতার সাক্ষাৎ নেই। শুধু প্রতিধ্বনি—তুমি আছ?—প্রতিধ্বনি—"আছ।" "কই তুমি?" প্রতিধ্বনি "তুমি"। "কোথা?" প্রতিধ্বনি "হোথা!" "কৈ?" 'ওই।"

সাংঘাতিক যজ্ঞ! যজ্ঞ ঠিক হচ্ছে যজ্ঞেশ্বরও ঠিক আছেন, অভাবদর্শী লোকে ভাবছে গৃহদাহ দহনশালা হেথা-থেকে পালা পালা! যাবে কোথায়? তা' জানি না! মূল না দেখ্‌লে এই রকম হয়।

ঋষিরা বল্লেন—বৎস! এত পালা-পালি ছুটোছুটি করচ কেন? যজ্ঞেশ্বরকে দেখ—সেইদিকে চেয়ে থাক—চোখে ধোঁয়া লাগবে না। এটা গৃহদাহ নয়—যজ্ঞাগার।

"কই—কই যজ্ঞেশ্বর?"—ওই তোমা-তেই—তোমার অন্তরে, আমাতেই—আমার অন্তরে, এ যজ্ঞতেই যজ্ঞের অন্তরে—এই শিখাতেই শিখার অন্তরে—ওই জ্বালা-তেই জ্বালার অন্তরে।

জ্বালার অন্তরে শান্তি? স্বর্গে ও মর্ত্তের মাঝে সত্যি সিঁড়ি আছে?

ঋষি গম্ভীরমধুর স্বরে বল্লেন—"বৎস! এখান থেকে দুটার একটা নিতেই হবে—হয় অভাব—নয় ভাব। কিছু নেবে না—তা এ যজ্ঞে হবে না।

"আমরা ভাব চাই।"

"তবে ভাব দেখ!

"কই ভাব?" "দেখ ভাব"

"কই তিনি?"—"দেখ তিনি।" তিনি

বলে দেখ তাঁকে পাবে—তিনি নয় বলে দেখ—তাকে পাবে না। যেমন দেখবে তেমনি পাবে। যতটা তিনি নয় বলে মনে হবে—ততটা তিনি নয় হবেন, ততটা তাকে হারাবে।

যেটা যা—তাকে তাই বল্লেই সত্য বলা হয়—আর তাই না বল্লে মিথ্যা বলা হয়। তাঁকে যতটা ছেটে বাদ দাও—ততটাই শূন্য হয়—শিখা হয়—জ্বালা হয়।

"কিন্তু এটা যে এই রকমই দেখতে পাচ্চি।"

হাঁ এই রকম—মাত্র এই রকমটা নয়। তাকে এই রকম দেখ্চ—"তিনি এই রকম" এই বলে দেখ, তা' হ'লেই পূর্ণ সত্য বলা হবে—মূলে শূন্য মুছে পূর্ণ বসাও—সব পূর্ণ হবে। মূলে শূন্য বসিয়ে—অভাব বসিয়ে, দেখ বলে, তাই তার অভাব দেখ্‌ছ। অভাবটা ভাবেরই প্রকার বিশেষ। অভাবকে ভাব বলে কেন—জগৎকে তিনি বলে দেখ—ঠিক চেনা হবে—ঠিক দেখা হবে—সত্য দেখা হবে। এই সত্য দেখাকে সত্যপ্রতিষ্ঠা বলে।

আমি তাইতো উদাসী।

(শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ নিয়োগী।)

ঝড়ের বাতাস এলো সে একদিনে,
জীবন-ঢাকা ঘুরিয়ে দিলে গুণে,
সুপ্তি আমার এলো জাগরণে,
থাম্‌লো আবিল হাসি,—
আমি তাইতো উদাসী।

চূর্ণ যত আকাশভেদী চূড়া,
হাহাকারের ভাণ্ড হ'লো ধরা,
বিশ্ব ভেঙ্গে আমায় দিলে সারা,
বাজিয়ে মিলন বাঁশী,—
আমি তাইতো উদাসী।

বল্‌লে সে সুর কাণে কাণে এসে,
'থাকিস্‌নে আর অমন ধারা দেশে,
পচা পাঁকে ঠেল্‌বে অবশেষে,
আয়, অসীম আলোয় মিশি'।
আমি তাইতো উদাসী।

বসন ভূষণ উড়িয়ে দিলে হেসে,
ব্যর্থতা সে বুঝিয়ে দিলে বসে,
ত্যাগের মন্ত্রে দিক্ষা দিলে এসে,
ছায়ায় ছায়ায় আসি,—
আমি তাইতো উদাসী।

দুঃখের পথে নিরবতার মাঝে,
পিযূষ-ক্ষরা ঝর্ণা ধারা রাজে,
দেখ্‌বো তারে চল্‌বো তারি কাজে,
জড়িয়ে বিমল হাসি,—
আমি তাইতো উদাসী।

আভিজাত্য গৌরব ও নমঃশূদ্র সমস্যা। *

(রায় শ্রীললিতমোহন শর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ।)

সুদূর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শেষ সীমান্তে অবস্থান নিবন্ধন আমরা বর্ত্তমান বাঙ্গালার সামাজিক আভ্যন্তরীন অবস্থা সবিশেষ অবগত না হইলেও মাঝে মাঝে মাসিক সংবাদ পত্রের কৃপায় কতকটা আভাস পাইয়া থাকি মাত্র। দু এক মাস অতীত প্রায়, সংবাদ-পত্রে দেখিলাম যে মেদিনীপুর "বারলাইব্রেরীর" একজন কায়স্থ খানসামা যুবক উক্ত "বারের" জনৈক নমঃশূদ্র জাতীয় উকিল্ মহাশয়কে জল, পান ও তামাক দিতে নারাজ। এই মহাপরিবর্ত্তন ও সাম্যতার যুগে এই সংবাদে আমরা বড়ই দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে নমঃশূদ্র জাতির সংখ্যা ও গুরুত্ব নিতান্ত সামান্য নহে। এই নিরীহ কৃষিবল জাতি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে এতাবৎ নানা প্রকারে নিপীড়িত ও পদ-বিদলিত হইয়া আসিতেছে। অন্যান্য জাতির ন্যায় বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে ইহারা শিক্ষায়, দীক্ষায় সমুন্নত হইয়া নিজেদের সামাজিক ন্যায্য-অধিকার বুঝিতে পারিতেছেন। প্রতিভা ও প্রাধান্য অন্যান্য জাতির ন্যায় ইহাদেরও কম নহে। প্রতিভা ও প্রাধান্য কোন জাতির এক-চেটিয়া সম্পত্তি নহে—উহা ভূমা ন্যায়বান ভগবানের সাধারণ দান। মর্য্যাদা ও উন্নতির পথ কাহারও কুলক্রমাগত নহে। একজন অন্যের প্রতি অযথা অত্যাচার করিবে ইহাও মহান্ পরমেশ্বরের ইচ্ছা নহে। একজন স্পৃশ্য ও অন্য জন

* এই প্রবন্ধের উপযুক্ত শাস্ত্রসঙ্গত প্রতিবাদ পাইলে তাহা সাদরে প্রকাশিত হইবে। আঃ সঃ

অস্পৃশ্য ইহাও ভগবৎ উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার রাজ্যে লাল, কালা, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল কি কোনও পার্থক্য আছে? সমাজের তথা কথিত নীচ জাতিগুলিকে ঘৃণা করিবার সনদ কি কেহ আমাদিগকে দিয়াছেন? তথা কথিত নীচ জাতিগুলি কি সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন না? শিক্ষায় দীক্ষায়, সমুন্নত উদারচেতা একজন নমঃশূদ কি একজন কায়স্থ খানসামা অপেক্ষা গরীয়ান্ নহেন? কেন আভিজাত্য গৌরবে স্ফীতবক্ষাঃ কায়স্থযুবক এহেন ব্যবহার করিল? আমাদের বিশ্বাস "নমঃশূদ্র ও চণ্ডাল এক" এই বাল্য কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিই ইহার নিদান। এই সঙ্কীর্ণতার বশবর্ত্তী হইয়াই আমাদের ন্যায় তথা কথিত (Socalled) শিক্ষিতগণ ও এতাবৎকাল বঙ্গের একটী প্রধান জাতির প্রতি অবিচার করিয়া আসিতেছে, অদ্য আমরা দেখাইব—যে আমাদের উক্ত ধারণার মূলে কোন সত্য বিনিহিত নাই। বাঙ্গালার নমঃশূদ্রগণ জাতিতে চণ্ডাল নহেন। ভগবান মনু বলিতেছেনঃ—

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষতাচ্চণ্ডালশ্চাধমোনৃনাম্।
বৈশ্যরাজন্য বিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥

শূদ্র পিতা হইতে বৈশ্যা গর্ভে আয়োগব, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ক্ষতজ, ও ব্রাহ্মণী গর্ভে অধম চণ্ডাল জাতি সম্ভূত। ইহারা প্রতিলোমজ বলিয়া বর্ণসঙ্কর।

যদি মহাত্মা মনুর এই বাক্য সত্য হয় তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙ্গালার নমঃশূদ্রগণ ও চণ্ডালগণ এক নিদান সম্ভূত নহেন। কেন? এই উভয় জাতির শৌচাচার সম্পূর্ণ পৃথক! ভগবান মনু বলিয়াছেন।

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট সুতা দ্বিজ-ধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রানান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ
স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্য হইতে বৈশ্যাতে বৈধ বিবাহে জাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া, ও ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে অনুলোমক্রমে বৈধ

বিবাহে জাত মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) ও মাহিষ্য এই তিন জাতি—মোট এই ছয় জন দ্বিজধর্ম্মা, ইহারা যথাকালে উপনীত হইবেন ও দ্বিজাতি-সমুচিত অধ্যয়নাদি সর্ব্ব সংস্কারে অধিকার লাভ করিবেন। (যথার্য্যাৎ জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কার-মর্হতি।" মনু. ৬৯। ১০ অঃ) কিন্তু অপধ্বংসজগণ বা বর্ণসঙ্করগণ অর্থাৎ সূত, মাগধ, আয়োগব বৈদেহক, ক্ষত্তা, ও চণ্ডাল-গণ শূদ্রদিগের ন্যায় সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন! শূদ্রের ধর্ম্ম কি? শাস্ত্রকার বলেন,—

"শুধ্যেৎ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি॥"
মনুসংহিতা।

ব্রাহ্মণ দশ দিনে, ক্ষত্রিয় বার দিনে, বৈশ্য পনের দিনে :ও শূদ্রগণ এক মাস অশৌচ ধারণ করিয়া শুচি হইবেন।

কিন্তু বাঙ্গালার নমঃ শূদ্রগণকে আমরা একমাস অশৌচ ধারণ করিতে দেখি না বা কেহ শুনে নাই। পক্ষান্তরে ইঁহারা দশাশৌচ ধারণ করেন। এবং

"বামুন চাঁড়াল মুচি।
এগার দিনে শুচি॥"

এই প্রবাদ বাক্যেরই সত্যতা সপ্রমাণ করে। হাঁ বাঙ্গালায় এই প্রবাদ বাক্য প্রচলিত রহিয়াছে বটে কিন্তু উহা অমূলক ভিন্ন সমূলক নহে। কেন? বাঙ্গালার নমঃশূদ্রগণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোদিত "কুদর জাতি" তাই উহাদিগের অশৌচ পিতা ব্রাহ্মণের ন্যায়!

"ব্রাহ্মণ্যা মৃষিবীর্য্যেণ ঋতোঃ প্রথম বাসরে।
কুৎসিত শ্চোদরে জাত কুদর স্তেন কীর্ত্তিতঃ
তদশৌচং পিতৃতুল্যং পতিত ঋতু দোষতঃ॥
১১৫।১১৬।১০ অ ব্রহ্মখণ্ড।

কোন ঋষি আপনার ব্রাহ্মণী পত্নীতে ঋতুর প্রথম দিবসে উপগত হইলে যে সন্তান হয় তাহার নাম "কুদর"। তাহার অশৌচ পিতৃতুল্য। ঋতুদোষবশতঃ তাহাদের পাতিত্য জন্মিয়াছে।

এখন চেতস্মান্ সামাজিকগণ দেখুন, যাঁহাদের অশৌচ পিতৃতুল্য, যাঁহারা বর্ণসঙ্কর নহেন তাঁহারা কি শাস্ত্রোক্ত চণ্ডাল হইতে পারেন? চণ্ডালের অশৌচ এক

মাস পক্ষান্তরে নমঃশূদ্রগণ বা কুন্দরগণ দশাশৌচ ভাগী সুতরাং এই দুই জাতি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিদানজ তাহা কে অস্বীকার করিবেন?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তকার ত বর্ণসঙ্করগণকে মাতৃধর্ম্মা বলিয়াছেন "মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ"। চণ্ডালের মাতা ব্রাহ্মণী, অতএব উহাদের অশৌচ দশ দিন এবং নমঃ শূদ্রগণেরও অশৌচ ১০ দিন। সুতরাং এই উভয় জাতি ত এই হিসাবে এক জাতি হইতে পারে না। না তাহা হইতে পারে না। কেন? ব্রহ্মবৈবর্ত্তের "মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ" এই উক্তি মন্বাদি-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও অগরীয়সী। "শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করাঃ।"

শুদ্ধিতত্ত্ব।

বর্ণসঙ্করগণের শৌচ ও অশৌচ শূদ্রবৎ হইবে, পরন্তু মাতৃবৎ নহে। আর যদি বর্ণসঙ্করগণ মাতৃধর্ম্মা হইতেন, তাহা হইলে সূত, মাগধ, বৈদেহক, আযোগব ও ক্ষত্তাকে আমরা যথাক্রমে দশ ও বার দিন অশৌচ ধারণ করিতে দেখিতাম। কিন্তু উহারা কি সকলেই মাসাশৌচী নহেন?

এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার নমঃশূদ্র-গণের অন্যান্য আচার ব্যবহার দেখিয়াও মনে হয় না যে তাঁহারা জাতিতে চণ্ডাল। মনু বলিয়াছেন—

চণ্ডালশ্বপচানান্তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
আপাপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্বগদ্দর্ভম্॥
বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারচ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ॥

চণ্ডাল ও শ্বপাকেরা গ্রামের বাহিরে বাস করিবে, ইহারা কোন পাত্র ব্যবহার করিতে পারিবেনা কুকুর ও গর্দ্দভ ইহা-দিগের ধন। ইহারা মড়ার কাপড় পরিবে, ভাঙ্গাপাত্রে খাইবে, ও লোহার অলঙ্কার ধারণ করিবে, ইহারা একস্থানে বাসী নহে। বর্ণনা দৃষ্টেই মনে হয় যে ডোম ও *মুর্দ্দফরাশগণই শাস্ত্রোক্ত চণ্ডাল জাতি।* পক্ষান্তরে বাঙ্গালার নমঃ শূদ্রগণ আমাদের দশ জনের ন্যায় নিয়ত গৃহ বাসী, ও গ্রামের অভ্যন্তরে বাস করেন এবং তাঁহারা কৃষি ও সূত্রধরের কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন ও কেহ বা আমাদের ন্যায় শিক্ষার

দীক্ষায় সমুন্নত হইয়া অন্য রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তাহারা আমাদের ন্যায় কাংস্য পাত্রে ভোজন করেন এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ধারণ করেন। যাহা হউক এই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা বাঙ্গালার নমঃ শূদ্রগণকে চণ্ডাল জাতি মনে করেন তাঁহারা কত দূর ন্যায় পথভ্রষ্ট ও জাতিতত্ত্বে অনভিজ্ঞ তাহা চেতস্মান্ সামাজিক গণ বিচার করিয়া দেখিবেন। নমঃ শূদ্রগণ জাতিতে 'কুন্দর' ইহা যে কেবল আমরাই বলিতেছি এমত নহে। পরম পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গগত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এই ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে নমঃ শূদ্র নামের উল্লেখ নাই বটে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ভারতে শাস্ত্রোক্ত নাম কয়টা জাতির আছে? ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র কন্যার গর্ভজাত সন্তান দেবল বা পারশবগণই কি বাঙ্গালার আচার্য্য বামুনে পরিণত হয় নাই। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত সন্তান "অম্বষ্ঠগণ" কি বাঙ্গালার "বৈদ্য জাতি" বলিয়া পরিচিত নহেন? বৈশ্য হইতে শূদ্র কন্যার গর্ভজাত সন্তান "করণগণই" কি ভারতের নানাস্থানে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন না? ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠকন্যার গর্ভজাত সন্তান আভীরগণই কি বাঙ্গালার সদ্গোপ বা গোয়ালা জাতি বলিয়া সুপরিচিত নহেন? উপনাম গ্রহণ ও আসল নাম ত্যাগের আর কত দৃষ্টান্ত দিব।

বৃথা আভিজাত্য গৌরবে মত্ত হইয়া ভারতবাসী আমরা কিরূপ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি ও হইতেছি তাহা আর অধীয়ান গণের অবিদিত নাই। উচ্চ জাতির দেহ যে উপাদানে গঠিত, অন্ত্যজগণের দেহও সেই উপাদানে রচিত। ভগবানের রাজ্যে জন্মগত উচ্চ ও নীচ বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। উহা আছে কেবল আমাদের সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের মধ্যে। এই সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারকে যত দিন আমরা পদদলিত করিয়া উন্নতমনা না হইতে পারি ততদিন আমাদের নিস্তার নাই "ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরেই" থাকিবে। অতএব হে বঙ্গীয় কৃষক ভ্রাতৃগণ তোমরা

ভারতের ভবিষ্যৎ; তোমরা এ সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিওনা। এই বিংশ শতাব্দীর মহা-লোকে ও সাম্যের যুগে বৃথা আভিজাত্য গৌরবে স্ফীতবক্ষ হইয়া ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিও না। কার্য্যক্ষেত্রে সকলে সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন কর—ভারতের মঙ্গল হইবে।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

(শ্রীপঞ্চানন শিরোমণি, কথক।)

চাতক এবার নিস্পন্দ নিলশ্চ, আর কথা কয় না। সকলেই বুঝিতে পারিল যে, পক্ষী প্রাণত্যাগ করিল। স্রোত-বেগে চাতক এবার ভাসিয়া চলিল, গঙ্গা-তরঙ্গে তার মৃত দেহ নাচিতে নাচিতে ক্রমে অদৃশ্য হইল। ঘাটে উপবিষ্ট জন-গণ সকলেই নির্ব্বাক হইয়া চাতক বৃত্তান্ত স্মরণ করিতেছিল। এমন সময়ে সন্ন্যাসী সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সকলকে বলিলেন—আমি সন্ধ্যা বন্দনা সমাপন করি, তোমরা কেহ যাইও না—আমি এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে তোমাদের নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ হইবে। কেবল তোমাদের কেন—এই আলোচনা প্রচলিত হইলে সমস্ত সংসারেরই কল্যান লাভ হইবে সন্দেহ নাই। আশা করি এই চাতক বাক্যই যেন অধঃপতিত সমাজের পুনরুদ্ধারের হেতুস্বরূপ হয়। আমি আজ নিত্যকর্ম্ম সঙ্ক্ষেপ করিয়া যত সত্বর পারি তোমাদের সহিত মিলিত হইব। তোমরা উপরে যাও এই বলিয়া সন্ন্যাসী কাষ্ঠ-পাদুকা-যুগল মোচন করিয়া আরও দুইটী সিড়ি নামিয়া জলস্পর্শ পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ হইয়া জাহ্নবী জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা সমাপন করিতে লাগিলেন। বসিলে, তরঙ্গিনীর জল গায়ে ছিটাইয়া লাগে এজন্য এই ভাবে সায়ংকৃত্য সমাধা করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। তাঁহার আদেশ পালন

জন্য প্রায় সকলেই ঘাটের উপরিভাগে মার্ব্বল প্রস্তর নির্ম্মিত চত্বর মধ্যে গিয়া বসিলেন, কেহ কেহ বা জাহ্নবী জল গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া আচমন পূর্ব্বক সন্ধ্যা কেহ কেহ বা ঐরূপে অভীষ্ট দেব দেবীর চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। পল্লী হইতে ক্রমে ক্রমে অনেক ভদ্র লোক এই সময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। যেন সংসারের শোক দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া শান্তি লাভ প্রত্যাশায় শান্তিদায়িনী ত্রিলোক-তারিণীর সুখময় ক্রোড়ে সমাসীন হইলেন। পূর্ব্বোপবিষ্ট ব্যক্তিগণ সঙ্গেই ইহারা চত্বরে বসিলেন। যাঁহারা চাতক বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন, তাঁহারা এতক্ষণ সেই সকল কথারই মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে চাতকের অবস্থা ধ্যান করিয়া কতক্ষণে সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁদের অমৃতময় সদুপদেশ প্রদান করিবেন এই আশায় তারা তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন নবাগত ব্যক্তিগণ আসায় যেন তাঁদের সেই সভার নিস্তব্ধতা দূরীভূত হইল। কেহ কেহ দুটী একটী কথার প্রসঙ্গারম্ভ করিলেন। এমন সময়ে সহসা চতুর্দ্দিকে আলোক মালা জ্বলিয়া উঠিল। সেই ঘাটমধ্যেও একটী উজ্জ্বলালোক তথাকার অন্ধকার দূরীভূত করিবার জন্য জ্বলিয়া উঠিল। দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা ঝাঁঝরি নিনাদিত হইতে লাগিল। ভাগীরথী বক্ষে তরণী যাতায়াত প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। দাঁড়ী মাঝিরা উল্লাসে সুন্দর সঙ্গীত আরম্ভ করিল। সুখময়ী সন্ধ্যার আগমনে জগৎ আবার অভিনব সাজে সুসজ্জিত হইল। একটী উড়িয়া দেশীয় ভৃত্য চত্বরে বসিয়া প্রথম সোপানে দুটী চরণ রাখিয়া এতক্ষণ সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, তার কুক্ষিদেশে মৃগচর্ম্ম ছিল। সন্ন্যাসী সন্ধ্যা সমাপন করিয়া যেমন জল ছাড়িয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইলেন, অমনি সেই ভৃত্য সোপানশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত একটী বিস্তৃত সিঁড়িতে মৃগ-চর্ম্মটী পাতিয়া দিল। বলা বাহুল্য যে পূর্ব্বের জোয়ারে ঐ সিঁড়িগুলি সুধৌত ও পরিষ্কৃত হইয়াছিল। সন্ন্যাসী সেই মৃগচর্ম্মে উত্তর মুখে বসিলেন, ভৃত্য তাড়া-

ভাড়ি কমণ্ডলুটী গঙ্গাজল পূর্ণ করিয়া তাঁর সম্মুখে রাখিয়া এবং একটী গৈরিক বস্ত্রের ঝুলী তাঁর সম্মুখে দিল। সন্ন্যাসী পদ্মাসনে বসিয়া ঝুলি হইতে একছড়া মালা বাহির করিয়া গলদেশে ধারণ করিলেন এবং এক ছড়া ছোট মালা দক্ষিণ করে গ্রহণ করিয়া জপ করিতে বসিলেন। ভৃত্য আবার পূর্ব্ব মত উঠিয়া গিয়া চত্বরে বসিল। সন্ন্যাসির সহিত যাঁরা কেহ কেহ সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেছিলেন তাঁহারা কার্য্য সমাপন করিয়া একে একে চত্বরে আসিতে লাগিলেন। এই সময়ে পল্লী হইতে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দুটী ভদ্রলোক সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে এখানে আসিতে লাগিলেন। ইহার নাম শ্রীবেণীমাধব মুখোপাধ্যায় বয়ঃক্রম প্রায় ৪৫ বৎসর, দেহ বেশ হৃষ্ট পুষ্ট, উজ্জ্বল কান্তি, চির-কাল উত্তম ভোগ জন্য সুকুমার শরীর। ইহার জমিদারীর আয় অনেক টাকা বিশিষ্ট ধনী লোক। ইনি এক গাছি ছড়ী দুলাইতে দুলাইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে চত্বরে উপবিষ্ট একটী যুবক সহসা গাত্রোত্থান করিয়া বেণী বাবুকে প্রণাম করিয়া তাঁর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন। বেণীবাবু বলিলেন—"কি সুবোধ যে, কবে এলে ?"

সুবোধ। আজ্ঞে কাল এসেছি। গাড়ীতে বড় কষ্ট হওয়ায় শরীর ভাল ছিলনা বলিয়া আপনার চরণ দর্শন কর্ত্তে যেতে পারি না, কাল সকালে যাব মনে করেছিলাম।

বেণীবাবু। তোমার বাবা বেশ ভাল আছেন ত ?—বলিয়া বসিবার জন্য ইতস্তত দেখিতে লাগিলেন ঐ সময় উপবিষ্ট জন গণের মধ্যে কতক গুলি লোক সরিয়া গিয়া তাঁকে মার্ব্বল পাথরের উপর কাপড় দিয়া ঝাড়িয়া স্থান দিল, তিনি বসিলেন। তাঁর সহচর দুজনও বসিলেন এবং সুবোধ সম্মুখেই বসিল। সুবোধের পার্শ্বে একটী গৈরিকের, অন্তর্ব্বাস বহির্ব্বাসধারী তুলসীমালা কণ্ঠে নাসিকায় তিলক এবং হস্তে জপের থলিকা, মুণ্ডিত মস্তক এক বৈষ্ণব সহাস্য বদনে বলিলা বেণী বাবুকে নমস্কার করিলেন। বেণী বাবু

ইহার বৈষ্ণবের বেশ দেখিয়া বৈষ্ণব ধারণায় প্রতি নমস্কার জন্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া গলদেশে যজ্ঞোপবীত দেখিয়া যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেই প্রতিনমস্কার করিলেন এবং সুবোধকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন সুবোধ তোমার বাবা বৃন্দাবন প্রাপ্ত হলেন নাকি? বৈষ্ণব বলিলেন—বৃন্দাবন প্রাপ্ত হওয়াতো অল্প সৌভাগ্যের কথা নয়? তবে পাবার চেষ্টা বটে।

বেণীবাবু। তাই দেখিতেছি—দেশ একবারেই ছাড়লেন।

সুবোধ। দেশে আসার কথা কিছু বল্লেন না। বৈষ্ণব বল্লেন—দেশে এলেই ত রেষারেষি? দেশ বা রেষারেষি না ছাড়লে ত আর সে দেশ লাভ হয় না। এবার বেণী বাবু তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপনার নিবাস? সুবোধ বলিল ইনি আমার সঙ্গে বৃন্দাবন থেকে এসেছেন, বাবার সঙ্গে এর বেশ পরিচয় হয়েছে, ইনি আমাদের দেশ দেখতে এসেছেন। ইনি একজন পরিব্রাজক। বেণী বাবু বলিলেন—ইনি তাহলে তোমার বাপকে চেনেন?

বৈষ্ণব। আজ্ঞে আমি আমাকেই যখন চিন্তে পারলাম না, তখন পরকে কেমন করে চিনব বলুন। তবে পরিচয় কথকটা—এমন সময়ে ঘাটেরদিকে খড়মের শব্দ শুন্তে পাওয়া গেল, প্রায় সকলেই সেই দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল।

সন্ন্যাসী সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে চাতালের উপর দাঁড়ালেন। একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, বোধ হয় সকলেই আছেন? একজন বলিলেন—আজ্ঞে আমরা সকলেই আছি তা ছাড়া আরও কয়েকজন নবাগত। সন্ন্যাসী কথা কহিতে কহিতে সেই লোক সকলের সম্মুখে আসিলেন। তখন সকলেই তাঁকে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে মধ্যভাগে বসবার জন্য লোক উঠাইয়া সরাইয়া দিল। তখন পূর্ব্বোক্ত উড়িয়া দেশীয় ভৃত্য আসিয়া সেখানে মৃগচর্ম্ম পাতিয়া দিল। সন্ন্যাসী এবার বসিলেন। নবাগত জনগণের প্রতি বলিলেন যাঁরা আমি আসার পর এসেছেন, তাঁরা বোধ হয় চাতক বৃত্তান্ত কিছু জানেন না? বেণীবাবু বল্লেন—আজ্ঞে না। চাতক কি?

সন্ন্যাসী বলিলেন, তবে শুনুন আমি এখানে আসিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া যেমন একটী সিঁড়িতে বসেছি, দেখলাম পূর্ব্বের ঝড়ে একটী চাতক জলে পড়ে ভেসে আসছে। এক এক বার নড়চে আর ঊর্দ্ধদিকে মুখ করে হাঁ করচে। সেটা একটী নৌকার গায়ে এসে লাগলো দেখে তাকে তোলবার জন্য বলিলাম সে কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে মুহূর্ত্ত কাল মনুষ্যভাষী হয়েছিল। পাখী আপনাকে জল হতে তুলতে নিষেধ করে অনেক কথা বললে। তার প্রধান কথা এই—আমি তাকে কাতর দেখে বলিলাম যে, তোমার জীবনের আর আশা ত নাই তবে অশেষ পাপহরণকারী গঙ্গাজল পান কর, পরকালে শ্রেয়োলাভ হইবে।

সে কিছুতেই পান করিল না। আমি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় বল্লে যে আমি চাতকজাতি। আমরা চিরকাল নীরদের স্বচ্ছ নীর ঊর্দ্ধমুখে পান করে থাকি, আজ যদি অধোমুখে জল পান করি, তাহলে আমার পিতৃপুরুষগণ আমায় কুলাঙ্গার বলে ঘৃণা করে নিকটে বসতেও স্থান দেবেন না, অতএব আমি গঙ্গাজলের মোক্ষদায়িনী শক্তি থাকলেও স্বধর্ম্ম ত্যাগ কর্ত্তে পারিনা। কারণ “স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ” চাতক এই মহাবাক্য বলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল।

এখন এস, এই চাতককথিত মহাবাক্যের আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

স্ব—কি? ধর্ম্ম—কি? নিধন—কি? শ্রেয়ঃ—কি?

স্ব শব্দে আপন। আপন কি ইহার বিচার আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন। এখন সেই উপদেশ একবারে দিতে গেলে চলিবে না কেহই বুঝিতে পারিবে না এমনি উপরোক্ত কয়টী কথার অর্থই অনেকের পক্ষে নীরস ও দুর্ব্বোধ্য হইবে। অগ্রে ক্ষেত্র মধ্যে চাষ দিয়া তৃনাদিহীন পরিষ্কৃত হইলে যেমন বীজ বপন মাত্রেই অঙ্কুরিত হয়, তেমনি প্রথম কর্ত্তব্য কি বক্তার সেটী বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, নতুবা বৃথা চেষ্টা হইবে। সমাগত জনগণের মধ্যে হয়ত অনেকের পরকালে বিশ্বাস নাই হয়ত অনেকের আছে। এ অবস্থায় প্রথম বিশ্বাসের আবশ্যক। শাস্ত্রে বিশ্বাস, কারণ শাস্ত্র ঋষিবাক্য, ইহাতে বিধি ও নিষেধ আছে এবং মহাজনবাক্যে বিশ্বাস, তাঁরা বিফল বাক্য কখনও বলেন না, সে গুলি সিদ্ধান্ত বাক্য।

ক্রমশঃ।

"কেন তোরা এমন হলি ?"

(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ।)

(১)

ভাইরে কেন এমন হ'লি ?
হায়, কেমন করে, কেমন করে,
এমন ভাবে ব'য়ে গেলি ?

(২)

সোণার মানুষ ছিলি তোরা,
আপন দোষে হ'লি সারা,
পরের ভাবে মাতোয়ারা
আপন্ মাথা আপনি খেলি।

(৩)

আপন বলে যাহা ছিল,
কে কোথায় সব লুটে নিল,
পরের কথায় আপন ঘরে
ভাইয়ে ভাইয়ে কিলাকিলি।

(৪)

তোরা ভাইরে বলিস্ ছেলে চাষা,
যা'রা তোদের সকল আশা,
তা'রা চাষা নয়রে, শেষ ভরসা
ভাই বলে কর কোলাকুলি!

(৫)

ধিক্‌রে তা'দের বড় মানুষি,
ভাই থাকে যা'র উপবাসী,
এঁটো ঝুটায় যা'রা খুসী
তা'দের কথা কা'রে বলি।

(৬)

রায় সাহেব, আর রাজা হওয়া
গাধার মতন, খেতাব বওয়া,
নেটীব, নীগার্ হ'লি 'মিষ্টার'
মুখে সিগার, চোখে ঠুলী।

(৭)

তোরা আপন ভাষায় কস্‌নে কথা
আপনি খেলি আপন মাথা,
যেমন খাঁচার ভিতর বসে তোতা
কয়বে মুখে পরের বুলি।

(৮)

আপন ভাষা আপন ভূষা,
মিটেনা তা'য় তোদের আশা,
এমন করে আপনারে
পরের পায়ে কে দেয় ডালি?

(৯)

আমি দেখে এলাম জগৎ ঘুরে,
তোদের মতন কেহ নয়রে,
ওরে বনের পশু বনের পাখী
তারাও তোদের দেয়রে গালি।

(১০)

দুঃখের কথা বলবো কা'রে,
তোদের দুঃখে পাষাণ ঝরে,
তোরা দিশাহারা আপন ঘরে,
আপন পায়ে বেড়ী দিলি।

আত্মা এক ও নিত্য।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র সার্ব্বভৌম।)

ওঁ নমো নারায়ণায়। পরব্রহ্ম পরমাত্মা পুরুষ। সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি বা মায়া। প্রকৃতি দ্বিবিধা। যথা, পরা ও অপরা বা বিদ্যা ও অবিদ্যা। রজস্তমোগুণের অস্পৃষ্টা শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে বিদ্যা এবং রজস্তমো গুণের আধিক্য ও সত্ত্বের ন্যূনতাহেতু মলিন সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলে। ব্রহ্ম বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রধান উৎকৃষ্ট উপাধি ধারণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্য্যামী জগৎকারণ ঈশ্বরপদবাচ্য হয়েন। সৃষ্ট্যাদি কার্য্য তাঁহার তটস্থলক্ষণ এবং সচ্চিদানন্দ তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ। যাঁহার বিক্ষেপ শক্তি হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ তেজঃ হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া

পুনঃ প্রলয় কালে পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। তিনি আবার রজস্তমোগুণের আধিক্য ও সত্ত্বের ন্যূনতা হেতু মলিন সত্ত্বপ্রধান অল্পজ্ঞ সুখ দুঃখ ভোগী জীব পদবাচ্য হয়েন। কেবল গুণের তারতম্য হেতু তিনি বিদ্যাবচ্ছিন্ন ও অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য উপাধি বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। সুতরাং পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন। "প্রজ্ঞানমানন্দংব্রহ্ম" "অহং-ব্রহ্মাসি" "তত্ত্বমসি" ও "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," এই মহাবাক্য সকল ঋগযজুঃসামাথর্ব্ব বেদে কীর্ত্তিত আছে। ইহার তাৎপর্য্য ঈশ্বর ও জীব অভিন্ন। যেমন বৃক্ষ ও জল সমষ্টি অভিপ্রায়ে বন ও জলাশয়পদবাচ্য হয়; তদ্রূপ অজ্ঞানোপহত চৈতন্য নানারূপে নানা ঘটে বিরাজ করিয়া এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদবাচ্য হয়েন। গাভী সকল, বর্ণ, আকৃতি ও প্রকৃতিতে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহাদের দত্ত ক্ষীর যেমন এক বর্ণেরই হইয়া থাকে, মৃত্তিকা নির্ম্মিত সরাকলসাদি মৃণ্ময় পাত্রসকল পরস্পর আকার ও উপাধির ভিন্নতাসত্ত্বেও যেমন এক মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছু নহে, উর্ম্মি, বিম্ব ও ফেণ প্রভৃতি বিবিধ উপাধি ও আকৃতি বিশিষ্ট হইলেও তাহারা জল ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং হার, বলয় ও কুণ্ডলাদি সুবর্ণ নির্ম্মিত হইয়া যেমন বিবিধাকৃতি ও নাম যুক্ত হয়; তদ্রূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ সকল জীবে সমভাবেই বিরাজমান আছেন। গগণস্থ চন্দ্রমা উদয়কালে নানা জলাশয়, হ্রদ, নদ, নদী ও সমুদ্রে যেমন পৃথক পৃথক চন্দ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক চন্দ্র একটী ভিন্ন দুইটি নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আত্মা এক হইয়া বহুরূপে দৃষ্ট হয়েন। যেমন তিলমধ্যে তৈল, ক্ষীরমধ্যে ঘৃত, পুষ্পমধ্যে গন্ধ ও ফলমধ্যে রস সর্ব্বত্র সমভাবে নিরবচ্ছিন্ন বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ আত্মা-জীবের পাঞ্চভৌতিক স্থূল ও সূক্ষ্মাদি শরীরে জাগ্রৎস্বপ্নাদি অবস্থায় অন্বয় ও ব্যতিরেক সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছেন।

জীবগণ শরীরত্রয়বিশিষ্ট। যথা, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ বা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এই তিন অবস্থা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। মৃত্তিকোৎপন্ন শস্যাদি প্রকৃতি পুরুষ দেহে শোণিত শুক্ররূপে স্থূল দেহ উৎপন্ন করে। স্থূল শরীর চতুর্ব্বিধ। যথা, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। যে দেহ জরায়ু হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা জরায়ুজ, অর্থাৎ পশু মনুষ্যাদি দেহ; যাহা অণ্ড অর্থাৎ ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা অণ্ডজ; যথা, সর্প পক্ষী প্রভৃতি; যাহা স্বেদ অর্থাৎ উত্তাপ বা ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা স্বেদজ; যথা, মশকাদি এবং যাহা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠে তাহা উদ্ভিজ্জ অর্থাৎ বৃক্ষলতাদি। রসরক্ত,মাংস, মেদাস্থি, মজ্জা, শুক্র, এই সপ্ত ধাতু নির্ম্মিত স্থূল শরীর। বাক্, হস্ত, পদ, গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; মন, বুদ্ধি এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ু ইহারা সপ্তদশ লিঙ্গাত্মক সূক্ষ্মশরীর। জাগ্রদবস্থায় স্থূলশরীরে এবং স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম শরীরে কার্য্য হইয়া থাকে। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর যথায় লীন হইলে সুষুপ্তি হয়, তাহাকে কারণ শরীর বলে। এতদবস্থাত্রয় ব্যতীত আর এক অবস্থা আছে তাহা তুরীয় শব্দে অভিহিত হয়।

জীবের পঞ্চ অবয়ব ও পঞ্চাবস্থা। তমঃ, তামিশ্র, অন্ধতামিশ্র, মোহ ও মহামোহ এই পাঁচ অবয়ব। শৈশব, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ এই পাঁচ অবস্থা। জীব যখন বিষয় ভোগের সুখ দুঃখ অনুভব না করিয়া কেবল স্তনপান ও রোদনাদি করে, তখন তমঃ অবয়ব ও শৈশবাবস্থাবিশিষ্ট। যখন পরমার্থ জ্ঞানের অভাব থাকে এবং কেবল আমার পিতা, আমার মাতা এবংপ্রকার জ্ঞান জন্মে তখন তামিশ্র অবয়ব ও কৌমার অবস্থাবিশিষ্ট। যখন অনিত্য দেহাভিমান প্রবল হইয়া আমি সুন্দর, আমি বিদ্বান, আমি ধনবান, আমার ভার্য্যা প্রভৃতি জ্ঞান হয়, তখন অন্ধতামিশ্র অবয়ব ও যৌবনা-

বস্থা ; যখন আমার ঐশ্বর্য্য, আমার পুত্র, আমার ক্ষমতা প্রভৃতি অভিমান জন্মে তখন মোহ অবয়ব ও প্রৌঢ়াবস্থা এবং যখন সবর্ণ অসবর্ণ, স্বজাতি বিজাতি ইত্যাকার সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক জ্ঞানে আবৃত হয়, তখন মহামোহ অবয়ব ও বৃদ্ধাবস্থা।

জীব রজস্তমোগুণের আতিশয্যহেতু তাপত্রয় ও পঞ্চক্লেশের বশবর্ত্তী হয়। তাপত্রয় যথা, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ, যথা, শারীরিক ও মানসিক। বাত পিত্ত শ্লেষ্মা বৈষম্য নিমিত্তক শারীরিক এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা ও বিষাদাদি নিমিত্ত মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। মানুষ পশু পক্ষী সরীসৃপাদি জন্য আধিভৌতিক এবং যক্ষ রাক্ষস বিনায়ক গ্রহাদি নিমিত্তক আধিদৈবিক দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চ ক্লেশ যথা, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা—অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, দুঃখকে সুখ বলিয়া জ্ঞান ও আত্মাভিন্ন বস্তুতে আত্মজ্ঞান। সূক্ষ্ম শরীরে অহংজ্ঞানের স্থিতিকে অস্মিতা, সুখেচ্ছায় অনুরাগকে রাগ, দুঃখ বিবেচনায় যে ক্রোধাদি হয় তাহাকে দ্বেষ এবং জন্ম মরণরূপ জ্ঞান সত্ত্বে দৃঢ় প্রবৃত্তি নিবন্ধন স্বয়ংকৃত বস্তু ত্যাগে অশক্ততাকে অভিনিবেশ কহে।

ঈশ্বর একমাত্র নিত্য তদ্ভিন্ন সকলই অনিত্য বা মিথ্যা। তবে মহর্ষি গৌতম যে চার্ব্বাক মত নিরাকরণার্থ দিক্, কাল, আকাশ, আত্মা ও পরমাণুকে নিত্য বলিয়াছেন তাহা অমূলক হইলেও নিন্দনীয় নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য মহান ও অতীব পবিত্র ছিল। কিন্তু মহর্ষি সিদ্ধকপিলের নাম দিয়া যে দর্শন প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় জনৈক নাস্তিক দার্শনিকের বুদ্ধিপ্রখরতার পরিচয় দিবার জন্য, অন্য কারণে নহে। বাস্তবিকই যদি মহাত্মা কপিল এই দর্শনের প্রণেতা হন, তাহা হইলে তাঁহার এরূপ অসদৃশ বেদবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইল কেন, ইহা বেদান্তসর্ব্বস্ব, ধর্ম্মপ্রাণ, আস্তিক জগতের বুদ্ধির অগম্য হইবে, সন্দেহ নাই। ইহা

কেবল বিগত ধর্ম্ম বুদ্ধি, অনধীত শ্রুতি স্মৃতি ও কপটাচার জগদবঞ্চকদিগের আদরের জিনিষ হইবে বলিয়া আমার মনে হয়। ঈশ্বর আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ও অপরিচ্ছিন্ন। যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি অগ্নি হইতে পৃথক নহে, তদ্রূপ আত্মশক্তি, যদ্দারা সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। পৃথিবীর স্থিতিকাল যে পরিমাণে শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রলয় কালের পরিমাণ ও তদ্রূপ। প্রলয় কালে আত্মার কোন কার্য্য থাকে না, সুতরাং তৎকালে তিনি নির্গুণ এবং সৃষ্টিকালে আত্মার ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়া তৎকালে শাস্ত্রে তিনি সগুণ বলিয়া বর্ণিত হন। বস্তুতস্ত তাঁহার শক্তি তাঁহা হইতে পৃথক নহে। তিনি যখন আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী তখন তাঁহার শক্তি পৃথক হইয়া কোথায় অবস্থান করিবে? শিব শব্দ হইতে ইকার রূপ শক্তি বিশ্লেষ করিলে শব শব্দ যেমন অবশিষ্ট থাকে মাত্র, তদ্রূপ আত্মা হইতে তাঁহার শক্তি বিশ্লেষ করা হইলে আত্মা তখন কি অবস্থায় অবস্থান করেন, তাহা বর্ণনা করা দুষ্কর। যেমন জীবদেহে যখন ক্রোধাদির কার্য্য প্রকাশ পায়, তখন জীব ক্রোধী পদবাচ্য হয়, অন্য সময়ে শান্ত প্রকৃতি থাকে, তদ্রূপ আত্মা কার্য্য কালে সগুণ এবং প্রলয় কালে যখন নিশ্চেষ্ট অবস্থায় থাকেন, তখন নির্গুণ বলিয়া কথিত হন। যেমন ক্ষমাশীল জীবের ক্রোধকালে ক্রোধকে স্থানান্তর হইতে আহ্বান করিয়া আনিতে হয় না, তদ্রূপ নির্গুণ ব্রহ্মকে সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে নিজ শক্তিকে অন্যত্র হইতে আনাইয়া আশ্রয় করিতে হয় না। স্বপ্রকাশমান আত্মার ত্রিগুণাত্মকশক্তি স্বরূপ অজ্ঞান জ্ঞান বিরোধী হইয়া অবিবেকিগণ সমীপে নিরন্তর নিগূঢ় ভাবে অবস্থান করিতেছে। যেমন আলোক উপস্থিত হইলে অন্ধকারের স্থিতি লোপ হয়, তদ্রূপ বিবেকীর জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়।

কারণ অনাদি হইলে কার্য্যও অনাদি হইয়া থাকে। কারণরূপ ঈশ্বর যখন অনাদি ও অনন্ত, তখন কার্য্যরূপ ব্রহ্মাণ্ড

যে অনাদি ও অনন্ত হইবে, তদ্বিষয়ে বিচিত্রতা কি? অতএব জগতের প্রথম সৃষ্টি নাই। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কার্য্যরূপ জগতের প্রথম সৃষ্টি অনুসন্ধান করিতে গেলে, কারণরূপ আত্মার প্রথমোৎপত্তির জিজ্ঞাসা আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব আর্য্য যাঁহাদের সনাতন ধর্ম্মগ্রন্থ—বেদ, তাঁহাদের মনে স্বপ্নেও এরূপ অনার্য্যজুষ্ট সংশয় স্থান পাইতে পারে না। জীব কেবল স্বকীয় জন্মান্তরীণ কর্ম্মপ্রভাবে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গাদি নানাযোনি প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মের বিচিত্রতা-নিবন্ধন সুখ-দুঃখরূপ বিচিত্র ফল ভোগ করিয়া থাকে। জগতে যাবতীয় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অবস্থা জন্মান্তরীয় সদসৎ কর্ম্ম জন্য জীবকে ভোগ করিতে হয়। জীব নিজ কর্ম্মফলে এমন কি বিষ্ঠার কৃমিকীটত্ব হইতে ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়া থাকে। ইহাতে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কোনরূপ স্বেচ্ছাচারিতা বা পক্ষপাতিত্ব নাই।

আত্মা সদা মুক্ত ও সত্য এবং জগৎ মিথ্যা। আত্মার কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব কিছুই নাই। যদ্রূপ দর্পণোপরি কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়িলে দর্পণ মধ্যে সেই পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ দর্পণে পরমাত্মার প্রতিভা পড়িয়া অহংভাব প্রকাশ পায়। ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন মহাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, কেবল ঘটস্থিত বলিয়া ঘটাকাশ উপাধি ধারণ করে—আত্মাও তদ্রূপ পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহেন, তবে দেহস্থিত বলিয়া দেহী অর্থাৎ জীবাত্মা উপাধিবিশিষ্ট হয়েন। তিনি দেহমধ্যে আছেন সত্য, পরন্তু যেমন শুভ্র স্ফটিক কোন রক্তজবার নিকটস্থ হইলে রক্তবর্ণ স্ফটিক বলিয়া প্রতীত হয়, বস্তুতঃ রক্তবর্ণ হয় না, তদ্রূপ আত্মাও দেহবর্ত্তী হইয়া দেহ নহেন। অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত লৌহদণ্ড যেমন দগ্ধ লৌহদণ্ডপদবাচ্য হইয়া দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়, বাস্তবিক অগ্নি লৌহদণ্ড নহে, সেইরূপ আত্মার প্রকাশে দেহ চৈতন্যপ্রাপ্ত হয় বলিয়া আত্মা কখনই শরীর নহেন।

সূর্য্যদেব যেমন স্বকীয় প্রখর রশ্মিপ্রভাবে পৃথিবীস্থ যাবতীয় সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ রস শুষ্ক করিয়া তাহাদের গন্ধ হরণ করিয়া লন, অথচ তাঁহাতে কোন গন্ধ স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ আত্মা দেহস্থিত হইলেও সুখ-দুঃখাদি দেহের ধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

আত্মা ব্যতীত যাবতীয় পদার্থ অনিত্য, ক্ষণধ্বংসী বা মিথ্যা সূক্ষ্ম শরীরে স্বপ্নকালে জীব যেমন নানা ভীষণ ও রমণীয় মূর্ত্তি দর্শনে তাহাদের নিত্যতা জ্ঞানেও একান্ত ভীত ও আহ্লাদিত হয়, এবং তাহা স্বপ্ন বলিয়া অলীক বোধ করে না, তদ্রূপ জাগ্রৎ অবস্থায় ও অজ্ঞান-রূপ স্বপ্ন-প্রভাবে এই প্রপঞ্চময় যাবতীয় মাযাময় মিথ্যা পদার্থ বা জগৎকে নিত্য বলিয়া বোধ করে। জীব নিকৃষ্ট অজ্ঞানোপহত চৈতন্য বলিয়া নিত্যানিত্য বস্তু বিচার করিতে অসমর্থ হইয়া আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি প্রভাবে অধ্যারোপ করিয়া ফেলে। যেমন ভ্রম বশতঃ শুক্তিতে রজতজ্ঞান, রজ্জুতে সর্প ও সর্পে যষ্টি বুদ্ধি হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান বশতঃ জীব অবস্তুকে বস্তু জ্ঞান করে। পরন্তু যেমন তৎপরে জ্ঞানোদয়ে শুক্তি রজ্জু ও সর্প বলিয়া প্রতীতি হয়; রজত সর্প ও যষ্টি জ্ঞান থাকে না, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে এই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। রজনীতে যেমন কাষ্ঠ খণ্ডে তস্কর ও বৃক্ষে প্রেতভ্রম এবং তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের বিস্তীর্ণ বালুকাময় ভূমিতে উজ্জ্বল বালুকারাশি দর্শনে জলাশয় ভ্রম হয়, তদ্রূপ এই মিথ্যা মায়াময় জগৎকে সত্য বলিয়া বোধ হয়। মেঘাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে যেমন তমোহারি সূর্য্যকে মেঘাবৃত বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক এইরূপ বৃহৎ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সামান্য একটু মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন হইবার নহে, তদ্রূপ জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন চক্ষে স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া এই মায়াময় জগৎকে সত্য বলিয়া দেখে।

ঈশ্বরই জীবের একমাত্র আশ্রয়, গতি ও উপাস্য। জীব মলিনতাপ্রযুক্ত ভ্রমবশে আমি, তুমি, আমার, তোমার ইত্যাকার মোহময় বুদ্ধিতে স্বীয় সচ্চিদানন্দরূপ জানিতে অসমর্থ হইয়া অবিদ্যা-বশে পুনঃ

পুনঃ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া কষ্টভোগ করে। অভিমানে অভিভূত হইয়া আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনবান, আমি নির্ধন, আমি রাজা ও আমি প্রজা ইত্যাকার বোধ হইয়া থাকে। কাম-ক্রোধাদি রিপুপরতন্ত্র হইয়া ভ্রমবশে স্ত্রী, পুত্র, ঐশ্বর্য্য, স্বর্গ ইত্যাদি অনিত্য ও মিথ্যা বস্তুকে নিত্য ও স্বীয় বিবেচনায় কর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকে। অধর্ম্ম, হিংসা, নিন্দা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, অসত্য ও কৌটিল্যকে আশ্রয় করিয়া নিরন্তর অনর্থরূপ অর্থ ও যশোলাভে যত্নবান থাকে। অর্থ ও অর্থকরী বিদ্যামদে মত্ত থাকিয়া রজস্তমোগুণের প্রাবল্য-নিবন্ধন নাস্তিকতার বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অপৌরষেয় বেদ, পরকাল ও ঋষিবাক্যে বিগতবিশ্বাস হইয়া সামান্য পশ্বাদির ন্যায় আহার, নিদ্রা ও মৈথুনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবিয়া তাহাতেই নিরন্তর আসক্ত থাকে। অগম্যাগমন, অপেয় পান, অভক্ষ্য ভক্ষণ, মিথ্যা-প্রবঞ্চনাদি ঘোরতর প্রত্যবায়-জনক অকার্য্যসকল তাহারা অসঙ্কুচিত-চিত্তে নিতান্ত উপাদেয় ও রুচিকর জ্ঞানে অবাধে নিত্যকর্ম্মের ন্যায় নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও ঋষি এই শব্দত্রয় শ্রবণে তাহারা নৈসর্গিক বিদ্বেষপ্রভাবে তুচ্ছজ্ঞানে বিবিধ হাস্য-পরিহাস পূর্ব্বক নানাবিধ কুৎসা করিয়া থাকে। এরূপ কদাচার সম্প্রদায়ের অধর্ম্মাচরণ নিবৃত্তির আশা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ধর্ম্ম দুই প্রকার। যথা—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক বা স্থূল ও সূক্ষ্ম। ব্রত, যাগ, যজ্ঞাদিরূপ প্রবৃত্তিমূলক বা সকাম-ধর্ম্মই স্থূল এবং ব্রহ্মজ্ঞান-সাধন-নিমিত্তক নিবৃত্তিমূলক নিষ্কাম-ধর্ম্মই সূক্ষ্ম। স্থূল ধর্ম্ম হইতে সূক্ষ্ম ধর্ম্মের উৎপত্তি। কারণ, বৈধ ভোগ দ্বারা বিষয়-তৃষ্ণা নিবারণ না হইলে বাসনার নিবৃত্তি হয় না। বাসনাক্ষয়ই চিত্তস্থিরতার প্রধান উপায়। যদ্দারা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি ও রজস্তমোগুণের হ্রাস হয়, তাহার নাম সাধনা বা যথানিয়মে ঈশ্বরোপাসনা। যে সাধন-বলে প্রাচীন মুনিঋষিগণ অবিদ্যার নাশ করিয়া মহৎপদ, ষড়ৈশ্বর্য্য, অষ্টসিদ্ধি ও ষোড়শ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঐশ্বরিক প্রেম বা ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও যোগ ইহারা পথস্বরূপ। অধিকারী হইয়া জীব ঋষ্যাদিকৃত শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ঐ পথ অবলম্বন করিলে ক্রমশঃ অবিদ্যার নাশ হয়। তখন জীব আত্মজ্ঞানী হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে। অবিদ্যা-নাশে কর্ত্তৃ ও কর্ম্মভাব তিরোহিত হইয়া জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ইহাদের পরস্পরের ভেদ-জ্ঞান দূর হইয়া যায়। আত্মজ্ঞান হইলে শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ, ঈর্ষা, দ্বেষ, কপটতা এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কিছুই থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া জীব ব্রহ্মপদ বা নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হয়।

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ।

বিপদ্ না হইলে কেহ কখন ডাক্তার ডাকে না এবং সে অবস্থায় যদি কেহ ভিজিট লইয়া যায় তাহাও কোন দোষের হয় না, কেন না ডাক্তারের ব্যবসাই বিপদের বাড়ী যাওয়া এবং নিজের প্রাপ্য অর্থ গণিয়া লওয়া। কিন্তু বিন্দুবাসিনী পুত্রকে টাকা ফিরাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন কেন তাহা বিন্দুবাসিনী ভিন্ন অপর কেহই সহজে বুঝিতে পারিবে না।

চিকিৎসক পুত্রের রোগীর বাড়ী অনাহুত অবস্থায় যাওয়া আসা করা, অযাচিত অবস্থায় বেদানা, আঙ্গুর, নাসপাতি প্রভৃতি রোগীর বাড়ী পাঠান এবং নিয়ম মত সংবাদাদি লওয়া অন্য কাহারো কাছে অস্বাভাবিক বলিয়া ঠেকিতে পারে, কিন্তু বিন্দুবাসিনীর নিকট তাহা আদৌ অন্যায় কিম্বা অস্বাভাবিক ঠেকে নাই।

সুরেশের সহিত তিনি অনেকবার কিরণময়ীর বাটী গিয়াছিলেন এবং অনেক রাত্রিও তথায় কাটাইয়াছিলেন। কিরণ-ময়ীর কোন আপত্তিই শোনেন নাই।

অশ্রুর সেবা সুশ্রূষার অর্দ্ধেক ভার প্রায় তিনিই লইয়াছিলেন।

না মরিলে মৃত্যুর যন্ত্রণা জানা যায় না। জীবিত অবস্থায় তাহা শুধু কল্পনাই করা যায়; বাস্তব জিনিষটা বুঝা যায় না। কিরণময়ী বিধবা, কিরণময়ী সহায়হীনা, কিরণময়ীর একমাত্র কন্যার ভারী অসুখ, যে কন্যা তাঁহার অতীতের স্মৃতি, বর্ত্তমানের শান্তি এবং ভবিষ্যতের চিন্তা। বিধবার দুঃখ বিধবা ভিন্ন কে বুঝিবে? সহায়-হীনার বিপদ সহায়হীনা বিনা অপর কে উপলব্ধি করিবে? সন্তানের কঠিন পীড়ায় জননীর উৎকণ্ঠা ও চিন্তা শোকে সন্তপ্তা জননী ভিন্ন আর কে বুঝিবে? সহানুভূতি সমানে সমানেই হইয়া থাকে। সুতরাং বিন্দুবাসিনীর নিকট কিছুই অস্বাভাবিক ঠেকিল না বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

প্রথম দিনই অশ্রুকে দেখিয়া তিনি তাহাকে কন্যার মত ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। এমনি ভাবে তাহার সেবা সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, যেন সে তাঁহারই পেটের মেয়ে। প্রথম সাক্ষাতেই অশ্রু যখন তাহার ক্ষীণ হাত দুটী বাড়াইয়া তাঁহার পদধূলি লইতে গিয়াছিল, তিনি তাহার হাত দুটী ধরিয়া নিজের কোলের উপর রাখিয়া বলিয়াছিলেন "ভাল হ'য়ে ঢের পায়ের ধুলো নিও মা, এখন থাক্।" অশ্রুও তাঁহাকে মায়ের মতই ভক্তি করিত, শ্রদ্ধা করিত।

কিরণময়ীর সহিত দুই দিনের আলা-পেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অতীত জীবনের একটা রহস্যময় ইতিহাস আছে। শুধু এইটুকুই বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন; ইহার অধিক আর কিছুই উপ-লব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই-টুকুই তাঁহার হৃদয়ে কিরণময়ীর স্থান আরও দৃঢ় ও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। পাছে কিরণময়ীর মনে কষ্ট হয় বলিয়া তিনি এই ইতিহাসটুকু জানিবার জন্য একদিনও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। যতই কিরণময়ীকে দেখিতেন, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, ততই কেমন তাঁহার প্রতি বিন্দুবাসিনীর সহানুভূতি,

স্নেহ ও মায়া বাড়িয়া যাইত।

কিন্তু কিরণময়ী ততই যেন অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তিনি সদাই মনে করিতেন সুরেশ এবং বিন্দুবাসিনীর এত যত্ন সমস্তই তাঁহার পাপের বোঝার উপর আরও পাপ বাড়াইতেছে। এত সহানুভূতির বোধ হয় তিনি যোগ্য নন, তাঁহার কন্যা অশ্রু বুঝি এত আদর পাইবার সৌভাগ্য করিয়া তাঁহার অতীতকালের কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ তাঁহার জঠরে জন্মায় নাই। সেই জন্য তিনি প্রাণ খুলিয়া বিন্দুবাসিনীর সহিত মিশিতে পারেন নাই। সুরেশ যখন ঘরের ছেলের মত জলখাবার চাহিত, তখন তাঁহার যেন কেমন কেমন ঠেকিত; অথচ সুরেশকে খাওয়াইবার জন্য তাঁহার মাতৃহৃদয় উৎসুক হইয়া পড়িত। তিনি মনে করিতেন—সুরেশকে ছেলের মত সম্মুখে বসাইয়া খাওয়াইবার সৌভাগ্য ভগবান্ বোধ হয় তাঁহাকে দেন নাই। তাঁহার সদাই আশঙ্কা হইত—পাছে সুরেশের কিম্বা বিন্দুবাসিনীর ইহাতে কোন অমঙ্গল হয়, অকল্যাণ হয়। সুতরাং সদাই তিনি একটু কুণ্ঠা বোধ করিতেন, কেমন যেন তাঁহার বাধ বাধ ঠেকিত, তেমন খোলাখুলি ভাবে মেশামিশি করিতে পারিতেন না।

বিন্দুবাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার জন্য কিরণময়ীর প্রাণ স্নেহে এবং কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গিয়াছিল। উপরন্তু যখন তিনি প্রথম দিনই তাঁহাকে 'দিদি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া ঘরে ঢুকিলেন, তাঁহার হৃদয়ের এ ভাব তখন আরও বাড়িয়া গেল এবং ইহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—তাঁহার এবং সুরেশের অবিশ্রান্ত সেবা-সুশ্রূষা এবং আন্তরীক যত্ন ও চেষ্টা দেখিয়া যখন কিরণময়ী ভূতভবিষ্যত ভুলিয়া গিয়া কেবলমাত্র বর্ত্তমান লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, তখনই বিন্দুবাসিনী এবং সুরেশের সহিত আপনার লোকের মত মিশিতে পারিতেন। কোন বাধা থাকিত না, কোন ব্যবধান থাকিত না, কোন কুণ্ঠাবোধও থাকিত না, কিন্তু পরক্ষণেই স্মৃতির তীব্র কশাঘাত কে যেন তাঁহার পৃষ্ঠে মারিত এবং তাঁহাকে বিন্দু-

বাসিনী ও সুরেশের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিত।

ইচ্ছা আছে আন্তরিকতা আছে, তত্রাচ সম্মুখে যেন একটা কঠিন বাধা আছে—এ ভাবটী বিন্দুবাসিনীর লক্ষ্য এড়াইল না। কিন্তু ইহার কোনই কারণ বুঝিতে পারিলেন না। আরও ইচ্ছা করিয়া কিরণময়ীর হাতে খাইতেন এবং পুত্রকেও খাওয়াইতেন।

রোগশয্যায় শুইয়াও অশ্রু মাতার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু সেও ইহার কোনই কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। ক্রমেই অশ্রু দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। বেশী কথা কহিতে পারিত না। চুপ করিয়া শুইয়া থাকিত। কেবল মাত্র সুরেশ এবং বিন্দুবাসিনী আসিলে যা একটু আধটু কথা কহিত।

আজ তাহাও পারিল না। কিছুক্ষণ সুরেশের সহিত কথা কহিয়াই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং চক্ষু বুজিয়া নিস্তব্ধ ভাবে শুইয়া রহিল। একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল। কিছুক্ষণ তাহার পাশে বসিয়া তাহার একখানি হাত ধীরে ধীরে নিজের উরুদেশ হইতে নামাইয়া শয্যায় রাখিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইতেই সেটুক ভাঙ্গিয়া গেল। কখন যে তাহার হাতটী সুরেশের কোলের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল অশ্রু নিজেই তাহা জানিত না। সুরেশ যখন তাহা নামাইয়া দিল, তখন সে বুঝিতে পারিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফ্যাকাসে গাল দুটী একটু আরক্তিম হইয়া গেল। মনে করিল সুরেশকে আরও একটু বসিতে বলিবে। কিন্তু অবাধ্য জিহ্বা তাহা বলিতে দিল না এবং অবাধ্য রক্তের চঞ্চল চলাচল তাহাতে সহায়তা করিল।

এমন সময়ে একটা রেকাবীতে কিছু মিষ্টান্ন ও ফলমূল লইয়া কিরণময়ী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সুরেশকে বলিলেন,—"এটুকু খেয়ে ফেল বাবা।" সুরেশও বিনা বাক্যব্যয়ে রেকাবিটী হাতে লইয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। সেই যে একটু আরক্তিম হইয়া অশ্রু চক্ষু বুজিয়াছিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুরেশ সেখানে ছিল, ততক্ষণ তার চক্ষু খুলে নাই।

কিছুক্ষণ সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কিরণময়ী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তোমার গরিব মাকে যেন কখন ভুল না বাবা, চিরকাল মনে রেখো। গরীবের বাড়ীতে তোমরা পায়ের ধূলো দিয়েচ এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।" রেকাবী হইতে মুখ তুলিয়া সুরেশ দেখিল, কিরণময়ীর চক্ষু জলে ভরা ভরা।

"ওসব কথা ছেলেকে বলা কেন দিদি" বলিয়া বিন্দুবাসিনী কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কিরণময়ী বিন্দুবাসিনীর পায়ের ধুলা লইতে গিয়া তপ্ত অশ্রুর দ্বারা তাঁহার চরণদ্বয় সিক্ত করিয়া দিলেন। বিন্দুবাসিনী তাঁহাকে উঠাইয়া বলিলেন, "কাঁদছিলে কেন দিদি? সুরো বলছিল অশ্রু নিশ্চয়ই সেরে উঠবে।"

যে অব্যক্ত বেদনার জন্য কিরণময়ী আজ ক'দিন হইতেই অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, তাহার কারণ তিনি এবং রতন ভিন্ন পৃথিবীতে আর কেহই জানে না।

উপর্য্যুপরি কয়েক দিন হইতে চিন্তার ধারা কিরণময়ীর অন্তরে এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাঁহার মনের এ ভাবের তরঙ্গ একদিন তাঁহার সমস্ত হৃদয়তট প্লাবিত করিয়া ভাষার উৎসে বাহির হইয়া পড়িল। সারাদিনটা অশ্রুর সেবা সুশ্রূষা করিয়া বৈকালে বাটী ফিরিবার নিমিত্ত বিন্দুবাসিনী নীচে নামিয়া আসিতেছিলেন। কিরণময়ী তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য তাঁহার সঙ্গেই আসিতেছিলেন। নীচে আসিয়া কিরণময়ী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "দিদি, তোমরা এত আদর যত্ন কর ব'লেই কি তোমাদের জন্যে আমার এত ভয় হয়? কি করে আমাদের এত ভালবাসলে দিদি?

কিরণময়ীর হৃদয়ের মধ্যে একটা কিসের ঝড় উঠিয়াছে বিন্দুবাসিনী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং এই সকল প্রশ্ন যে তাহারই বিকাশ, ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "কি যে বাজে ভাব দিদি, তার ঠিক নেই। মানুষ মানুষকে ভালবাসবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি?"

"সেটা তোমরাই দেখিয়েছ। যথার্থই তুমি কি আমার দুঃখ বুঝতে পেরেছ

দিদি ?"

"বিধবা নইলে বিধবার কথা কে বুঝবে দিদি ? মেয়ে মানুষই মেয়েমানুষের মনের কথা বুঝতে পারে।"

বিন্দুবাসিনীর হাত ধরিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "তাহ'লে দিদি অশ্রুকে তোমার পায়ের কাছে রেখে দিলুম। সে আজ থেকে তোমারই হ'ল। পৃথিবীতে আর তার কেউ নেই। সে বড় অভাগী, বড় অসহায়া। দিদি, আজ থেকে তুমিই তার মা হ'লে। আমি কখন প্রাণ দিয়ে তাকে ভালবাসতে পারিনি, সমস্ত হৃদয় দিয়ে স্নেহ কর্ত্তে পারি নি। যখনই আমি তার মুখের দিকে চেয়েছি, আর ভবিষ্যত ভেবেছি আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে একটা শুধু হাহাকার বসেছে, অব্যক্ত বেদনায় সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে, চোখের জলে সমস্ত বুকটা ভেসে গেছে। দিদি, তোমার পায়ে পড়ি অশ্রুকে কখন তাড়িয়ে দিও না। সে বড় দুঃখী। আমি মা হ'য়ে তার নির্দ্দোষ জীবনে কালিমা ঢেলে দিয়েছি। তার ইহকাল পরকাল নষ্ট করেছি।" চোখের জল আসিয়া কিরণময়ীকে আর কথা কহিতে দিল না। বিন্দুবাসিনীর চক্ষুদ্বয়ও আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"তা হ'লে আজ আর বাড়ী যাওয়া হ'ল না। তোমায় এ অবস্থায় ফেলে বাড়ী যাব কি ক'রে দিদি।"

দুইদিন সেখানে থাকিয়া তৃতীয় দিনের দিন স্বালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যা-বেলায় সুরেশের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সুরেশ একটী ডাক্তারী পুস্তক পড়িতেছে। অশ্রুকে আরোগ্য করিবার নিমিত্ত পুত্রের একটা ঐকান্তিক চেষ্টা দেখিয়া তিনি অত্যন্তই প্রীত হইয়াছিলেন। সেও যে তাঁহার মত কিরণময়ীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি দেখাইতে পারিয়াছে, আর ইহা যে তাঁহারই এতকাল শিক্ষার ফল, এইটুকু ভাবিয়া বিন্দুবাসিনী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।

জননীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া পুস্তকটী টেবিলের উপর রাখিয়া সুরেশ বলিল, "কিছু দরকার আছে মা ?"

বিন্দুবাসিনী খাটের উপর বসিয়া বলিলেন, "তুই যদি একলা অশ্রুকে ভাল কর্ত্তে না পারিস্, একটা কোন বড় ডাক্তারকে নিয়ে আয় না কেন। অতবড় ভারী রোগী কি তুই একলা সারাতে পারবি ?" সুরেশ একটু চঞ্চল হইয়া বলিল, "আজ হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন মা ? ওঁরা কি কিছু ব'লছিলেন ?" "না না দিদি কিছু বলেন্‌নি। আমিই ব'লছি। বরং আমি একথা পাড়তে দিদি বল্লেন—না দিদি তা হবে না, তাহলে অশ্রু আমার বাঁচবে না। তুই ছেলে মানুষ নতুন পাশ ক'রে বেরিয়েচিস্, তাই বলছিলুম না হয় কোন বড় ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ কর্।"

"অশ্রুর কথা বন্ধ হ'য়ে গেছে ব'লে তুমি একটু ভয় পেয়ে যাচ্ছ, না মা ? টাইফয়েড রোগে তো ওরকম হয়। ওতে ভয়ের কারণ বিশেষ কিছু নেই।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিন্দু-বাসিনী বলিলেন, "পোড়া গরুই রাঙ্গামেঘ দেখে ভয় পায় বাবা, তাই তোকে বলছিলুম। স্বেচ্ছায় সে দায়িত্বটা ঘাড়ে তুলে নিয়েছিস্, দেখিস্ বাবা ! শেষ পর্য্যন্ত যেন সেটা বজায় রাখতে পারিস্।"

"জানতো মা। তোমার আশীর্ব্বাদে, তোমার পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নিয়ে আমি এর চেয়ে আরও কত ভারী কাজ ক'রেছি। আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন এতেও আমি সফল হ'তে পারি।"

মাতার উপর পুত্রের অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি দেখিয়া বিন্দুবাসিনীর হৃদয় আনন্দে এবং গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। বিন্দুবাসিনী মনে মনে বলিলেন, "আমার ছেলের মতই ব'লেছিস্ সুরেশ। ঠিক এইটেই যে আমি তোর কাছ থেকে আশা ক'রেছিলুম।"

পরদিন কিরণময়ীর বাটী আসিয়া সুরেশ দেখিল কিরণময়ী অশ্রুর ঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া কাঁদিতেছেন। সুরেশকে দেখিয়া চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, "এস বাবা এস।"

"আজ অশ্রু কেমন আছে মা ?"

"সেই রকমই আছে বাবা, মোটেই

কথা কইতে পাচ্ছে না; শুধু মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তাইতে আমার প্রাণটা আরও ফেটে যায় যে বাবা। রতনকে ওর কাছে বসিয়ে তাই একটু বায়রে এসেছি। অশ্রুর ওমুখ আমি আর দেখতে পারিনা।"

কয়েক দিন হইতে অশ্রুর জিহ্বার জড়তা আসিয়া তাহার কথা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। শুনিতেও তেমন ভাল পাইত না। মাঝে মাঝে শুনিতে পাইলেও কোন কথার একেবারেই উত্তর করিতে পারিত না। ইসারায় বুঝাইতে চেষ্টা করিত।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সুরেশ অশ্রুর পাশে গিয়া বসিল এবং একটু চীৎকার করিয়াই ডাকিল, "অশ্রু!" অশ্রু তখন ঘুমাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে চক্ষুমেলিয়া চাহিয়া দেখিল সুরেশ আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া অশ্রুর যে খুব আনন্দ হইয়াছে ইহা তাহার মুখের ভাবে সুরেশ বুঝিতে পারিল। অশ্রু কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু পারিল না। সুরেশ একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কোনো কথা বলবার চেষ্টা ক'রো না, চুপ ক'রে থাক।"

রতন বলিল, "আর কত দিন দিদি-মণির এ ভোগান্তি আছে বাবু?"

"যত দিন কপালে লেখা আছে রতন।"

"কোন ভয়ের কারণ নেই তো বাবু?"

"না রতন; দু'চার দিন বাদেই তোমার দিদিমণি আবার কথা কইবে।"

একটু উচ্চ কণ্ঠেই এই কথা কয়টী সুরেশ বলিয়াছিল। অশ্রু আবার একবার চক্ষু মেলিয়া সুরেশের দিকে চাহিল, আবার কি বলিতে গেল বলিতে পারিল না। এবার অশ্রু কাঁদিয়া ফেলিল।

কথা কহিবার ইচ্ছা আছে অথচ কথা কহিতে পারিতেছে না, এদৃশ্যটী সুরেশের পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিল, "একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। কিন্তু এবার আর অশ্রু চক্ষু বুজিল না। একদৃষ্টে সুরেশের দিকে চাহিয়া রহিল—যেন বলিতে চেষ্টা করিতেছিল, "ওগো

কেন তুমি এত ক'রে আমায় যত্ন ক'চ্ছ? কেন তুমি আমায় বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টা ক'চ্ছ? আমি তো কখন এ ঋণ শোধ ক'ত্তে পারবো না। আমি যে বড় গরীব! না না, আমায় বাঁচাও। আমি মরে গেলে আমার দুঃখিনী মাকে দেখবে কে?”

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া অশ্রুর অশ্রু মুছাইতে গিয়া সুরেশ নিজেই কাঁদিয়া ফেলিল। ডাক্তার হইয়াও এ দৃশ্যটা তাহার কোমল প্রাণে অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক বলিয়া মনে হইয়াছিল। অধিকক্ষণ থাকিলে রোগীকে সান্ত্বনা দেওয়া দূরে থাক্ নিজেই কাঁদিয়া অধীর হইবে এই ভাবিয়া সুরেশ যাইবার নিমিত্ত শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অশ্রু আবার কাঁদিয়া ফেলিল। ভাষাহীন নয়নাশ্রুর ভিতর দিয়া যেন সে বলিয়া উঠিল, “না, না, যেওনা, যেওনা। আর একটু ব'স; তোমায় ভাল ক'রে দেখে নি। তুমি আমার পাশে ব'স। পায়ে পড়ি তোমার, এত শিগ্‌গীর যেও না। তুমি চলে গেলে যে আমি বাঁচব না! আর একটু থাক। আবার আমার নাম ধরে ডাক। তোমার গলার স্বর ভাল ক'রে শুনে-নি। আবার সে রকম ক'রে আমার দিকে চাও। যদি আমি আর না বাঁচি! আর যদি তোমায় দেখতে না পাই! ওগো! তোমার পায়ে পড়ি আর একটু থাক।”

বুঝি এ আর্ত্তনাদ, ভাষাহীন এ শব্দ সুরেশের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। সে আর যাইবার কোন চেষ্টাই না করিয়া ধীরে ধীরে অশ্রুর কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। অশ্রু চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিল।

ক্রমশঃ।

আগমনী।

শারদ সপ্তমী ঊষা,
বিকশিত নানাজাতি ফুল
কিশলয় :—
করিতেছে মাতৃ-আবাহন।
কিন্তু এই শুভদিনে,
বাঙ্গালীর হৃদুদ্যানে,
যে ফুল ফুটিয়া আছে,
পুষ্পাঞ্জলি দিতে আজ
মাতার চরণে ;—
লবে কি মা তুমি তাহা ?
দেখিবে কি বাঙ্গালীর ভবিষ্য-চিত্রণ ;
ঘুচাবে কি হৃদয় বেদন ?
হইয়াছে মরুভূমি
বাঙ্গালার স্বর্ণ-খনি
আছে মাত্র বাঙ্গালীর
মর্ম্মভেদী হাহাকার—
তাই কি দেখিতে দীনে,
আসিলি মা এই দিনে—
এ নহে সময় মাগো।
তৃপ্তি নাহি বাঙ্গালার।
তোরেই পাবার তরে
প্রাণেতে আকুল আশা ;
কিন্তু মাগো।
পাষাণের মেয়ে তুই
হৃদে কভু দয়া নাই :—
চির দিন রবে কি মা
হেন অন্ধকার ?
ঘুচায়ে মনের খেদ,
বাঙ্গালার দুর্ব্বিসহ
হৃদয়ের জ্বালা
বিতরি করুণা-কণা,
দাঁড়া মাগো ত্রিনয়না,
দেখিয়ে মোদের দু'ক
আনন্দ অপার।
আর কোন ভিক্ষা নাই
চরণে তোমার।

সম্পাদক।

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং। *

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।)

ভোজরাজের সভাপণ্ডিত উত্তররাম চরিত প্রণেতা মহাকবি ভবভূতি অতি অল্প বয়সেই সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া একজন মহা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পিতা কিন্তু তাঁহাকে অপরিণামদর্শী বালক জ্ঞানে সর্ব্বদা পাঠে অমনোযোগী বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন। ভবভূতি ইহাতে মনে মনে বিশেষ বিরক্ত হন; ভাবেন,—আমি এত বড় পণ্ডিত হইয়াছি যে, আমাকে পরাস্ত করিতে পারে এমন পণ্ডিত বিরল, তথাপি পিতা আমাকে পাঠে অমনোযোগী বলিয়া সর্ব্বদা ভর্ৎসনা করেন! ইহা আমার উপর তাঁর একান্ত অবিচার করা হইতেছে।

বৈশাখী পূর্ণিমা রাত্রি,—নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে পৃথিবী হাসিতেছে। প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে ভবভূতি ও অপর পার্শ্বে তাঁহার পিতামাতা শয়ন করিয়া আছেন। মধ্য রাত্রে তাঁহার মাতা পিতাকে বলিলেন, "দেখ, আজ পূর্ণিমার চন্দ্রমা কেমন সুন্দর!"

ভবভূতির পিতা একবার ভবভূতির দিকে চাহিলেন; তাহাকে নিদ্রিত মনে করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—"ও কি চাঁদ দেখিতেছ! উহা অপেক্ষা ঐ যে আর এক চাঁদ ওখানে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, —ও আরও কত বেশী সুন্দর! এই অল্প বয়সেই জ্যোৎস্নালোকের ন্যায় ওর জ্ঞানালোক ভুবন ছাইয়া ফেলিয়াছে!"

"তবে যে তুমি উহাকে পাঠাভ্যাসে রত না থাকিবার জন্য সর্ব্বদা তিরস্কার কর?"

"উহা ওর মঙ্গলের জন্যই আমায় করিতে হয়,—অন্যথা উহার মনে অহঙ্কার আসিয়া ওর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে। অহঙ্কারই যশোলাভের প্রধান অন্তরায়।"

---

* গল্পটি সম্পূর্ণ জনশ্রুতি ইহাতে কোনও ঐতিহাসিক-ভিত্তি নাই।

বস্তুতঃ ভবভূতি নিদ্রিত ছিলেন না। তিনি নীরবে পিতামাতার সকল কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। মনে মনে বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, —অকারণ পিতার উপর বিরক্ত হইয়া তিনি কি বিষম অন্যায় কার্য্যই করিয়াছেন। তিনি মহাপাপী,—পিতার নিকট বিধান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে।

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই ভবভূতি পিতৃসকাশে উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, "পিতঃ! যদি কেহ তাহার পিতার উপর অন্যায় বিরক্ত হয়, তাহা হইলে তার প্রায়শ্চিত্ত কি?"

তাঁহার পিতা অনুমানে সকল ব্যাপার বুঝিলেন; বলিলেন, "এক বৎসরকাল শ্বশুরালয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া অবস্থান করাই তার প্রায়শ্চিত্ত।"

বিবাহ করা অবধি ভবভূতি বহু সাধ্যসাধনা করা সত্ত্বেও কখন শ্বশুরালয়ে যান নাই। এখন হঠাৎ বিনা আহ্বানে,—বিশেষতঃ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে মহা সমস্যার কথা। সঙ্কল্পিত প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতেই হইবে; সুতরাং তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া শ্বশুরালয় যাত্রা করিলেন।

(২)

বহুকালের পর ভবভূতি শ্বশুরালয় আসিয়াছেন। চারিদিকে একটা মহা হৈচৈ কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামের পণ্ডিতগণ তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভবভূতি নির্ব্বাক,—বহু সাধ্যসাধনা দ্বারাও কেহ তাঁহাকে কথা বলাইতে সক্ষম হইল না। সকলে তাহাকে উন্মাদ কল্পনা করিল। কেহ বা শান্তিস্বস্ত্যয়ন কেহ বা চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিল। ভবভূতি সমভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শ্বশুরবাটীর আত্মীয় স্বজনেরা মহা বিষণ্ণ,— অনন্যোপায় হইয়া সাধ্যমত ভবভূতির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। অবশ্য দীর্ঘকাল গলগ্রহভাবে শ্বশুরবাটী অবস্থান করার দরুণ তাহার প্রতি যত্নের

বিশেষ কিছু ত্রুটী হইল না। ক্রমে বৎসর পূর্ণ হইয়া আসিল।

ভবভূতির কোনও সম্বন্ধী-পুত্রের অন্নপ্রাশন। আত্মীয় কুটুম্বে বাড়ী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সকলেই সাধ্যমত কিছু না কিছু যৌতুক লইয়া আসিয়াছে। স্বামী উন্মাদগ্রস্থ থাকায় ভবভূতি-পত্নী যে কিছু যৌতুক দিতে পারিতেছেন না, ইহাই তাঁহার মহা দুঃখ। তিনি মনঃকষ্টে রাত্রে শয়ন করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেইদিন ভবভূতির প্রায়শ্চিত্ত কাল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি পত্নীকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

হঠাৎ স্বামীকে কথা কহিতে দেখিয়া ভবভূতি-পত্নী স্তম্ভিত হইলেন। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "না, আমি আর কাঁদি নাই। তুমি যে কথা কহিয়াছ, ইহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়া গিয়াছে।"

ভবভূতি তাঁহার মৌনব্রত ধারণের কারণ আনুপূর্ব্বিক স্ত্রীর নিকট বিবৃত করিয়া কহিলেন, "এখন বল, কেন তুমি কাঁদিতেছিলে?"

অগত্যা ভবভূতি-পত্নী তাঁহার মনঃকষ্টের কারণ জানাইলেন। ভবভূতি কিয়ৎকাল কি ভাবিলেন; পরে বলিলেন, "দেখ, আমি গরীব ব্রাহ্মণ,—অর্থ সামর্থ্য আমার কিছুই নাই। বিদ্যাই আমার পরম সম্পদ। আমি একটী শ্লোক লিখিয়া দিতেছি। ইহার মূল্য দশ সহস্র মুদ্রা। তুমি এই শ্লোকটী কোথাও বিক্রয় করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশনে যৌতুক দান করিও। আমি কাল প্রাতেই এ স্থান ত্যাগ করিব।" ভবভূতি শ্লোক লিখিলেন,—

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়া-
মবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।
বৃণুতে হি বিমৃশ্যকারিণং
গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥

[অর্থাৎ, হঠাৎ কোনও কার্য্য করিও না—কেননা অবিবেচনাই যত অনর্থের মূল। যিনি বিবেচনা করিয়া সকল কার্য্য

করেন, গুণগ্রাহী সম্পদ তাঁহাকেই বরণ করিয়া থাকেন।]

(৩)

ভবভূতি-পত্নী সমস্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়াও শ্লোকটি বিক্রয় করিতে পারিলেন না। তিনি বিষণ্ণ-মনে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে এক বণিক-পুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই বণিক-পুত্রের বয়স প্রায় বিশ বৎসর। বাল্যাবধি ইহার পিতা প্রবাসী থাকায় জীবনে সে কখন কোনও অভিভাবকের শাসনাধীনে থাকে নাই। ফলে সে যথেচ্ছাচারিতারই প্রশ্রয় লইয়া বিশেষ-অমিতব্যয়ী ও বিলাসিতার দাস হইয়া পড়িয়াছিল। সে প্রয়োজন অপ্রয়োজন বিবেচনা না করিয়াই খেয়ালবশে ভবভূতি-পত্নীর নিকট হইতে এই শ্লোকটি ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইল; বলিল, "আমি আপাততঃ ইহার অৰ্দ্ধেক মূল্য অর্থাৎ পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিয়া ইহা ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। পরে ইহার দ্বারা যদি আমার কোনও কাজ হয়, তাহা হইলে আমি উহার অবশিষ্ট অৰ্দ্ধেক মূল্য প্রদান করিব।

ভবভূতি-পত্নী আর কোনও গত্যন্তর না দেখিয়া অৰ্দ্ধেক মূল্যেই শ্লোকটি বিক্রয় করিলেন।

বণিক-পুত্র তাহার সাহায্যে শ্লোকটিকে বড় বড় অক্ষরে প্রস্তরফলকে খোদিত করাইয়া নিজ শয়ন-কক্ষে স্থাপন করিলেন।

এই বণিক-পুত্র যখন মাত্র চারি বৎসরের শিশু, তখন তাহার পিতা বাণিজ্যার্থে বিদেশ গমন করেন। এতাবৎ তিনি একবার দেশে আসা ত দূরের কথা, স্ত্রী-পুত্রের কোনও সংবাদ পর্য্যন্ত রাখেন নাই।

ষোল বৎসর প্রবাস বাসের পর বণিক হঠাৎ একদিন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতে তাহার স্ত্রীর চরিত্র কিরূপ আছে—কোনরূপ ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য তাঁহার একান্ত বাসনা হইল। এ কারণ তিনি একেবারে গৃহাগত হইলেন না, বা তাহার স্ত্রীকে জানাই-

লেন না—নন্দা-তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সুযোগক্রমে একদিন নিশীথে বণিক চোরের ন্যায় গোপনে তাঁহার নিজের বাটীতে গমন করিয়া ধীর-পদবিক্ষেপে তাঁহার স্ত্রীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষে আলোক জ্বলিতেছিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী ঘোর নিদ্রায় অচেতন এবং তাহার পার্শ্বস্থ শয্যায় অপর একজন অপরিচিত যুবক নিদ্রিত।

এ দৃশ্যে বণিক তাঁহার স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী কল্পনা করিলেন। তাঁহার মনে স্বতঃই ক্রোধের উদয় হইল। ক্রমে তিনি এতাদৃশ আত্মহারা হইলেন যে, আর ধৈর্য্য-ধারণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; উভয়কেই তৎক্ষণাৎ হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি যেমন প্রথমে তার অপরিচিত যুবককে হত্যা করিবার জন্য অসি কোষমুক্ত করিয়া সজোরে উত্তোলন করিলেন, অমনি উহা দেওয়ালে সংলগ্ন প্রস্তরফলকে গিয়া সশব্দে লাগিল। শব্দে চমকিত হইয়া, তিনি পশ্চাতে একবার চাহিলেন; দেখিলেন, প্রস্তরফলকে বড় বড় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,—

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং"

তিনি ভাবিলেন—ঠিকই ত, সহসা ইহাদিগকে বধ করিবার প্রয়োজনই বা কি! ইহারা নিরস্ত্র, যখন ইচ্ছা ইহাদিগকে হত্যা করা যাইতে পারে। এখন দেখাই যাক্ না—ইহারা কি কৈফিয়ৎ দেয়।

অসি কোষবদ্ধ করিয়া বণিক তাঁহার স্ত্রীকে জাগাইলেন। তাহার স্ত্রী এরূপ গভীর রাত্রে শয়ন-কক্ষে স্বামীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, সহজে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

বণিক কোনওরূপ সম্ভাষণ বা ভূমিকা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যুবকটি কে?"

বণিক-পত্নী আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে "এ যে তোমারই সেই চারি বৎসরের শিশু" বলিয়া পুত্রকে জাগাইলেন এবং তাহার পিতার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। পুত্র পিতৃ-চরণে প্রণত হইলেন।

হঠাৎ কি সর্ব্বনাশই সাধন করিতে যাইতেছিলেন ভাবিয়া বণিকের হৃদয় দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। স্পন্দনবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, বণিক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শ্লোকটি তুমি কোথায় পাইয়াছ?"

অযথা অর্থব্যয় করার দরুণ পিতা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন ভাবিয়া পুত্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; কিন্তু পিতার জেদ দেখিয়া উত্তর করিল, "মহাপণ্ডিত ভবভূতির পত্নীর নিকট হইতে উহাকে অর্দ্ধেক মূল্য অর্থাৎ পাঁচ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছি।"

বণিক বলিলেন, "উহার প্রকৃত মূল্য দশ সহস্র মুদ্রা অপেক্ষা আরও কত বেশী তাহা নির্ণয় করা আমার সাধ্যাতীত। কল্য প্রাতেই তুমি উহার স্বরূপ মূল্য প্রদান করিয়া আসিবে।"

গুরু ও ঋত্বিক করণ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(লেখক — শ্রীচন্দ্রশেখর নাথ)

এই ত গেল শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতির কথা, এ দিকে তন্ত্রও বলিতেছেন,—

"শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান॥
আশ্রমীধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহেশক্তোগুরুরিত্যভিধীয়তে।

যিনি শান্ত (অদুষ্ট বা সৌম্যমূর্ত্তি), দান্ত (দমগুণবিশিষ্ট), বিনয়ী, শুদ্ধবেশ-সম্পন্ন, শুদ্ধাচারবিশিষ্ট, সুপ্রতিষ্ঠ (প্রতিভাশালী), সর্ব্বদা শুচি অবস্থায় থাকেন, ধর্ম্ম-শিক্ষাদানে পারদর্শী, সুবুদ্ধিমান্, আশ্রমবাসী, ধ্যানপরায়ণ, তন্ত্র-মন্ত্র বিশারদ, শিষ্যের প্রতি দয়া বা কুপথগামী শিষ্যকে স্বধর্ম্মে রত করাইতে সক্ষম, ঋষিরা তাঁহাকেই গুরু বলিয়া থাকেন।

অপিচ, আগম সংহিতাও বলেন,—

"উদ্ধর্তুঞ্চৈব সংহর্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তপস্বীসত্যবাদী চ গৃহস্থোগুরুরুচ্যতে॥

যিনি মন্ত্রদানাদি দ্বারা উদ্ধার করিতে

ও পাপ বিনাশ করিতে সমর্থ হন এবং যিনি তপস্বী, সত্যবাদী ও গৃহী, তাদৃশ ব্রাহ্মণই গুরুপদবাচ্য। অর্থাৎ তিনিই গুরুর উপযুক্ত পাত্র। তথাহি তন্ত্রার্ণব তন্ত্রে,—

"গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।
উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তে স্ত্রিতয়াত্ম গুরুঃস্মৃতঃ"
গুশব্দে অন্ধকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

'গ'কার সিদ্ধি বা জ্ঞানদাতা, 'রেফ' পাপহারক এবং 'উকার' শব্দে শঙ্কর উক্ত হইয়াছেন। অতএব এই ত্রিবিধ বর্ণ সংযোগে গুরু শব্দ সাধিত হয়। অথবা 'গু' শব্দে অন্ধকার, 'রু' শব্দ তন্নিরোধক, সুতরাং অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করেন বলিয়াই গুরু, নতুবা গুরুর বংশধরেরা গুরু নহেন।

"অভিসপ্তমপুত্রঞ্চ কদর্য্যং কিতবং তথা।
ক্রিয়াহীনং শঠঞ্চাপি বামনং গুরুনিন্দকং॥
জলরক্তবিকারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ মতিমান্ সদা।
সদামৎসর সংযুক্তং গুরুং তন্ত্রেণ বর্জ্জয়েৎ॥
ইতি বামলতন্ত্রম্।

অভিশাপগ্রস্ত, পুত্রহীন, কদাকার বা কুৎসিত, ক্রিয়াহীন, বামন (খর্ব্বাকার), গুরুনিন্দক (গুরুর নিন্দাকারী বা অতিশয় নিন্দুক), জলোদর ও বাতরক্তাধিকারী প্রভৃতিকে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া অপর গুরু গ্রহণ করিবেন। এবং যিনি সর্ব্বদা মৎসর (সর্ব্বদা স্বার্থানুসন্ধি), তাহাদিগকেও তন্ত্রোক্ত প্রমাণের দ্বারা শাস্ত্রকার পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন। সংক্ষেপে এই গুরুকরণ বিষয় বলা হইল, এক্ষণে পুরোহিত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

"পুরোজনস্য হিতং সাধয়তি যঃ স পুরোহিতঃ।" যিনি পুরোজনের অর্থাৎ যজমানের হিতসাধন করেন, তিনিই পুরোহিত-পদবাচ্য কিন্তু এখন আর ঐরূপ অর্থ করিলে চলিবে না।

এখন যিনি পুরোজন বা যজমানের পুরদস্তুত অহিত সাধন করিতে পারেন—তিনিই প্রকৃত পুরোহিত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে পুরোহিত বলিতে গেলে, পুরোহিতবংশীয় কোন এক জন শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত স্বার্থাভিলাষী ব্যক্তিবিশেষকেই বুঝাইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান-পরিশূন্য অজ্ঞ বা মূর্খদিগের দ্বারা ধর্ম্মক্রিয়া

করাইয়া, পশুক্রিয়া করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও আমরা অজ্ঞতাবশতঃ তাহাই করিয়া থাকি। পশুক্রিয়া করিয়া ধর্ম্মে পতিত হওয়া অপেক্ষা না করাই মঙ্গলজনক।

"দ্বিবিধং কর্ম্মকাণ্ডং স্যান্নিষেধবিধিপূর্ব্বকম্।
নিষিদ্ধকর্ম্মকরণে পাপং ভবতি নিশ্চিতম্।
বিধানকর্ম্মকরণে পুণ্যং ভবতি নিশ্চিতম্।
ত্রিবিধ বিধিকূটঃ স্যান্নিত্যনৈমিত্তকাম্যতঃ
নিত্যেহকৃতে কিল্বিষং স্যাৎ কাম্যে নৈমিত্তিকে ফলম্
দ্বিবিধন্তু ফলং জ্ঞেয়ং স্বর্গো নরক এব চ।
স্বর্গে নানাবিধঞ্চৈব নরকে চ তথা ভবেৎ।
পুণ্যকর্ম্মাণি বৈ স্বর্গো নরকং পাপকর্ম্মণি।
কর্ম্মবন্ধময়ী সৃষ্টি র্নান্যথা ভবতি ধ্রুবম্॥
ইতি শিবসংহিতা ১ম পটল

কর্ম্মকাণ্ড দুই প্রকার—নিষেধ ও বিধি সঙ্গত। নিষিদ্ধ বা বিপরীত কর্ম্মকরণে পাপসঞ্চয় হয় এবং বিধিবিহিত ক্রিয়া আচরণে পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। বিধিবিহিত কর্ম্ম ত্রিবিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। নিত্যকর্ম্মের দ্বারা দৈনিক পাতক নষ্ট হয়, কাম্য ও নৈমিত্তিক কার্য্যে পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। কর্ম্মফল দ্বিবিধ—স্বর্গ ও নরক। স্বর্গে যেরূপ নানাবিধ ভোগ হয়, নরকেও তদ্রূপ নানাপ্রকার ভোগ হইয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্ম বা বিধিবিহিত কর্ম্মে স্বর্গভোগ এবং বিপরীত বা পাপকার্য্যে নরকভোগ হয়। ইহজগৎ এই প্রকার কর্ম্মবন্ধময়, পাপ বা পুণ্য যাহা করিবে, তাহার ফল নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে, কোনমতেই ইহার অন্যথা হইবে না।

সুতরাং গুরু বা পুরোহিত গ্রহণ করিতে হইলে একটু দেখিয়া শুনিয়াই করা কর্ত্তব্য।

যদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যে,—

"পুরোহিতঞ্চ কুর্ব্বীত দৈবজ্ঞমুদিতোদিতম্।
দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলমথর্ব্বাঙ্গিরসে তথা।
৩১৩ ১ম অধ্যায়।

দৈবকার্য্যে পারদর্শী (গ্রহোৎপাত ও শান্তির উপায়বেত্তা), শাস্ত্রোক্ত বিদ্বান্ বা দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, সদ্বংশীয়, অনুষ্ঠানসম্পন্ন, দণ্ডনীতি বা অর্থশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নকারী, অথর্ব্বাদি রসোক্ত বা অথর্ব্ববেদোক্ত শান্ত্যাদি কার্য্যে সুনিপুণ, এমত ব্যক্তিকে ঋত্বিক বা পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী করিবেন।

শনিবার।

(শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে)

"শনি" তুমি নাম ধর, কার্য্যে "বৃহস্পতি"।
বিরহ-বিধুরা-নারী পাবে আজি পতি॥
পল্লীগ্রামে দুর্গোৎসব প্রতি শনিবারে।
হপ্তা বাদে বাসা ছেড়ে পতি আসে ঘরে॥
তোমার নামেতে আহা! কত মধু ঝরে।
কেরাণী-কুলের বন্ধু, এস ধীরে ধীরে॥
জানাইতে ললনারে সুদিন উদয়।
বিরহের অবসান তোমার কৃপায়॥
দু'টি কাল' চোক্ আজি হেরিবে কেরাণী।
তাই, কেহ ছোটে শিয়ালদা কেহ বেলেঘাটা।
হাওড়ায় যায় কেহ, বেজে গেছে দুটা॥
খাবার কাহার' হাতে কার' হাতে পান।
নবীনা যুবতী যার,—তার মুখে গান।
কত হর্ষে, কত বেগে, উঠিছে গাড়ীতে।
মনের আনন্দে সব পৌঁছিবে বাড়ীতে॥
ওদিকে ঘরেতে কান্তা বাঁধিতেছে কেশ।
দর্পনেতে রাখি মুখ হাসিতেছে বেশ॥
প্রাণেশ আসিলে আজি কথা নাহি কব।
প্রথমে দেখাব ভাল পরে শোধ লব॥
কুলের কামিনী যত, লজ্জাবতী লতা।
পুরো হপ্তা সয়েছেন বিরহের ব্যথা॥
মিটাবে(ন) প্রাণেশ এসে, আজ শনিবারে।
সহিছেন যত ব্যথা—যৌবনের ভারে॥
অভিমানী ভার্য্যা যার, সে ভাবিছে মনে।
ভাঙ্গাতে হইবে মান, ধরিয়া চরণে॥
তিরস্কারে কয় যবে—"দাও অলঙ্কার"।
কানের ভিতরে পশে মধুপ ঝঙ্কার॥
কি করিব, কোথা পাব? কেরাণীর প্রাণ।
কেমনে রাখি গো বল মানিনীর মান॥
নূতন বিবাহ যার, সে ভাবিছে মনে।
কখন মিলিব আমি প্রিয়তমা সনে॥
কিনিয়াছি প্রিয়া তরে সুগন্ধি সাবান।
কোমল করেতে দিয়া, রাখিব গো মান॥
সোমবারে প্রিয়া ছাড়ি' এসেছি সহরে।
প্রফুল্ল বালিকা আহা! পড়ে আছে ঘরে॥
প্রতিদিন পত্র লিখি, না পাই উত্তর।
মেসের আবাসে থেকে প্রেমে জর জর॥
ধন্য তুই ওরে শনি! তোরই কৃপায়।

সোহাগে ধরিব হৃদে, প্রদোষে প্রিয়ায় ॥
কৈশোর ছাড়িয়া যারা পড়েছে যৌবনে।
হয়েছে শিশুর পিতা, ভাবে তারা মনে ॥
পুরো হপ্তা সহিয়াছি সাহেবের রোষ।
বিধুমুখী ভার্য্যা দেখি, পাইব সন্তোষ ॥
প্রিয়ার কোলেতে শিশু, দেখিলে নিশায়।
কত সুখ, কত শান্তি উছলিয়া যায় ॥
সংসারের জ্বালা কিম্বা দারিদ্র্য পীড়ন।
মুছে যায় প্রাণ হতে না থাকে বেদন ॥
চাঁদের জ্যোছনা আর ফুলের সৌরভ।
মলয় বাতাস আর কোকিলার রব ॥
একাধারে শোভে আজি কেরাণীর প্রাণে।
এসেছি সহর ছাড়ি, প্রণয়ের টানে ॥
বাপের পলিত কেশ কি বলিব হায়।
জোলো দুধ মরে যেন ক্ষারেতে দাঁড়ায় ॥
কত রস, কত সুধা পড়ে গাল বেয়ে।
গৃহেতে দাঁড়ালে গিয়ে গিন্নী আসে ধেয়ে ॥
গৃহেতে বসিয়া বলে "দুধে কেন জল?"
তোমার কাছেতে এবে সকলি বিফল ॥
উত্তরে গৃহিণী কহে "কি করিব বল।
আগে ছিল যত দ্রব্য সকলি আসল ॥
নূতনে আদর হয়, পুরাতন ফেলে।
নাবিকের কিবা সুখ ভাঁটা পড়ে এলে ॥
জোয়ারের স্ফীত বক্ষ দেখেছ নদীতে।
কভু উচ্চে, কভু নিম্নে তরণী নাচিতে ॥
তরুণী ছিলাম যবে, ওগো মোর বিভু!
সকলি বিফল হ'ল, বলেছিলে কভু?
যৌবনে খেয়েছ যাহা, এবে কোথা পাবে।
সেকাল একাল হায়! ভেবে কিবা হবে ॥"
শনির দোহাই দিয়া বৃদ্ধ কয় পুন।
বুড়ারো হ'য়েছে দেখ নবীন-যৌবন ॥
শনিবারে আসে যেন মরা গাঙ্গে বান।
দুর্ব্বল কেরাণী প্রাণে ফোটে কত গান ॥
এই দিনে কেন গিন্নী হেন কথা কও?
হপ্তা পরে আসিয়াছি, আজি মোর হও ॥
জামাই বাবুরা যারা, শনিবার পেয়ে।
চোরের মতন যান শ্বশুর আলয়ে ॥
ফিট্ ফাটে দেহ ঢাকা, যেন ঘেরাটোপ।
পালিশ্ করেছে মুখ মেখে চেরী সোপ ॥
এসেছে জামাই বাবু পড়ে গেল গোল।
বলেছি ত দুর্গা পূজা, নাহি খালি ঢোল।
আদরে জামাই বাবু যাইলে উপরে।
পেলবা সুন্দরী যত আসে ধীরে ধীরে ॥
জামায়ের চারিদিকে সুন্দরীর বেড়া।

লেডিস্মিতে বসে, হায়! বাবু হন মেড়া॥
কত ব্যথা, কত শ্লেষ, দাশুরথী ছড়া।
সুন্দরীর মুখে ছোটে জলের ফোয়ারা॥

কে বলে ললনা তুমি—সরলা অবলা।
গৃহের প্রাঙ্গণে দেখি—তুমি পাহারলা॥

বাবুদের "বাবু" তুমি, প্রণয়ের খনি।
সরমের সরভাঙ্গা অয়স্কান্ত মণি॥

কেমনে বর্ণিব আমি, কত তব গুণ।
তোমার কৃপায় ওগো! দেহে ধরে ঘুণ॥

মুঠার ভিতরে রাখ ম্যাজিষ্ট্রেট কত।
দুর্ব্বল কেরাণী যারা, তারা হয় হত॥
আঁখিঠেরে দাও তুমি প্রাণ নাথে ফাঁসী।
তোমার চরণ তলে গয়া গঙ্গা কাশী।"
এস শনি, হের আজি মধুর মিলন।
নলিন বদনে কত সোহাগ-চুম্বন॥
বি-এ, এম-এ, নহি আমি, ওগো মোর শনি।
বিদ্যাবুদ্ধি নাহি বেশি, সামান্য কেরাণী॥
আপিসে বসিয়া রচি, "কাব্যি" তব নামে।
আলোচনা তরে আজি পাঠালুম খামে॥

সয়তান।

(শ্রীজীবনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লিখিত।)

অদ্বৈতবাদের ও দ্বৈতবাদের বিচার বিতর্ক চিরকালই চলিতেছে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সদাত্মার সহিত অসদাত্মার বিবাদ প্রসঙ্গে একেশ্বরবাদ টিকিতেছে না। ঈশ্বর—শান্তি বা পুণ্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। সয়তান—অশান্তি বা পাপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এক দিকে দেবগণ, অপর দিকে দেবদ্বেষী দানবগণ। বাইবেলের মধ্যে "লুসিফার" এক সময়ে স্বর্গে অতিপ্রিয় দেবদূত ছিল। ঈশ্বরের সহিত বিদ্রোহাচরণ করায় সে স্বর্গচ্যুত হয়।

অসদাত্মার সর্পরূপ পরিগ্রহের বিষয় প্রায় সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত আছে। একেশ্বরবাদ কোথাও পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নাই। আদম ও ইভ সর্পরূপী সয়তানের মতলবে জ্ঞানবৃক্ষের ফলভক্ষণ করিয়া স্বর্গ

ভ্রষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের "মার" বাইবেলের "লুসিফার" ও কোরাণের ইবলিস্ একই অবস্থায় পড়িয়াছিল। ইহাতে আমাদের ঋগ্বেদের বৃত্রাসুর বধ হইতে সয়তানের উপাখ্যান রচিত হইয়াছে ইহা প্রতিপন্ন করা সহজ হইয়া পড়ে। ইউরোপের পণ্ডিতেরা বলেন—সর্পরূপী সয়তানের কল্পনা জোরায়াষ্টারের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুকৃতি। এই ধর্ম্মে পরমেশ্বরের নাম জারুন আকরণ (অনন্তকাল) ধর্ম্মেশ্বরের নাম আহুরা মজদা। আর অধর্ম্মেশ্বরের নাম আংরো মেইন। আহুরামজদা আলোকের আর আংরো-মেইন অন্ধকারের স্রষ্টা। উভয়ই ঈশ্বর, যুগপ্রলয় পর্য্যন্ত পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। আধিদৈবিক অর্থে "ইন্দ্র" বলিলে সূর্য্যকে বুঝায়। বৃত্র অর্থে আবরণ বা সূর্য্যের আবরণ মেঘ। "আলোকের আধার সূর্য্যের সহিত অন্ধকারের জনয়িতা, বৃত্রের বা মেঘের অবিরাম দ্বন্দ্ব চলিতেছে।" যখন বৃত্র জয়লাভ করে, সূর্য্যকে দেখিতে পাওয়া যায় না—পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়।

যদিও সূর্য্যরশ্মি ক্রমাগত বাধা পাইতেছে, তরুলতা, এমন কি প্রাণী পর্য্যন্ত মারা যাইতেছে, কিন্তু ইন্দ্র বা সূর্য্যই শেষে জয়লাভ করিতেছেন, এ কথা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। অর্থাৎ মেঘ জল হইয়া ধরিত্রীবক্ষে নিপতিত হইতেছে। আধ্যাত্মিক অর্থে ইন্দ্রই পরমেশ্বর। তিনিই আলোকদাতা, জীবনদাতা, জ্ঞানদাতা এবং সকল ধর্ম্ম ও সত্যের আধার।

সূর্য্য যেমন মেঘে ঢাকা পড়েন এবং তাহাতে যেমন পৃথিবীতে অন্ধকার হয়, সেইরূপ জ্ঞানসূর্য্য কুপ্রবৃত্তির দ্বারা আবৃত হন এবং তাহাতে হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। বৃত্রের সাহায্যকারী বলিলে রিপুগণকে ও অসংখ্য কুপ্রবৃত্তিকে বুঝাইয়া থাকে। এরূপ অর্থ ধরিলে প্রায় সকল কথাই উড়াইয়া দেওয়া যায় বটে কিন্তু সকল সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে আমাদের সনাতন ধর্ম্মমতেরই ছায়াপাত হইয়াছে, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গ্রীক পুরাণোক্ত সপক্ষ স্বনখর এবং অগ্নিশ্বাসী সর্প বিশেষের ড্র্যাগন। জেসন এবং

ক্যাডমাস ড্র্যাগনের দন্ত বপন করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে সশস্ত্র সৈন্যগণ উত্থিত হইয়া পরস্পরকে যুদ্ধে নিহত করে। ভবিষ্যধ্বংসের বীজ বা বিষবৃক্ষ বলিলে ইংরাজী ভাষায় Dragons teeth বুঝায়।

রমানাথ সরস্বতী বলেন—বৃত্র একজন আসিরিয়া দেশীয় দলপতি। সমগ্র আর্য্যভূমিকে জনশূন্য করিবার মানসে অদিসুর নাম্নী দেবীর আরাধনায় অকৃতকার্য্য হওয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক সবংশে নিধন হয়। তাহা হইলে আর্য্যজাতির সহিত সেমিতিক জাতির যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অনুমিত হইতে পারে।

বৃ ধাতু হইতে বৃত্র, আবরণার্থে এবং হন ধাতু হইতে অহি হননার্থে।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে জানা যায় যে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিলে ব্রহ্মহত্যা আসিয়া ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল। তজ্জন্য দেবরাজকে পরিতাপ করিতে হইয়াছিল এবং সুখ তাহার অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবেশ করে নাই।

গুণবান ব্যক্তি যদি লজ্জা পান এবং পরের নিকট নিন্দাভাজন হন, তাহা হইলে তিনি গুণ সত্ত্বেও সুখ বোধ করিতে পারেন না। পুরন্দর দেখিলেন—ব্রহ্মহত্যা মূর্ত্তিমতী চণ্ডালীর ন্যায় তাঁহার পশ্চাতে দৌড়িয়া আসিতেছে, জরাহেতু তাঁহার দেহ কম্পিত হইতেছে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়াতে সে রক্তাক্ত বসন পরিধান করিয়াছে এবং পক্ক কেশ বিকীর্ণ করিয়া কহিতেছে—দাঁড়াও দাঁড়াও। তাহার নিশ্বাসবায়ু হইতে মৎস্য গন্ধ বহির্গত হইতেছে। সে পথ অপবিত্র করিয়া আসিতেছে ইত্যাদি।

এই সমস্ত দর্শন করিয়া ইন্দ্র আকাশ ও সর্ব্বদিক্ ভ্রমণ করিয়া মানস সরোবরে প্রবেশ করিলেন এবং পদ্মমৃণালের সূত্র মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। সহস্র বৎসর তিনি আশ্রয় পাইলেন না। কারণ অগ্নি তাঁহাকে আশ্রয় আনিয়া দিতেন, কিন্তু অগ্নির জল মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা ছিল না।

(ক্রমশঃ)

দৈবী-গতি।

(পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব, লিখিত)।

একদা আকাশ পথে কপোত-দম্পতী,—
বিহরিছে মনসুখে, দৈব-ঘটনায় ·
আকুলিত কপোতিকা বলিছে স্বামিন !
অধুনা অন্তিমকাল কি হবে উপায় ?
হস্তে ধনু ব্যাধ এক বধিতে দোহায়,
অব্যর্থ সন্ধানে দেখ আসিছে ধাইয়া ;
কপোত কহিছে আরো দেখলো উপরি,—
কালান্তক সম শ্যেন আসিছে ছুটিয়া।
রক্ষা আর নাহি যদি নিম্নপথে যাই ,
ব্যাধের হস্তেতে তবে মরণ নিশ্চিত ;
উপরে উঠিলে শ্যেন সাক্ষাৎ শমন,
ধরিবে, বধিবে প্রাণ কি হবে বিহিত ?
নিশ্চয় হয়েছে প্রিয়ে কাল সমাগত,
একমনে চিন্ত এবে দেব ভগবান ,
পরকালে হবে শুভ শাস্ত্র সম্বিদিত,
কপোত কপোতী মনে স্মরে ইষ্ট নাম।
ঈশ্বর রাখেন যারে, কি করে বিপৎ,
হেনকালে দেখ তথা শমন প্রেরিত,
কৃষ্ণসর্প ব্যাধপদে দংশিল হঠাৎ,
হস্তস্থিত ধনু হতে শর হল চ্যুত।
বায়ুবেগে ছুটী শর শ্যেনেরে বিধিল,
শরাঘাতে পড়ে শ্যেন ব্যাধ অচেতন,
সভয়ে নয়ন খুলি কপোত যুগল,
ব্যাধ ও শ্যেনের দশা করে দরশন।
পুলকে রোমাঞ্চ তনু কপোত কপোতী,
নির্ভীব হইয়া বলে দেব দয়াময় !
তুমি যারে রাখ তারে কি করে নিয়তি ?
বিপদের বন্ধু তুমি জয় তব জয় ॥

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, বি এ)

অশ্রুর সেই বেদনা পূর্ণ নয়নের দৃষ্টি, ভাষাহীন হৃদয়ের কথা, অব্যক্ত কাত-রোক্তি আজ কয়েকদিন হইতে সুরেশকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, অত্যন্ত

অন্যমনস্ক করিয়া দিয়াছে। শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরেই কি সুরেশ অশ্রুর জন্য অক্লান্ত ভাবে এত পরিশ্রম করিত? সুরেশ ভাবিয়া দেখিল, কর্ত্তব্য ছাড়া আরও যেন কিছু তাহাকে দিন দিন অশ্রুর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

আজকাল সুরেশের অজ্ঞাতেই অনেক সময়ে অশ্রুর সেই ম্লান ফ্যাকাসে মুখখানি, বড় বড় দুটো চখের কোণে ভরা জল, কৃতজ্ঞতা পূর্ণ নয়নের সেই দৃষ্টি, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহখানি তাহার হৃদয়ে ভাসিয়া উঠিত। সেই সঙ্গে সুরেশও যেন অশ্রুর হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত বেশী পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাইত। যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায় অশ্রুর হৃদয়ের মধ্যে সে শুধু নিজেরই প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইত।

একদিন সন্ধ্যার পর শুইয়া শুইয়া সুরেশ কত কি ভাবিতেছিল,—এমন সময় ইন্দু আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে তখন আলো ছিল না। অন্ধকারে সুরেশ ইন্দুকে দেখিতে পায় নাই। ইন্দু কাছে আসিতেই সুরেশ একটু চমকিয়া বলিয়া উঠিল, "কে?" ইন্দু বলিল, "চিন্তে পাচ্চ না সুরেশদা?"

আলোর সুইচ টিপিয়া সুরেশ বলিল, "কে? ইন্দু? শ্বশুরবাড়ী থেকে কবে এলি ইন্দু?" খাটের উপর বসিয়া ইন্দু বলিল "আজই এক্ষুণি এসেছি।" কিছুক্ষণ ইন্দুর দিকে চাহিয়া সুরেশ বলিল, "এক-মাসের মধ্যে তোর এত পরিবর্ত্তন হ'য়ে-গেছে! অসুখ ক'রেছিল?" "অসুখ কেন ক'রবে! আমি কি বড় রোগা হ'য়ে গেছি সুরেশদা?

"শুধু তো রোগা হ'সনি ইন্দু। চেহারাটা বড় বিশ্রী হ'য়ে গেছে, এখন আর শ্বশুরবাড়ী যাবি নি তো?"

ইন্দু একটু হাসিয়া বলিল, "তারা তিন দিনের কড়ারে আমায় পাঠিয়েছে সুরেশদা। মেয়াদ ফুরুলেই আবার গিয়ে ঘানি টানতে হবে।"

"তাইতো! আবার তাহ'লে তুই যাবি?"

"তুমি কি বল সুরেশদা, যাওয়া কি আমার উচিৎ নয়?"

"যাবি বৈকি ইন্দু, শ্বশুরবাড়ী যাবি নি ?"

"আমিও তাই ভাবছিলুম, যেতে যে আমাকে হবেই। তা ছাড়া আর তো কোন উপায় নেই।"

সুরেশ খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল—তারা তোকে বড় কষ্ট দেয়, না ?

হাসিয়া ইন্দু বলিল, তুমি কষ্ট কাকে বল সুরেশদা! মানুষ যেটা সহ্য করতে পারে না, সেইটেই তো কষ্ট। তা আমার কাছে তো সবই গা সওয়া হয়ে গেছে সুরেশদা; কাজেই কষ্ট বলে আমার আর কিছুই নেই। সুরেশ কোন উত্তর করিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে ইন্দু বলিল—ওসব বাজে কথা যাক্ সুরেশদা। ওতো একঘেয়ে চিরসঙ্গী আমার আছেই। আমি এত তাড়াতাড়ী তোমার কাছে কেন এলুম জান ?

কেন ?

তুমি যে আমায় সেই মেয়েটীর কথা লিখেছিলে তারই বিষয়ে জানতে এলুম।

একটু চঞ্চল হইয়া সুরেশ বলিয়া উঠিল —ও, অশ্রুর কথা বলছিস্ ?

হাঁ, তুমি যে লিখেছিলে তাদের বাড়ী আমায় নিয়ে যাবে। কালই আমায় নিয়ে চল সুরেশদা ? পরশুতো আমায় আবার শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে।

আমার কোন আপত্তি নেই ইন্দু। কাকি-মা যদি রাগ করেন ? বীরেন যদি টের পায় ? তুই যে আজ কাল বড় পরাধীন ইন্দু।

তোমরাইতো আমাদের পরাধীন করে রেখে দাও সুরেশদা। আবার আমরা পরাধীন বলে তোমরাই আমাদের ওপোর দরদ দেখাও। আমি যাবই সুরেশদা—যে যাই বলুক।

"কাল থাক ইন্দু। আর একদিন তোকে নিয়ে যাব। ভাল করে সে সেরে উঠুক।"

মুখটা একটু গম্ভীর করিয়া বিষাদভাবে ইন্দু বলিল,—তার আগে কি আমায় যেতে নেই সুরেশদা ? তুমি যে আমায় লিখেছিলে, অশ্রু আমারই মত দুঃখী। সেই জন্যেই তো তাকে দেখবার জন্য আমার

এত আগ্রহ। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল,—আচ্ছা সুরেশদা, সে কি সত্যসত্যই আমার মত দুঃখী? এতটা বোধ হয় না, না?

সুরেশ দেখিল, ইন্দু কান্না চাপিবার চেষ্টা করা সত্বেও তাহার চক্ষের জলে চাদরের খানিকটা ভিজিয়া গিয়াছে।

সুরেশ বলিল, কাঁদিসনি ইন্দু কালই তোকে তার কাছে নিয়ে যাব। তারও একটা কথা কবার লোক হবে।

আমারও একটা প্রাণ খুলে কথা কবার লোক হবে সুরেশদা।

এমন সময়ে বীরেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল,—বাঃ! ভাই বোনে দেখছি যে বেশ জমিয়েছ। মান-ভঞ্জনের পালা হচ্ছে বুঝি? ভাল, ভাল।

ইন্দু ঘোমটা দিয়া অন্য দ্বার দিয়া চলিয়া গেল।

ইন্দুর সহিত বীরেনও আসিয়াছিল। দুইদিন শ্বশুরালয়ে থাকিয়া ইন্দুকে লইয়া পুনরায় চলিয়া যাইবে, ব্রজবালার সহিত সেইরূপ কথা হইয়াছিল।

বীরেনের শ্লেষোক্তি শুনিয়া সুরেশের আপাদ মস্তক জলিয়া গেল! কিন্তু অনেকটা সামলাইয়া লইয়া বলিল,—"এই যে বীরেন বাবু! এস, বস।"

বীরেন বলিল, "আজ কাল প্রেমের ব্যবসাও খুলেচ না কি হে?" "তা প্রেমের ব্যবসাটা কি কিছু মন্দ নাকি? তুমি কি বল?" "আরে রামঃ মন্দ বলে কোন্ শালা। মেয়ে মানুষের জন্মই তো তাদের নিয়ে পুরুষ মানুষরা ছিনিমিনি খেলবে বলে।"

সুরেশের সেই কতকগুলি পত্র ইন্দুর বাক্সর ভিতর পাওয়া পর্য্যন্ত বীরেনের সন্দেহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইন্দুকে এবং সুরেশকে নির্জ্জনে একসঙ্গে দেখিবার জন্য সেই দিন হইতেই তাহার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। আজ তাহা সফল হইল!

বীরেনের কথা শুনিয়া সুরেশ বলিল, "তোমার তো বেশ মনের উচ্চতা দেখছি বীরেন বাবু! তুমি পুরুষ মানুষ বলে নিজেকে গর্ব্ব করো?"

"মাইরি বল কথাটা কি নেহাৎ মিথ্যে বলেছি ?"

"তা'হলে কি তুমি বলতে চাও যে মেয়েমানুষের একটা হৃদয়, প্রাণ, নিজস্ব ব'লে কিছু নেই ?"

হাঃ হাঃ হাঃ !!! করিয়া হাসিয়া বীরেন বলিল,—"তুমিও যেমন—তাদের আবার প্রাণ। এই যেমন দেখনা কেন তোমার বোনের, ওর কি হৃদয় কিংবা প্রাণ ব'লে কোন জিনিষ আছে ? স্ত্রীলোকদের ভগবান সৃষ্টিই করেছেন—পুরুষ মানুষরা তাদের উপভোগ করবে বলে। তারপর যখন অরুচি জন্মে যাবে, উচ্ছিষ্টের মতন আস্তা-কুড়ে ফেলে দিলেই হল। এই তোমার বোন্‌কেই ধর না কেন—

বাধা দিয়া সুরেশ বলিয়া উঠিল—"থাক্ থাক্,ইন্দুর নাম তুমি মুখে এনো না বীরেন। তোমার মুখে ওনাম শোভা পায় না।"

"কেন বাপ্, ইন্দুর নামে তোমার প্রাণে এত ব্যথা লাগল কেন ! তাহ'লে দেখছি তোমার বোনটী তো বড় সোজা লোক্ নন্।"

সুরেশ বেশ একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "তুমি তা'বলে যেন ওকে সোজা ক'ত্তে যেও না বীরেন বাবু। তার আগে নিজে একটু সোজা হবার চেষ্টা কোরো।"

"আচ্ছা ভায়া সত্যি ক'রে বল দিকি তোমার বোনটী লোক কেমন ?"

"বোনটী আমার কি রকম জান ! ঠিক যেন একতাল সোনা। যেমনি ছাঁচে ফেলবে, তেমনি গড়ন হবে। একতাল কাদা মনে করে যেন পায়ে দলে যেও না। বরং আমার ভয়—তোমার মতন একতাল গোবরের কাছে বোনটী আমার কতদিন খাঁটি সোনা থাক্‌বে। তবে সে কষ্টি-পাথরে পরক করা—ভয় করবারও বিশেষ দরকার নেই।

বীরেন বলিল,—"কি যে পাগলের মত বকে গেলে একবর্ণও বুঝতে পাল্লুম না।

সুরেশ বলিল,—"সে আমি অনেক আগেই বুঝেছিলুম। তোমাকে বলাই আমার ঝকমারী হয়েছে।"

বীরেনকে সুরেশের কক্ষে প্রবেশ

করিতে দেখিয়া ইন্দু বাড়ী চলিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া ব্রজবালার জ্যেষ্ঠা কন্যা ইন্দিরা বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ লা! শ্বশুরবাড়ী থেকে আস্‌তে না আসতেই সুরেশদের বাড়ী গিছলি! ও মা! তুই হলি কি লা? এক্ষুণি না গেলেই চলতো না?"

ইন্দু একটু অগ্রাহ্যের ভাব দেখাইয়া বলিল,—"না বড়দি, চলতো না; সেই জন্যেই তো গিছলুম্।"

"মেয়ের আবার কথা দেখেছ। সাধে কি আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে মরিস্। কোথায় মার সঙ্গে দুটো কথা বার্ত্তা কইবি তা না, গেলি সুরেশের কাছে।"

"বলচিই তো বড়দি যে, আমি সুরেশদাব কাছে গিছলুম। ও কথা বার বার বলে তুমি কষ্ট কচ্ছ কেন?"

ইন্দিরা আরও চটিয়া গিয়া বলিল, "সুরেশের বাড়ী তোর কি আছে রে? খালি খালি ওর কাছে যাস্? ওখানে যাবার কি দরকার? না গেলে কি দিন চলে না?"

ইন্দুও রাগিয়া বলিল—"না, চলে না।"

"মেয়ের মুখ দেখেছ। মাত্তে হয় ঐ মুখে মুড়ো ঝাঁটা। আবার মাকে বলা হয়েছে,—শ্বশুরবাড়ী আর যাব না।

"বলেছিই তো। গাড়ী থেকে আজ নেমেই ঐ কথা বলেছি।

"আমরা জন্মেও কখন ও কথা শুনিনি বাপু। আমাদেরও এককালে বিয়ে হয়েছিল; তোর মত কখন ও রকম করে চলাই নি।"

প্রায় এক সপ্তাহ হইল ইন্দিরাকে ব্রজবালা শ্বশুরালয় হইতে আনাইয়াছেন। ইন্দিরা ইন্দু অপেক্ষা প্রায় তের বৎসরের বড়।

কোনই উত্তর না পাইয়া ইন্দিরা পুনরায় বলিল—"মেয়েমানুষের মুখে ও সব আবার কি কথা!—শ্বশুরবাড়ী যাব না, স্বামী মনে ধরে না, এসব—"

ইন্দু এবারেও কোন উত্তর করিল না, ইন্দিরা পুনরায় বলিল,—"এই জন্যেই তো বীরেন তোকে দেখতে পারে না। স্বামী স্ত্রীলোকের গুরু, তাঁরা যা বলেন তাই শুনতে হয়; যদি তাঁদের সঙ্গে নরকেও

যেতে হয় তাতেও স্ত্রীর কুণ্ঠিত হতে নেই ; হাসিমুখে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া উচিৎ।''

ইন্দিরার বক্তৃতার মাঝখানেই ইন্দু একটু অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল,—"বিয়ে হওয়া পর্য্যন্তই তো ঐ বক্তৃতা শুনে আসছি বড়দি। স্বামী কি জিনিষ, তা আমি তোমার চেয়ে ভাল বুঝি। ও সব ফাঁকা আওয়াজ আর আমার ভাল লাগে না।''

ইন্দিরা ক্রোধের সপ্তমে উঠিয়া বলিল, "তা ভাল লাগবে কেন। সুরেশের কথা বল্লে বেশ্ ভাল লাগতো, না ?

ইন্দু অনেক কষ্টে নিজের ক্রোধকে দমন করিয়া বলিল, "কি যে বল বড়দি তার ঠিক নেই। সুরেশদা যে আমার দাদা !''

"যেই হোক্ না সে, ইন্দিরা তো ঠিক কথাই বলেছে ইন্দু।'' এই বলিয়া ব্রজবালা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—এমনই বা কি কথা আছে ইন্দু, যে, সময় নেই অসময় নেই, খালি সুরেশের কাছে যেতে হবে। বীরেন যদি টের পায় তা হলে কি হবে বল্‌তো ?

ছল ছল নেত্রে মায়ের দিকে চাহিয়া ইন্দু বলিল—তুমিও ঐকথা বল্লে মা ?

তা বলবো না—তুই মরে যা না ইন্দু, আমার সকল দুঃখের অবসান হউক। কি কুক্ষণেই তোকে পেটে ধরেছিলুম—তুই মরে যা, আমার হাড় জুড়াক।

ইন্দু আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—এখনও যে দু'ঘণ্টা হয় নি মা—শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছি। একটা রাতও কি চুপ করে থাকতে পাল্লে না ? এই বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

আহারাদির পর রাত্রে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া ইন্দু দেখিল, বীরেন চক্ষু বজিয়া শুইয়া আছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মনে করিয়া মশারী ফেলিয়া ইন্দু মশারীর বাহিরে একখানি মাদুরী বিছাইয়া শয়ন করিল।

বীরেন বাস্তবিক ঘুমায় নাই। নিদ্রার ভান করিয়াছিল মাত্র। ইন্দুকে মশারীর বাহিরে শুইতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—আজ যে বড় বাইরে শুলে ? একটু পরে

সুরেশের কাছে পালিয়ে যাবার মতলব আছে বুঝি? ইন্দু মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, কোনই উত্তর করিল না। বীরেন পুনরায় বলিল—ওসব ইচ্ছে না চাঁদ! এস ভিতরে এস; পা দুটো একটু টিপে দাও।

ইন্দু কোন কথা না বলিয়া মশারি তুলিয়া বীরেনের পা টিপিয়া দিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে বীরেন বলিল—ক'দিন থেকে সুরেশের সঙ্গে এ রকম পীরিত চল্‌ছে শুনি? ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে বাবা! আজ একেবারে হাতে হাতে ধরা।

ইন্দু তত্রাচ কিছু বলিল না। সে জানিত, বীরেনের সহিত তর্ক করা কিংবা তাহার কোন কথার প্রতিবাদ করা বৃথা।

বীরেন বলিয়া যাইতে লাগিল—এতই যদি তার সঙ্গে তোমার প্রেম, তা'হলে বাবা এ গরীবকে নিয়ে টানাটানি করা কেন? সুরেশকে বিয়ে কল্লেই তো পাত্তে।

এসব কথা ইন্দুর এক রকম গা সওয়া হইয়া গিয়াছিল। সে নিস্তব্ধভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

তা আমায় যদি তোমার এতই অপছন্দ সুরেশের কাছে থাক্‌লেই পার—বিয়ে নাই বা হলো, অমন ত অনেকেই থাকে।

ইন্দু আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল—ভাইয়ের সম্বন্ধে এ রকম করে বল্‌তে তোমাদের জীবে আটকায় না?

বীরেন বেশ সহজভাবেই বলিল—আর লুকিয়ে কি হবে প্রাণেশ্বরী? হাতে হাতে ধরা পড়েও অস্বীকার কত্তে লজ্জা করে না চাঁদবদনী?

ইন্দু একটু গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিল—সুরেশদার সম্বন্ধে ওসব কথা বলো না, বলে দিচ্ছি।

বীরেন কুটীলভাবে একটু হাসিয়া বলিল—ও বাবা! ভিতরে ভিতরে কিছু না থাক্‌লে কেউ কি এমনি করে ফোঁস করে ওঠে? কি পীরিতের টান বাবা! একেই বলে যথার্থ লভ্।

ইন্দু বলিল—তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি আর আমাকে এ রকম করে বাক্য-

যন্ত্রণা দিও না। এসব কথা শুনে যে আমার গা শিউরে উঠচে।

বীরেন বলিল—তা ওরকমভাবে ধরা পড়লে সকলকারই গা শিউরে ওঠে। দেখ প্রাণ, আমি না হয় একটাও পাস দিতে পারিনি, তা বলে এটা ভেবনা যে, দুপাতা ইংরিজি আর দু'দশখানা বাংলা বই পড়ে তুমি আমার চেয়ে খুব বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হয়ে পড়েছ। আমি মুখ্যু বটে কিন্তু এসব বিষয়ে আমার চোখে ধূলো দিতে পারবে না—বুঝলে? আর সুরেশটাকে তো আমি খুব ভালকরেই চিনি! বেটা লম্পটের চূড়ান্ত। শালার ছেলে ডুবে ডুবে জল খায়।

দলিতা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া ইন্দু বলিল—ফের বল্‌ছি, সুরেশদাকে অমন করে বলো না। সুরেশদার মত তুমি যদি এককণাও হতে পাত্তে তাহলে তরে যেতে।

কি, আমাকে অপমান?—এই বলিয়া বীরেন সজোরে ইন্দুকে পদাঘাত করিল। ইন্দু খাট হইতে নীচে পড়িয়া গিয়া কেবল মাত্র একবার বলিল—উঃ! মাগো!

কিছুক্ষণ পরে বীরেন বলিল—এক গ্লাস জল দাও। ইন্দু ধীরে ধীরে উঠিয়া একগ্লাস জল গড়াইয়া বীরেনের হাতে দিল। জল খাইয়া বীরেন বলিল—ওখানে পান আছে দাও। ইন্দু বলিল—রাত্রি ১টার সময় পান খাবে কি আবার?

বীরেন বলিল—তোমার তাতে কি, আমার খুসি খাব। আর কিছু না বলিয়া পানের ডিবাটী ইন্দু বীরেনের হাতে দিল। বীরেন বলিল—কালই আমি তোমায় নিয়ে যাব। এখন তোমার কস্টের হয়েছে কি? সুরেশের সঙ্গে পীরিত করা বের করে দেব।

ইন্দু বলিল—থাক্, ওকথায় আর কাজ নাই—অনেক রাত্রি হয়ে গেছে, ঘুমোও দিকি।

ইন্দু বাহিরে যাইতেছে দেখিয়া বীরেন বলিল—ও কি, যাচ্চ কোথায়? পা টেপা কি হয়ে গেল না কি?

আস্‌ছি—বলিয়া ইন্দু কক্ষের বাহিরে আসিয়া কলতলার দিকে গেল এবং

বীরেনের পদাঘাতে খাট হইতে পড়িয়া গিয়া কপালের খানিকটা কাটিয়া গিয়াছিল এবং খাটের কোণে লাগিয়া হাতের এক জায়গায় খানিকটা ছড়িয়া গিয়াছিল, সেই ক্ষতস্থানগুলি বেশ করিয়া ধুইয়া রক্ত পরিস্কার করিল এবং কাপড়ের যে যে স্থানে রক্ত লাগিয়াছিল, তাহাও ধুইয়া ফেলিল—পাছে প্রাতঃকালে ইহা ইন্দিরা কিংবা ব্রজবালার নজরে পড়ে। এমনি করিয়াই ইন্দু নিজের বেদনা গোপন রাখিত।

কলতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু দেখিল—বীরেন ঘরের সামনে দালানে দাঁড়াইয়া আছে। ইন্দুকে দেখিয়া সে বলিল—আমার মনে হল বুঝি তুমি পালিয়ে সুরেশের কাছেই বা চলে গেলে। এই বলিয়া ঘরে গিয়া পুনরায় শয়ন করিল এবং ইন্দুকে পা টিপিয়া দিতে আদেশ করিল।

স্বামীর পদসেবা করিতে করিতে ইন্দু বীরেনের পায়ের কাছেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোর পাঁচটা বাজিতেই ইন্দুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বীরেন তখনও বেশ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিল। ইন্দু ধীরে ধীরে স্বামীর মাথার কাছে যাইয়া, তাহার কোটরাগত চক্ষু, কুঞ্চিত ললাট, দীপ্তিহীন পাংশুবর্ণ গণ্ডদ্বয় ও অত্যাচার প্রপীড়িত দেহখানি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

হঠাৎ বাহিরে ব্রজবালার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া ইন্দুর চমক ভাঙ্গিল এবং অঞ্চল দিয়া চক্ষুর্দ্বয় মুছিয়া ভগবানের উদ্দেশে মনে মনে বলিল—হে ভগবান্! আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পারি।

বীরেনের পদধূলি মস্তকে লইয়া ইন্দু ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। বীরেন ইহার কিছুই টের পাইল না। সে তখন ভোরের গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

শিবপুর কাহিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(শিবপুর "সাহিত্য-সংসদের" ইতিহাস শাখা হইতে
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত।)

৩—ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য।

ইংরাজী আমলের প্রথম ভাগে, শিবপুর ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের জন্য বঙ্গের নানা স্থানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শুধু বঙ্গে নয়—বঙ্গের বাহিরেও, এখনও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। এই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে শিবপুরের প্রসার ও প্রতিপত্তি এবং "বেতোড়" ও "থানা-মেকুয়ার" যবনিকা অন্তরালে অবস্থান করিতে হয়।

শিবপুরের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে হালদার, মজুমদার পাঠক ও ভট্টাচার্য্য ইহারাই প্রাচীন বলিয়া পরিচিত। তন্মধ্যে হালদার ও মজুমদারেরা—নবাব সরকারে কর্ম্ম করিয়া উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন—আর ভট্টাচার্য্য সন্তানেরা শাস্ত্র আলোচনা, অধ্যয়ন অধ্যাপনা, যজন যাজন ও দীক্ষা দান করিয়া সমাজে বরণীয় হইয়াছিলেন ও শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়েরা শাস্ত্রাদি পাঠ এবং যজন-যাজন করিতেন।

এই পাঠকদিগের কয়েক ঘর, বেতোড়-বাক্‌সাড়ায় বাস করিতেন। ইহারা তিন চারিশত বৎসর ঐ অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন। যথা :—

"কংসারি শ্রীধর পরে যদুনাথ নাম,
পাঠক মর্য্যাদায় ত্যজে বল্লালীর কাম।
গোপীকান্ত রামকৃষ্ণ রাজেন্দ্র পাঠক
বাক্‌সাড়া গ্রাম বাসে হইল দক্ষক।
তাঁর দুই সুত বিষ্ণুদেব, কৃষ্ণদেব
কনিষ্ঠের বংশ নাহি দিল দিবদেব।

* * * *

বিষ্ণুর কনীয় সুত কন্দর্প ঘোষাল
কৈশোরে কিশোর প্রেমে হইল রসাল
ঐ গুণে লালা অতি সদয় হইয়া

দেশধিপ রাজকার্য্যে দিলা নিয়োজিয়া।
গোবিন্দ পুরেতে বাস দিলেন তাঁহার
গড়্যা বেহালা খিদ্দিরপুরে নিরন্তর।
তস্য তিন সুত কৃষ্ণচন্দ্র প্রথম
গোকুল চন্দ্র রাম চন্দ্র অতীব উত্তম।"
—"করুণা নিধান বিলাস" কাব্য
মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল রচিত।

ইহাদের কুলগত উপাধি ছিল ঘোষাল, আর পুরাণাদি পাঠ করিতেন বলিয়া ইহাদের সামাজিক উপাধি ছিল পাঠক। এই বংশের যদুনাথ পাঠক "অশেষ শাস্ত্র অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু "বল্লালীর কাম" পরিত্যাগ করিয়া স্বকৃত ভঙ্গ হয়েন। যদুনাথের প্রপৌত্র রাজেন্দ্র পাঠক যে বেতড বাক্সাডায় বাস করিতেন—ইহার লিখিত প্রমাণ আছে। বিষ্ণুদেব এবং কৃষ্ণদেব নামে রাজেন্দ্র পাঠকের দুইটি পুত্র ছিল; তন্মধ্যে কৃষ্ণদেব নিঃসন্তান ছিলেন। জ্যেষ্ঠ বিষ্ণুদেবের ছিল দুই পুত্র—রামদুলাল এবং কন্দর্প। ইহাদের মধ্যে রামদুলাল পাঠক বেতড় বাক্সাড়ায় বাস্ করিতে লাগিলেন আর কন্দর্প নানা উপায়ে ধনী হইলে পৈতৃক পাঠক উপাধি ত্যাগ করিয়া, কন্দর্প ঘোষাল নামে আত্ম পরিচয় দান পূর্ব্বক পিবপুরের পর পারে তদানীন্তন গোবিন্দপুর গ্রামে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য গোবিন্দপুর গ্রাম ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে, অন্যান্য লোকের ন্যায় কন্দর্পকেও ঐ গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। ইনি খিদিরপুরে গিয়া তখন স্থায়ী বাস আরম্ভ করেন। কন্দর্প ঘোষালের দুই পুত্র ছিল, কৃষ্ণচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্র এই গোকুলচন্দ্র তদানীন্তন ইংরাজ গভর্ণর ভেরেলষ্ট সাহেবের অধীনে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দাওয়ান ছিলেন।

গোকুলচন্দ্র নিঃসন্তান থাকায় তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্টচন্দ্রের পুত্র মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল দাওয়ান গোকুলচন্দ্রের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। ইহাঁর সময়ে ইহাঁদের খিদিরপুরের বাটী, বর্ত্তমান ডক্ নির্ম্মাণের জন্য

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় ভূকৈলাসে গিয়া ইনি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ইনিই ভূকৈলাস রাজবংশের আদিপুরুষ।—

"Kandarpa Ghosal removed to Kidderpore when the village of Gar Gobindapur in which he had resided was taken up as a site for the construction of Fort Willam. Kandarpa had two sons Krishna Chandra and Gakul Chandra. The latter was Dewan to Mr. Verelst Governor of Bengal and made large fortune. On the death of Gokul his hephew Joynarayan, the only son of Krishna Chandra enheritted his property He settled in Bhukailash near Kidderpore and founded temple there. He received the title of Maharaja Bahadur from the Emperor of Delhi with the privilege to maintain 3500 sowars He founded the Joynarayan College at Benaras at a heavy cost and handed it over to the missionaries with on endowment for its support. He was a Bengali poet of no mean Calibre.—See "Bengal under the Liutenant Governors" By C. E Buckland vol. II. page 1080.

এত কথা লিখিবার একটু তাৎপর্য্য আছে। এই প্রতিপত্তিশালী ভূকৈলাস রাজবংশের আদি পুরুষদিগের গুরু ছিলেন—শিবপুরবাসী ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক পণ্ডিতগণ। সমগ্র বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দাওয়ান গোকুলচন্দ্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তখন সামান্য ছিল না। লর্ড ক্লাইব ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পর ভেরলেষ্ট সাহেবকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গভর্ণর পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই গভর্ণর সাহেবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন—দাওয়ান গোকুল ঘোষাল। বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার বড় বড় জমীদার ও সম্ভ্রান্ত লোক—দাওয়ানজীর সহিত নানা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এহেন দাওয়ানজীর গুরুধাম শিবপুরে অবস্থিত হওয়ায়, শিবপুরে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য বৃদ্ধি হওয়া বিচিত্র নহে। শুধু ইহাই নহে—দাওয়ানজীর বন্ধু বিক্রমপুর কাওলীপাড়ার জমীদার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা এবং অন্যান্য বৈভবশালী লোকে তখন এই শিবপুরবাসী ব্রাহ্মণদিগকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। সেকালে হিন্দু-পরিবারে গুরুর প্রতিপত্তি

কিরূপ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং দাওয়ানজীর গুরুকে প্রসন্ন করিবার জন্য বঙ্গের বড় বড় জমীদার মহাশয়েরা ইহাদিগকে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই সকল ভূমি দানের তালিকা পরবর্ত্তি অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে প্রদত্ত হইবে।

১৩০৭ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়" ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়, "রাজ কবি জয়নারায়ণ" শীর্ষক প্রবন্ধে ভূকৈলাস রাজবংশের যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে "গুরুধাম শিবপুরের বিশেষ কোন আলোচনা নাই। ৺বিজয়-রাম সেন প্রণীত "তীর্থমঙ্গল" কাব্য ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে রচিত। লেখক বিজয় সেন, দাওয়ান গোকুলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্টচন্দ্রের সহিত তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। এই দাওয়ান ভ্রাতার সহিত বহু দ্রব্য-সম্ভার-পূর্ণ নৌকা, ময়ূরপঙ্খী, পালওয়ারী তরণী, তোষাখানা প্রভৃতি নৌবহর ও বঙ্গের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি গমন করিয়া-ছিলেন; এছাড়া আত্মীয়-কুটুম্ব তো ছিলই। "সাহিত্য-পরিষৎ" হইতে প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, এই "তীর্থমঙ্গলের" যে সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন তৎপাঠে জানা যায়, কেবল-মাত্র তীর্থ-দর্শন ও পরিভ্রমণ যে কৃষ্টচন্দ্র ঘোষালের উদ্দেশ্য ছিল, এমন নহে, অন্য কোন গৌণ কারণও ছিল। কবি তাহা প্রকাশ করেন নাই; তবে বসু মহাশয় উক্ত গ্রন্থ মধ্যে, গোকুলচন্দ্রের উক্তি প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন যে—"দেওয়ান গোকুলচন্দ্রের উক্তি হইতে এই তীর্থ-যাত্রার অপর কারণও জানা যাইতেছে।...১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন ও পলাসী-বিজেতা লর্ড ক্লাইভ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ঐ কয় প্রদেশের গভর্ণর হইয়াছিলেন। এ সময়ে সুদূর এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে ইংরাজ আধিপত্য প্রসারিত হইয়া-ছিল। এ সময়ে হিন্দুস্থানের আভ্যন্তরীণ গতিবিধি ও দেশের অবস্থা লক্ষ্য রাখা ইংরাজ রাজপুরুষগণের প্রয়োজন হইয়া-

ছিল। সুতরাং সমস্ত হিন্দুস্থানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মনের ভাব ও গতিবিধি পরিদর্শন করিবার জন্য দাওয়ানজী ঘোষাল মহাশয় আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পাঠাইবেন তাহা কিছু অসম্ভব নহে।" এই তীর্থভ্রমণ-কালে বঙ্গের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক, কাশীনরেশ, পাটনার ভায়া বিষ্টু সিং রাজা সেতাব রায়, নবদ্বীপের রাজা প্রভৃতি তাঁহার প্রতি যে সমাদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তৎপরে বেশ বুঝিতে পারা যায় কৃষ্টচন্দ্র ঘোষালের তৎকালে কিরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল।

এ হেন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, এই বিরাট তীর্থ-বাহিনী লইয়া যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, শিবপুরে শ্রীগুরু-চরণ বন্দনা করিতে আসিলেন; যথা :—"তীর্থ-মঙ্গল" নামক গ্রন্থের "যাত্রারম্ভ" নামক অধ্যায়ের প্রারম্ভে :—

"পার হৈয়া শীঘ্রগতি গেল্যা শিবপুর,
শীঘ্র উত্তরিলা গিয়া যথায় ঠাকুর।
গলবস্ত্র হয়্যা ইষ্টদেবে প্রণমিলা;
যথোচিত নিবেদিয়া বিদায় হইলা।
আশীর্ব্বাদ করি দেব করিলা বিদায়,
তথা হইতে বাটী গেলা কর্ত্তা মহাশয়।"

আর তীর্থ হইতে যখন ফিরিলেন তখন :—

"খিদিরপুর গঙ্গাধারে আইল বাহিয়া,
উভরড়ে ধায় লোক এ কথা শুনিয়া।
কুটুম্ব সাক্ষাৎ আর গোমস্তা সকল,
জয় জয় কর্যা আইসে বেড়ে যায় বল।
বাবুজী আইলা আর দাওয়ান মহাশয়,
তাঁর সঙ্গে কত লোক আগু পাছু ধায়।

* * * *

দাওয়ানজীর স্থানে কর্ত্তা বিদায় হইয়া,
ইষ্ট-প্রণমিতে গেলা বাবুকে লইয়া।
পাল্কীতে চড়িয়া গেলা হয়্যা গঙ্গাপার;
তীর্থের সামগ্রী সঙ্গে চলে ভারে ভার।
শিবপুর চলি যান হয়্যা আনন্দিত,
ইষ্টদেব সন্নিধানে হৈলা উপস্থিত।
ভূমিষ্ট হইয়া দুঁহে প্রণাম করিয়া,
আজ্ঞা হইলে বসিবেন রহিলেন দাঁড়াইয়া।"

কতকাল পরে তীর্থ হইতে জ্যেষ্ঠ কৃষ্টচন্দ্র ফিরিলেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য

কত লোক গঙ্গাতীরে গেল। তাঁহার অনুজ দাওয়ান গোকুল ঘোষাল এবং তাঁহার আত্মজ জয়নারায়ণ, যিনি পরে মহারাজা হইয়াছিলেন এবং যাঁহাকে কবি উপরি-উক্ত বর্ণনায় "বাবু" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন—ইহাঁরাও আসিলেন। কিন্তু কৃষ্টচন্দ্র, ভ্রাতা গোকুলচন্দ্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মিষ্টালাপে শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া বিদায় দান করিলেন। নিজে নৌকা হইতে নামিলেন না; পরন্তু নিজপুত্র "বাবু মহাশয়"—জয়নারায়ণকে ও তীর্থের সামগ্রী লইয়া সর্ব্বাগ্রে শিবপুর গ্রামে গুরুর পাদ বন্দনা করিতে গেলেন। এ হেন গুরুভক্তি যেমন গৌরবের—এ হেন শিষ্য-ভাগ্যও সেইরূপ শ্লাঘার বিষয় নহে কি? গুরু পবিত্রচেতা ও শিষ্য সন্তাপ-হারক না হইলে—এ ভক্তি-উৎস প্রবাহিত হয় কি? আবার দীনতা দেখুন; এত বড় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি গুরুর আজ্ঞা ব্যতীত বসিতে পারেন না; গুরুর সম্মুখে পিতা-পুত্রে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন। তখন :—

"গুরুদেবের আজ্ঞা হইলা আসনে বসিতে,
নতি করি বসিলেন হয়্যা এক ভিতে।
তীর্থের সামগ্রী যত নজর করিয়া,
বাটীর ভিতরে সব দিলা পাঠাইয়া।
ত্রয়স্থলীর * কথা যত নিবেদন করি,
প্রণাম করিয়া হৈলা পাল্কীতে শোয়ারী।
শীঘ্রগতি আসি কর্ত্তা গঙ্গা হৈল পার।"

ইতি "তীর্থমঙ্গল" কাব্যে "গৃহে প্রত্যাগমন" অধ্যায়।

বিগত ১৩২৭ সালের "প্রবাস-জ্যোতিঃ" নামক কাশীধাম হইতে প্রকাশিত পত্রে অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী মহাশয় "মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল" শীর্ষক প্রবন্ধে, "তীর্থ-মঙ্গলের" এই বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যথার্থ ই লিখিয়াছেন :—

"সেকালে এই ঘোষাল-বংশই ছিলেন বাংলার সর্ব্বময় কর্ত্তা। কৃষ্টচন্দ্রের কনিষ্ঠ গোকুলচন্দ্র বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার তাৎ-কালিক গবর্ণর হারি ভেরেলষ্ট সাহেবের দেওয়ানী পদ লাভ করিয়াছিলেন, কাজেই তখন এই ঘোষাল-বংশের সম্ভ্রম ও প্রতি-

* ত্রয়স্থলীর অর্থ—গয়া, কাশী ও প্রয়াগ।

পত্তি সামান্য ছিল না। কাশীর তাৎকালিক মহারাজ বলবন্ত সিংহ যে কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—

"আইস আইস মহারাজা ধনম চরিত,
তোমার দর্শনে মোর শরীর পবিত্র।"

তীর্থমঙ্গল।

সেই কৃষ্ণচন্দ্র বহুকাল পরে বাটীতে ফিরিয়া, নৌকা হইতে নামিলেন না—সেই নৌকাতেই পুত্রকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাপারে গুরুদর্শন করিতে গেলেন। পিতা ও পুত্র দুই জনে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—গুরুর আজ্ঞা ভিন্ন বসিতে পারেন না। তীর্থের দ্রব্য-সামগ্রী সর্ব্বাগ্রে গুরুকেই উপহার দেওয়া হইল। জয়নারায়ণ প্রথম জীবন হইতেই গুরুভক্তির এইরূপ আদর্শ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই শেষ-জীবনে গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারিয়াছেন।

বাঙ্গলা ১১৭৭ সন্ অর্থাৎ ইংরাজী ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তীর্থ-ভ্রমণান্তে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল শিবপুরে গুরু প্রতি এই পরম ভক্তির পরিচয় প্রদান করার কথা, তখন নানাভাবে নানাদেশে প্রচারিত হইয়া শিবপুরের ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের গৌরব পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। আর, মহারাজা জয়নারায়ণ তাঁহার শেষ-জীবনে এই গুরুভক্তির চিরস্থায়ী স্মৃতি কাশীতে রাখিয়া গিয়াছেন—উহার নাম "গুরুধাম"। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে গুরু-মূর্ত্তি আছে—সুবর্ণ-নির্ম্মিত গুরু-পাদুকা আছে॥ আর প্রাচীর-গাত্রে লিখিত আছে—"বিরচ্য গুরুধামেদং শক্ত্যা স্থাপিতবান্ গুরুম।" এ স্থাবরাদি দান বিক্রয় বন্ধক দিবার ক্ষমতা কাহারও কদাচ থাকিবে না। গুরুধাম মহারাজের গুরুভক্তির অন্যতম প্রমাণ। অধ্যাপক হরিহর শাস্ত্রী যথার্থ ই লিখিয়াছেন—"এইরূপে গুরুর স্মৃতি চিরদিন জাগাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা আর কাহারও দ্বারা হইয়াছে কি না জানি না।"...ইহার পরেই কিন্তু লেখক আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"যে গুরুর উদ্দেশে এত আয়োজন, দুর্ভাগ্যের সেই গুরুবংশের বিশেষ কোনও পরিচয় আমরা পাই নাই। কেবল "তীর্থ-মঙ্গল

পাঠে জানা যায় যে, মহারাজদিগের গুরু-বংশের নিবাস ছিল হাওড়ার দক্ষিণ শিবপুরে।”

আশ্চর্য্যের বিষয়, সাহিত্য-পরিষদের ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী, অথবা শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও এই সকল বিষয় আলোচনা করিবার সময় বিশেষ ভাবে ঐ গুরুবংশ সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান করেন নাই। আমরা কিন্তু শিবপুরে থাকিয়া এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারি নাই। কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের ফলেই জানিতে পারিয়াছি যে—শিবপুরের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীজয়রাম পঞ্চানন মহাশয় এই ঘোষাল বংশের গুরু ছিলেন। সেই হেতু তিনি দাওয়ান গোকুল ঘোষালের নিকট হইতে বহু শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল দান পত্রের সনন্দ ও পরবর্ত্তি কালের হস্তান্তর—বিলি বন্দোবস্তের দলিল পত্র হইতে, এই প্রতি-পাদ্য বিষয়ের প্রামাণিক অংশগুলি নিম্নে দৃষ্টান্ত রূপে উদ্ধৃত করিলাম। যথা :—

(১) ইংরাজী ১৮৭৪ সালের ১৮৬৬নং আওড়ার রেজেষ্টারী তালিকা-ভুক্ত একখানা দলিলের অংশবিশেষ এই-রূপ—কস্য খারিজ দাখিলী মৌরসী মোকররী পট্টকপত্রমিদং কার্য্যানঞ্চাগে জেলা হুগলীর অন্তর্গত পুলিশ ষ্টেশন শিবপুরের সামিল, সবরেজেষ্টারী হাওড়ার এলেকাধীন আর্শা পরগণায় থানা-মেকুয়া গ্রামে খিদিরপুর ভূকৈলাস নিবাসী ৺গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়দিগের লাখরাজ জমীর মধ্যে আমি...ভট্টাচার্য্য এবং আমি........ভট্টাচার্য্য, পূর্ব্বপুরুষ ৺জয়রাম মুখোপাধ্যায় পঞ্চানন যে এক শত এক বিঘা জমী উক্ত ঘোষাল মহাশয়দিগের নিকট দান প্রাপ্ত হইয়াছে—তন্মধ্যে বা—ইত্যাদি (Registered in Book No 1 vol.—Page 16—19)

(২) শিবপুর ছোট ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের পৈতৃক সম্পত্তির যে ভাগ বাটোয়ারা হয়—সেই একরার নামা দলিল পত্রেও ঐ দানের উল্লেখ দেখিতে পাই যথা :—

“শুভ জমী জমার মৌরসী মোকররী পাট্টাপত্রমিদং কার্য্যানঞ্চাগে পরগণে আর্শা,

থানা মেকুয়া গ্রামে খিদিরপুর নিবাসী গোকুলচন্দ্র ঘোষালের দিয়ত আমাদের পৈতৃক ১০১ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী আছে তন্মধ্যে বড় বাড়ীর রকম আট আনা অংশ বাদে” ইত্যাদি।

উপরি উদ্ধৃত দলিল ব্যতীত আরও অন্যান্য দান—পত্রের দলিল আছে। সেগুলি যথাস্থানে আলোচিত হইবে। এক্ষণে, এই অধ্যায়ের উপসংহারে এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখি যে, ইংরাজী আমলের প্রথমেও শিবপুর ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের জন্য এবং পাণ্ডিত্যের জন্য, বঙ্গের নানা স্থানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

পথের আলো।

(শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস।)

সুদূর প্রান্তরে আমি, পথহারা হয়ে,
পড়ে আছি হেথা,
কুটিল কণ্টকময়, পথপানে চেয়ে,
ভুলেছি সে কথা।
গভীর আঁধারে যবে ছুটে চলে যেতে,
হৃদে পায় ভয়,
তখন থমকি আমি, স্তব্ধ যামিনীতে
ডুবি নিরাশায়।
ক্ষণ পরে এসে পুনঃ বিদ্যুতের ছটা,
আশা দেয় প্রাণে,
তখন নিবিয়া যায় হৃদয়ের জ্বালা,
পুনঃ সেই খানে।

মীরাবাঈ।

(এডমাণ্ড রসেল লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ।)

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।)

একদিকে গঙ্গা অন্যদিকে ইন্দুনদী একদিকে হিমালয় অন্যদিকে বিন্ধ্যগিরি—এই স্থানটীতে যে কেহ পরিভ্রমণ করিবে সেইই হিন্দীভাষায় রচিত জনপ্রিয় গানগুলিতে—আর কিছু না পায় ত একটী নাম অনবরত ধ্বনিত হচ্চে শুনিতে পাইবে। রাধাস্

বালকেরা তাহাদের মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রামসময়ে, ধর্ম্মোন্মাদ সন্ন্যাসীরা তাহাদের স্তোত্রপাঠাদি সময়ে—বিখ্যাত গায়করন্দ তাহাদের সঙ্গীতালাপ সময়ে, নাচনাওয়ালীরা তাহাদের শুধু আনন্দোল্লাস সময়ে একই নাম গান করে—মীরা—রুজভুনূপুর নিক্কনের বহু উর্দ্ধে সে নাম উত্থিত হয়—মীরাবাই, মীরাবাই। কে এ মহিলা? যাহাকে সামনে পাও তাহাকেই জিজ্ঞাসা কর। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সকলেই তাঁহাকে জানে, ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, পূজা করে। সে মহিলা মনুষ্য-কুলের দেবী-স্বরূপিণী। বহু জন্মান্তরীণ সুকৃতির ফলস্বরূপ তাঁহার আত্মা সম্যক্ পরিশুদ্ধ। মহিলাকুলের ভিতর তিনি অতি উচ্চ অবস্থার সাধিকা। ভারতীয় কবিকুলের মধ্যেও তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। রাজপুতানার এই অতি মনোমদ পুষ্পটী চিতোরের মহারাণার প্রাসাদোদ্যানেই সদা বিকশিত ছিল সুতরাং এই সুপদ্মটী—মীরাবাই চিতোরের রাজকুমারের সহিত বিবাহিতা হন এবং বৃদ্ধরাণার মৃত্যুতে মেওয়ারের রাণী পদে অধিরূঢ়া হন। কবি স্বামী, কবি স্ত্রী—অধিকাংশ সময়ই তাঁহারা কাব্যামৃত পানে বিভোর থাকিতেন। ক্রমে স্বামী ও স্ত্রীর রচনা ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিল। রাজকুমার নিম্নস্তরের বিষয়-বিরতিতে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন; রাজকুমারী উচ্চ স্তরের ও উচ্চ অঙ্গের বিষয় বিশ্লেষণে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বহুল পাঠ করিয়া বৃন্দাবনের সুন্দর রাখালবালককেই শ্রীভগবান রূপে দেখিতে লাগিলেন। প্রেম-পারাবার শ্রীভগবানের সহিত প্রেম-স্থাপন ভিন্ন ইহ-পরকালে আনন্দ পাইবার উপায় নাই—ইহা মীরাবাই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌রূপে দেখিতে লাগিলেন। তিনি নিজেকে গোকুলের গোপীগণ মধ্যে একজন বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রূপক মধ্যে প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, প্রেম-জীবনের মধ্যে অধ্যাত্ম জীবনের সন্ধান পাইয়া মীরাবাইয়ের সমস্ত রচনা ভগবান-বিষয়ক হইয়া উঠিল। হরি-প্রেমই তাঁহার গানের বিষয় হইল। এই ভাবেই কাল কাটিতে লাগিল। এদিকে রাজ্য-ভার আসিয়া পড়িল। মীরাবাই রাণী হইলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীন হইলেন এবং তাঁহার স্বামীও তাহার পরমাত্ম-আলোচনায় যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগ করিয়া দিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে প্রবল অনুসন্ধিৎসা, প্রাণে ভগবৎ-প্রেম ও ধর্ম্মভাবে উৎকট সাধনা ক্রমশঃ তাঁহাকে বিভোর করিয়া জাগতিক-ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন করিয়া তুলিল। গৃহ-কর্ম্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সংসার-ধর্ম্মে তিনি একরূপ অনাস্থমনা হইয়া উঠিলেন। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তিনি তাঁহার সঙ্গিনীগণ সহ গুণময়ের গুণকীর্ত্তনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই গোপিকা, এক অদৃশ্য—তাঁহাদের নিকট পরিদৃশ্যমান গোবিন্দ আরাধনায় মীরাবাইএর সহিত জগৎ ভুলিলেন।

তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনা এবং সুমিষ্ট কণ্ঠ সম্বন্ধে কিংবদন্তী এখনও বহুভাষিণী। এবং ইহাও শুনা যায় যে, তাঁহার স্বাভাবিক রচনা-কৌশল, সুকণ্ঠ ও সঙ্গীত-মাধুর্য্য ব্যতীত যে অগাধ প্রেম, মর্ম্মস্পর্শী করুণতা ও গম্ভীর ভাব-সম্পদ্ তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিত

তাহাই তাঁহার গানগুলিতে ধ্বনিত হইয়া জনমন মুগ্ধ ও উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিত।

তবে কতদিন এ আত্মা চিতোর রাজসংসার গারদে আবদ্ধ থাকিতে পারে? যিনি বিশ্ব প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি কোন গৃহ-বিশেষে বদ্ধ থাকিতে পারেন না। পদ্ম মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি বিরাজ থাকায়, মীরাবাই সেই মন্দিরে আকৃষ্টা হইলেন। সেই মন্দিরেই মীরাবাই গান করিতে করিতে আত্মহারা হইতেন। শ্রীভগবান্ দয়া করিলেন। তিনি প্রেম-পুলকে মূর্চ্ছিতা হইলেন। সেইদিন হইতে প্রত্যহই তিনি সেই মন্দিরে যাইতেন ও তাঁহার প্রেমের-হরির নাম গান করিতেন। যে কেহ সেই গান শুনিত সেই গলে গিয়ে মীরার সাথে হরিকে ও মীরাবাইকে ভালবেসে ফেলিত। এই রকমে ক্রমে দুদশটী, তারপর শত শত, তারপর সহস্র সহস্র লোক সমাগত হইতে লাগিল। রাজপ্রাসাদ প্রায় ত্যাগ করিয়া, প্রেমের ঠাকুর শ্রীভগবানের শ্রীমন্দিরেই মীরাবাই বাস করিতে লাগিলেন।

ভারতবর্ষের দূরদূরান্তরে মীরাবাইএর নাম ও খ্যাতি প্রসারিত হইল। 'দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা' মহামান্য মোগল সম্রাট আকবর সা,—যাঁহার ইতিহাস এখনও সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহে—তিনি এ সংবাদ পাইলেন। 'গুণী গুণং বেত্তি'—স্বভাব-কবি আকবর সা সদ্গুণের আদর করিতে জানিতেন এই জন্যই তাঁহার সভা কলা ও বিজ্ঞান-বিদ্যায় বিভূষিত পণ্ডিত গণের দ্বারা মুখরিত থাকিত। মীরাবাইএর কথা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গীত-সুধা পান করিবার জন্য আকবর সা ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। যদিও চিতোর তাঁহার শাসনাধীন হয় নাই, তত্রাচ মহারাণার সহিত তাঁহার তাদৃশ শত্রুতা ছিল না। কিন্তু তিনি হিন্দুর স্পর্দ্ধা জানিতেন এবং রাজপুতনায় সমরানল সৃষ্টি করিবার আশঙ্কায় প্রকাশ্যভাবে মীরাবাইকে দেখিবার ও তাঁহার গান শুনিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। মীরাবাই যে একটী রাজ্য-বিশেষের রাণী তাহা নয়—তদপেক্ষাও অধিক পবিত্র অধিক উচ্চ—তিনি হিন্দু-মহিলা। আকবর সা জানিতেন যে, চিতোরের রাজপুতেরা তাহাদের রাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় এক বাদসাহের সহিত শেষ-প্রাণ পণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। আকবর সা আরও জানিতেন যে সেই রাণী ও তাঁহার সভাস্থ সমস্ত স্ত্রীলোকই বিজাতীয় কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা স্পৃষ্ট হইবার অপমান হইতে আত্মরক্ষাকল্পে জ্বলন্ত অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। শেষে তিনি গায়ক তানসেনকে স্মরণ করিলেন এবং ইহা স্থির হইল যে, মোগল বাদসা হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া যে মন্দিরে প্রত্যহ মীরাবাই ভজনগান করেন তথায় উপস্থিত হইবেন। এই ভাবেই তাঁহারা যাইলেন একক ও লোকজন না লইয়া—তাঁহারা মীরাবাইকে দেখিলেন এবং তাঁহার গান শুনিলেন। সম্রাট এতই মুগ্ধ হইলেন যে মীরাবাইএর চরণে পতিত হইয়া মুক্তি-সাধনের উপদেশ যাচ্ঞা করিলেন। মীরাবাইএর সৌন্দর্য্যের অব্যক্ত দ্যুতিতে আকবর জ্ঞান হারাইলেন। তাঁহার চাহনি উৎকৃষ্ট ফুলের পাপড়ীর মতন তাঁহার উপর আসিয়া পড়িয়া আকবরকে বিমুগ্ধ করিল। পরিধৃত ছিন্ন কন্থার অভ্যন্তর হইতে বহুমূল্য

হীরক-হার বাহির করিয়া তিনি বলিলেন—"ভদ্রে, আপনার মন্দিরস্থ ঠাকুরের জন্য এই সামান্য উপহার গ্রহণ করুন।" মীরাবাই হার গ্রহণ করিয়া, ছদ্মবেশী সম্রাটের প্রতি সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করিলেন ও বলিলেন—"মহাশয়, ইহা বহু মূল্যবান মনে হইতেছে—আপনারা সন্ন্যাসী, কিরূপে ইহা পাইলেন?" আকবর বলিলেন—"যমুনায় স্নানকালে আমি উহা পাইয়াছি; আপনাকে ও আপনার ঠাকুরকে দান করা ছাড়া আমি উহার অন্য ব্যবহার জানি না।" মীরাবাই তাঁহাদের ভগবৎ-প্রীতির জন্য ধন্যবাদ দিলেন। সম্রাট ও গায়ক দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিন্তু এই হীরক-হার—হীরক-অভিসম্পাত লইয়া কমল-কলিকার প্রাণসংহার করিল। মীরাবাইএর আনন্দ-উচ্ছ্বসিত প্রাণে নিরানন্দের রেখাঙ্কিত করিল। তাঁহার গার্হস্থ্য-সুখ অন্তর্হিত হইল; স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা হইলেন। হীরক এতই মূল্যবান্ যে, সে সম্বন্ধে চতুর্দ্দিকে সাড়া পড়িয়া গেল—শ্যাম-হরির শ্যাম অঙ্গে দ্যুতিমান হীরক দেখিতে হাজারে হাজারে লোক আসিতে লাগিল। একজন বলিল—ইহা বহু লক্ষ মুদ্রায় দিল্লীর বাদসাহ আকবর ক্রয় করিয়াছিলেন। ক্রমে দুইটী অপরিচিত সন্ন্যাসীর পরিচয় প্রকাশ পাইল। রাজপদচিহ্ন গোপন করিবার সাধ্য কাহার? চিতোরের রাণা শুনিলেন—মহামান্য মোগলসম্রাট তাঁহার স্ত্রীকে দেখিয়াছেন, স্পর্শ করিয়াছেন এবং বহু ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়াছেন।

মীরাবাই তাঁহার সম্মান হারাইয়াছেন: পবিত্র মেওয়ার বংশে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছেন। বিজাতীয় স্পর্শে তিনি জাতি হারাইয়াছেন। মীরাবাইয়ের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। রাজদণ্ডাজ্ঞা প্রতিপালন করিবার লোক নাই। রাজকর্ম্মচারীগণ একে একে সকলেই অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা লিখিত ও মহারাণার স্বাক্ষরিত হইয়া মীরাবাইয়ের প্রতি আদেশ করিল যে, তিনি স্বহস্তে প্রাণত্যাগ করুন। দৈনিক পূজার পর মন্দির হইতে ফিরিবার কালে মীরাবাইয়ের হস্তে এই কঠোর আদেশলিপি পতিত হইল। তাহা দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কি আমার স্বামীকে একবার দেখিতে পারি? কর্ম্মচারী বলিল—রাণী-মা! এই আদেশ-লিপিতেই লিখিত আছে দেখুন,—মহারাণা স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে, তিনি আপনার মুখদর্শন করিতে পারেন না। হিন্দু স্ত্রী তাঁহার স্বামীর কথা শিরোধার্য্য করিবে—মীরা এই মাত্র বলিলেন। অন্যদিনের ন্যায় সেদিনও তিনি বহু ভক্ত-সমাবৃত হইয়া মন্দিরে আসিয়াছিলেন। রাজদণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে তাহারা বিশেষ ব্যথিত ও উত্তেজিত হইবে ভাবিয়া মীরাবাই কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রাণীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া একখানা পুরাতন হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিলেন। সকলেই তন্দ্রাঘোরে বিগত-চেতন, কেহই জানিল না—মীরা কখন স্থান ত্যাগ করিলেন। যামিনী—স্বর্ণবর্ণ সাটী-পরিধৃতা নর্ত্তনশীল ও বিঘূর্ণিত তারকাবলী দ্বারা সমাচ্ছন্না। নদী-সৈকতে আসিয়া কিছুক্ষণ সুগভীর প্রার্থনায় নিরত থাকিয়া মীরাবাই ভীষণ তরঙ্গ-বক্ষে ঝম্পপ্রদান করিলেন। বারিবক্ষে পতিত হইবামাত্র একটী স্বর্গীয় তেজোরশ্মি তাঁহার চক্ষু-সম্মুখে প্রতিভাত হইল ও অজ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই

দেখিলেন যে, এক উজ্জ্বল জ্যোতিঃসম্পন্ন পরম রমণীর মূর্ত্তি নীচে নামিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল—মীরা, তোমার স্বামীর আজ্ঞা পালন করিয়াছ; তুমি তোমাকে হত করিয়াছ. এখন তোমাকে এক উচ্চতম কার্য্য করিতে হইবে—এক মহত্তর কার্য্য তোমাকে উঠিতে ও পুনরায় জীবনধারণ করতঃ লোকশিক্ষা দিতে আদেশ করিতেছে। মীরার সংজ্ঞালোপ হইল।

যখন মীরার জ্ঞান হইল—চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন—দিনের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-স্নাত হইয়া নদী-সৈকতে পড়িয়া রহিয়াছেন। তিনি উঠিলেন ও হরি-গুণ-গান করিতে করিতে সেই বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া তিনি একদল রাখালবালক দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছাসকল, বলিতে পার, আমি কোন্‌পথে মহাতীর্থে গমন করিব? রাখালবালকেরা তাঁহাকে দুগ্ধ খাওয়াইল, মা বলিল ও শ্রীবৃন্দাবনধাম অভিমুখে লইয়া চলিল। মীরা চলিল—হরিগুণ-গানে বিভোর হইয়া গগন-পবন মুখরিত করিয়া, মর্ত্ত্যে স্বর্গের মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া চলিল। নরনারী যে সেই গান শুনিল সেই নিজ কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া, বালক বালিকা তাহাদের খেলা ফেলিয়া সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিল—সকলেই আজ হরিগুণ-গানে মাতোয়ারা; মুখে প্রাণ মাতান গান "হরি বোল হরি হরি বোল" কতলোকে মীরাকে নানা প্রকার দ্রব্য-সম্ভার দিতে আসিল, কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না।

অনেকে অতি উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিল। কেহ কেহ তাহাদের গৃহ-প্রাঙ্গন পরিত্যাগ করিল এবং নানা অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া মীরার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। মীরাবাই যখন শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন, তখন মনে হইল সাক্ষাৎ উমা কৈলাস হইতে সাঙ্গোপাঙ্গ সপরিবার ও সবাহনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মীরাবাইএর বৃন্দাবনে আগমন বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল এবং তাঁহার সঙ্গীত-সুধা মুখে মুখে উচ্চারিত হইতে লাগিল। চিতোরের ভক্তগণ বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং বহুজন—যাহারা পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখেন নাই তাহারাও এক নূতন ভাব-প্রণোদিত হইয়া দলে দলে আসিয়া জুটিতে লাগিল।

তিনি এখন আর মেবারের মহারাণী নহেন চির-পরিত্যক্তা ভিক্ষু রমণী। ভিক্ষাপাত্র হস্তে বিশালতর রাজ্যের অধিশ্বরী। সে রাজ্য প্রেমের রাজ্য—মনুষ্যের মোক্ষ ও পরম শান্তির আগার।

এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে রূপ সনাতন নামে এক গোঁসাই প্রভু থাকিতেন। রূপ সনাতন প্রগাঢ় পণ্ডিত, উচ্চ অঙ্গেরভাবুক, ঘোর সন্ন্যাসী ও স্ত্রী-বিদ্বেষী। তাঁহার মত ছিল—"কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ ভিন্ন মুক্তি নাই।"

মীরা এ কথা শুনিয়া তাঁহাকে লিখিলেন "শ্রীবৃন্দাবনে একটী মাত্র পুরুষ আছেন এবং সেই এক পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ! তদ্ভিন্ন সমস্ত প্রাণী তাঁহার প্রেম আশ্রয় করিয়া জীবিত সুতরাং তাঁহারই স্ত্রী-স্বরূপ—এবং তাঁহার সহিত রক্ত-মাংস সম্পর্কে সম্পর্কিত। রূপ গোঁসাই এই এক-কর্ত্তা-তত্ত্ব সম্যক প্রণিধান করুন এবং যদি তিনি পুরুষ হইয়া চোরের মত এই শ্রীকৃষ্ণ রাজ-অন্তঃপুরের স্ত্রী-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ লাভ

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অগোচরে এ স্থান ত্যাগ করুন, নতুবা ধরা পড়িলে রাজদণ্ডার্হ হইবেন।" ইহা পাঠে গোঁসাই অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া মীরাকে সানন্দে যে মন্দিরে তিনি বাস করিতেন সেই খানে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন মীরা সামান্যা নারী নহে। মীরা আসিয়া প্রভুর চরণে পতিতা হইয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন।

"বৎসে, আমি আর তোমার কি করিতে পারি?"

"পিতঃ! আমাকে আপনার সান্নিধ্যে একটু স্থান দেন, যাহাতে আপনার শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভগবৎ-কথা শুনিতে পাই।"

সেই অবধি মীরা সেই মন্দিরে স্থান লাভ করিলেন। রূপ গোঁসাই বলিতেন—তিনি মীরার শিষ্য। মীরা বলিতেন—তিনি রূপ গোঁসাইএর শিষ্যা। এই ভাবে কাল অতিবাহিত হইয়া চলিল। মীরার হরি-সঙ্কীর্ত্তন ও রূপ গোঁসাইএর প্রেম শ্রীবৃন্দাবনে স্বর্গের অমৃত ধারা ছুটাইয়া দিল এবং সহস্র সহস্র নরনারী আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি ধূলিকণায় হরি নামামৃত পরিব্যাপ্ত করিয়া দিল। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীমন্দির পাদপৃষ্ঠে বসিয়া মীরাবাই যে শ্রীহরি নাম গান শুনাইলেন—সে প্রাণমাতান গান—দূরে হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গে, গঙ্গা যমুনার তটভূমে, পঞ্চনদভূমে—সুদূর মহারাষ্ট্রে এমন কি দিগন্ত-বিস্তারি সমুদ্রের শ্যাম-অঙ্গে উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত হইয়া সমগ্র স্থানে এক মহা হরিনাম-প্লাবন আনিয়া দিল।

চিতোরও এ আনন্দ-কণা লাভ করিল। চিতোরের হাটে, মাঠে, গোঠে,—প্রত্যেক গৃহ-প্রাঙ্গণে—প্রত্যেক রাজপথে—উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে মীরা-প্রসঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। রাণা যেখানেই যান, সেখানেই মীরা-প্রসঙ্গ শুনিতে লাগিলেন। অবশেষে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হইল। রাণা বুঝিলেন—যে রাজ্য হইতে তিনি মীরা-রাণীকে বহিষ্কৃতা করিয়াছেন, সে রাজ্য অপেক্ষা মীরাবাইয়ের রাজ্য অতি উচ্চস্তরের এবং মীরাবাইএর এ ঐশ্বর্য্য সম্পদের তুলনায় রাণার রাজ-সম্পদ্ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তিনি মীরাকে বহিষ্কৃতা করিয়াছেন। তিনি মীরার মৃত্যু-আজ্ঞা দিয়াছেন। কারণ *সম্রাট-সংস্পর্শ জন্য মীরা* এবং মীরার অবস্থানে রাজ-পরিবার লোক-নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু মীরা মেওয়ার-বংশ কলঙ্কিত করেন নাই। মীরার যশোভাতীতে মেওয়ার-বংশ যশোদৃপ্ত। সমস্ত জগৎ মীরার কৃপা ভিক্ষা করে—মীরাকে ভালবাসে। রাণা তখনও মীরা-প্রেমে মুগ্ধ। তিনি ছদ্মবেশে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবন পৌঁছিলেন। মন্দির-পাদপৃষ্ঠে বসিয়া মীরা—তাঁর গণ্ড দুটী ম্লান-পঙ্কজের বিশুষ্ক কেশরের ন্যায়—কিন্তু মীরার হাঁসি লুকাইবার নহে। ছদ্মবেশী রাণা ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। "আমি—ভিক্ষুক স্ত্রী—আপনি কোন ধনী সকাশে গমন করুন।"

রাণা বলিলেন—"সৎ ভিক্ষুক ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করে।"

"কিন্তু দানের যোগ্য আমার কি আছে?"

নতজানু হইয়া রাজা বলিলেন—"ক্ষমা! ক্ষমা ভিক্ষা চাই।"

মীরা—নারী মীরা স্বামী-পদ-প্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন।

"প্রাণেশ, স্বামীন্—এতদিন পরে দাসীকে মনে পড়েছে।"

কি সুখের মিলন! রাণা মীরাবাইকে রাণীর মত করিয়া ফিরাইয়া আনলেন। কিন্তু মীরা বৎসরের অর্দ্ধেক ভাগ শ্রীবৃন্দাবনে সেই মন্দিরে বাস করিবার মনস্থ করিলেন। মীরার শিক্ষা উৎকট সন্ন্যাসের সপক্ষে নহে—ইহা বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুমোদিত। শ্রীকৃষ্ণ-ধর্ম্মানুমোদিত নহে। মীরা বলেন—দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কর কিন্তু হরি-প্রেম চাই—হরিসে লগে রহো ভাই।

গান অনুবাদ করা সহজ নহে কিন্তু এ সম্বন্ধে একটী গান অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে গানের মাধুরী না থাকিলেও মীরার রসপটুতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।—

জলে নিমজ্জিত হইলে যদি মোক্ষ মিলে
ত' মাছ পাবে না কেন?
নিরামিষাশী হইলে যদি মোক্ষ মিলে
ত' বাঁদর ও পক্ষীরাও পাইবে
শাকসব্জী খেলে যদি পাওয়া যায়
ত' হরিণ ও ছাগলেও পাইবে
মীরা বলে—হরি প্রেম বিনা মিলিবার নহে।

মীরার জীবন ও ধর্ম্মমত পাঠে বুঝা যায়—ভারতের ধর্ম্ম ভারতবাসীর নিকট কি ভাবে প্রতিভাত হয়—আমরা (ভারতের দেশবাসী) বুঝিতে পারি কিরূপে ভগবৎ-শক্তি সর্ব্বত্র ভারতের অণুপরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। অবশ্য এ ভাব—"হিদেন গুডস্" বলিয়া যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন তাঁহাদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। এ সত্যোপলব্ধি আমার আসিয়াছিল একদিন লণ্ডনে সার্ জগদীশ বোসের বাটীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ কালে। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধিব্যাহারে একটী হিন্দু-যুবক ছাত্র প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিয়াছিল—

"যখনই আমি ইহাকে দেখি তখনই আমার মনে হয় ইনি সাক্ষাৎ শিব।" কথাটী বলিতে বলিতে যুবকের চক্ষু দুটী জ্বলিয়া উঠিল, অধরোষ্ঠ প্রগাঢ় ভক্তিতে অবনমিত হইল এবং সে দৃশ্য দেখিয়া অবধি আমি শিব নামে সত্য-সত্তা উপলব্ধি করিলাম এবং তদবধি শিব আমার নিকট সত্য—চির সত্য—ধ্রুব সত্য।

মীরার প্রত্যেক গানে এই সত্য উপলব্ধি আনিয়া দেয়। প্রত্যেক হিন্দুনারীর পবিত্র হৃদয়-জ্যোতিতে—

হরিসে লগে রহো ভাই—
হরি বিনা গতি নাই,
হরি-রূপ মহামূল্য রতন সদা সর্ব্বদা প্রাণয়ে রাখো।

গোপালন, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত-খাদ্য।

(শ্রীস———)

বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা ৪৫৩,২৯২৪৭ গো-মহিষের সংখ্যা ২৫৩,৫৫৮৩৮। বঙ্গদেশে যত মহিষ আছে গরুর সংখ্যা তাহার ২৫ গুণ বেশী। প্রতি একশত নব-

নারী ৫৬টী গো-মহিষ পালন করিয়া থাকে।

পুরাকালে গোধন ভারতবাসীর প্রধান সম্পত্তির মধ্যে গণ্য ছিল। যিনি যত অধিক গো-পালন করিতেন, তিনি তত বড় ধনী বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু এখন অনেক লক্ষপতিকেও দুগ্ধ কিনিয়া খাইতে হয়। অনেক ধনবানের ভবনে ল্যাণ্ড, ব্রুম, মটরের ছড়াছড়ি কিন্তু বাটীতে একটীও গাভী নাই। সেকালে গো-সেবা আর্য্যগণের মহাপুণ্যের মধ্যে গণ্য ছিল। গো-গ্রাস দান হিন্দুর নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত ছিল। আজকাল যেমন রজত মুদ্রা দানের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, সেকালে ইহার পরিবর্ত্তে অন্নদান ও গো-দানের ব্যবস্থা দেখিতে পাই। কিন্তু গো-দান করিবার শক্তি অনেক ধনবানেরও নাই; কাজেই ইহার পরিবর্ত্তে যৎকিঞ্চিৎ রজত-মুদ্রা দিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাই।

আমরা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের গুণাগুণ আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

দুগ্ধ,—কৃশ, শিশু, বালক, বৃদ্ধ ও দীপ্তা-নল ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ বিশেষ হিতকর পূর্ব্বাহ্নে দুগ্ধ পান করিলে শরীরের পুষ্টি অগ্নির দীপ্তি ও শুক্রবৃদ্ধি হয়; মধ্যাহ্নে সেবন করিলে বল ও অগ্নিবৃদ্ধি এবং কফ ও পিত্তনাশ হয়; রাত্রিকালে দুগ্ধপানে শরী-রের হিতসাধন, নানা দোষক্ষয় ও চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। রাত্রে ভোজ্যদ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পান না করিয়া কেবল দুগ্ধ সেবন বিধেয়।

শৈশবাবস্থায় দুগ্ধ পান করিলে শরী-রের পুষ্টিসাধন, বৃদ্ধাবস্থায় দুগ্ধ সেবনে শুক্র বৃদ্ধি হয়। ক্ষয়রোগীর দুগ্ধ একান্ত প্রয়োজনীয়।

বিবর্ণ বিরল, অম্লরসান্বিত, দুর্গন্ধযুক্ত ও ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া এবং অম্ল অথবা লবণ মিশ্রিত দুগ্ধ অহিতকর; এরূপ দুগ্ধ সেবনে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। দোহনকালে দুগ্ধ সাধারণতঃ গরম থাকে, ইহাকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ কহে। ধারোষ্ণ গব্যদুগ্ধই পান করা হিতকর কিন্তু ঐ দুগ্ধ শীতল হইলে তাহা পান করা

বিধেয় নহে। মহিষ দুগ্ধ দোহনের পর শীতল করিয়া পান করিলে শরীরের হিত-সাধন করে। গো মহিষ ব্যতীত অন্য জন্তুর কাঁচা দুগ্ধ প্রভৃত অহিতকর। গরম দুগ্ধ সেবনে কফ ও বায়ু এবং শীতল দুগ্ধ পানে পিত্তনাশ হয়। রাত্রে যাহাদের স্বপ্নদোষ হয় তাহাদের পক্ষে দুগ্ধদধি প্রভৃত অনিষ্টকর। যেদিন দিবসে কি রাত্রে গরম দুগ্ধ পান করিবে সেই রাত্রেই স্বপ্নদোষ হইবে। দুগ্ধ ও জল সম পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করতঃ দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইলে তাহা অত্যন্ত লঘু হয়। বিশুদ্ধ দুগ্ধ যত অধিক সিদ্ধ হয় ততই উহা গুরু, স্নিগ্ধ এবং শুক্র ও শক্তিবর্দ্ধক হয়।

গো-দুগ্ধ—মধুর রস, মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য স্তন্যকারক ও স্নিগ্ধ। ইহা দোষ, ধা, তু মল ও স্রোত সমূহের কিঞ্চিৎ ক্লিন্নতা-কারক, গুরু এবং ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, জরা ও সমস্ত রোগে হিতকর। কপা গাভীর দুগ্ধ পান কদাচ বিধেয় নহে। অনেকে যক্ষারোগগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়।

মহিষ-দুগ্ধ—গব্য-দগ্ধ অপেক্ষা মধুররস, স্নিগ্ধ, শুক্রকারক, গুরু, নিদ্রাজনক, অভি-ষ্যন্দী, ক্ষুধাবর্দ্ধক ও শীতবীর্য্য।

ছাগ দুগ্ধ—কষায়, মধুররস, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, লঘু এবং ইহা রক্তপিত্ত, অতিসার, ক্ষয়কাশ ও জ্বররোগে বিশেষ হিতকর।

মেষ-দুগ্ধ—স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, অশ্মরী-হারক, অহৃদ্য, তৃপ্তিজনক, কেশের হিত-কর, গুরু ও শুক্রবর্দ্ধক, পিত্ত ও কফকারক এবং ইহা বাতজ, কাশ ও বায়ুরোগনাশক।

দুগ্ধের সর—গুরু, রতিশক্তিবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক, বাতঘ্ন, তৃপ্তিকর, পুষ্টি-কারক, স্নিগ্ধ এবং ইহা বলকারক, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক।

মাখন—গব্য মাখন হিতজনক পুষ্টি-কারক, বর্ণপ্রসাধক, পুষ্টিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, ধারক এবং ইহা বায়ু রক্তপিত্ত, ক্ষয়, অর্শ ও কফনাশক। বালক বৃদ্ধ সকলেরই পক্ষে মাখন হিতকর বিশেষতঃ ইহা শিশুর পক্ষে অমৃততুল্য।

মহিষ নবনীত—বায়ুবর্দ্ধক, কফকারক, গুরু, শু [illegible] ইহা দাহ [illegible]।

দুগ্ধজাত মাখন চক্ষুর হিতকারক রক্ত-পিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, অতিশয় স্নিগ্ধ, মধুররস, ধারক ও শীতবীর্য্য। সদ্য প্রস্তুত নবনীত মধুররস, ধারক, শীতবীর্য্য লঘু ও মেধাজনক। পুরাতন নবনীত—গুরু, বলকারক, মেদোবর্দ্ধক এবং ইহা অর্শ ও কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

ঘৃত—গব্যঘৃত চক্ষুর অত্যন্ত হিতকর, শুক্রজনক অগ্নিবর্দ্ধক, বাত, পিত্ত ও কফ-নাশক, মেধাজনক, লাবণ্য, কান্তিপ্রদ ওজোধাতুজনক, অত্যন্ত তেজস্কর অলক্ষ্মী বিনাশক, বয়ঃস্থাপক, আয়ুস্কর রুচিকর। সকল ঘৃত অপেক্ষা গব্যঘৃতই শ্রেষ্ঠ।

মহিষ-ঘৃত—রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক শীতবীর্য্য, কফকারক ও শুক্রজনক।

ছাগঘৃত—অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, বলকারক, কটুবিপাক এবং ইহা কাশ শ্বাস ও ক্ষয়রোগে বিশেষ হিতকর।

বৎসরাধিক কালের ঘৃতকে পুরাতন ঘৃত কহে। ঘৃত যত অধিক দিনের হইবে উহার গুণের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইবে। পুরাতন ঘৃত ত্রিদোষনাশক এবং ইহা মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, অপস্মার ও তিমির রোগে বিশেষ হিতকর।

ভোজন, তর্পণ, শ্রম, বলক্ষয়, পাণ্ডুরোগ কামলা, ও নেত্ররোগে নূতন ঘৃত সমধিক উপকারী। রাজযক্ষ্মা, কফজ রোগ, আম জন্য রোগ, বিসূচিকা, মদাত্যয়, জ্বর, মন্দাগ্নি এই সকল রোগে এবং বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত উপকারী নহে। সহ্য মত ঘৃত ব্যবহার করিতে হয়, ঘৃত ব্যবহারে অনেক সময় ক্ষুধার হ্রাস হইয়া যায়।

দধি—দুগ্ধ কুসুম কুসুম গরম থাকিতে পূর্ব্ব দিনের দধি সামান্য পরিমাণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে ছয় সাত ঘণ্টা মধ্যে উহা জমিয়া ঘন দধি হয়। পূর্ব্ব দিনের সামান্য দধিকে "সাজা" বা "দম্বল" কহে। আজকাল দধি প্রস্তুতের জন্য বাজারে ল্যাক্টিক্ এসিড ট্যাবলেট (Lactic acid tablet.) নামক এক প্রকার দধি বীজ

পাওয়া যায়। কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজের জীবাণুতত্ত্ববিদ্ বহুদর্শী ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর এক প্রকার দধি-বীজ আবিষ্কার করিয়াছেন। উহার দ্বারা উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ দধি প্রস্তুত করা যায়। "দম্বলে" এক প্রকার জীবাণু থাকে, উহারা উদ্ভিদ্ শ্রেণীর অন্তর্গত, দেখিতে গোলাকার ও লম্বা-রকমের। এই জীবাণুগুলি লম্বা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—১ম, ল্যাক্টিক এসিড ব্যাসিলা, ইহারা লম্বা প্রকৃতি বিশিষ্ট। ২য়, ষ্ট্রেপটোকসান্ ইহারা গোলাকার। সাধারণ দধিতে অনেকগুলি জীবাণু থাকে, তাহাদের দ্বারা দধি সুগন্ধ হয়। দুগ্ধের মধ্যে অল্প পরিমাণ চিনি ও খড়ির গুঁড়া দিয়া দই পাতিলে উহা বড়ই ঘন হয় এবং অধিক টক হয় না। এই দই সুগন্ধি ও খুব হিতকর এবং অধিকতর বলকারক হয়। স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, মন্দাগ্নি, উদরাময়, অস্থি-বিকৃত, যক্ষ্মাকাশ প্রভৃতি রোগে ইহা বড়ই উপকারী। খড়ি ক্যাল্‌সিয়াম-জাতীয় পদার্থ বিশেষ; ইহা আমাদের দেহের পক্ষে বড়ই উপকারী—ইহার দ্বারা আমাদের দেহের অস্থি পুষ্ট হয়। স্নায়ু-মণ্ডলী ও মস্তিষ্কের উহা একটা বড়ই প্রয়োজনীয় উপকরণ। সকল জীব-কোষেই ইহা আবশ্যক। ইহার সহায়-তার কোষটী বিভাগ হইয়া শরীর বৃদ্ধির কার্য্য করে। বুলগেরিয়া দেশের কৃষকেরা নিয়মিত ভাবে দধি ভোজন করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করে। সে দেশে অনেকেই শতাধিক বর্ষকাল বাঁচিয়া থাকে। লোক সংখ্যার অনুপাতে বুলগেরিয়া দেশে যত দীর্ঘজীবী মনুষ্য আছে পৃথিবীর আর কোন দেশে তত নাই। এই সমুদায় কারণে বুলগেরিয়ার দধিবীজ বা দম্বল এখন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। দধির জমাট অংশ যত উপকারী তরল অংশটী সেরূপ নহে। মূত্রাশয় অন্ত্রপীড়া এবং অন্ত্রপীড়া ঘটিত যকৃতের পীড়ায় দধির ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। বাসী দধিতে দুগ্ধাম্ল বা ল্যাক্টিক্ এসিডের মাত্রা বেশী এবং শর্করার পরিমাণ কম। একারণ সদ্য-দধি অপেক্ষা বাসি দধি অধিক টক

হয়। টক দধি অহিতকর। এইরূপ উদ্ভিদাণুগুলি সেরূপ সতেজ না থাকায় ইহার উপকারিতা শক্তি হ্রাস পায় এবং ইহা ব্যবহারে বাত প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সদ্যজাত দধি অর্থাৎ যাহা অধিক টক নহে, তাহাতে দধি বীজাণুগুলি সতেজ থাকে বলিয়া শরীরের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

"দধিতে যে ল্যাক্টিক এসিড প্রস্তুত হয় তাহাই অম্লগুণবিশিষ্ট বলিয়া পচন নিবারণ করে। এই অম্ল রসটুকু অল্প হইলে বড়ই মুখরোচক ও বড়ই উপকারী হয়। ল্যাক্টিক এসিড বেসিলীর এমন শক্তি আছে যে আর এক রকম বেসিলী "বেসিলী কোনই"—কে আয়ত্তাধীন রাখে। এই 'কোনই' জাতীয় বেসিলী পরিমিতরূপে আমাদের খাদ্যে থাকিলে হজমের পক্ষে অনেক উপকার করে, তবে কখনও কখনও অতিরিক্তও বিকৃত হইয়া—বা অন্য কোন নূতন জীবাণু দ্বারা দূষিত হইয়া মানব দেহে বড়ই ক্ষতি করে।"

"সু-প্রসিদ্ধ একজন রাশিয়ান পণ্ডিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়াছেন যে "কোনই" বেসিলীর প্রাদুর্ভাব বা বিষাক্ততা হইতে অনেক রোগ হয়। তাহারা যে ক্লেদ-গুলি খাদ্যনলে উৎপন্ন করে, সেগুলি বড়ই বিষাক্ত। সেইগুলি রক্তে নীত হইয়া অনেক ব্যাধি ঘটায়। ইহাদের দ্বারাই বৃদ্ধ বয়সের আবির্ভাব সংঘটিত হয়। তাই পরিমিত পরিমাণে দই খাওয়াই স্বাস্থ্যকর।" (ভারতবর্ষ আষাঢ় ১৩২০।)

"সু-প্রসিদ্ধ জীবাণু তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার মেচ্‌নিকফ (Matchnikoff) বলেন—আমাদিগের মন্ত্রের মধ্যে বহু উদ্ভিদাণু বিদ্যমান আছে। তাহারাই অন্ত্র মধ্যস্থ ভুক্ত দ্রব্যের পচন ক্রিয়ার এবং মাতিয়া উঠার (Fermentation) কারণ। তাহারা অন্ত্র মধ্যে যে বিষাক্ত ক্লেদ উৎপন্ন করে, তাহা রক্ত মধ্যে শোষিত হইয়া নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন করে, এবং উহাদের দ্বারাই জরা বা বার্দ্ধক্য আনীত হয়। এইরূপে ইহারা আমাদের শরীরকে ক্ষয় করিয়া অকালে বার্দ্ধক্য আনয়ন করে। সাধারণতঃ বৃহদন্ত্র মধ্যে ইহারা অধিক

সংখ্যায় বাস করে। এই নিমিত্ত যে সমুদায় জীবের বৃহদন্ত্র অথবা Colon নাই, তাহারা অতিশয় দীর্ঘজীবী। কাক, বাজ, প্রভৃতি পক্ষী প্রায় আড়াই শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। অন্ত্রাশ্রিত এই সমুদায় উদ্ভিদাণু দধি বীজের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।" (ভারতবর্ষ শ্রাবণ ১৩২৩।)

দধির এত গুণ থাকিলেও অবস্থা বিশেষে সর্ব্বরোগে ইহা ব্যবহার করা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। ম্যালেরিয়া, কাশি, বাত, অম্ল, ক্ষত প্রভৃতি রোগে ইহা প্রভূত অনিষ্টকর। দুগ্ধ হইতে দধি অনেকটা নিরাপদ। দুধের রোগবীজ কোষে কীটাণুগণ নিজেই প্রসার পায় ও সংক্রামক হয়। টাইফয়েড, ক্ষয় বিসূচিকা প্রভৃতি অনেক ব্যাধি প্রায় দুগ্ধ হইতে সংক্রামিত হয়।

দধির সাধারণ গুণ—উষ্ণবীর্য্য, জঠরা-নলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, কষায়ামধুরস, গুরু অম্ল-বিপাক, এবং ধারক। ইহা রক্তপিত্ত, শোথ, মেদ ও কফবর্দ্ধক। কিন্তু মূত্রকৃচ্ছ্র, সর্দ্দি শীতজ্বর, বিষম জ্বর, অতিসার অরুচি ও কৃশতা রোগে প্রশস্ত। দধি বলকারক। গব্য দধি অত্যন্ত স্বাদু, বলকারক, রুচিপ্রদ, পবিত্র, অগ্নি-দীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও বায়ু নাশক। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে—সকল প্রকার দধির মধ্যে গব্য দধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট। রাজ-নির্ঘণ্টকার বলেন—গব্য-দধি অতি পবিত্র, স্নিগ্ধ, শীত, অগ্নিদীপক, বলকারক মধুররস অরুচিনাশক, ধারক এবং বায়ুরোগ নাশক।

মহিষদধি—সুস্নিগ্ধ, শ্লেষ্মাকারক, বাতপিত্তনাশক, অভিস্যন্দি (অর্থাৎ রসনির্গত করিতে সমর্থ) শুক্রবর্দ্ধক, গুরু ও রক্তদূষক।

ছাগ-দধি—অতিশয় ধারক, লঘু, ত্রিদোষনাশক এবং অগ্নিদীপক। ইহা শ্বাস, কাস, অর্শ, ক্ষয় এবং কৃশতারোগে প্রশস্ত।

দধি চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করা বিধেয়। ইহা তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও দাহ-নাশক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রক্তপিত্ত রোগে দধি অনিষ্টকর কিন্তু শর্করামিশ্রিত

দধি রক্তপিত্তনাশক। আয়ুর্ব্বেদে আছে—

সশর্করং দধিশ্রেষ্ঠং তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহজিৎ।

গুড়যুক্ত দধি বাতনাশক, শুক্রজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক ও গুরুপাক। রাত্রিতে দধি ভোজন করিতে হইলে ঘৃত এবং জল মিশ্রিত করিয়া সেবন করাই বিধেয়। অগ্নিতে দধি উত্তপ্ত করিয়া ভোজন করিবে না। জলঝরা শুক্না দধি ধারক কিন্তু দধির জল বিরেচক।

ঘোলে—দধিকে উত্তম রূপে মন্থন করিয়া উহার মেদময় অংশ বা নবনীত তুলিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে আমরা ঘোল বলিয়া থাকি। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-গ্রন্থে পাঁচ প্রকার ঘোলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্চিৎ ও ছচ্ছিকা। সরের সহিত নির্জ্জল দধি মন্থন করিলে ঘোল প্রস্তুত হয়। জলের সহিত সরবিহীন দধি মন্থনে মথিত হয়; চতুর্থাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাকে তক্র এবং অর্দ্ধেক জলের সহিত দধি মন্থন করিলে উহাকে উদশ্চিৎ কহে; প্রচুর জলের সহিত দধি মন্থনে যাহা প্রস্তুত হয় তাহাকে ছচ্ছিকা বলে।

চিনি-সংযুক্ত ঘোলে রসালার (দধি শর্করা কর্পূর লবঙ্গাদি মশলা সংযোগ প্রস্তুত) ন্যায় গুণকারী অর্থাৎ শুক্রজনক পুষ্টিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক। ঘোল—বায়ু ও পিত্তনাশক। মথিত, কফ ও পিত্তনাশক। তক্র—ধারক, কষায়াম্ল, মধুর রস, সুস্বাদু, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক তৃপ্তিজনক বায়ুনাশক। ইহা গ্রহণী প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে হিতকর। তক্র লঘু বলিয়া ধারক, সুস্বাদু হইলেও পিত্তপ্রকোপক নহে এবং রুক্ষতা হেতু কফ নষ্ট করিয়া থাকে। উদশ্চিৎ কফবর্দ্ধক, বলকর এবং অত্যন্ত শ্রান্তিনাশক। চচ্ছিকা—শীতল, লঘু, কফকারক পিত্ত, শ্রম ও তৃষ্ণানাশক। কিন্তু লবণযুক্ত হইলে অগ্নিদীপক হয়। পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার ঘোলের মধ্যে তক্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(ক্রমশঃ)

মায়া।

(শ্রীকৃপানন্দ বিশ্বাস।)

(১)

দেবী কি দানবী তুমি বুঝিলনা মন,
আসিয়া পড়িনু হায় তোমার কুহকে
মোহিনী মুরতি তব বধিল জীবন
দেখায়ে ছায়ার বাজি এ বিশ্ব সমক্ষে।

(২)

জান তুমি কতরঙ্গ ওগো মায়াবিনী।
দগ্ধ কর প্রাণমন তপ্ত-মরু মাঝে
তবু ধায় তোমাদিকে জগতের প্রাণী
এ খেলা কি দিন দিন ভাল তোমা সাজে?

(৩)

সাজায়েছ সারা বিশ্ব মনমত করি,
পাতিয়ে মায়ার জাল মায়া কুহকিনী
যুঝিতে তোমার সাথে কেবা আছে আর
যে আসে তোমার রাজ্যে পলায় তখনি!

(৪)

দয়া করে কর তুমি এই আশীর্ব্বাদ
মিটে যাক যত দ্বন্দ্ব আমার আমারি
তা হইলে ধন্য মোর জনম ধরায়
ঘুচে যাক চির তরে মোহ অন্ধকার।

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এ)।

(৯)

অশ্রুর বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু বলিল, "বেশ মেয়েটী সুরেশদা" আমার বড় পছন্দ হয়েছে। যেমন মিষ্টি

কথা তেমনি মিষ্টি স্বভাব। অসুখে পড়ে থাকা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে কেমন কথা কইল।

"একঘণ্টার আলাপে তুই যে তার সমস্তটাই জেনে ফেলেছিস্ ইন্দু।"

"দু'দণ্ড কথা কইলেই মানুষ চেনা যায় সুরেশদা। অশ্রুর যখন কথা বন্ধ হ'য়ে গিছ্‌ল ভাগ্‌গি তখন যাই নি তাহ'লে সে তো এমনি করে আমার সঙ্গে কথা কইতে পারত না। সে যদি আমার মায়ের পেটের বোন হ'ত তাহ'লে বেশ হ'ত সুরেশদা"।

"কেন ইন্দু তাহ'লে কি হ'ত ?

"মনের মতন ক'রে সাজাতুম, নিজের মতন করে গড়ে তুলতুম, প্রাণভরে ভালবাসতুম। আর কি কত্তুক জান সুরেশদা ? একটু হাসিয়া সুরেশ বলিল, "কি ক'রতিস ইন্দু ?" "চোখে চোখে রাখতুম, কখন বিয়ে দিতুম না।" হো হো করিয়া সুরেশ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "বল্ না কেন মালা-গেঁথে তাকে বুকের ওপোর রেখে দিতিস্।"

"তুমি ঠাট্টা কর'চ, কিন্তু আমি ঠিক কথা ব'লচি সুরেশদা। অশ্রুকে আমি বড় ভালবেসে ফেলেছি। তুমিই বলনা কেন, তাকে একবার দেখলে না ভাল বেসে থাকতে পারা যায় ?"

সুরেশ আর বলিবে কি ? সে যে এ মহাসত্যটী বহু পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়াছিল। ইন্দু সেই আবিষ্কারটীকে বিবৃক্তি করিল মাত্র।

ইন্দু বলিল, "যদি সময় থাকত আমি আবার তার কাছে যেতুম।" "কালকের দিনটা তো থাকবি ইন্দু। কাল তোকে আবার তার কাছে নিয়ে যাব'খন।"

"আমি যে আজই সন্ধ্যার পর যাব সুরেশদা। তিন দিনের মেয়াদে এসেছিলুম, দুদিনেই সে মেয়াদ ফুরিয়ে গ্যাছে।"

"তা হবে না ইন্দু। আমি বীরেনকে বলবো আরও কিছুদিন তোকে এখানে রাখতে, এ অবস্থায় শ্বশুরবাড়ী গেলে মারা যাবি যে। তোর শরীরে কি আর কিছু আছে !"

"এই শরীর নিয়েই আমায় যেতে হবে।

সুরেশদা। তুমি তো জানো আমার দুজায়গাই সমান।"

"চোখের চামড়া থাকলে কেউ কখন তোকে এ অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারে না। *আমি বীরেনকে ব'লবই।"*

গতবারের ঘটনা স্মরণ করিয়া ইন্দু বলিল, "না, না কারো কাছে বলো না। দোহাই তোমার। মাতো একবারও যেতে বারণ করেন নি। তবে তুমি কেন বারণ করবে সুরেশদা। বল আমার জন্যে কাউকে কিছু ব'লবে না?" "সেখানে গিয়ে তোকে হাঁড়ি ঠেলতে হবে, গঙ্গা থেকে ঘড়া করে জল তুলে আনতে হবে, শাশুড়ীর ঝাঁটা লাথি খেতে হবে, আর বীরেনের কষ্ট দেওয়া তো আছেই—তুই এত কি করে সহ্য করিস্ ইন্দু? তুইতো একটুও কষ্ট সহ্য কত্তে পারতিস্ না।"

একটু ম্লান ভাবে হাসিয়া ইন্দু বলিল, "তুমিইতো একদিন আমায় বলেছিলে সুরেশদা! যে সকলের উচিত নিজের নিজের অবস্থা মত নিজেকে তৈরী করে নেওয়া। আমি যে তারই কাজ করছি; তবে তুমি আমায় তাতে বাধা দিচ্ছ কেন সুরেশদা?"

উত্তর করিবার মত সুরেশ কিছুই আর খুঁজিয়া পাইল না; শুধু ভাবিল ইন্দু *ও বীরেন ঠিক যেন স্বর্গ ও নরক। বহু*-তপস্যা করিলে এইরূপ একটী রত্ন পাওয়া যায়। বীরেন সেই রত্নকে পায়ে দলিয়া হেলায় হারাইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে ইন্দু বলিল, "লোকে বিয়ে করে কেন সুরেশদা?—বিশেষতঃ এই মেয়ে মানুষেরা; বেটাছেলেরা বিয়ে করে করুক; মেয়েমানুষেরা কি বিয়ে না করে থাকতে পারে না?"

ইন্দুর কথায় সুরেশ না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল, "মেয়েরাই যদি বিয়ে না করবে,তাহলে পুরুষরা কাকে বিয়ে করবে? এ যে তোর পাগলের মত কথা হল।"

নিজের ভ্রম বুঝতে পারিয়া ইন্দু বলিল, "কাহারও তাহলে বিয়ে করা উচিত নয়।"

"না ইন্দু তোর সঙ্গে তাহলে আমার মিললো না।"

"কেন সুরেশদা? আমার বোধ হয় বিয়ে করে পায়ে বেড়ী না পরে পৃথিবীর অনেক কাজ করা যায় তোমাদের কথা বল্‌ছিনি সুরেশদা, আমাদেরও কথা বল্‌চি।"

"আমাদেরও বাদ দিলে চলবে না ইন্দু। তোরা যেমন বিয়ে করে পরাধীন হস, আমাদের মধ্যেও অনেকে তাই হয়। ও বিষয়ে পুরুষদের গর্ব্ব করবার বিশেষ কিছু নেই।"

"তার চেয়ে তো বিয়ে না করাই ভাল সুরেশদা? সবাই কেন ভাই বোনের মতন এক হয়ে কর্ত্তব্যের ভেলায় চড়ে কর্ম্মের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিক না।"

"বিয়েটাও যে কর্ম্মেরই একটা অঙ্গ ইন্দু, কর্ত্তব্যের একটা অংশ। যে পৃথিবীকে ভগবান এত যত্ন করে সৃষ্টি করেছেন সেটাকে মানুষ-শূন্য করা তো আর তাঁর উদ্দেশ্য নয়। বিয়ে জিনিসটা আমার বোধ, হয় তাঁরই অভিপ্রেত। তবে এই টুকু পৃথিবীতে মানুষের গাঁদি লেগে যাওয়া, তার জন্যে তাঁকে দায়ী করা যেতে পারে না। সে বিষয়ে তিনি মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। বিয়ে জিনিষটাকে মন্দ বলিস্‌নি ইন্দু।"

"কিন্তু আমার বোধ হয় সুরেশদা, বিয়ে ক'ল্লে এত ছোট ছোট কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হয় যে কোন একটা বড় কাজে হাত দেবার ফুরসুৎই পাওয়া যায় না।"

"তার জন্যেও তো মানুষই দায়ী ইন্দু। কর্ম্মের ভিতর দিয়ে সমস্ত কর্ত্তব্যগুলোকেই ক'রে যেতে হবে, এমন কি ভগবানকে পাবার চেষ্টা করা পর্য্যন্ত। তাঁকে ডাক্‌তে হ'লে যে সন্ন্যাস ধর্ম্ম নিয়ে কেবল চলেই যেতে হবে তার কিছু মানে নেই। আমার মনে হয় সংসারের কোলাহলে, পাপের মধ্যে থেকেও পাপীর একজন না হয়ে শুধু কর্ম্মের ভেতর দিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়। এবং সেই পাওয়াটাই আমার মতে ঠিক পাওয়া।"

"তা হ'লে তুমি ব'লতে চাও সুরেশদা, যে বিয়েটাও আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে—সেটা কর্ম্মেরই একটা অঙ্গ।"

"তাইতো ইন্দু। গীতার সেই শ্লোকটা

বোঝাবার সময়ে তোকে একদিন ব'লে ছিলুম, মনে আছে বোধ হয়? পুরুষ প্রকৃতি এক না হ'লে কোন কাজই সম্পূর্ণ হয় নাই, সেই এক হওয়াটাই যে মানুষের সাধনার সিদ্ধি, কর্ম্মের সমাপ্তি।"

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া থাকার পর সুরেশ বলিল,—"বিয়ে করা মানে যে স্ত্রীলোকের দাসত্ব স্বীকার করা তা নয়। স্ত্রী, পুরুষ উভয়েরই নিজের নিজের কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্যগুলো ক'রে গেলেই বেশ বুঝতে পারা যায়, স্ত্রীলোক না হ'লে পুরুষের চলে না, আবার পুরুষ না হ'লে স্ত্রীলোকেরও চলে না। কাজে কাজেই স্ত্রীলোককে বোনও হ'তে হয়, স্ত্রীও হ'তে হয় এবং মাও হ'তে হয় আবার পুরুষকেও ভাই, স্বামী ও বাপ্ হ'তে হয়।"

খানিকক্ষণ পরে সুরেশ আবার বলিল, "যারা নিজের যা কিছু ভাল তা পরের জন্য উৎসর্গ ক'র্ত্তে পারে, পতিতকে উদ্ধার ক'র্ত্তে চেষ্টা করে, দরিদ্রের দারিদ্র্য-মোচন ক'র্ত্তে যত্নবান হয়, রোগীকে সেবা ক'র্ত্তে কুণ্ঠিত হয় না, যেখানে মাথা নীচু করবার দরকার, সেখানে মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়ায় না, নিজে বাসন মেজে, নিজে রেঁধে, নিজে হাতে বাজার ক'রে অর্থ বাঁচিয়ে সেই টাকায় পরের অভাব দূর করে; দেশের ও বিদেশের মঙ্গলের জন্য দান করে, নিজের জীবনধারণের মত আবশ্যকীয়টা রেখে সব পরের জন্য ত্যাগ ক'র্ত্তে পারে ইন্দু, আমার মতে, সেই যথার্থ ত্যাগী, সেই সংযমী এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা না হ'লেও, দুপাতা ইংরাজী না পড়লেও, যথার্থ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, সেই দেশের শিরোমণি এবং আদর্শ। ইন্দু! সেইখানেই পুরুষ মানুষের পুত্রত্ব, ভ্রাতৃত্ব, স্বামীত্ব, পিতৃত্ব, এবং মনুষ্যত্ব, আর স্ত্রীলোকেরও কন্যাত্ব, ভগ্নিত্ব, স্ত্রীত্ব, মাতৃত্ব এবং নারীত্ব। সেইখানেই তাদের মান মর্য্যাদা এবং আভিজাত্য। শুধু নভেল প'ড়ে মাথা গরম ক'রে আর পরের কাছথেকে ধার করা হাবভাবে মাথাটা ভারী করে, ঘী, দুধ খেয়ে পালঙ্কে শুয়ে বক্তৃতা ক'র্লে চ'লবে না ইন্দু! কাজ করা চাই।"

আরও অনেক আলোচনার পর ইন্দু চলিয়া গেল, শুধু বলিয়া গেল, "যে পথ দেখিয়েছ সুরেশদা' আশীর্ব্বাদ কর যেন চিরকাল সেই পথেই থাকতে পারি।"

রাত্রে খাইবার সময় অনেক কথাবার্ত্তার পর বিন্দুবাসিনীকে সুরেশ বলিল, সমাজের কথা হচ্চে না মা, কথা হচ্চে মন নিয়ে। বেটাছেলেরা মনে মনে ভাবি স্ত্রীর যেরকম একটা ছবি কল্পনা ক'রে রেখে দ্যায়, তেমনি মেয়েরাও তাদের স্বামীর ছবি নিশ্চয়ই কল্পনা করে। মনের মতন না হ'লেই উভয় পক্ষই দুঃখিত হয়। ফলে দাঁড়ায় এই যে, বিবাহিত জীবনটা একটা ভারবওয়া গোছ্ হ'য়ে পড়ে। বেশী বয়সে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে আমাদের দেশের গৌরী-দানটা মন্দ ছিল না—এমন সময়ে বিয়ে হ'ত যখন বিয়ে কাকে বলে মেয়েরা জানত না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটা বাসনাও যে জেগে ওঠে সেটা-কেইবা অস্বীকার ক'ল্লে চ'লবে কেন মা! ইন্দুর আমাদের তাই হ'য়েছে, সে যেমন উঁচু মনের মেয়ে তার আশা হ'য়েছিল স্বামীটীও ঐ রকম হবে; কিন্তু ঠিক উল্টোটা হ'য়ে পড়ল। এতে তো দুঃখিত হবার কথাই মা।"

বক্তৃতার স্রোতে পুত্রের খাওয়া ভাসিয়া যায় দেখিয়া বিন্দুবাসিনা চুপ করিয়া রহিলেন। (ক্রমশঃ)

গয়ার ইতিহাস।

গুরুপাদগিরি (গুরপা)।

(শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার, বি-এল)

গয়া জেলার পুণ্যময় নৈরঞ্জনা তীরে উরুবিল্ল গ্রামে বোধিদ্রুমতলে শাক্যসিংহ, বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়া হইতে ২৫ মাইল পূর্ব্বদিকে হিওএন্‌সাঙের নির্দ্দিষ্ট "কুক্কুটপাদ" গিরি বা গুরপা পর্ব্বত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ক্যানিংহ্যাম ও স্কীন্ সাহেব বলেন যে গয়ার জমীদার রায় লছমী নারায়ণ বাবুদের

অধিকৃত কুর্কীহার প্রাচীন কুক্কুটপাদ গিরি। এই স্থান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে খনিত হইয়াছে: যুদ্ধের জন্য তাহা সম্প্রতি স্থগিত আছে। সাউথ বিহার রেল লাইনের উজীরগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া এক ক্রোশ উত্তরে যাইলে কুর্কীহার গ্রামে পঁহুছান যায়। আমার মনে হয় যে কুর্কীহারে বৌদ্ধ যুগের কোন বিহার ছিল তাহাকেই ডাঃ কানিংহ্যাম সাহেব ভুল ক্রমে গুরুপাদ গৃহের সহিত সমত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ আমার মনে হয় যে ইষ্টইণ্ডিয়া রেল লাইনের গুর্পা ষ্টেশনের অব্যবহিত সন্নিকটে যে উচ্চ পর্ব্বত দেখা যায়, তাহাই বৌদ্ধ যুগের ও হিওয়েনসাঙ কথিত গুরুপাদ গৃহ পর্ব্বত। এ সম্বন্ধে ১৯০৬ সালের নবপর্য্যায় দ্বিতীয় ভাগ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকার ২৩ পৃষ্ঠায় বাবু রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে মতটি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাই আমার সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এ দেশের রাজকীয় ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, যবন প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বহু প্রকারে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উপর যবন প্রভাব অশেষ প্রকারে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহার কয়েকটি প্রধান কারণ ছিল। (১) মহাভারতের যুগ হইতে ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ পাশ্চাত্য দেশ সমূহের সহিত ছিল। রোমক নগরের সহিত সেকালের প্রাচীন ভারতের সখ্য-ভাব দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল। এই সম্বন্ধ খৃঃ পূঃ ২৯ হইতে খৃষ্টীয় ৬৮ সাল অর্থাৎ সম্রাট নীরোর শাসনকাল পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ডাঃ ৺সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয়। রোমক নগরের সহিত ভারত এবং বাক্‌ট্রিয়া প্রদেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ সম্রাট নীরোর পর হইতে কিছু কমিয়া যাইলেও, বাইজাবস্তাইন সম্রাটগণের শাসন কাল অতিক্রম করিয়া ৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহার পর হইতেই গথ্‌স্,

হুন ও ভান্দালগণের আক্রমণে রোমক রাজ্য ক্রমশঃ হীনবল হইয়া আসিলে এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। গয়া জিলার স্থানে স্থানে যে সকল কুশল ও গুপ্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এইগুলি রোমক মুদ্রার অনুকরণ মাত্র। হিন্দুর জ্যোতিষ্ক পুস্তক সমূহে বিশেষতঃ ভাস্করাচার্য্য (দ্বাদশ শতাব্দী), বরাহমিহির (পঞ্চম শতাব্দী), প্রভৃতির পুস্তকে, মহাভারতে এবং পালী-পীটকের অন্তর্গত রোমক জাতকে * রোম নগরের উল্লেখ বহুল দেখা যায়, এবং বৌদ্ধ আর্কিয়লজী এবং আর্কিটেক্চারে রোমীয় প্রভাব বহুল পরিদৃষ্ট হয়।

এই গুরুপাদ গিরিতে বুদ্ধ দেবের প্রিয় শিষ্য কশ্যপের নশ্বর দেহের শেষ অস্থি কঙ্কালাদি ধারণ করিয়া আছে। পরবর্ত্তী মৈত্রের বুদ্ধের আগমন কাল পর্য্যন্ত তিনি শাক্যবুদ্ধের কৌশিক বস্ত্রাদি ধারণ করিয়া অবস্থান করিবেন। পরবর্ত্তী বুদ্ধের আবির্ভাব হইলে তিনি ঐ পরিধেয় বস্ত্রাদি মৈত্রের বুদ্ধের হস্তে অর্পণ করিয়া মহানির্ব্বাণে পুনঃ শায়িত হইলেন। গুরুপা সম্বন্ধে বাবু রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটী সুন্দর বিবরণ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকার নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় ভাগে এপ্রেল ১৯০৬ সালের সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

গুরুপাদ পর্ব্বত-গুহায় সেদিন বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দের বৃহৎ কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়া কলিকাতায় নীত হইয়াছিল। গুরুপাদটি বর্ত্তমান কালের গুরুপা ষ্টেশন। ইহার শিখরে দেবীর মন্দির বিরাজমান। বুদ্ধের সময়ের যষ্ঠিবন গয়ার উত্তর পূর্ব্ব কোণস্থিত পাথরকাটি ও তপোবন সন্নিকটস্থ বর্ত্তমান জেঠীয়ান্, এবং কুক্কুটপাদ পর্ব্বত মুণ্ডপ্রেষ্ঠার (করসল্লীমহল্যা) পার্শ্বেই অবস্থিত। গুরুপা পর্ব্বতের শিখর দেশস্থ মন্দিরের বিষয় সে দিন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের বাবু রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় নব পর্য্যায় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় দ্বিতীয়

* Fanshell's translation.

তাহা আমি ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত করিয়াছি। এই স্থান বৌদ্ধদিগের নিকট বিশেষ পবিত্র। ভগবান বুদ্ধদেব এই পর্ব্বত গুহায় অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। কুক্কুটপাদ পর্ব্বতের বিষয় ডাঃ কানিংহাম সাহেবের পুস্তকে বিশেষ উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেব এইখানে আসিয়া আসন গ্রহণ করিবার মানসে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য না হইয়া দেবগণ কর্ত্তৃক উরুবিল্ল গ্রাম-সন্নিকট বোধিদ্রুমতলে তপস্যায় আদিষ্ট হইয়া আসন গ্রহণ করেন।

গোপালন, দুগ্ধ ও দুগ্ধ-জাত খাদ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

(শ্রীস———)।

ভাবমিশ্র বলেন—

> ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিন্ন
> তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
> যথা সুরাণামমৃতং সুখায়
> তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ॥

অর্থাৎ তক্র সেবনকারীকে কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না, অথবা কোন রোগগ্রস্ত হইতে হয় না। কথিত আছে—অমৃত যেরূপ দেবগণের সুখাবহ, তক্রও সেইরূপ মানবগণের সুখপ্রদ। গ্রীষ্মকালে, দুর্ব্বল ব্যক্তি, ক্ষত, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে সেবন অবিধেয়।

ঘোল—দুগ্ধ ও দধি অপেক্ষা অধিক তরল, লঘুপাক; গুরু পাক দধি যাহাদের সহ্য হয় না তাহাদের ঘোল ব্যবহার করা উচিত। পুষ্টিকারিতায় ইহা দুগ্ধ ও দধি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। যাঁহাদের দুগ্ধ পরিপাক হয় না, তাঁহারা সহ্য মত দধি অথবা ঘোল ব্যবহার করিতে পারেন। দুর্ব্বল পাকস্থলাবিশিষ্ট অজীর্ণ রোগীর দুগ্ধ সহ্য হয় না। কিন্তু ঘোল

ব্যবহারে তিনি আদৌ অসুস্থতা অনুভব করেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রকারগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে ঘোল বহুব্যাধি নাশক এবং জরা-বার্দ্ধক্য-নিবারক। মন্দাগ্নি বায়ুরোগ, অরুচি প্রভৃতি ব্যাধিতে এবং স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হইলে তক্র অমৃতের ন্যায় উপকার করে। ইহা বল-দোষ, বমি, প্রসেক (লাল স্রাব) বিষম জ্বর, পাণ্ডু, মেদোরোগ গ্রহণী, অর্শ মূত্রাঘাত, ভগন্দর, প্রমেহ গুল্ম, অতিসার, শূল, প্লীহা, জলোদর অরুচি, শ্বেতরোগ, কুষ্ঠ, শোথ, পিপাসা কোষ্ঠগত রোগ এবং ক্রিমি নাশ করিয়া থাকে। রক্তামাশয় আমাশয়, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি অন্ত্র-ঘটিত রোগে ঘোল উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঘোলের মধ্যস্থিত দধি বীজাণু এই সকল রোগবীজাণুকে ধ্বংস করে। দুগ্ধের ন্যায় ঘোলের মধ্যে টাইফয়েড, যক্ষ্মা, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগের বীজাণু দৃষ্ট হয় না। ঘোলেও দুগ্ধাম্ল (lactic acid) পাওয়া যায়। উদরাময় রোগে ঘোল ব্যবহার করাই প্রশস্ত।

দধি জমাট বাঁধিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই উহা মন্থন করিলে যে ঘোল হয়, তাহারই উপকারিতা শক্তি অনেক বেশী। ইহা টক নহে পরন্তু সুস্বাদু। এইরূপ ঘোলে রোগবীজাণু-নাশক উদ্ভিদাণু সমূহ সতেজ অবস্থায় থাকে বলিয়া ইহা অত্যন্ত উপকারী। অতিশয় টক ঘোল স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। খড়িগুঁড়া মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত দধির ঘোল স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য অজীর্ণ যকৃৎ যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে সমধিক হিতকারী। উহা আমাদের স্নায়ুমণ্ডল এবং মস্তিষ্ক প্রভৃতির ক্ষয়পূরণ ও গঠনের সাহায্য করে।

ছানা।—দুগ্ধকে গরম করিয়া উষ্ণ অবস্থায় পুরাতন ছানার জল অল্প অল্প করিয়া দিলে উহার পনিরময় অংশ চাপ বাঁধিয়া পৃথক হইয়া পড়ে এবং ইহাকে একখণ্ড বস্ত্রে বাঁধিয়া কিছুক্ষণ ঝুলাইয়া রাখিলে, উহার জল নির্গত হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ছানা বলে। ফটকিরি টার্টারিক এসিড, নাইট্রিক

এসিড প্রভৃতি পদার্থ এবং তেঁতুলের দ্বারাও গরম দুগ্ধ হইতে ছানা প্রস্তুত করা যায়। ছানা গুরুপাক মাংস অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর এবং শক্তি-সংস্থাপক ইহাতে শর্করার পরিমাণ কম থাকায় বহুমূত্র রোগে পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। বস্ত্রের দ্বারা ছানা ছাঁকিয়া লইলে যে জল অবশিষ্ট থাকে তাহাকে ছানার জল কহে। ইহা অতিশয় লঘুপাক। পাতি-লেবুর রস দিয়া দুগ্ধ ছিটাইলে যে ছানা প্রস্তুত হয় তাহার জল পাকস্থলীর প্রদাহ, ক্ষত, গ্যাসট্রিক জ্বর এবং অন্ত্রপীড়া ঘটিত রোগে উৎকৃষ্ট পথ্য। চিনিররস দ্বারা ছানা হইতে রসগোল্লা, ছানাবড়া, ক্ষীর-মোহন, বিলাসী, বরফী, পান্তুয়া প্রভৃতি নানাবিধ অতি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর মিষ্টান্ন সকল প্রস্তুত হয়।

পনির অতিশয় গুরুপাক, মাংসের দ্বিগুণ পুষ্টিকর এবং তিনগুণ শক্তি-সংস্থাপক।

শব্দ ও শব্দ-শক্তি।

(শ্রী[illegible]চন্দ্র [illegible]-ভূষণ—কথক।)

বিশ্বপতির বিশাল রাজ্যের গুণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে বেশ উপলব্ধি হয় যে, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড, জল, স্থল, আকাশ প্রভৃতি সকল স্থানই শব্দময়। এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা শব্দের পূর্ণত্ব বিষয়ে প্রতিনিয়তই অনুভব করিতেছি, কিন্তু সেই অনুভবকে আমরা মনোমধ্যে বড় একটা আমল দখল দিই না। কোন কোন চিন্তাশীল মনীষী ভাবুক সময়ে সময়ে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া অভিনব তথ্যের আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পান। এই শব্দতত্ত্ব, শব্দমাহাত্ম্য ও শব্দশক্তি যে নিতান্তই আমাদের ভাবিবার, বুঝিবার ও আলোচনা করিবার বিষয় এ বিষয়ে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দণ্ডে

দণ্ডে ক্ষণে ক্ষণে যাহা আমাদের নয়ন পথে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হইতেছে, পরিতাপের বিষয় যে, সে কথা আমরা প্রায় পর্য্যালোচনা করি না। বিশ্ব-নিয়ন্তার বিপুল সম্রাজ্যের নানা দেশে নানা স্থানে নানা ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা প্রচলিত। তাঁহার আকার তাঁহার গুণ ও তাঁহার লীলা কোন কোন স্থলে উপাসকমণ্ডলীর ভাবিবার ও আলোচনা করিবার বিষয়। অন্যপক্ষে কোন কোন স্থানে তাঁহার নির্গুণত্ব ও নিরাকারত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ব্রহ্ম ভাবই আলোচ্য ও চিন্তনীয়। ধ্যান, পূজা, হোম, জপ তপ এই সকল উপাসনার একএকটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সকল পূজার সকল উপাসনার এমন কি সর্ব্ববিধ আরাধনার শেষে ভগবানের গুণ ও নামকীর্ত্তন উপাসনার প্রধান অঙ্গ বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহাকেই স্তুতি বা জপ বলা হইয়া থাকে। উপাসনার প্রধান অঙ্গ এই স্তুতি বা জপ "শব্দ"-মূলক। মানবের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্মই এই যে, কোন অভূত-পূর্ব্ব অত্যদ্ভুত পদার্থ দর্শন করিলেই প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্নিগ্ধ সুধাকরের বিমল চন্দ্রিকা অথবা পূর্ণ-বিকসিত প্রসূনের সুচারু সুষমা দর্শনে কোন্ নেত্রবান সহৃদয় ব্যক্তি নীরবে থাকিতে পারেন? অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার অনন্ত জ্ঞানের আকর, অনন্ত করুণার পারাবারস্বরূপ ভগবানের গুণ ও শক্তির আলোচনা করিলে ভক্তের হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠে। সাধক তখন সেই প্রেমের উচ্ছ্বাস বাক্য বা শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই অভিব্যক্তির নামই স্তব। আর সেই স্তবাত্মক ঈশ্বর-তত্ত্ব যাহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া প্রেমার্দ্র হৃদয়ে চিন্তা করি সেই চিন্তার নামই জপ। শব্দ-মাহাত্ম্য ও শব্দ-শক্তির অসীম প্রভাব বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বাক্য ও মনের দ্বারা জপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্ব শব্দের বিলয়-সূচক প্রণব (ওঁকার) শব্দ ঈশ্বর-বোধক বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শব্দই ব্রহ্ম। তাই যোগদর্শনকার পতঞ্জলি ঈশ্বরের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

"সত্য-বাচকঃ প্রণবঃ।"

অর্থাৎ প্রণব শব্দই ঈশ্বর-বাচক। ঐ প্রণব দ্বারাই ভগবান্‌কে আহ্বান করা হইয়া থাকে। এই প্রণবাত্মক আহ্বানই "মন্ত্র" বলিয়া প্রসিদ্ধ। মন্ত্র দ্বারা আমরা কেবল ভগবান্‌কেই ভাবনা করিয়া থাকি, মন্ত্রই আমাদের রক্ষা-কবচ ও পরমার্থ-সিদ্ধির উপায়।

"মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ।"

আমাদের উচ্চারিত ও শ্রুত সকল শব্দেরই পরিণাম চরম লয় "ওঙ্কার"। অ, উ, ম এই তিনটি সম্যক্ মিলিত হইয়া ওঁ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। শব্দ সকলের ব্যষ্টি ও সমষ্টি-বোধক ওঙ্কার দ্বারা ভগবানেরই মহিমা গীত হইয়া থাকে। অ, উ, ম এই তিনটি বর্ণ পৃথক পৃথক উচ্চারিত হইলে আমরা কি বুঝিব? ইহার দ্বারা এই বুঝা যায় যে এই বর্ণে ক্রমান্বয়ে ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদত্রয়; জাগরণ, নিদ্রা ও সুষুপ্তি এই তিন বৃত্তি বা অবস্থাত্রয়; ভূর্লোক, ভুবলোক ও স্বর্লোক এই ত্রিলোক এবং ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই দেবত্রয়কে প্রতিপাদন করা হইতেছে। এবং উক্ত তিন বর্ণের সম্মিলিত ওঁকার অর্থাৎ সূক্ষ্মনাদ-ধ্বনি দ্বারা, নির্বিকার ত্রিগুণাতীত কূটস্থ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

এই ওঙ্কার শব্দ বা ধ্বনি সম্বন্ধে যদি আমরা কিয়ৎকাল মনোনিবেশ পূর্ব্বক অনুধ্যান করি, তাহা হইলে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই জগতে জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বস্থানে ওঙ্কার ধ্বনি ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্ট রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। মনে করুন, কোন স্থলে পুরাদমে একটা হাট বা বাজার বসিয়াছে, ঐ হাটের লোকের মধ্যে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, উড়িয়া, ইংরাজ, নেপালী, ভুটীয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতীয় লোক সমূহ বিভিন্ন ভাষায় সকলেই শব্দ উচ্চারণ করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকের উচ্চারিত শব্দ সকল সম্মিলিত হইয়া এক অখণ্ড ওঙ্কার ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে, ঐ সূক্ষ্ম নাদ বা

ধ্বনির মধ্যে ছেদ নাই। একটু দূরে দণ্ডায়মান হইয়া ইহা শ্রবণ করিলেও বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মনে করুন, আমি কোন সুদূর প্রান্তরস্থ এক দীর্ঘ পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছি, পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী মারুত হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া একপ্রকার বোঁ বোঁ শব্দ করিতেছে শুনা যায়। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, ঐ বোঁ বোঁ শব্দের পরিণাম ধ্বনি সেই ওঙ্কার ব্যতীত আর কিছু নহে। কর্ণে অঙ্গুলি দিলেও সেই ওঙ্কার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, এক কথায় বলিতে গেলে এই জগতের সকল শব্দই সেই একমাত্র প্রণব-জ্ঞাপক। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাহাকে যে শব্দেই আহ্বান কর না কেন সেই একমাত্র ব্রহ্মনামই তাহাতে উচ্চারিত হইয়া থাকে, এতাবৎ আমরা কেবল ব্রহ্ম-নাম ও তদ্বোধক শব্দেরই আলোচনা করিতেছি, কিন্তু শব্দের যে শক্তি আছে, এক্ষণে সেই বিষয়ের কিছু আলোচনা করা যাউক।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই মন্ত্র শক্তিতে বিশ্বাস করেন না। পূজা, সন্ধ্যাবন্দনা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি ক্রিয়ায় মন্ত্র উচ্চারণ করায় তাহাদের শ্রদ্ধা হয় না। পরন্তু কাহাকেও তাহা করিতে দেখিলে নানা প্রকার উপহাস করিয়া থাকেন। ফলতঃ, শক্তি বা বাক্যের বল আমরা প্রতি মুহূর্তে অন্তর্বাহ্যে অনুভব করিতেছি। উচ্চারিত বাক্যের কণ্ঠস্বরের তারতম্যে অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে মনের ভাব বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিলে তাহা শ্রবণে মনোমধ্যে কখন রাগ, কখন হর্ষ, কখন প্রেম, কখন স্নেহ, কখন অহঙ্কার, কখন অভিমান প্রভৃতি নানা ভাবের উদয় হয়, তাহাতে আমরা মনে মনে সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি। শব্দের যদি শক্তি না থাকিত তাহা হইলে কখনও আমরা ঐ রূপ সুখ দুঃখ উপলব্ধি করিতাম না। দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডীতে দেবগণ যখন শব্দাত্মিকা মহাশক্তির মহিমা বর্ণনা করিয়া তাঁহার—স্তব করিতেছেন ঃ—

"শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-

মৃদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥"

"হে দেবি! ঋক্, যজুঃ, ও প্রণবযুক্ত সামবেদের মনোহর পদ সকলের তুমিই শব্দময়ী শক্তি। মা! তুমি ভব সংসারের মঙ্গল-স্বরূপা ত্রিবেদ-রূপিণী, এবং সর্ব্ব জগতের অনন্ত যন্ত্রণাহারিণী বৃত্তিরূপা শক্তি।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পরম প্রকৃতি আদ্যাশক্তি মাই ঋক, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়ের শব্দময়ী মহাশক্তি। সেই মাতৃরূপা মহাশক্তির স্তব ও জপাদি এখন আমাদের সাধনার চরম উদ্দেশ্য এবং চরম কার্য্য।

কিন্তু কি পরিতাপ! আমরা সেই মহাশক্তি-রূপিণী মায়ের নিজস্ব সন্তান হইয়া আজ শক্তিশূন্য হইয়াছি, আমাদের আর পূর্ব্বের মত হৃদয়ে তেজ নাই, কোন কার্য্যে উদ্যম উৎসাহ নাই। তেজঃ, উদ্যম, উৎসাহের স্থলে অবিশ্বাস আসিয়া অনেকের হৃদয়-ক্ষেত্র অধিকার করিয়াছে, তাই তাহারা মন্ত্রশক্তি বিশ্বাস করে না, কাহাকেও মন্ত্র উচ্চারণ করিতে দেখিলে, ভণ্ড বলিয়া উপহাস করে, মন্ত্রশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। আমাদের অনুমান হয় যে, শক্তিরূপিণী মাতার সন্তান হইয়া তাহাদের এবম্বিধ মতি গতির পরিবর্ত্তন কেবল কুশিক্ষা ও অসৎসঙ্গের ফল।

বাক্-যন্ত্র-প্রতিহত কণ্ঠধ্বনি বায়বীয় তরঙ্গ-তাড়নে কর্ণ পটাহে আঘাত করিবা-মাত্র স্নায়বীয় যন্ত্র দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়, তথা হইতে মেরুদণ্ডের মজ্জা অবলম্বন করতঃ সমগ্র শরীরে প্রসারিত হইয়া মনোমধ্যে হর্ষ, দুঃখ, তেজঃ, অভিমান, ভয়, শোক প্রভৃতি বিবিধ ভাবের উদয় করিয়া থাকে। শব্দের যদি শক্তি না থাকিত তাহা হইলে কখনই উক্ত ভাব সমূহ প্রকাশ হইত না। একই অর্থবোধক শব্দ ঐরূপ বারবার আঘাতের তারতম্যে মনোমধ্যে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। এ সকল বুঝিবার ও ভাবিবার বিষয়। মনে করুন, শিবশব্দ ও হরশব্দ উভয়ই মহাদেবের নাম বাচক। শিব শিব শিব শব্দ উচ্চারণ

করিলে মনোমধ্যে অতি স্নিগ্ধকর শান্তিময় শান্ত ভাবের প্রকাশ হয়, এবং হর হর হর শব্দ উচ্চারণ করিলে মনোমধ্যে অত্যুগ্র রৌদ্র ভাবের সমাবেশ হয়। শব্দ-শক্তির সামর্থ্যেই এই রূপ ভাব-তারতম্যের কারণ। শব্দের শক্তি সম্বন্ধে একটী গল্প মনে পড়িল, এক্ষণে পাঠক মহোদয়গণকে সেই গল্পটি উপহার দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কোন স্থানে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ইংরাজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মন্ত্রশক্তির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কার্য্য সন্ধ্যাবন্দনা, জপ, তপ এবং পিতৃগণের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠান করিতে কখনও অবহেলা করিতেন না। শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করাকে তিনি মহাপাপ বলিয়া গণ্য করিতেন। দেব ও পিতৃকার্য্যসকল যথারীতি অনুষ্ঠান করিতেন। কোন সময়ে নব্য সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষাভিমানী কোন এক উদ্ধত প্রকৃতি যুবকের সহিত একদা তিনি নৌকাযোগে বহুদূর গমন করিতেছিলেন। কথায় কথায় যুবকের সহিত প্রৌঢ়ের নানা প্রকার শাস্ত্রীয় সদালাপ হইতে লাগিল। বিবিধ শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা দর্শনে যুবকের মনে তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মিল। তাঁহার জ্ঞানগরিমা, এবং তত্ত্বোপদেশ দ্বারা যুবক আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। নানা সদালাপে ক্রমে স্নানের সময় উপস্থিত হইল। উভয়েই স্নানকার্য্যের উদ্যোগে রত হইলেন। যুবক অল্পক্ষণ মধ্যেই স্নানাদি সমাপন করিয়া নৌকায় আগমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে জলযোগার্থ আনীত ফল মূলাদি মিষ্টান্ন প্রভৃতি একত্রে উভয়েই জলযোগ করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের স্নান ক্রিয়া আর সমাপন হয় না। তিনি নিত্য কার্য্য সমাধা করিয়া রীতিমত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ

কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাম গোত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সকলের তর্পণ করিলেন। এতাবৎকাল যুবকটি ব্রাহ্মণের মন্ত্রাদি উচ্চারণে ও কার্য্যকলাপ দর্শনে অতিশয় বিরক্ত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। একে মন্ত্রাদিতে তাহার কিছু মাত্র বিশ্বাস নাই, ঐ সকল কার্য্য তিনি অলীক আড়ম্বরমাত্র জ্ঞান করিতেন; তাহার উপর জলযোগের সময় অতীতপ্রায় দেখিয়া ব্রাহ্মণের কার্য্য কলাপের প্রতি যুবকের আন্তরিক অশ্রদ্ধা জন্মাইতেছিল। বিশেষতঃ তিনি ক্ষুধাদেবার কঠোর পীড়নে পীড়িত হইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছিলেন। ব্রাহ্মণ যথাকালে স্নান তর্পণাদি সমাপন করিয়া নিকটে সমাগত হইলে পর, যুবক অতিশয় বিরক্তি-সহকারে তাঁহাকে কহিলেন—"মহাশয়কে প্রাচীন জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আড়ম্বর দেখিয়া আপনার প্রতি আমার অত্যন্ত বিরক্তি জন্মাইয়াছে। আপনার মত পণ্ডিত লোকেও যদি এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইবেন, এরূপ অলীক অশ্রদ্ধেয় তর্পণাদি কার্য্য করিবেন, তবে অপর সাধারণ লোকেও আপনাদের আচরণ অনুকরণে দেশকে কুসংস্কার জালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। তাহাতে দেশ একবারে উৎসন্ন যাইবে। আমার মন্ত্রশক্তিতে আদৌ বিশ্বাস নাই। কতকগুলি কল্পিত বাক্য উচ্চারণ করিয়া গঙ্গার জল গঙ্গায় ফেলিলে কখনই পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তিসাধন হইতে পারে না। তাহাতে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে তাহার মত মূর্খ আর জগতে নাই।" ব্রাহ্মণ এতক্ষণ স্থির ভাবে যুবকের কথাগুলি প্রলাপ বাক্যবৎ শ্রবণ করিতেছিলেন। এক্ষণে আর সুস্থির থাকিতে না পারিয়া রোষ-কষায়িত লোচনে ক্রুদ্ধ হইয়া উগ্র-মূর্ত্তি ধারণ করতঃ কহিলেন—"যে শালা শ্রাদ্ধ তর্পণের মন্ত্রে বিশ্বাস না করে, আমি তাহার বাপের মুখে প্রস্রাব করিয়া দিই।" বলা বাহুল্য যুবকটী পূর্ব্ব হইতেই তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছিল। এখন প্রবীণের মুখে অযথা গালাগালি শুনিয়া একেবারে চটিয়া গেলেন। বলিলেন—"কি মহাশয়!

আপনার কথায় বিশ্বাস করি না এবং আপনার কার্য্য বুঝিতে পারি না বলিয়া আপনি আমাকে ইতর লোকের ন্যায় অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিলেন?” প্রবীণ তখন ধীর গম্ভীর শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া বলিলেন—“কৈ? বাপু আমি ত তোমাকে কোন গালাগালি দিই নাই। যে কয়েকটী কথা ব্যবহার করিয়াছি তাহার ত কোন শক্তিই নাই। কেন না, তুমি ত মন্ত্রবল বা শব্দ-শক্তি মান না। তবে আমার উচ্চারিত শব্দ কয়েকটীতে তোমার এত রোষ হইল কেন? মনে কর শালা-শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, তোমার ভগ্নীর সহিত পরিণীত হইলে আমি ভগ্নীপতি পদবাচ্য, তখন তোমাকে শালা সম্বোধন করিতে পারি। কিন্তু বিবাহ করা দূরে থাক্, আমি কখন তোমার ভগ্নীকে চক্ষেও দেখি নাই। এ অবস্থায় শালা শব্দ ব্যবহারে তোমার কষ্ট হইবার কারণ কি? দ্বিতীয়তঃ “আমি তার বাপের মুখে প্রস্রাব করি” বলিয়াছি। সংক্ষেপে যে তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের উদ্দেশে বলা হইয়াছে ও সেই প্রস্রাব তিনি পান করিলেন ইহা কিরূপে স্থির করিলে? তিনি ত স্বর্গগত। তিনি কি ঐ অপবিত্র দ্রব্য পান করিবার জন্য এখানে এই দণ্ডেই উপস্থিত হইলেন? তোমাকে শালা সম্বোধন ও তোমার পিতৃদেবের উদ্দেশে কোনরূপ অসৎ আচরণ আমার অভিপ্রেত নহে।” বৃদ্ধের এই যুক্তি-তর্কপূর্ণ কথায় যুবক শান্ত হইলেন না, বরং অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—“বেশ মহাশয়! স্পষ্টতঃ গালি দিলেন, আবার বলেন গালি দিই নাই। আপনি কি বুঝাতে চাহেন যে আপনি আমার ভগ্নীকে বা পিতাকে উদ্দেশ করিয়া গালি দেন নাই?” বৃদ্ধ কহিলেন—“তবে বাপু তুমি মন্ত্রে বিশ্বাস কর এবং শব্দের শক্তি স্বীকার কর এবং উচ্চারিত শব্দের দ্বারা ব্যক্তি-বিশেষের মনে রোষ বা আনন্দ জন্মাইতে পারা যায়—স্বীকার কর। তা বেশ—যখন মন্দ কথাগুলি বিশ্বাস কর, ভাল কথাগুলি বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি? মাত্র অবিশ্বাসকারীর বাপের মুখে প্রস্রাব ত্যাগ

করি—বলাতে যদি প্রকৃত প্রস্তাব ত্যাগ বিশ্বাস কর, তবে শাস্ত্রানুযায়ী দেব-ঋষি-গণের তর্পণের জলে যে তাঁহাদের সন্তোষ হইবে না কিরূপে বিশ্বাস কর? যুবক তখন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া প্রবীণের পদানত হইয়া বড় বিনয়-সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শব্দ-শক্তির বিষয়ে আর তাঁর অবিশ্বাস রহিল না।

সাথের সাথী।

(পণ্ডিত শ্রী[illegible] জ্যোতির্ণব।)

অপার তরঙ্গময় এ সমুদ্র মাঝে—
ওদিকে যে'ওনা ফের' বলি বার বার।
কে দেয় দেখায়ে পথ, সতত নয়নে রাখি,
দুখে দুখী সুখে সুখী ? কত আহ্লাদিত—
অভাগার মুছাইয়ে নয়ন আসার॥

প্রিয় যাহা অভিলাষ পূরিছে তাহাই—
সতত মঙ্গলতরে শিক্ষিছে নিরত।
এক অঙ্কে আরম্ভিয়া, অন্য অঙ্কে সমাপন,
যথাস্থানে নিয়োজন করিতে সর্ব্বদা—
পরম হিতৈষী ইনি বড়ই বিব্রত॥

দয়াই অস্তিত্ব তাই দয়াময় নাম—
সুখে দুঃখে শোকে হর্ষে বিষাদে বৈপাতে।
মানব-মূর্ত্তির মাঝে, বিশ্বাসিতে সেইরূপ,
সমান ভাবেতে সবে স্নেহ-পরায়ণ—
বান্ধব প্রকৃত তিনি সদা এ মহীতে॥

কে মিত্র ? এ মহীতলে ইঁহার সমান—
প্রত্যক্ষ দর্শনে যারে সহচর ভাবি।
এতই কৃপণ মোরা, এতই হৃদয়-হীন;
এত নিকটজনে নাহি দেখিতে বাসনা—
তবুও বিরতি নাই—কি সাথের সাথী॥

পাগলের কথা।

উপক্রমণিকা।

(শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

আমি এখন পাগল। লোকে আমায় পাগল আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে। ঘর-বাড়ি, ধন-দৌলত, আত্মীয়-স্বজন, মান-সম্ভ্রম ইত্যাদি যাহা কিছু সংসারী লোকের থাকা সম্ভব, তাহার কিছুই আমার নাই। আছে কেবল—লজ্জা-নিবারণের জন্য একখানি মাত্র ছিন্ন বস্ত্র। তাহাও জনৈক মহানুভবের দান। আমি গৈরিকবসন-পরিহিত, জটাজুট-চিমটা-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীও নহি। আমার আস্তানা, চেলা, ধুনি প্রভৃতি কিছুই নাই। গায়ে ভস্মও মাখিনা, শাঁখও ফুঁকিনা, গাঁজাও টানিনা। যখন যে আহার্য্য পাই, তদ্দ্বারাই উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকি। অভ্যাসের মধ্যে খাওয়া, শোওয়া, আর কাপড় পরা। তিনটাই ইচ্ছাকৃত নহে, অপরিহার্য্য। কারণ খাওয়া ঈশ্বরের শাসন, শোওয়া কর্ম্মের শাসন, এবং কাপড় পরা রাজার শাসন।

আমার একটা মহৎ দোষ যে, আমি মৌনীবাবার মত অনবরত দুই ঠোঁট এক করিয়া থাকিতে পারি না। সকল সময়েই যাহার তাহার সঙ্গে অনর্গল বকিয়া থাকি। জানিনা, আমার কথা আবল তাবল কিংবা যুক্তিসঙ্গত। লোকে কিন্তু দেখি আমার সহিত কথা কহিতে ভালবাসে, কৈ রাগ করে না। কেন তা জানি না। আমি কিন্তু না-সংসারী না-উদাসীন, কাজে-কাজেই লোকে আমায় পাগল বৈ আর কি বলিবে? মানুষ স্বাভাবিক ও সাধারণ রীতিনীতির বহির্ভূত হইলেই তাহার একটা বিশেষ কিছু নামকরণ হইবে—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত নহি, বরং সন্তুষ্ট। আমি পাগল হইয়াই সুখী।

একদিন আমার সব ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে আমিও একজন দুনিয়ার মানুষ ছিলাম। সংসারী মানুষের মত আমার

সবই ছিল। জ্ঞানবান বলিয়া সমাজে আমার অল্প সুখ্যাতিও ছিল এবং ধনবান বলিয়া একটু প্রতিপত্তিও ছিল। উপর্য্যু-পরি ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আমি এখন সকল-হারা—পাগল। পাগল হইয়া দেখিতেছি, আমি মানুষের ভালবাসা পাইয়াছি। তখন তাহা পাই নাই। তখন শত্রুমিত্র সকলেই অবসর পাইলে আমার জীবনের শান্তিটুকু নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইত। এখন আমি সকলের অনুকম্পার পাত্র। আমার নগণ্য জীবনের উপর কাহারও শ্যেন দৃষ্টি পড়ে না। তখন ঈশ্বর আমার হৃদয়ের মধ্যে বহুবাসনা জাগাইয়া দিয়া মুহূর্ত্তে তৎ-সমুদয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। এখন এ হৃদয়-শশ্মানের সকল চিতাই নির্ব্বা-পিত। ইহা এখন নানা শোক দুঃখের মধ্যেও আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনার ভাবে আপনি ডুবিয়া আছে। কোন আশা নাই, অভিলাষ নাই; তাই স্বার্থপরার্থের হিসাবও নাই। তাই আজ আমি একটা অস্বাভাবিক জীব হইলেও আবালবৃদ্ধ-বনিতার বড় আদরের 'পাগলা—হর'।

আমার কার্য্যও নাই, অবসরও নাই। ভবঘুরের মত এদিক সেদিক ঘুরিয়া বেড়াই, একটী সঙ্গী পাইলেই অনর্গল বকিতে থাকি। একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে একটা নগরের প্রান্তবর্ত্তী মাঠের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় দেখি, কতকগুলি ভদ্রলোক একরাশি বস্ত্র জড় করিয়া কি-একটা লঙ্কাকাণ্ডের আয়োজনে ব্যস্ত। আমায় তথায় উপস্থিত দেখিয়া সকলেই সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "এই যে হরনাথ এখানে! আইস আমাদের অগ্ন্যুৎসবে যোগদান কর।"

আমি। কলিযুগে এ আবার কোন্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান? শুনিয়াছি তখনকার কালে যজ্ঞকাষ্ঠেই অগ্ন্যুৎসব হইত। এযে বস্ত্রসমষ্টি দেখিতেছি। ব্যাপারটা কি?

ভদ্রলোক। বলি, ওহে হরনাথ, এঁ তোমার সে-কেলে শাস্ত্রীয় যজ্ঞ নহে। এ বর্ত্তমান কালোচিত বস্ত্রযজ্ঞ।

আমি। শাস্ত্র-টাস্ত্র জানিনা বাবা। আমি পাগল-ছাগল মানুষ। যা মনে উদয় হয় তাই বলি। তা—এ যজ্ঞ করলে কি

কি ফললাভ হবে ?

ভদ্রলোক। যজ্ঞের অনেক ফল! দেশমাতৃকার দুঃখদৈন্য মোচন হবে; দেশবাসীর দুর্দ্দশা দূর হবে; দেশে আবার শান্তির প্রতিষ্ঠা হবে।

আমি। কিছু বুঝিলাম না।

ভদ্রলোক। হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "শুন নাই কি যে, দেশের লোক বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়া স্বদেশজাত সূতায় বোনা এ দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে ?"

আমি। সাধু উদ্দেশ্য। এই ভাবে সকল বিষয়েই স্বাবলম্বী হইলেই দেশের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। ইহার সহিত এ বস্ত্রযজ্ঞের কি সম্পর্ক আছে, বুঝিলাম না।

ভদ্রলোক। সেই উদ্দেশ্যে যাহার যত বিদেশী কাপড় ছিল, তৎসমুদয় আজ ভস্মসাৎ করিয়া দেশী বস্ত্র ক্রয় করিবার মনস্থ করিয়াছি।

আমি। কেন বাবা, ও কাপড়গুলার কি এমন কিছু মন্ত্রশক্তি ছিল যাহা না পুড়াইলে দেশীবস্ত্র ব্যবহারে বাধা প্রদান করিত ?

ভদ্রলোক। তা নয় হরনাথ, তুমি কিছু বোঝ না।

আমি। আজ্ঞে না, বাবারাই পাগল হইয়াছি। [illegible] না জানি কি হইতেন।

সকলে হাসিল।

ভদ্রলোক। এই দেখ। আমরা এমনি বাবু হইয়া পড়িয়াছি যে, অমন ফাইন কাপড় চোখের সম্মুখে দেখিলে আর মোটা কাপড় পরিতে ইচ্ছা হইবে না। আবার ওগুলা না সরাইলে দেশী কাপড় ক্রয় করিতে গা বহিবে না।

আমি। বেশ কথা, ওগুলা না পুড়াইয়া আমার মত অনাথ আতুরকে দান করুন না কেন ? তাহা হইলে আমাদেরও উপকার হইবে, আর তোমাদেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

ভদ্রলোক। তা হয় না হরনাথ। আমরা যাহা মন্দ ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, তাহা অপরকে দিব কেন ? তাহাতে তাহাদের অপমান করা হয়।

আমি। হরি হরি! এতদূর সদাশয়

করে হইলে বাবা? তোমাতে আমাতে সমজ্ঞান, সহানুভূতি হইলে তো দেশমাতৃকার দুঃখদৈন্য একদিনে দূর হয়। এই দেশই বেদ ও সাম্যের জন্মস্থান। সেই বেদ ও সাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে কি আর বিদেশী কাপড় পুড়াইয়া দেশোদ্ধার করিতে হয়? বলি বাপু, তোমার আর তোমার চাকরের খাওয়া পরা কি সমান হইয়া থাকে? তুমি যে পোষাক পরলে অপমান বোধ কর, তোমার চাকরকে কি তাহা পরতে দাও না? তুমি সরু সদগন্ধ চাউলের ভাত খাও; তোমার বাটী ভিখারী আসিলে কি সেই চাউল একটা লোকের উদর পূরণোপযোগী পরিমাণে দিয়া থাক? শুধু একটা হুজুগে মাতিয়া ঐ বিষয়টিতেই সাম্যভাব দেখাইলে চলিবে কেন বাবা? আর এক কথা,—যে বস্ত্রগুলা পুড়াইতে চলিয়াছ, তাহার মূল্যের দরুণ যে টাকাটা দিয়াছ তাহা তো সাগর পারে চলিয়া-গিয়াছে। সে টাকা আর ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই। এখন সে টাকার পরিবর্ত্তে যাহা পাইয়াছ, তাহা যাহাই হউক, নষ্ট না করিয়া কোনকিছু দেশের কাজেই লাগাইয়া দাও। দেশে শিল্পোন্নতি কর, কৃষিকার্য্যে মন দাও, দেশজাত বাণিজ্যের বিস্তার কর, দেশের জিনিষ দেশের কাজে লাগাও, কাঙ্গাল গরীবের মুখ চাও,—স্বাবলম্বী হয়ে স্বদেশজাত পণ্যে সন্তুষ্ট থাক মনোবৃত্তির উচ্চতাসাধন কর। এই সব করলে তবে মানুষ হওয়া যায়। কেবল অনুৎসবে নয়। কাজে কথায় এক হয়ে অনাথ ও আতুরের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হও। যাহারা তোমাদের মুখাপেক্ষী তাহাদের উপর সদয় হও, ভগবানের অমোঘ আশীর্ব্বাদ লাভ করবে। দেখ, কত লোক শতগ্রন্থী বস্ত্র পরিধান করে কোন রকমে লজ্জানিবারণ করে, কত লোক একেবারে বিবস্ত্র, কৌপীন মাত্র সার। শীত, তপবসায় তাহারা শিশুসন্তান-গুলিকে বুকের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিয়া দারুণ যন্ত্রণায় দিনাতিপাত করে। তাহাদের ঐ সকল বস্ত্র দান করিলে তোমাদের ইহকাল পরকাল রক্ষা হইবে। আর অপমান করার কথা বলিতেছিলে? তুমি দেশীই

পর, আর বিদেশীই পর, তুমি বেশভূষা করিয়া যাইবে. আর আমরা তোমাদের পদতলে পড়িয়া হা অন্ন হা বস্ত্র করিয়া কাঁদিতে থাকিব—ইহাতে কি আমাদের বেশী মানবৃদ্ধি করা হইবে? আমি পাগল, প্রাণে যা উদয় হইল, বলিয়া ফেলিলাম। এখন তোমাদের বিচার্য্য।

ক্রমশঃ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীপঞ্চানন শিরোমণি, কথক।)

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ
সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥
(গীতা)

গুরূপদেশে শ্রদ্ধাবান্ গুরূপাসনাদিতে তৎপর ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন এবং তদ্দারা অচিরাৎ পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং
সংশয়াত্মনঃ॥ (গীতা)

অজ্ঞ শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্ম ব্যক্তি স্বার্থ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে সংশয়াত্মার ইহলোকও নাই পরলোকও নাই এবং সুখও নাই।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
(গীতা)

তুমি প্রণিপাত প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। ইহা সাক্ষাৎ ভগবদ্বাক্য। পুনশ্চ।

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বৌ ভাবৌ
জীবসংস্থিতৌ।
প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারী নিবৃত্তিঃ পরমাত্মনি॥
যামলং।

সংসারে জীবগণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই ভাবে অবস্থান করে থাকে। সংসারী-

গণ প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিত। আর যাঁরা পরমাত্ম-লাভেচ্ছু তাঁরা নিবৃত্তিযোগে অবস্থিত।

শাস্ত্রসজ্জন-সংসর্গ-পূর্ব্বকৈঃ সতপোদমৈঃ।
আদৌ সংসারমুক্ত্যর্থং প্রজ্ঞামেবাভি
বর্দ্ধয়েৎ॥ যোগবাশিষ্ঠে।

এই দারুণ সংসারযাতনা নিবারণের জন্য সাধুশাস্ত্রের আলোচনা, সাধুসঙ্গ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ এবং তপস্যা দ্বারা সদসৎ বিবেচনায় পরিশুদ্ধ শুভ বুদ্ধির উদয় হয়।

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম নতু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্ব্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মকোটিভিঃ॥
বিবেক-চূড়ামণি।

চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ কর্ম্ম ব্রহ্ম উপলব্ধির হেতু নয়। কিন্তু ব্রহ্ম উপলব্ধির অবলম্বন যে জ্ঞান সেই জ্ঞানোপার্জ্জনের হেতু। ভিন্ন কোটী কোটী কর্ম্ম দ্বারাও ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না। কেবল বিচারের দ্বারা ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়।

এইরূপ পবিত্র শাস্ত্রালাপ হইতেছে এমন সময় অদূরে সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রুত হইল। কে যেন গান গাহিতে গাহিতে এই ঘাটেই আসিতেছে। সন্ন্যাসী নিস্তব্ধ হইলেন। একজন বলিয়া উঠিলেন যে, আপনি বসুন; উনি একজন সাধু। একতারা লইয়া কদিন হইল পাড়ার মধ্যে, কখন বা গঙ্গার ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখছি। এখানে আসার সময়ে ওঁকে আমি কালীমন্দিরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঐ গান গাহিতে শুনে এলাম। সন্ন্যাসী বলিলেন দিব্য কণ্ঠ, বেশ গান, গানটী শুনা যাক্। সাধু ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিল অনেক লোক একত্রে বসিয়া আছে। সে যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া কণ্ঠস্বর পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদু করিল। সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিয়া তাঁকে সম্মান পূর্ব্বক বলিলেন, আসুন—এইখানে বসুন। বলিবামাত্র লোক সরিয়া গিয়া তাঁকে স্থান দিল। গায়ক বলিলেন—দেখুন এ রাগিণীর এখন সময় না হলেও সন্ধ্যার পূর্ব্বে গাহিতে আরম্ভ করিয়াছি। অতি মধুর বলিয়া এখনও ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। আমার পরম সৌভাগ্য আজ রজনী সুপ্রভাতা—তাই ভবাদৃশ মহাত্মার শ্রীচরণ

দর্শন করিতে গেলাম।

সন্ন্যাসী বলিলেন গানটী গান, পরে অন্য কথাবার্ত্তা হবে এখন।

গান।

রাগিণী আশাবরী। তাল একতালা।

তারা তারা করে যে ডাকে তাঁহারে,এ ভব সংসারে তারা তারে তারে।
ডাক তার স্বরে অভয়া মায়েরে অকূল সাগরে
সুখে যাবি তরে॥
কেনরে কাতর হও মোর মন
মার পদে সব কর সমর্পণ
অন্তরে রাখিয়ে তীব্র আকিঞ্চন
আকুল পরাণে ভাস প্রেমনীরে॥

খাদ।

অবাধ্য সন্তানে মায়ে যদি মারে
মা মা করে ছেলে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে
সে কান্না মায়ের বাজিলে অন্তরে
অমনি মা তারে নেয় কোলে করে।
শোক তাপে যত হবে জ্বালাতন
তত ডাক মাকে করিয়ে রোদন
অন্তর বেদনা বুঝিয়ে তোমার নিশ্চয় বেদনা
পাবে মা অন্তরে॥

সন্ন্যাসী বলিলেন আবার একবার গান।

পুনরায় গানারম্ভ—

আহা সুন্দর সঙ্গীত। দিব্য বাক্য-বিন্যাস। মা অপরাধী সন্তানে প্রহার করলেও ছেলে মা, মা বলেই কাঁদে। মা ক্রোধের বশীভূতা হয়ে সন্তানে প্রহার করে চলে যান, কিছুক্ষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করে ভৎর্সনাও করেন কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে সব ভুলে জান। ছেলের অপরাধ ও তৎকৃত শাসন এই দুটীই যুগপৎ মায়ের কোমল অন্তরে উদিত হ'য়ে তাঁকে বড়ই উদ্বেগ প্রদান করে। স্নেহময়ী জননী অমনি রোরুদ্যমান শিশুর দিকে অল্পে অল্পে দেখেন। অপত্য-স্নেহাকুলা মা তখন অগ্রে মনের দ্বারা স্মরণ, পরে দর্শন ও তৎপরে রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করেন। বালক অপরাধী হলেও সে স্নেহের বস্তু এবং অজ্ঞান, তাকে আমার প্রহার করা উচিত নয়—ঐটীই স্থির করে নয়ন মন বালকের প্রতি রেখে দেখেন যে, বালক নিজ অপরাধ মনেও করে না। সে কেবল মায়ের প্রহারে তাঁর ভালবাসা মনে করে অভিমানে

ফুলে ফুলে অস্ফুট স্বরে রোদন করচে। বালক জানে ক্ষুধাতৃষ্ণা সুখ দুঃখ সকল সময়েই মা। সে মা ছাড়া কিছুই জানে না। অতএব মা বুলী বালক ছাড়ে না। মায়ের সান্ত্বনা পর্ত্তে বিলম্ব হলে যে বালক এইভাবে মার প্রাণ আকুল করে স্থির অচল অটল ভাবে কাঁদতে পারে, সেই মার কৃপা লাভে সমর্থ হয়। অনন্যমনা বালকের এই সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা জেনে সাধকগণ এই ভাব-শিক্ষায় যত্নবান হন। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে নিদারুণ নিপীড়িত হয়েও যদি সাধক বিচলিত না হয়, বরং দুঃখ-পরম্পরায় অর্থাৎ দুঃখের উপর যত দুঃখ পায়, ততই যদি মার জন্য প্রাণ আকুল ক'রে সে কাঁদতে পারে, মা আর কি তখন থাকতে পারেন? অমনি ধেয়ে এসে সন্তানকে কোলে নিয়ে সান্ত্বনা করেন। সন্ন্যাসী শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে বেণীবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কেমন বাবু সাধনার কথা এখন থাক। বালকের এইরূপ তীব্র আকুলতায় মা আকুলা হন না কি? বেণীবাবু বিশেষ কিছু বলিলেন না, উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ ঐ রকমই হয়। সন্ন্যাসী বেণী বাবুকে চিনিতেন। এ জন্য তাঁকে লক্ষ্য করেই কথাটা বললেন। সন্ন্যাসী এ ভাবটীকে আরও বিশদভাবে সাধারণকে বুঝাবার জন্য বলতে আরম্ভ করলেন—মার প্রহারে ছেলে যদি ছুটে বাবার কাছে কি দাদার কাছে বা দিদির কাছে যায়; মাও তখন দেখলেন, যার কাছে হ'ক গেছে এখনি ওদের সান্ত্বনায় ভুলে যাবে—আর কি মার প্রাণ তেমন কাঁদে। সে বালক মাকে আর কি তেমন আকুল কর্ত্তে পারে?

বালকের অন্তঃকরণে অহঙ্কার স্থান পায় না। সরল প্রাণের সরল বিশ্বাস, সরল দৃষ্টি, সরল ভাব। বালকের সমস্তই সরল। যাদের অন্তরে অহঙ্কার স্থান পেয়েছে তাদের আর এ ভাব নিকটে আসে না। অহঙ্কারের একটী নাম তম। এই তম দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অধর্ম্ম অনুচরবর্গের সহিত তার হৃদয় ক্ষেত্রে বিচরণ করে। জ্ঞানের অভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন গণের আচরিত পথ সকল ভ্রম-সঙ্কুল মনে কর্ত্তে থাকেন।

শাস্ত্রে অবিশ্বাস এমন কি সাক্ষাৎ ভগবানেও অবিশ্বাস সকলকেই সন্দেহ, আত্ম-মীমাংসাও ভুলিয়া যান। কারও জাতিগত অভিমান কারও অবিদ্যাগত অভিমান আর কারও ঐশ্বর্য্যগত অভিমান প্রবল হয়ে তাকে অধঃপাতিত করে।

দ্বাপরে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র একদা গোচারণ করিতে করিতে বালকদের বলিলেন যে, আমরা ক্ষুধার্ত হয়েছি নিকটে ঐ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করছেন, তোমরা গিয়ে আমরা ক্ষুধার্ত বললে অন্নদান করবেন নিয়ে এস। বালকগণ আনন্দে তথায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা জ্ঞাপন করলেন কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ অভিমান বশে স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরকেও চিনিতে অসমর্থ হয়ে তাঁদের বিতাড়িত করলেন।

তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাৎ ভগবন্তমধোক্ষজং।
মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্ত্যাত্মানো ন মেনিরে॥
শ্রীমদ্ভাগবত।

তারা যাঁকে যজ্ঞে তুষ্ট করবার জন্য ভূরি আয়োজন করেছেন, সেই কৃপাময়ের কৃপায় তাঁরা 'আমরা ব্রাহ্মণ' এই অভিমান বশে কৃষ্ণ—গোপজাতি বিবেচনায় অবজ্ঞা করিল। তম দ্বারা জ্ঞান অবরুদ্ধ হইল। বালকগণ ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণকে বলিল, অন্তর্যামী সমস্ত বুঝিলেন—এরা আমায় পাবার জন্যই এত ক্লেশ-সাধ্য কর্ম্ম করছে কিন্তু অভিমান জন্য চিনতে পারলে না। দয়াময় তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেতু যাদের অভিমান নাই সেই বিপ্র-পত্নীগণের নিকট বালকগণকে প্রেরণ করলেন। তারা শুনবামাত্রেই চতুর্ব্বিধ অন্ন আনয়ন করে ভগবানকে দান করে কৃতার্থা হয়েছিলেন। এদের অভিমান ছিলনা, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অসুর-সংহার কালীয়দমন ইত্যাদি যোগ্যতায় তাদের বিশ্বাস বশতঃ তাকে ঈশ্বর জ্ঞান করেছিল। পণ্ডিতগণ তা করেন নাই, তাঁর যোগ্যতার দিকে দৃষ্টি করবার ক্ষমতা অভিমানে নষ্ট করে ফেলেছিল। আমরা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত এই অভিমান তাঁদের বুঝতে দেয় না। তৎপরে যজ্ঞ-পত্নীগণের নিকট সমস্ত কথা শ্রবণ করে তাঁদের সেই অভিমান তিরোহিত হয়েছিল। এই অভিমান কেবল মনুষ্যের নয়, দেব-

ভাবও হয়ে থাকে। দেবরাজ চন্দ্রের হয়েছিল এবং এমন কি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পর্য্যন্ত হয়েছিল। তাঁর কৃপা ভিন্ন কিছুতেই সে অভিমান যায় না।

ক্রমশঃ।

স্ব-প্রকাশ।

(মল্লার মিশ্র—একতালা)।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, বি, এস, সি।

জীর্ণ প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরে
ত্রিদিবের ছটা— নব জ্যোতি-ঘটা
কোথা হ'তে এল আঁধারে ?
ধূলি ধূসরিত যত আবর্জ্জনা
নিমেষে উড়ায়ে দিল কোন জনা ?—
শূন্য আসন পূর্ণ ক'রল
ফুল্ল-কুসুম সম্ভারে ?
রুদ্ধ দুয়ার কে দিল খুলি ?
নির্ব্বাণ প্রদীপ কে দিল জ্বালি ?
মঙ্গল ঘট চিন্ময়-পট
স্থাপিল রুদ্ধ আধারে ?
নীরব নীরব মন্দির মাঝে
ঐ যে অভয় বাঁশরী বাজে !—
ললিত লহরে ডুবাও আমারে
নিত্য নবীন সুরে।

হরিনাম।

সেবা-ধর্ম্ম।

(শ্রীনবদাকান্ত কবিরত্ন)

"ব্রহ্মা হ'তে কীট পরমাণু
সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ,
কর সুখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,

জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥”

দাও ভাই! দুঃখীর উষ্ণ অশ্রু সযত্নে মুছিয়া দাও। ক্ষুধাতুর কাঙ্গাল—দরিদ্র-নারায়ণের মুখে এক মুষ্টি অন্ন তুলিয়া দাও! ঐ শীতার্ত্ত নগ্ন-দেহে একখানি স্থূল বস্ত্র জড়াইয়া দাও। গৃহহীনের ঝড়ে-জলে, শীত বা তাপে মাথা রাখিবার মত একটু পর্ণ-কুটীর বাঁধিয়া দাও। পীড়িতের জন্য একটু পথ্য,এক কোঁটা ঔষধের সুবন্দোবস্ত কর। অজ্ঞান পতিতকে তোমার জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে এক কণিকা প্রদান করিয়া উহাকে সুপথে টানিয়া লও। সর্ব্বপ্রকার অনা-চার হইতে দূরে সরিয়ে রাখ। ব্যাধিগ্রস্তের সেবা পরিচর্য্যা, বিপন্নের বিপদ মুক্তির জন্য মন-প্রাণ উৎসর্গ কর। উহাদিগকে সকল প্রকার অজ্ঞানতা—সর্ব্ববিধ কুসং-স্কারের হাত হইতে মুক্ত কর। শিক্ষায়-দীক্ষায় মানুষ করিয়া—দেবতারূপে গড়িয়া তুল। অন্ধ, অক্ষম, দুর্ব্বলেরা যাহাতে আপন হাতে আপনার অন্ন-বস্ত্র প্রস্তুত করিতে—আপন দুঃখ-দুর্গতির মুক্তির পথ আপনি খুঁজিয়া লইতে—আপন পায়ে আপনি দাঁড়াইতে পারে, এমনি ভাবে উহাদিগকে গড়িয়া তুল। প্রেমের বন্যায় বিশ্ব ভাসাইয়া দাও। ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণার অন্ন-ক্ষেত্র—সদাশিবের কাশী অনন্ত শান্তির ‘মঙ্গল মঠ’ সংস্থাপনে বিশ্বজোড়া আপন গৃহ নির্ম্মাণে প্রাণপণ চেষ্টা—জীবন উৎসর্গ কর।

“পরের কারণ, এ জীবন মন,
সতত সঁপিয়া দাও॥”

ঐ দেখ, তোমার সম্মুখে কি সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে? কাজে লাগিয়া যাও। ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের বক্ষে বিশাল মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে! এই উত্তপ্ত বালুকারাশিকে স্নেহ-বারি-সেচনে শীতল, উর্ব্বর করিয়া উহাতে মঙ্গলের বীজ বপন করিতে হইবে। ঐ দেখ; তোমরই দৃষ্টির সম্মুখে বঙ্গের সূতিকাগৃহে—পরম শান্তি-নিকেতন জননীর কোলে কি ভীষণ শ্মশান অনল জ্বলিতেছে! সেই আগুনে প্রত্যহ বাঙ্গালার এক তৃতীয় অংশ স্নেহের শিশু জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। শত শত

স্নেহময়ী জননী প্রাণ-প্রতিম শিশুর সহিত আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতেছেন! লক্ষ লক্ষ দরিদ্র-নারায়ণ 'হা অন্ন! হা বস্ত্র!' করিয়া দৈন্যের শত বিভীষিকার ভিতর থাকিয়া থাকিয়া নিয়ত শিহরিয়া উঠিতেছে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। বঙ্গের-মৃত্যু-সংখ্যা পাশ্চাত্য কুরুক্ষেত্র মহাসমরে মৃত্যু-সংখ্যাকেও পরাভব করিয়াছে। নানা-বিধ নিবার্য্য ও অনিবার্য্য ব্যাধিতে প্রতি-বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক অকালে মহা-কালের করাল কবলে গড়াইয়া পড়িতেছে। আমাদের অকর্ম্মণ্যতা ও অজ্ঞানতার অভিশাপ দেশ-মাতৃকার বিশাল বক্ষে ভয়া-বহ শ্মশান অনল জ্বালিয়া দিয়াছে।

বিশ্বময় বিশ্বেশ্বর। একি ভাই, তাঁহারই মরমের উষ্ণ নিশ্বাস নহে। কর ভাই! ঐ সকল অশান্তি দুর্গতির অনন্ত দুঃখ মুক্তির উপায় বিধানে স্বীয় নশ্বর জীবন উৎসর্গ কর। প্রকৃত সেবকের ন্যায় সেবা-কর্ম্মে লাগিয়া যাও, সেবা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হও। দরিদ্র-নারায়ণের অর্চ্চনা কর, তবেই তোমার হরিপূজা—নারায়ণ-সেবা সার্থক হইবে! সাধনার সিদ্ধি আসিয়া আপনি গৃহ-দ্বারে হাসিয়া দাঁড়াইবে।

'নামে রুচি জীবে দয়া' সত্য আলাপন—
বিশ্ব-ধর্ম্ম-সার—সর্ব্ব ঘটে নারায়ণ।
সাধ বিশ্ব-জন-হিত—প্রেমে দাও কোল,
আত্মহারা হ'য়ে সদা বল 'হরিবোল'।

বেজেছে; বাঙ্গালীর হৃদি-বৃন্দাবনে প্রেমের বাঁশী বেজেছে। ঐ শুন, যমুনার কূলে কদম্বের তলে আবার শ্যামসুন্দরের রাধানামের সাধা বাঁশী বাজিতেছে—নব বঙ্গে আবার সর্ব্বমঙ্গলময়ের মঙ্গল-শঙ্খ নিনাদিত হইতেছে। এই বংশীরব শ্রবণেই না একদিন যমুনা উজান বহিত; ব্রজাঙ্গনারা কুল-মান ত্যাগ করিয়া—সতী পতি-সেবা ছাড়িয়া, স্নেহবতী জননী কোলের শিশুকে দূরে রাখিয়া, গৃহ-কর্ম্ম-নিরতা গৃহিণী আরব্ধ কার্য্য অসম্পন্ন ফেলিয়া, ভোজনার্থিনী সম্মুখের অন্নথালা সরাইয়া, নিদ্রাতুরা নিদ্রালস-নয়ন মার্জ্জনা করিয়া, সমাজ-তাড়না, গুরুজন-গঞ্জনা সব উপেক্ষা করিয়া, লাজ-ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া ত্রস্তবাসে, মুক্তকেশে, উন্মাদিনী-বেশে,

উদাস মনে, আকুল প্রাণে, ত্বরিত চরণে—কুশ-কঙ্কর-কণ্টক-পথে মহানন্দলের, অন্বেষণে—মহাবাসে মিলিবার, পারমানন্দরসে মজিবার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া যাইতেন। সাধন-ভজনপরায়ণ ভাগ্যবান মানব মাত্রেই জীবনের কোনও শুভ মহেন্দ্র ক্ষণে যদি বৃন্দাবনে এই প্রেমের বাঁশরী-শ্যামসুন্দরের এই মধুর বংশীধ্বনি শুনিতে পাইয়া থাকেন। এ বাঁশী শুনিলে মাটির মানুষ সোণার মানুষ হইয়া যায়—মানব আপনাকে ভুলিয়া বিশ্বপ্রেমে মজিয়া সেই প্রেমময়ের অন্বেষণে ছুটিয়া বেড়ায়।

শ্যামের বাঁশীর এই মধুর স্বর—"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করল মোর প্রাণ।" তাই এই বংশীধ্বনি শ্রবণে—কস্তুরী-সৌরভ-মুগ্ধ মৃগের ন্যায় সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, রেলে, জাহাজে, পদব্রজে, কাশী, গয়া, শ্রীবৃন্দাবন, লাঙ্গলবন্ধ, নবদ্বীপ, শ্রীক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, কামরূপ, চন্দ্রনাথ, সাবিত্রী, গঙ্গোত্রি, কনখল, বদরিকাশ্রম, কেদারখণ্ড, হৃষিকেশ, অযোধ্যা, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার প্রভৃতি সুদূর তীর্থে সেই বংশীধরের অন্বেষণে ছুটিয়া যায়।

প্রাণে এ প্রেমের বাঁশী বাজিয়াছিল—কর্ণে এ মধুর বংশীরব ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়াই শাক্যসিংহ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ, কেশব, বিজয়কৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গ, বিবেকানন্দ, লোকনাথ, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, রামপ্রসাদ, জগবন্ধু কবীর, নানক, তুকারাম এবং তুলসীদাস প্রভৃতি মহাপুরুষেরা—অবতার, দেবতা এবং সাধনসিদ্ধ মহাজনগণ কেহ রত্নসিংহাসন ত্যাগ করিয়া এবং কেহ বা ভোগৈশ্বর্য্য ও গৃহসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সেই চির শান্তির—পূর্ণমঙ্গলের অনুসন্ধানে বংশীধরের সেই মোহনবংশী-নিঃসৃত প্রেমামৃত পানে বিশ্বজনীন প্রেমে নিমগ্ন হইতে—অমর হইয়া বিশ্ববাসীর প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

প্রার্থনা।

(শ্রীক্ষিরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ)

নিত্য সিদ্ধ বুদ্ধ সত্য মুক্ত ভগবান,
হে শুদ্ধ অপাপবদ্ধ দেব দীপ্যমান,
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বত্রব্যাপ্ত সকলের সার,
হে দেবাদিদেব, পদে করি নমস্কার;
শুদ্ধ করহে, বুদ্ধ করহে, পুণ্য করহে প্রাণ,
মুক্ত করহে, যুক্ত করহে শক্তি করহে দান।
বিশ্বের ঈশ্বর দীপ্ত বিশাল বিরাট,
হে রাজাধিরাজ প্রভো স্বরাট সম্রাট,
কৃপাসিন্ধো, দীনবন্ধো অনাথের নাথ,
হে দেবতা পদে তব করি প্রণিপাত।
শুদ্ধ করহে, বুদ্ধ করহে, পুণ্য করহে প্রাণ,
মুক্ত করহে, যুক্ত করহে, ঋদ্ধি করহে দান।
জীবন সংগ্রামে ভীত আর্য্যসুতগণ,
হে দেবেশ পদে তব মাগিছে শরণ,
স্বার্থান্ধ মানব কত করে হয় হত;
দূর কর জগতের ভেদবাহ যত,
শুদ্ধ করহে, বুদ্ধ করহে, পুণ্য করহে প্রাণ,
মুক্ত করহে, যুক্ত করহে, বুদ্ধি করহে দান।
অবনত কর যত অসুর উদ্ধত,
করহে উন্নত, পদে যা'রা অবনত,
ন্যায় ধর্ম্ম দীপ্ত দণ্ড করিয়া হেলন,
পলকে সকল দুষ্ট করহ দমন।
খর্ব্ব করহে যতেক গর্ব্ব, মুক্ত করহে প্রাণ,
দূর করহে ভেদবিবাদ শান্তি করহে দান।
বরাভয় করে কর সবারে আহ্বান,
অমৃত, অমৃত, কর কটাক্ষে সিঞ্চন,
নবীন জীবন আজি নবীন প্রভাত,
কর আশীর্ব্বাদ পদে করি প্রণিপাত,
মুগ্ধ করহে, গন্ধে বরণে পূর্ণ করহে প্রাণ,
লিপ্ত রাখহে চরণে চিত্ত, ভক্তি করহে দান।

কাম না প্রেম।

[রূপক]

(শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস লিখিত।)

বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া কতকগুলি বামাচারী তান্ত্রিক মদ্যপানে নিরত ছিলেন। এমন সময় জনৈক যুবক টলিতে টলিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবকের বয়স আন্দাজ আঠার কি উনিশ হইবে; গঠন অতীব সুঠাম, বর্ণ চাঁপাফুলের ন্যায়, গলে উপবীত লম্বমান। যুবকের সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া যেন একটা অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য শ্রী উথলিয়া পড়িতেছিল—তাহার স্নিগ্ধ লাবণ্য মণ্ডিত দেহ খানি যেন শত চেষ্টা করিয়াও তাহা ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।

প্রাঙ্গণস্থ তান্ত্রিকগণ যুবকের আলুথালু বেশ ও রক্তাভ চক্ষু দেখিয়াই বুঝিয়া লইলেন যে যুবক নেশায় সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত। সুতরাং সুযোগ বুঝিয়া জনৈক বামাচারী তাহার সহিত ক্ষণিক রসালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

বামাচারী।—হ্যাঁরে ও ছোঁড়া! তুই যে এই বয়সে এমনি মাতাল হয়ে পড়লি, এর পর কি কর্‌বি বল দেখি?

যুবক।—কেন দাদা? এতে আমার অপরাধ কি? তোমরাই তো সোহাগ করে আমার "মাতাল ছোঁড়া" নামটা রটিয়েছ! লুকিয়ে চাপিয়ে আমি কোথা একটু ঘুটু করে দিটেনি, তাও তোমাদের চোখে সয়নি। অমনি মাছির মত গন্ধ পেয়ে চারিদিকে "ছোঁড়াটা উৎসন্ন গেল" বলে ভন্ ভন্ করে বেড়াও। কিন্তু তোমরা যে দাদা এই হাঁড়ি হাঁড়ি চোখের সামনে পার করছো—আমি কোথা গেয়ে বেড়াই বল তো?

বামাচারী যুবকের স্পষ্টবাদিতায় একটু অপ্রতিভ হইয়া অন্য কথা ফেলিয়া বলিলেন;—

"তা যাক্! তোর যে বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছে; এখন একটু সামলে চল। ছ্যাখ না কেন, তোর মা বাপ কেউ নাই—এ

সংসারে আপনার বলতে সব বিদায় নিয়েছে। তোকে যে দয়া করে ওপাড়ার পণ্ডিত মশায় তার মেয়ে দেবেন বলে সম্বন্ধ করছেন, তার জন্যও ত অন্ততঃ সাবধানে চলা উচিত।"

"রেখে দাও দাদা ও বিয়ের কথা। তোমাদের শুধু ওই রাত দিন বিয়ে বিয়ে লেগেই রয়েছে। বিয়ে কে করবে বল তো যে পণ্ডিত মশায় তাঁর মেয়ের জন্য চেষ্টা করবেন? আমি সম্বন্ধের কথা টের পেয়েই পণ্ডিত মশায়কে বলে এয়েছি আমি বিয়ে করবো না—কেন আমার জন্য নিরর্থক মাথা ঘামাচ্ছেন—তার চেয়ে অন্যত্র চেষ্টা করুন গে'।

"(সাংস্থকে) সে কিরে! বিয়ে করবি নাত রাতদিন কি ঐ ধোপানী মাগীটাকে নিয়ে বাশুলি দেবীর মন্দিরে ইয়ারকি দিবি? জানিস্, তাহলে তোকে দুদিন বাদে এ মন্দির থেকে ডেরা তুলতে হবে?"

যুবক ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তারপর আবেগ জড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল—

"দেখ দাদা! তোমাদের পায়ে পড়ি আর যা বল্‌তে হয় বোলো, কিন্তু ওই যুবতীর নামে এমন কলঙ্কটা রটিও না; আহা! তার তিন কূলে কেউ নাই। জাত ব্যবসায় ছেড়ে দু'মুটো অন্নের জন্য বাশুলী দেবীর মন্দির মার্জ্জনা করে। আমি বেশ জানি, সে স্বভাব চরিত্র বজায় রেখে আস্‌ছে। তবু তার নামে এমন কুৎসা রটাও কেন দাদা?"

বামাচারী যুবকের চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত ছিলেন। তথাপি রহস্যচ্ছলে এইরূপ অপ্রিয় সত্যের অবতারণায় সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

যুবক উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সত্বর মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেল।

এই স্থলে আমরা যুবক সম্বন্ধে এই প্রকার কলঙ্ক রটনার কারণের উল্লেখ করিব। যুবকের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার ছাৎনা গ্রাম। যুবকের পিতা এক জন গোঁড়া শাক্ত ছিলেন এবং নান্নুর গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর সেবা করিতেন। দেশে

তখন তান্ত্রিক মতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। মদ্য মাংস বিবিধ উপচারে বিশালাক্ষী দেবীর নিত্য পূজা অর্চ্চনা হইত। মন্দিরে বামাচারীগণের নিত্য ভিড় লাগিয়া থাকিত। যুবক শৈশবকাল হইতেই পিতার নিকট দেবী পূজা শিখিতে লাগিল। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ যুবকের পিতা তাহাকে অল্প বয়সেই ফাঁকি দিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। স্বাধ্বী পতিপ্রাণা পত্নীও স্বামীর অনুগমন করিলেন; সুতরাং বাল্যাবস্থায় এই যুবক সম্পূর্ণ আত্মীয় ও অভিভাবকহীন হইয়া পড়িল। অধিকন্তু, বামাচারীগণের সহবাসে সে অল্প অল্প মদ্যপান করিতেও শিক্ষা করিল।

নান্নুর গ্রামে তখন অনেক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তাঁহারা দয়াবশতঃ এই পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালকের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিয়া দিলেন। যাহার কোথাও কেহ থাকে না মহামায়ার করুণাভরা করপল্লব তাহার রক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রসারিত। যৌবনের প্রারম্ভে দেবীর ইচ্ছায় বালক বিশালাক্ষীর পূজারি পদে অধিষ্ঠিত হইল। শাক্তের বংশধর বলিয়া স্বভাবতঃ এই যুবকের শক্তির প্রতি অচলা অহৈতুকী ভক্তি ছিল। সে কায়মনো-বাক্যে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে বিশালাক্ষী দেবীর পূজা করিতে লাগিল। যুবক স্বয়ং ভোগ রন্ধন করতঃ অতিথি অভ্যাগতকে ভোজন করাইয়া পরে নিজে প্রসাদ পাইত।

বিবাহ করিবার জন্য অনেকে যুবককে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু চিরদিন কুমার থাকিয়া শক্তি-মন্ত্রের উপাসনা করিবার বাসনা হৃদয়ে জাগরূক থাকায় যুবক বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল না।

এই সময়ে নান্নুর গ্রামে এক রজক রমণী বাস করিত। রমণী সবে মাত্র কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে সমাগত এবং লোকললামভূতা অপূর্ব্ব সুন্দরী। রজক কন্যা হইলেও যুবতীর চরিত্র ভাল ছিল। যুবতী জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন না করিয়া বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির মার্জ্জনা করিত। ভক্তিমতী ও শুদ্ধাচারিণী

বলিয়া যুবক এই রমণীকে অত্যন্ত স্নেহ করিত।

যুবতীর প্রতি যুবকের এই প্রকার অপূর্ব্ব স্নেহই মূর্খ গ্রামবাসীগণের পূর্ব্ব কথিত কলঙ্ক রটনার উপাদান স্বরূপ হইয়াছিল।

(২)

যে সময়কার কাহিনী লিখিতেছি তখন বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত তান্ত্রিকধর্ম্মের ঘোরতর সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত। জয়দেবের প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বৈষ্ণবদিগের সহিত শাক্তগণের বিষম বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছিল। নূতন ধর্ম্মের নূতন উচ্ছ্বাস সহ্য করিতে না পারিয়া বামাচারী তান্ত্রিক-গণ নিরীহ বৈষ্ণবগণকে অযথা উৎপীড়ন করতঃ নৃমুণ্ডমালিনীর জয় ঘোষণা করিতেন। ফলতঃ এই প্রকার অযথা অত্যাচার নৃমুণ্ডমালিনীর করুণার উদ্রেক করিত কিনা তাহা জানি না; তবে বৈষ্ণবগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া যুবকের করুণ হৃদয় পরদুঃখে গলিয়া যাইত। সে এই প্রকার লাঞ্ছিত অবমানিত বৈষ্ণবগণকে কাছে বসাইয়া নানাপ্রকার আশ্বাস দান করিত এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদের গান শুনিয়া তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া সম্মানের সহিত বিদায় করিতে লাগিল। এইরূপে বৈষ্ণবগণের সহিত তাহার ক্রমশঃ সাহচর্য্য ঘটিতে লাগিল। শাক্ত যুবক ক্রমশঃ অলক্ষিতভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমে আকৃষ্ট হইল। কিন্তু হইলে কি হয়? যুবক শক্তির সেবাইত—পাছে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিলে তাহাকে শাক্তগণের কোপ দৃষ্টিতে পড়িতে হয়, এই আশঙ্কায় যুবক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণে সাহসী হইল না। শাক্তগণ কুপিত হইলে তাহাকে বিষম বিপন্ন হইতে হইবে—তাহার অন্নের সংস্থান জন্মের মত ঘুচিয়া যাইবে। বিশেষতঃ কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তাহার লাঞ্ছনার অবধি থাকিবে না। এই প্রকার সাত পাঁচ ভাবিয়া যুবক বামাচার ত্যাগ করিতে পারিল না।

যুবক বামাচার ত্যাগ করিতে পারিল না বটে, কিন্তু ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা কে বুঝিতে পারে? লীলাময়ীর লীলা প্রভাবে

শাক্ত যুবক ঘটনান্তরঙ্গের একটি মাত্র আঘাতে গোঁড়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া গেল! যুবক একদিন স্নান করিতে গিয়া স্রোতে ভাসমান একটি প্রফুল্ল পদ্মকোরক সংগ্রহ করিল। তাহার পর মন্দিরে আনিয়া সেই কুসুমটি চন্দন প্রলিপ্ত করিয়া বিশালাক্ষী দেবীর পাদপদ্মে অর্পণ করিল। সেই দিন রাত্রিকালে যুবক স্বপ্ন দেখিল—দেবী তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন "বাছা! ভক্ত আমার, আজ তুই যে ফুলটি আমার পায়ে দিয়েছিস, তাহা বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য। বিষ্ণু আমার গুরুর গুরু—আমি তাই ফুলটি আমার মাথায় ধারণ করেছি।" বিস্মিত যুবকের কৌতূহল বশতঃ আর নিদ্রাগম হইল না। সে তৎক্ষণাৎ আলো জ্বালিয়া বিশালাক্ষীর মন্দিরে গিয়া দেখিল, তাহার স্বপ্ন কথিত দেবীর উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। সত্য সত্যই সেই চন্দন প্রলিপ্ত পদ্মকোরকটি বিশালাক্ষী দেবীর মস্তকে উজ্জ্বল পদ্মরাগের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভক্ত হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—যুবক বিশালাক্ষীর মধ্যে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তাহার ভেদজ্ঞান ঘুচিয়া গেল—প্রেমের আলোকে কালী ও কালা এক হইয়া গেল। সেই অবধি যুবক নির্ভয়ে বিষ্ণু প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিল।

শাক্তগণ বামাচারী যুবকের এই আশ্চর্য্য ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। ক্রমে তাহাদের অসন্তোষ ও বিরক্তি বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ভক্ত যুবকও বুঝিতে পারিল যে তাহার শান্তিময় জীবনে অশান্তির কালমেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে—শাক্তগণ তাহাকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে এবং অচিরে এই শাক্তরোষ তাহার অদৃষ্টাকাশে বজ্রানলের রেখা টানিয়া রন্ধ্রগত শনির ন্যায় তাহার জীবনের সকল শান্তি নষ্ট করিয়া দিবে। বুঝিল বটে, কিন্তু নিয়তি তখন তাহাকে বহুদূরে লইয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং যুবক এই নব প্রবর্ত্তিত পথ হইতে আর ফিরিতে পারিল না।

(৩)

যুবকের ধর্ম্মান্তর গ্রহণে শাক্তগণ হাড়ে

হাড়ে চটিয়া গেলেন। অধিকন্তু এই যুবক যুবতীর সম্বন্ধে তাঁহারা নানাপ্রকার অপবাদ রটনা করিতে লাগিলেন। যুবক ব্রাহ্মণ সন্তান ও সামাজিক দৃষ্টিতে পতিত—এই প্রকার পতিত চরিত্রহীন ব্রাহ্মণের দ্বারা দেবার পূজা চলিতে পারে না বলিয়া যুবককে পুরোহিতের পদ হইতে চ্যুত করিবার বিষম ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। যুবককে সমাজচ্যুত করিবার নেতা একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। তিনি একদিন তাহাকে বিরলে ডাকাইয়া অনেক কৌশল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যুবক যখন তাহাতেও স্বীকৃত হইল না তখন তিনি রোষকষায়িত লোচনে কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"পাজি ছোঁড়া! বল্ তোকে কে এই বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করলে?" যুবক নির্ভয়ে উত্তর করিল—"সেই ধোপার মেয়ে।"

ধোপার মেয়ে? কি আশ্চর্য্য! রজক কন্যা ব্রাহ্মণ সন্তানের দীক্ষা গুরু? ব্রাহ্মণ যুবকের উপদেষ্টা? একি! আজ তিনি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন নাকি? ব্রাহ্মণ বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে যুবকের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সম্মুখে ভীষণ বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় ব্রাহ্মণ এতদূর আশ্চর্য্যান্বিত ও বৈর্য্যচ্যুত হইতেন না।

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিলেন—"মূর্খ! ভণ্ড! মাতাল! চরিত্রহীনা রজক রমণী তোর দীক্ষা গুরু? সত্য করে বল তোকে,কে এই বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিলে?"

ভক্ত যুবক তখনও স্থির ধীর অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "সত্য বলিতেছি, সেই ধোপার মেয়ে। সেই ধোপার মেয়েই আমার বৈষ্ণব মতের সহজ সাধনার গুরু; সেই রজক কন্যাই আমার এই নব ধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাহারি সহিত প্রবর্ত্ত হইয়াই আমি এই সাধনার পথে দেবীর আদেশে অগ্রসর। যদি না বিশ্বাস করেন, তবে শুনুন।'

সমাজনেতা ব্রাহ্মণ কি জানি কেন কিছুক্ষণ বিস্ময়ে যুবকের পানে চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাহার মুখে সেই

অধীর আবেগ ও বিস্ময়ের ভাব অন্তর্হিত হইয়া যেন ধীরে ধীরে কি একটা শান্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। যুবক বলিতে লাগিল—তবে শুনুন। আমি একদিন সারা দিবসের পরিশ্রমের পর ক্লান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িয়া ছিলাম। সহসা এক দারুণ চপেটাঘাতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি শিহরিয়া উঠিয়া শয্যার উপর বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম বন-দেবী নিত্যার সঙ্গিনী বাশুলী ডাকিণী আমার শিয়রে দণ্ডায়মান; আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমাকে কি আদেশ করেন?" ডাকিণী কহিল;—"আমার আদেশ নহে এ তোদের বনদেবী নিত্যার আদেশ। তিনি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার গান শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। বহুকাল ঝুমুর শুনিয়া দেবীর ঝুমুরে অরুচি হইয়াছে।" আমি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে আপনাকে এই লীলা গান শোনাইবে? তেমন অকপট ভক্ত কবি ও মধুর কণ্ঠ সাধক কোথায়?" তিনি কোন প্রকার উত্তর না করতঃ বলিলেন—"তুমি যাও। এখনই লীলারসজ্ঞ ভক্তের অনুসন্ধান করিয়া আন। আমি বৃন্দাবন লীলা অবশ্যই শুনিব। আমি বিরুক্তি না করিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া তোর কাছে আসিয়া ছিলাম; কিন্তু দেখিলাম তুই শাক্ত—শক্তি প্রতিমার পূজারি। শাক্তের মুখে বৈষ্ণবতত্ত্ব ভাল শুনাইবে না। তাই তোকে বৈষ্ণব মতের সহজ সাধনায় দীক্ষিত করিয়া লইতে চপটাঘাতে জাগ্রত করিলাম।"

বাশুলির কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সভয়ে প্রশ্ন করিলাম—"লীলা প্রচারের পূর্ব্বে তাহা হইলে আমাকে বৈষ্ণব তত্ত্বের গূঢ় রহস্য জানিতে হইবে; কিন্তু কে আমাকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিবে?"

ডাকিণী অট্টহাস্য করিয়া আমাকে এই রজক রমণীর স্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিতে বলিলেন। দেখিলাম আমার সেই স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির অনুরূপ প্রতিকৃতি ঐ একমাত্র রজক কন্যা। তাহার পর সেই ডাকিণী আমাকে ধর্ম্মের মর্ম্ম শোনাইল

এবং রজক রমণীর সহিত কিরূপে সহজ-সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। আমিও সেই অবধি এই রজক কন্যার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছি। শান্তি-স্বরূপিণী এই রজক রমণীর শান্তশীতল চরণ দুখানি শান্তিলাভের একমাত্র আশ্রয় ভাবিয়া আমি তাহাকে রাধারূপে কল্পনা করিয়া কৃষ্ণ-লীলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।"

ভক্ত সাধক বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে আপনার স্বপ্ন কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে বাহ্য জ্ঞান শূন্য ও তন্ময় হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণঠাকুর যুবকের বর্ণনা শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার সন্দেহ ঘুচিল না। তিনি অবিলম্বেই এই যুবক যুবতীকে মন্দির হইতে বিতাড়িত করিয়া সমাজের সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন।

(৪)

"কাঁদ্‌ছো কেন সুন্দরী? কিসের জন্য কাঁদছো?" চিন্তাকুল যুবক অশ্রুমুখী সেই রজক রমণীকে ধীরে ধীরে এই কয়টি কথা বলিলেন।

সজল নয়না যুবতী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিল—"কেন কাঁদ্‌ছি আবার জিজ্ঞাসা ক্‌রছেন? কাঁদ্‌ছি আমার জন্য—কাঁদ্‌ছি আপনার জন্য; এবার কোথা থাক্‌বো ঠাকুর?"

যুবক হাসিতে হাসিতে যুবতীর চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন—"কেন প্রিয়তমে! এই বিশাল পৃথিবী—উপরে উদার অনন্ত আকাশ নিম্নে স্নেহময়ী ধরিত্রার শ্যামল অঞ্চল। এখানেও কি আমাদের দুটি প্রাণীর থাকবার ঠাঁই হবে না? মায়ের সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্রমন্দির ছেড়ে মহামায়ার কেমন বিস্তৃত বিরাট দেবালয়ে আশ্রয় নিয়েছি দেখ দেখি প্রিয়ে।"

যুবতী চুপ করিয়া রহিল।

যুবক বলিতে লাগিল—"ভাব্‌ছো কেন প্রিয়তমে। চল গ্রামের এক নির্জ্জন প্রান্তে বিজনমুখর মাঠের মাঝখানে পর্ণ-কুটীর রচনা করে লোকচক্ষুর অন্তরালে তোমাকে রাখবো। শান্তিময়ী প্রকৃতির বুকে শান্তি প্রতিমা তোমাকে অধিষ্ঠান করলে আমার প্রাণ চিরদিন শান্তির

উৎসঙ্গে যাপন করবে।”

ভাববিহ্বল যুবক এই কয়টি কথা বলিতে বলিতে ভাবাবেশে গাহিলেন।—

“শুন ওগো রজকিণী
ও দুটি চরণ শীতল বলিয়া
শরণ লইনু আমি।”

ভাবাবিস্টা ভক্তিমতী রজকিণীর হৃদয়ের স্তরে স্তরে যেন সেই সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা ঝঙ্কার দিয়া গেল! যুবতী সেই সুধামাখা সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্রের উপর শুইয়া পড়িলেন। তখন শুক্লা পঞ্চমীর স্নিগ্ধ চন্দ্ররশ্মি আপনার শুভ্র আলোক বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিক আলোক-রঞ্জিত করিতেছিল। শুক্ল জ্যোৎস্নায় শুক্ল-বসনা সুন্দরীকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। অলস সমীরণ কোথা হইতে প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার মধুর সৌরভ মাখিয়া যুবতীর চূর্ণকুন্তল লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। যুবতীর উৎফুল্ল যৌবনশ্রীর প্রতি সহসা দৃষ্টিপাত হইবা মাত্র ভক্ত সাধক দেখিলেন চারিদিক নিস্তব্ধ অনন্ত নীলাম্বর হইতে বসুন্ধরার শেষ প্রান্তটি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এক অখণ্ড শান্তি বিরাজিত। যে দিকে চাহিয়া দেখেন সেই দিকে অগাধ সুখ-স্বপ্ন, অগাধ সৌন্দর্য্য ও অনন্ত তৃপ্তি। অথচ যেন প্রাণের মাঝখানে কি একটা জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াও মিটিতেছে না—যেন কি একটা অতৃপ্ত আশা পূর্ণ হইয়াও অপূর্ণ রহিয়া যাইতেছে! সাধক আত্মহারা ভাবে শায়িতা যুবতীর মুখচন্দ্র পানে চাহিয়া গাহিলেন—

“জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।”

(৫)

এখন আর সেদিন নাই। অন্ন চিন্তায় বিভোর হইয়া এখন যুবক যুবতীর অতি কষ্টে দিন কাটে। অন্ন সংস্থানের প্রয়াস বশতঃ এখন সময় সময় ধর্ম্মাচরণেরও বহু বিঘ্ন ঘটে! তথাপি সহস্র দৈন্য-দুঃখের মাঝখানেও এই দুইটী প্রাণ এখন অবাধ-সুখ-স্বপ্নে বিভোর—কেননা উভয়ের প্রাণের পরতে পরতে অখণ্ড শান্তি বিরাজিত।

সংসারে কিন্তু সকল সুখেরই একটা সীমা আছে! কেননা এই শান্তি ভোগও তাহাদের অদৃষ্টে বেশী দিন স্থায়ী হইল না। ক্রমে গ্রামবাসীগণ জানিতে পারিল যে যুবক যুবতী গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তভাগে আশ্রম পাতিয়া স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছে। তাহাদের নির্ব্বাণোন্মুখ ঈর্ষানল আবার জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা এই নির্জ্জন শান্তি কুটীরে আসিয়াও অশান্তির উদ্রেক করিতে লাগিল। সহায়-সম্বল বিহীন আশ্রয় বিচ্যুত যুবক, যুবতীসহ নীরবে তাহাদের সকল অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল।

একদিন যুবতী ভিক্ষা করিবার জন্য গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। বলিয়া গেল তাহার ফিরিতে দুই চারি দিন বিলম্ব হইবে। যুবক কুটীরে একাকী বাস করিতে লাগিল। গ্রামবাসীগণ আসিয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহার ভিক্ষালব্ধ সঞ্চিত তণ্ডুল রাশি অপহরণ করিয়া লইয়া গেল।

তাহাদের প্রস্থানে যুবক দেখিল কুটিরে কণামাত্র তণ্ডুল নাই—মৃৎ-কলসী দুইটী ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কুটীরের পূর্ব্ব কোণের পর্ণাচ্ছাদন বল পূর্ব্বক কে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। ক্ষুধার্ত্ত যুবক অন্নের অভাবে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। কিন্তু কি করিবে? গ্রামবাসীগণের নিকট ভিক্ষার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। পর্ণকুটীর ছাড়িয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জীউর বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াও যাইতে যুবতী নিষেধ করিয়া গিয়াছে। সাধক আপনার ইষ্টদেবের ধ্যান ধারণায় মগ্ন হইয়া ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু এই ভাবেই বা কয়দিন চলিতে পারে? অনশনে থাকিতে থাকিতে যুবক পীড়িত হইল। পীড়া ক্রমে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। পিপাসায় অস্থির হইয়া শুষ্ক-কণ্ঠে কাতর ভাবে যুবক মুহুর্মুহুঃ চীৎকার করিতে লাগিল। গ্রামবাসীগণের কর্ণে সেই মর্ম্ম-ভেদী আকুল আর্ত্তনাদ প্রবেশ লাভ করাতে দুই একজন নিকটে উঁকি মারিয়া যুবকের শোচনীয় অবস্থা দেখিল বটে, কিন্তু কেহই

সেই আসন্ন-মরণ ব্রাহ্মণ সন্তানের তৃষ্ণার্ত্ত মুখে একবিন্দু জল দিল না। দুর্ব্বৃত্ত নরপিশাচেরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হতভাগ্য ব্রাহ্মণের যমযন্ত্রনা দেখিতে লাগিল।

এই ভাবে দুইদিন কাটিয়া গেল; তথাপি যুবতী ফিরিল না তৃতীয় দিবসের প্রাতে যুবকের কুটীর নিস্তব্ধ হইল। কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। দু'একজন প্রতিবাসী দেখিতে আসিল। দেখিল একবিন্দু জলাভাবে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের হৃৎপিণ্ডের গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। হতভাগ্যের প্রাণশূন্য শবদেহ শূন্যপিঞ্জরের ন্যায় কুটিরের মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতেছে।

গ্রামে শবদেহ পড়িয়া থাকিলে নিজেদের অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া কতিপয় বিকৃত মস্তিষ্ক গ্রামবাসী যুবকের মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গেল। ক্রমে চিতাসজ্জিত হইল, চিতার উপর হতভাগ্য প্রেমিক-যুবকের শব সংরক্ষিত হইল—চিতায় অগ্নি সংযোগের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

সহসা আকুল বিলাপে ও রোদন ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া আলুথালু বেশা, রুক্ষকেশা, রোরুদ্যমানা যুবতী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে সেই শ্মশান ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিয়োগ বিধুরা যুবতী পাগলিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল—

"কোথা যাও ওহে প্রাণবঁধু মোর
দাসীরে উপেক্ষা করি.
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক,
ধিরজ ধরিতে নারি;
বাল্যকাল হ'তে এ দেহ সঁপিনু
মনে আন নাহি জানি,
কি দোষ পাইয়ে মথুরা যাইবে
বল শ্যাম গুণমণি।"

ভক্তিমতী শুদ্ধচারিণী সতী যুবতীর বিলাপে নিদ্রোত্থিতের ন্যায় সাধক ভক্ত চিতার উপর উঠিয়া বসিলেন। গ্রামবাসী-গণ মনে করিল ব্রাহ্মণকে বুঝি "দানায়" পাইয়াছে। তাহারা ভয়ে শ্মশান ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। যুবককে জাগরিত দেখিয়া যুবতী মহা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তৃষিত, ক্ষুধার্ত্ত, শুষ্ককণ্ঠ যুবক

নবজীবন লাভ করিয়া ধীরস্বরে বলিল—

"এ দেশে রবনা সই দূর-দেশে যাব।"

তখন সন্ধ্যার ধূসর-রাগ-রঞ্জিতা ধরিত্রী উদাসিনী বেশে আপনার গৈরিক অঞ্চল প্রসারিত করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত উদাস-প্রাণ জীবগণকে স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পরিশ্রান্ত যুবতীকে সঙ্গে লইয়া যুবক আপনার কুটীরে ফিরিয়া আসিল। রাতে উভয়ের সুখ দুঃখের কত কথা কহিল। স্থির হইল প্রভাতে তাহারা অন্য গ্রামে যাত্রা করিবে।

(৮)

মহামায়ার লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে? যেদিন যুবক, যুবতীসহ কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন সেই রাত্রিকালে পূর্ব্বকথিত সমাজপতি ব্রাহ্মণঠাকুর স্বপ্ন দেখিলেন—যেন বিশালাক্ষী দেবী তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন—"দস্যু! নরপিশাচ তোরা আমার ভক্তের নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করেছিস—তোদের অত্যাচারে আজ তারা কিনা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে! যদি ভাল চাস্ তো এই বেলা সকলে গিয়ে তাদের ফিরিয়ে আন; তা নাহলে এই পাপে তোদের সর্ব্বনাশ হবে।"

সমাজপতির হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কম্পিত কলেবরে তিনি অতি কষ্টে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সকলের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইল। শ্রবণমাত্র সকলে যাইয়া যুবক যুবতীর শরণাপন্ন হইলেন এবং করযোড়ে তাহাদের ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। উদার প্রেমিক ভক্তসাধক সকলকেই আলিঙ্গন করিল। অনুতপ্ত গ্রামবাসীগণ এই নবীন ভক্তের সমীপে পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করতঃ পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই সমাজপতি ব্রাহ্মণ ঠাকুরই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রধান ও প্রিয়তম শিষ্যরূপে পরিচিত হইল।

ক্রমে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যুবক যুবতীর অলৌকিক মহিমা প্রচারিত হইল। বিস্ময়বিমুগ্ধ বৈষ্ণবগণ যুবকের এই অপূর্ব্ব পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তির সংবাদে আকৃষ্ট হইয়া

দলে দলে তাহাকে দেখিতে আসিলেন। যে সকল মূর্খ লম্পট ও নিন্দুকের দল এই যুবককে যুবতীর প্রতি ইন্দ্রিয়মোহে আসক্ত ভাবিয়াছিল, তাহারা স্বচক্ষে কাম ও প্রেমের প্রভেদ প্রত্যক্ষ করিয়া মানবজন্ম সফল করিল।

অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র বঙ্গবাসী চিনিতে পারিল যে এই ভক্তযুবক বাঙ্গালার কবি-চূড়ামণি সাধক প্রবর চণ্ডীদাস এবং এই যুবতী তাঁহার বৈষ্ণবমতের সহজ-সাধনার একমাত্র গুরু রজকরমণী রামমণি। যাঁহার পদাবলীর প্রত্যেক পদ বাঙ্গালা-ভাষায় অমূল্য রত্ন এবং অনন্তের আবেগে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ—বৈষ্ণবকবি জয়দেবের কণ্ঠনিঃসৃত অপার্থিব প্রেম-সঙ্গীতকে যিনি অপূর্ব্ব রাগিণীর অমিয় সুরে ললিতপঞ্চমে গাহিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ মুখরিত করিয়াছেন—ইনি সেই প্রেমিক গায়ক চণ্ডীদাস,—আর এই ভক্তিমতী শুদ্ধাচারিণী রমণী তাঁহারই গীতোক্ত সেই পুণ্যশ্লোকা "রজকিনী রামী।"

কবিবর বিদ্যাপতি এই উপলক্ষে চণ্ডীদাসকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। পতিতপাবনী জাহ্নবী পুণ্যতীরে যে পবিত্র ছায়া শীতল বটবৃক্ষমূলে এই দুই অপূর্ব্ব প্রেমিক পরস্পর পরস্পরকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন, তাহা আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের এই পুণ্যময়ী স্মৃতির নিত্য উদ্বোধন করিতেছে।

"হরি"

(শ্রীশৌরেন্দ্রনাথ দে।)

হরি! তোমারি চরণ প্রফুল্ল কুসুম,
তোমারি চরণ মধুর বিভাত,
তোমারি চরণ জ্যোৎস্না যামিনী,
তোমারি চরণ পরাণ মোর!

তোমারি চরণ নয়নের তারা,
তোমারি চরণ প্রেমের মূর্চ্ছনা,
তোমারি চরণ অধরের হাসি,
তোমারি চরণ স্নেহের ডোর!!

তোমারি চরণ অশোক মাধুরী,
তোমারি চরণ বসন্ত সমীর,
তোমারি চরণ পাপিয়ারি তান,
তোমারি চরণ জীবের লক্ষ্য !
হরি !
তোমারি চরণ আশ্রয় তরণী,
তোমারি চরণ জীবন মরণ,
তোমারি চরণ পরলোকে গতি,
তোমারি চরণ আমার মোক্ষ !!
তোমারি চরণে হরি !
এইটুকু মিনতি করি,
তব পদে দিও স্থান অন্তিম সময়ে।
জীবনের সন্ধ্যাবেলা,
চলিবে না আর খেলা,
ডাকিতেছে মৃত্যু ও'ই শিয়রে আসিয়ে ॥
যৌবন-জোয়ারে বিভু !
ভাবি নাই আমি কভু,
ডুবিতে হইবে মোরে অসীম আঁধারে।
কেটে গেছে দিন মোর,
নেশাতে হইয়ে ভোর,
"আমার" "আমার" করি' ভব-কারাগারে ॥
আমার "আমিত্ব" এবে,
কোথা প্রভু ! পড়ে রবে,
আপনার জন যারা মুখে নুড়ো দেবে।
বেড়াইয়ে পথে বাঁকা,
জমাইনু কত টাকা,
মুখাগ্নি করিয়ে তারা সব কেড়ে নেবে ॥
ধরায় আসিনু একা,
চলে যাব পুন একা,
কোন্ দ্রব্য বল হরি ! সঙ্গে যাবে মোর ?
কামিনী-কাঞ্চনে মাতি',
কাটানু দিবস রাতি,
দূর্ ক'রে দেবে তারা ছিঁড়ে স্নেহ-ডোর ॥
তুমি গো ! একাই সাথী,
তুমিই আমার গতি,
তোমার চরণ মোর আশ্রয় তরণী।
বুঝিয়াছি এবে হরি !
জগতে সবাই অরি,
কিছুই যাবে না সঙ্গে, যাবে "হরিধ্বনি" ॥
রাতুল চরণে হরি,
পুন এ মিনতি করি,
অধম সন্তানে তুমি রাখিও চরণে।
যে ক'দিন বেঁচে থাকি,
যেন গো ! তোমায় ডাকি,
তুমি বিনা মুক্তি কোথা জীবনে মরণে !!

বৃন্দাবনচন্দ্র।

(শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন।)

'বৃন্দাবন' ও 'চন্দ্র' এই দুইটি শব্দ একত্র হইয়া 'বৃন্দাবনচন্দ্র' হইয়াছে। এস্থলে কে কাহার পোষক বা উদ্বোধক অথবা ঔজ্জ্বল্যের বিবর্দ্ধক? 'রমেশ' 'উমেশ' 'মহেশ' 'সুরেশ' 'দেবেশ' 'গণেশ' 'কার্ত্তিক' প্রভৃতিতে 'চন্দ্র' যুক্ত হইয়া 'রমেশচন্দ্র'—ইত্যাদি যুক্তশব্দও হইয়া থাকে। এ সকল স্থলে যে শুধু শ্রুতি-মধুরতা আছে তাহা নয়, ইহা দ্বন্দ্বভাবে একাকরণের আদর্শ—পরস্পর সৌন্দর্য্যের দ্যোতক, গৌরবেরও প্রতিপাদক। তবে আধ্যাত্মিক ভাবে ধরিতে গেলে রমেশ প্রভৃতি শব্দসকল নিজেই সৌন্দর্য্য বা গৌরবের খনি। তবে মানুষ যখন ঐ সকলের প্রত্যেকে 'চন্দ্র' (বা অপর কোন শব্দ) শব্দ যোগ করে, তখন সে অর্থেই হউক, মানবীয় চক্ষে তাহা দেখিবারই বা ধরিবারই কথা! উমা+ঈশ=উমেশ= শিব, তিনি ত্রিগুণাতীত, তাঁহার সৌন্দর্য্য কি? তবে তাহাতে 'চন্দ্র' শব্দ যোগে 'উমেশচন্দ্র' বা 'শিবচন্দ্র' শব্দে, মহৎ স্থানে চন্দ্রের অবস্থিতি হেতু 'চন্দ্র'ও উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর। আর উমেশ বা শিব মহৎ হইতেও মহত্তর হইয়াও ত্রিগুণাতীত বা সৃষ্টির বাহিরের জিনিস হইয়াও নিজে নিজেকে হারাইয়াও, 'চন্দ্র'কে নিজ-গাত্রে স্থান দিয়া সকলের আশ্রয়রূপে বিশ্ব দৃষ্টির বিষয়ীভূত—হিন্দুর পবিত্রময় জীবনের প্রতিফলন। সনাতন-ভাবসম্পন্ন ঋষি বা মনীষীবর্গের আদর্শ, জীবনের চাকচিক্য স্বতঃপরতঃ এইরূপভাবেই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইলেও অণু হইতে অণুপ্রমাণ মহৎ হইতে মহত্তরের সহিত ঘনসন্নিবিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। তাই হিন্দু এখনও কি বিধি-ব্যবস্থায়—কি আচার-ব্যবহারে—কি নীতি বা যুক্তি-বিজ্ঞানে চক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করিয়া আছে। তাই হিন্দুর কি পবিত্রময় বেদ, উপনিষদ্, শাস্ত্র, কাব্য প্রভৃতি, কি

গণিত বা জ্যোতিষ-তত্ত্বের সুগভীর ভাব-সমুদয় অভ্রান্তভাবে পৃথিবীর সুসভ্য জাতি-সকলকে ও কৃতবিদ্য লোক সকলকেও চমকিত করিয়াছে ও করিতেছে। তাই হিন্দুর 'সোঽহং তত্ত্ব'—'ভক্তি অর্ঘ্য'—প্রেম-সম্পত্তি আজিও রসাতল হইতে আকাশ ভেদ করিয়া মণ্ডলাকারে অবিরাম-গতিতে কোথায় কোন্‌দিকে ছুটিতেছে। ষড়ঙ্গবেদ, উপনিষদ, ষড়্‌দর্শন, পুরাণ, উপপুরাণ কতদিকে জ্ঞান, কর্ম্ম, ধর্ম্ম প্রভৃতিকে তড়িচ্ছক্তি ন্যায় ছুটাইতেছে। কত জাতিতে কত মহাপুরুষ জন্মিলেন, দেখিলেন—ধরিবার জন্য ছুটিলেন,—আবার চলিয়াও গেলেন। সব বৃথা,—তাঁহাদের গতির সহিত সব মিশিয়া গেল। কিন্তু এ শাস্ত্রীয় শক্তি পূর্ণ সিন্ধুর ন্যায় যাদোরত্ন বক্ষে লইয়া শান্তাশান্ত ভাবে রহিয়াছে। তাই এ সম্পত্তি হিন্দুর এক-চেটিয়া—প্রীতির উপকরণ সহ ভাবের মহা নৈবেদ্য। হিন্দু নিজে ইহার সম্মুখে প্রকৃতি-পুরুষ পূজার যাজক বা সাধক:

এ নিয়মে বৃন্দাবনে চন্দ্র মিশিয়াছে কি? ইহাতে প্রথমতঃ বৃন্দাবনের ঔজ্জ্বল্যের বৃদ্ধি—ভাব সমুচ্চয়ের একীকরণ! দ্বিতীয়তঃ বিস্তীর্ণ শান্ত বনভূমির উপর শিশিরসিক্ত দূর্ব্বাদলের উপর চন্দ্রের সূত্রে গাঁথা হিসাবে নৈসর্গের পূর্ণ প্রসাদন।

হিমাদ্রির তুঙ্গ শৃঙ্গে উঠিয়া জলে, স্থলে ও শূন্যে প্রকৃতির রঙ্গলীলা সন্দর্শন করিলে, কি এক ভাব-হিল্লোল, কি এক নবীন ধারায় মনোনয়নকে যুগপৎ নাচাইয়া থাকে, সে ভাব সে ধারা স্বর্গীয় হইলেও—উন্মাদক হইলেও—অবসাদক হইলেও—মনকে গলাইলেও সকল প্রকার পূর্ণত্ব সাধনে অসমর্থ থাকেই। কেননা সেই প্রকৃতি জল, স্থল ও শূন্যের লীলা বা ভাববৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকিলেও চিরকালই যেন আরও মহত্তর-বৈচিত্র্যের স্পৃহায় আত্মহারা! ভাবে বিগলিত!! প্রেমে উন্মত্ত!!! সেই বৈচিত্র্যময় সম্পজ্জা, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর—সূক্ষ্মতম অণুপ্রমাণ। আবার স্থূল হইতে স্থূলতর—স্থূলতম, বিরাট, বিশ্বগর্ভ, মহানুভাব, প্রকৃতির এই স্থূল মিলনে নাই! ফুল্ল-পদ্মস্থ মধু অলি পান করিলেও তাহা স্থূলতঃ,

—বায়ু যে মধুকণিকা স্পর্শ করে—অলির তাহাতে অধিকার নাই। সেইজন্যই বলি 'বৃন্দাবনে'ই 'চন্দ্র' মিশুক, বা 'চন্দ্রে' 'বৃন্দাবন' মিশুক—'বৃন্দাবন'কে বিস্তীর্ণ 'বন', আর 'চন্দ্র'কে আকাশের 'চন্দ্র',—ইহা ধরিলে স্থূলতঃ মন পূর্ণভাবে গলিবে না—ছাঁকিলে শেষে 'খচা' দেখা যাইবেই। পূর্ণভাবে মনকে গলাইতে হইলে, শুধু চাউল-কলা দিয়া নৈবেদ্য বা পুষ্পগুচ্ছ 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া দিলে চলিবে না, নৈবেদ্য ও পুষ্পে রতি-ভক্তি মাখাইয়া প্রেমের অর্ঘ্যের সহিত 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া দিলে তবে মন গলিবে। তাই নারায়ণের পদ দ্রব হইয়া গঙ্গার উৎপত্তি। ইহাকেই বলে প্রেমের সৃষ্টি। সাধনার কুটিল ও দুর্গম পথ হইলেও, সাধকের প্রাণভরা আহ্বানে, নয়নভরা অশ্রুতে সরল ও সুগম! 'বৃন্দাবনে'র সঙ্গে 'চন্দ্রের' সমাবেশে ঠিক এইরূপ এক ভাবের অভিব্যক্তি আছে। তাই 'বৃন্দাবনচন্দ্র' অতি উপাদেয়, মুখভরা ও চোকভরা নাম! 'পুরুষোত্তম' বলিলে যেমন ত্রিগুণের পূর্ণ মূর্ত্তি• জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার লীলা-মাহাত্ম্য শ্রীক্ষেত্র-তত্ত্ব বা ঐ মূর্ত্তিত্রয়ের একীকরণ, কাশীশ্বর বা অন্নপূর্ণা বলিলে গঙ্গা ও বরুণাসি বেষ্টিত সাধুসেবিত কাশীক্ষেত্র বা শিবদুর্গার নাম-মাহাত্ম্য বুঝায়, সেইরূপ 'বৃন্দাবনচন্দ্র' বলিলে,—মহাতীর্থ বৃন্দাবন ও গোলকচন্দ্র কৃষ্ণের ধরায় জন্ম ও বাল্যলীলা রহস্যের একীকরণ এবং বৃন্দাবন-আকাশের 'চন্দ্র' স্বরূপ সর্ব্বময় 'শ্রীকৃষ্ণ' এই মহান্ অর্থ সূচিত করে। ইহা আমার কথা নয়—পুরাণবক্তা দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মুখ-কমলের অবিকৃত সুধা।

জানিনা কোন্ অর্থে আমার নাম 'বৃন্দাবনচন্দ্র' হইয়াছে। শুনিয়াছি আমি যখন জন্মগ্রহণ করি, তখন পুণ্যবতী পিতৃস্বসা নাকি মহাতীর্থ বৃন্দাবনে 'বৃন্দাবনচন্দ্র'কে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বাটী আসিয়া, ভুবন খুঁজিয়া, আর কোন নাম না পাইয়া, স্বহৃদয়ের ভাবের প্রতিফলন স্বরূপ এই নাম রাখিয়াছিলেন। মা বাপও ও নামের ভিতরে কি রস পাইয়াছিলেন,—কি সত্ত্বগুণে অনুরঞ্জিত দেখিয়া ভুলিয়া-

ছিলেন জানিনা,—তাঁহারাও বৃন্দাবনে মজিয়া গিয়া, ঐ নামকেই প্রীতির আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেই অবধি আমি বৃন্দাবন। তবে 'বৃন্দাবন' কি 'বৃন্দাবনচন্দ্র'—সেটা বেশ বুঝতে পারি না—ভাবিলে হিজি বিজি আসিয়া পড়ে।

আদর আব্দারে ক্রমে কি পরিবার—কি প্রতিবেশী—কি বাল্যসহচর—সকলের মুখে এই 'বৃন্দাবনচন্দ্র', 'বৃন্দাবন' 'বিনু', 'বিনে, 'বিন্দে', বেন্দা প্রভৃতি আখ্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠেন। যাক্ সে সকল কথা, এখন আসল কথা 'বৃন্দাবন' আগে কি 'চন্দ্র' আগে? আমার বিশ্বাস একেই দুই—দুয়েই এক!

পুরাণের কথায় দেখা যায়, বৃন্দাবন গোলকচন্দ্র কৃষ্ণের গোলকস্থ নিত্য 'বিহার স্থল'।* তথায় বিহার করেন—তাই তিনি স্বয়ং বৃন্দাবনচন্দ্র; তবেই হইল বৃন্দাবনও কৃষ্ণেরই আগে নয়—বৃন্দাবনচন্দ্রও আগে নয়। বৃন্দাবন—বৃন্দাবনই কৃষ্ণের। পরস্পর আধার আধেয় সম্বন্ধ! সুতরাং বৃন্দাবনের সমস্ত নিত্য ও শাশ্বত লীলা বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণের মনোগত ইচ্ছা; কাজেই পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও সূত্রমৌক্তিক ভাবে গ্রথিত। সূত্র ছিঁড়িলে মুক্তা ঝরিয়া পড়ে—আবার মুক্তা ঝরিলে মালা শ্লথ হয় ও সূত্রের স্থানবিশেষে শূন্য হইয়া পড়ে। গোলকের এই নিত্য বৃন্দাবন-লীলা ভূলোকে আনিয়া নিজ লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশ ও বংশীস্বরে ভক্ত-মণ্ডলীকে আকর্ষণই এ বৃন্দাবন-লীলার উদ্দেশ্য। সেই জন্যই 'বৃন্দাবন' ও 'বৃন্দাবনচন্দ্র'—কি বাহ্য, কি অন্তর, সকল দৃশ্যেই—সকল অবস্থাতেই সকল উপাসকদিগেরই প্রীতিপ্রদ ও প্রেমাস্পদ। তা' বলিয়া সে বৃন্দাবন বা বৃন্দাবনচন্দ্র আমি নই।

বৃন্দাবনের স্থূল দৃশ্যে বোধ হয় যে, সুবিস্তৃত বনের মধ্যে লোকসকল বাস করায় ক্রমে উহা নগর হইয়াছে এবং 'রাধা কৃষ্ণের' লীলা বর্ণন; প্রভৃতিতে ক্রমে তীর্থ আখ্যা পাইয়াছে। এ ভাবে ভাবিলে 'বৃন্দাবন' ত কিছুই নয়। ইহার এত বড় কাণ্ডে মৌলিক ভাব কই? কৃত্রিমতা ধরিলে সবই শূন্যগর্ভ, জীবন্ত

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ দ্রষ্টব্য।

মানবও মৃত হয়। 'বৃন্দাবন' বা 'বৃন্দাবনচন্দ্র' মৌলিক-তত্ত্বে অভিরঞ্জিত হইলেই প্রকৃত সাত্ত্বিক ভাবে প্রদ্যোতিত হয়,—সাধকের, ভক্তের মনে প্রতিফলিত হয়। সেই প্রতিফলন-রশ্মি অপরে ধরিয়া নিজের ও পরের হৃদয় উদ্ভাসিত করে—তপ্ত সংসারে শান্তি পায়। বৃন্দাবন সেই শান্তিকুঞ্জ,—বৃন্দাবনচন্দ্র সেই কুঞ্জের নিত্য আলোকময়ী পবিত্রতা। এখন বুঝিলে আমার নামের আকাশ পাতাল চেহারা।

যদুপুঙ্গব বসুদেব মথুরাপতি কংসের ভয়ে সদ্যোজাত পুত্র কৃষ্ণকে যমুনার পরপারে সাধারণের অজ্ঞাতসারে নন্দগৃহে রাখিয়া আসেন। ইহার পূর্ব্বে বসুদেব দ্বিতীয়া স্ত্রী রোহিণীকে গর্ভাবস্থায় নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে এক পুত্র প্রসব করেন, তাঁহার নাম রাম। বলাধিক্যবশতঃ তিনি 'বলরাম' বলিয়া বিখ্যাত।

বলরামের সহিত কৃষ্ণের মিলন এবং ক্রমে ব্রজবালকদিগের সহিত তাঁহাদের সম্মিলন ও গোচারণ প্রভৃতি লীলাসকল শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা নামে অভিহিত।

ক্রমে কংস, বসুদেবের গুপ্তকার্য্যসকল জানিতে পারিয়া হিংসাপরবশচিত্তে কৃষ্ণ-বলরামের ঘোর আততায়ী হইয়া উঠেন এবং বসুদেব ও দৈবকীকে কারাগারে আবদ্ধ করেন। কংসের এই শত্রুতা ক্রমে ব্রজপুরী আক্রমণ করে কিন্তু কৃষ্ণ-বলরামের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে সে সকল আক্রমণ ব্যর্থ হয়। ক্রমে ব্রজবাসিগণ কংসের উৎপীড়নে ব্রজ ত্যাগ করিয়া নিকটস্থ এক গভীর বনে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, কৃষ্ণই তাহার প্রধান উদ্যোগী। কারণ সেই বন নিত্য নবজাত তৃণ-সম্ভারে পরিপূর্ণ থাকায়, গোপজাতির প্রধান সহায় গোধনের কোনরূপ কষ্ট হইবে না এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতমালা নিকটস্থ বলিয়া স্থানটিও অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর। এ স্থান কংস-রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হইলেও শত্রুতা বা আক্রমণ হইতে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও রক্ষা হইতে পারে; কারণ, 'আমার ভয়ে দেশত্যাগ করিয়াছে' ইহা ভাবিয়াও যদি কংস একটু সাম্যভাব ধারণ করে। কিন্তু

ভিতরের তথ্য বড়ই দুর্ব্বোধ্য—স্থান-বিশেষে অবোধ্য। ইহাই গোলকে নিত্য বৃন্দাবনের বিকাশ। সেই বিকাশের সেই অন্ধকারময় নিভৃত গুহার আলোকস্তম্ভের কর্ত্তা 'বৃন্দাবনচন্দ্র' কৃষ্ণ।

ক্রমশঃ

শিল্প কলা।

(শ্রীঅরুণরঞ্জন প্রামাণিক।)

আমরা এই বিশ্বভুবনের একেবারে মুখোমুখী হয়ে আছি। এর সহিত আমাদের সম্বন্ধও বিচিত্র রকমের। তার মধ্যে আমাদের জীবন ধারণের দায় একটী। এর তরে আমাদের ভূমি চষ্‌তে হয়—খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়—যন্ত্র তৈরি কর্‌তে হয়। অভাব পূরণ করবার তরে আমরা নিয়তই কতরকমের সামগ্রী নির্ম্মাণ করছি। এই উপলক্ষ্যে আমাদের প্রকৃতির সংস্পর্শে আস্‌তে হয়; অর্থাৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং আমাদের অপরাপর অভাবের তাড়নাতেই আমরা প্রকৃতির পরিচয় পাই।

তারপর আমাদের চিত্ত আছে। এরও খোরাক চাই; সুতরাং এরও অভাব আছে। একে বস্তুর মধ্যে থেকে নিমিত্তের আবিষ্কার করতে হয়। বিচিত্র তথ্যের মধ্য থেকে এ যতক্ষণ না একটী সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারে ততক্ষণ এ বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে। মানুষের চিত্ত শুধু তথ্য লাভ করেই ক্ষান্ত হয় না—সে তার সংগৃহীত তথ্যের সংখ্যা এবং পরিমাণ-ঘটিত ভার লাঘব করবার তরেই তাদের মধ্যে একটা নিয়মের সন্ধান করে।

আমাদের মধ্যে আর একটী সত্তা আছে—এটা আমাদের দেহের অন্তরতর পুরুষ। এরও রুচি ও অরুচি আছে। এও এর প্রেমের অভাব পূরণ করতে সচেষ্ট হয়। আমরা যেখানে মানসিক এবং শারীরিক সকলবিধ দায় থেকেই মুক্ত,

সেই প্রয়োজন এবং স্থবিধার অতীত ক্ষেত্রেই এর আসন। মানুষের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠতম অংশ। বিশ্বের সহিত এর ব্যক্তিত্বের নিজস্ব সম্বন্ধ আছে—এর ব্যক্তিত্বকে সার্থক করবার তরেই এ বিশ্বের সংস্পর্শে আসে।

বিজ্ঞান জগত সত্যের জগত নয়—সে শক্তির লীলা নিকেতন এবং ব্যক্তি-বিবর্জ্জিত। আমরা বুদ্ধির যোগে বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে পারি কিন্তু ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে তাকে উপলব্ধি করিতে পারি না। মাঞ্চেষ্টারের তাঁতিরা যদিও আমাদের তরেই বস্ত্র তৈয়ার করে তথাপি তারা যেমন আমাদের পক্ষে ছায়ামাত্র এও ঠিক তেমনি।

আর একটী জগত আছে যা আমাদের পক্ষে একান্তই সত্য। আমরা তাকে দেখি এবং অনুভব করি। তার সঙ্গে আমরা প্রাণের আবেগ নিয়েই ব্যবহার করি। তার রহস্য অনন্ত কেননা আমরা তাকে বিশ্লেষণ কিম্বা পরিমাপ করতে পারি না। সে আছে এইটেই আমরা শুধু জানি।

এই জগৎ থেকে বিজ্ঞান ফিরে আসে—সে এর নাগাল পায় না। ইহাই শিল্প কলার লীলাভূমি। শিল্পকলার স্বরূপ যতক্ষণ না আমরা হৃদয়ঙ্গম করব ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এই জগতটির পরিচয় পাব না।

অবশ্য শিল্পকলার স্বরূপ না জানলে আমাদের যে বিশেষ কিছু এসে যাবে তা' নয়; কেননা শিল্পকলা জীবনের মত নিজের আবেগেই গঠিত হয়ে উঠে এবং মানুষও তার পরিচয় না জেনেই তাতে খুসি হয়। আমাদের চেতনার যে অন্তঃস্তরে প্রাণের সামগ্রী সকল নিজে নিজে অন্ধকারের মধ্যে নিভৃতে গোপনে সৃষ্ট ও পুষ্ট হচ্ছে আমরা এই শিল্পকলাকেও সেই খানে ছেড়ে রেখে অনায়াসেই নিশ্চিন্ত হতে পারি।

কিন্তু আমরা এমন সময়ের মানুষ যে সময় পৃথিবীর অন্তরকে বের করে আনা হচ্ছে এবং তলার জিনিষকে উপরে তোলা হচ্ছে। আজকাল আমাদের প্রাণের

ব্যাপারকেও জ্ঞানের আলোকে পরীক্ষা করতে হয়—এমন কি যদি জানার দ্বারায় আমাদের সন্ধানের বিষয়টি নষ্টও হয়ে যায় তাহলেও আদর্শের যাদুঘর পূর্ণ কর্‌বার তরে আমাদের জান্‌তেই হবে।

"শিল্পকলা কি" এ প্রশ্নের উত্তর নানা জনে নানাভাবে দিয়েছেন। যে ক্ষেত্রে আমাদের সৃষ্টি এবং সম্ভোগ উভয়ই স্বাভাবিক এবং অর্দ্ধ-সচেতন এরূপ আলোচনার দ্বারায় সেখানে সজ্ঞান উদ্দেশ্যের সঞ্চার করা হয়। শিল্প সৃষ্টিকে বিচার কর্‌বার উপযোগী আদর্শের উদ্ভাবন করাই এরূপ আলোচনার লক্ষ্য। বর্ত্তমান যুগে যারা শিল্পের বিচারক তারা তাদের নিজের কল্পিত আদর্শ অনুসারে শিল্পের সম্বন্ধে এমন সব রায় প্রকাশ করেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয়। যে সব শিল্প-কলা যুগ-যুগান্তর ধরে বিশ্বের শ্রদ্ধা পেয়ে আস্‌ছে তারা তাদের সেই অমৃতলোক থেকে নির্ব্বাসন দেবার ব্যবস্থা কর্‌তে দ্বিধা করেন না।

শিল্প সমালোচনার মধ্যে এই যে দুর্য্যোগ দেখা যাচ্ছে এর আরম্ভ পশ্চিমে; কিন্তু এ আজ সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে বাঙ্গলায় এসে উত্তীর্ণ হয়েছে—যেখানে পরিষ্কার আকাশ ছিল্ সেখানে ধূলি এবং কোয়াশার সঞ্চার করে সব আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। কি ভাবে যে শিল্পের বিচার করতে হবে সে সম্বন্ধে আমরা অনেকে মনে মনে অনেক জল্পনা কল্পনা করছি। কেহ বল্‌ছেন, সকলের বোধগম্য হওয়ার মধ্যেই শিল্পের শ্রেষ্ঠতা। কেহ বল্‌ছেন শিল্প সৃষ্টি থেকে আমরা যে পরিমাণে আমাদের জীবনের সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে পারি সেই পরিমাণেই সে শ্রেষ্ঠ। কেহ বা বল্‌ছেন সাময়িক সমস্যার সমাধান কর্‌বার পক্ষে যে শিল্প যত যোগ্য তার মূল্যও তত বেশী। কেহ বল্‌ছেন শিল্পীর অন্তরের ভাবকে যে পরিমাণে সে ব্যক্ত করতে পারে সে পরিমাণেই সে মূল্যবান। শিল্পের যা স্বভাব নয় মানুষ যখন তা দিয়েই তার বিচারের আদর্শ স্থির করতে উদ্যত হয়েছে কিম্বা নদীকে যখন কাটা খালের আদর্শে বিচার কর্‌বার প্রস্তাব চলেছে তখন এ

বিষয়টীকে এর অদৃষ্টের হাতে অর্পণ করে সরে দাঁড়ালে চলবে না—এর আলোচনায় আমাদের যোগ দিতেই হবে।

এখন কি আমরা সংজ্ঞা থেকে আরম্ভ করব? কিন্তু স্পষ্ট করে দেখ্‌বার তরে নিজের দৃষ্টি-শক্তিকে সঙ্কীর্ণ করা যেমন অন্যায়প্রয়াস, সজীববস্তুকে সংজ্ঞার দ্বারা বদ্ধ করাও ঠিক তেমনি। প্রাঞ্জলতাই সত্যের একমাত্র স্বরূপ নয়। Bull's Eye লণ্ঠন দিয়ে আমরা যেটুকু দেখি, তা' স্পষ্টভাবেই দেখ্‌তে পাই কিন্তু সে দেখা ত সম্পূর্ণ দেখা হয় না। চলনশীল চাকাকে জানতে হলে তার যে সমস্ত অর (spokes) গুণ্‌তে হবে, এমন কোনও মানে নেই। যখন শুধু আকার নয়, তার গতির হারের সম্বন্ধেও জান্‌বার প্রয়োজন হয় তখন চাকার অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা নিয়েই সন্তুষ্ট হতে হয়। সজীব বস্তু মাত্রেরই তার চতুর্দ্দিকের সঙ্গে একটী সুদূর বিস্তৃত সম্পর্ক আছে। তার মধ্যে কতকগুলি অদৃশ্য এবং অন্তর্নিহিত। সংজ্ঞার প্রলোভনে আমরা গাছের ডাল-পালা ছেটে কেটে তাকে কুঁদায় পরিণত করে সহজেই তাকে এক শ্রেণী থেকে আর একশ্রেণীতে গড়িয়ে নিয়ে যাবার উপযোগী করে পাঠ্য পুস্তকের যোগ্য করে তুল্‌তে পারি। কিন্তু কুদাটা খুব সাদা সিদে ডাল পালা বিবর্জ্জিত নগ্ন বলেই তা থেকে সমগ্র গাছের লক্ষণ পাওয়া যায় না।

অতএব আমি শিল্পের সংজ্ঞা রচনা করবার ব্যর্থ প্রয়াস করব না। এ যা থেকে উৎপন্ন আমি সেই নিমিত্তেরই আলোচনা কর্‌ব। এর মূলে কোনও সামাজিক উদ্দেশ্য আছে কি না অথবা এ শুধু আমাদের চিত্তবিনোদনের তরেই উদ্ভূত কিনা কিম্বা শুধু প্রকাশের আবেগ থেকেই এর উৎপত্তি কি না—আমি তাহাই দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।

"শিল্পকলাই শিল্পকলার উদ্দেশ্য" এই কথাটা নিয়ে অনেক দিন থেকেই বাক্‌বিতণ্ডা চলেছে। পশ্চিমের একদল সমালোচকেরা একে একাবারেই অশ্রদ্ধা কর্‌তে সুরু করেছেন। যে Puritanic

যুগে সম্ভোগ মাত্রকেই পাপ বলে বিবেচনা করা হত এ সেই যুগের বৈরাগ্যের আদর্শের পুনরাবির্ভাবেরই লক্ষণ। কিন্তু Puritanism মাত্রেই এক প্রকারের প্রতিক্রিয়া। এ সত্যকে তার সহজ অবস্থায় উপস্থিত করে না। সম্ভোগ যখন জীবনের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সে যখন নিজেকে স্বতন্ত্র-রচিত প্রথার মধ্যে উৎকট করে তুলে তখনই ত্যাগের আহ্বান আসে—সে আহ্বান সুখকে মায়াজাল বলে বর্জ্জন করবার ত্যাগীদের। আমি বর্ত্তমান শিল্পকলার ইতিহাস আলোচনা করতে চাচ্ছি না—সে যোগ্যতাও আমার নাই। তাহলেও যখন আমরা আমাদের অন্তরের সুখেচ্ছাকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করি—এবং যখন তাকে কেবলি জ্ঞান এবং কল্যাণের মধ্যেই নির্দিষ্ট করতে থাকি তখন আমাদের সুখ অনুভব করবার শক্তি যে তার স্বাভাবিক সৌষ্ঠব এবং স্বাস্থ্য হারিয়েছে একথা স্বীকার করতেই হবে।

প্রাচীন ভারতের আলঙ্কারিকেরা সম্ভোগকেই সাহিত্যের আত্মা বলে স্থির করতে ইতস্তত করেন নি। অবশ্য সে সম্ভোগ স্বার্থ-বিহীন! এই "সম্ভোগ" কথাটাকে প্রয়োগ করবার সময় একটুক সতর্কতার প্রয়োজন আছে। একে বিশ্লেষণ করলে এর বর্ণচ্ছত্রে বিচিত্র বর্ণের রশ্মিরেখা দৃষ্ট হয়। শিল্প জগতের উপাদান সমূহ শিল্প জগতের একান্ত নিজস্ব জিনিষ। তারা যে রশ্মি বিকীরণ করে তাদের বিশেষ বিশেষ সীমা এবং গুণ আছে। তাদের পৃথক করে তাদের মূল নির্ণয় করাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মানুষের সহিত পশুদের প্রধান প্রভেদ এই যে পশুরা তাদের অভাবের সীমার মধ্যেই বদ্ধ—আত্মরক্ষা এবং স্বজাতি রক্ষার করেই এদের অধিকাংশ চেষ্টা নিযুক্ত থাকে। খুচরা দোকানদারের মত এদের জীবন ব্যাপারে বড় রকমের লাভের প্রত্যাশা নেই। এদের যা আয় তার প্রায় সবটাই মহাজনের দেনা পরিশোধ করতে নিঃশেষ হয়। শুধু প্রাণ ধারণের তরেই এদের পুঁজি পাঁড়ি ব্যয় হ'য়ে যায়। কিন্তু মানুষ এই জীবন ব্যাপারে বড় মহাজনের মত। তার খরচের চেয়ে তার রোজগার ঢের বেশী। এই কারণেই মানুষের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অনেকটা উদ্বৃত্ত ভাগ থাকে—এই থেকে সে বাজেখরচ করবার স্বাধীনতা লাভ করে। তার প্রয়োজনের চারদিকে এই যে উদ্বৃত্ত স্থান থাকে এইখানেই সে এমন সব জিনিসের আবাদ করে যাতে তার কোনই প্রয়োজন নাই।

প্রয়োজনের তাগিদেই পশুদের জ্ঞানের দরকার হয়। কিন্তু সেই খানেই তাদের থামতে হয়। খাবার সংগ্রহ করতে এবং বাসার জায়গা স্থির করবার তরে তাদের চতুর্দ্দিকের সম্বন্ধে অনেক খবর জানতে হয়—বাসা নির্ম্মাণের তরে তাদের কোনও কোনও বস্তুর গুণেরও পরিচয় নিতে হয়। মানুষকেও প্রয়োজনের তাগিদে এমন অনেক জিনিসই জানতে হয়। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের একটা অতিরিক্ত অংশ আছে—সেসব জ্ঞান যে প্রয়োজনের অতীত এ কথা সে জোর করেই বলতে পারে। জ্ঞানই সেই সব জ্ঞানের লক্ষ্য। এইখানে জ্ঞান দায়মুক্ত বলে সে জ্ঞানকে যথার্থ ভাবে এই খানেই উপভোগ করতে পারে। এই জ্ঞানের উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের উপরেই তার দর্শন বিজ্ঞান জন্ম-লাভ করে।

পশুদের মধ্যে পরার্থপরতারও কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ বাপ-মার পরার্থ-পরতার মধ্যেই আবদ্ধ। বংশরক্ষার তরে এর একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই পরার্থপরতার ভাব খুব বেশী পরিমাণে দেখা যায়। যদিও জাতি রক্ষার তরেও তাকে পরার্থপর হতে হয় কিন্তু সে এখানেই থামে না। তার এই মঙ্গল-সাধনা মুষ্টি ভিক্ষার মত দিনগত অভাব মোচনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয় না। মঙ্গলই যে মঙ্গলের উদ্দেশ্য একথা সে অনায়াসেই বলতে পারে। মঙ্গলের এই ঐশ্বর্য্যের উপরেই তার নীতিশাস্ত্র গঠিত হয়। সততাকে উত্তম policy বলে সে গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয় না—সে সততাকে অবলম্বন করে সকল policy কে অতিক্রম করতে পারে বলেই সে সৎ হয় অর্থাৎ সততাকে সে শ্রেয় বলেই বরণ করে প্রেয় বলে নয়।

"শিল্পই শিল্পের লক্ষ্য" এই কথাটার আদিতে এই প্রাচুর্য্য। আমাদের কোন্ কর্ম্মের প্রাচুর্য্য থেকে শিল্প সৃষ্টি প্রেরণা লাভ করে এখন তাহাই স্থির করবার চেষ্টা করে দেখা যাক্।

পশুদের মত মানুষকে অনেক সময় প্রয়োজনের খাতিরেই হর্ষ, বিষাদ, ভয়, ক্রোধ, স্নেহ ইত্যাদি মনোভাবকে প্রকাশ করতে হয়। পশুদের মধ্যে এই সব ভাবের প্রকাশ প্রয়োজনের সীমা লঙ্ঘন করে না। মানুষের এই সব ভাব যদিও আদিতে প্রয়োজন থেকেই উৎপন্ন হয় তথাপি এরা তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে না—এরা অনন্তের মধ্যে শাখা প্রশাখায় নিজেদের বিস্তীর্ণ করে দেয়। মানুষের এই সব মনোভাবের সঞ্চয় আত্মরক্ষার মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। প্রয়োজন

সাধনের পরও তার অনেক উদ্বৃত্ত থাকে। এই সকল উদ্বৃত্ত অংশই শিল্প স্থষ্টির মধ্যে নিজেদের পরিস্ফুট করে তুলে এবং ইহাই সভ্যতার ভিত্তি।

যোদ্ধা শুধু যুদ্ধ করেই সন্তুষ্ট হয় না। এই প্রয়োজনটুকুর মধ্যেই সে তৃপ্তি-লাভ করতে পারে না। সে নানারূপ সঙ্গীত এবং বেশ ভূষার দ্বারা তার অন্তর্নিহিত যোদ্ধ, স্বভাবকে ব্যক্ত করতে থাকে—এসব আড়ম্বর যে শুধু নিষ্প্রয়োজন তা নয় এরা অনেক সময় ক্ষতিকর হয়ে উঠে। ধার্ম্মিক শুধু নিজের দেবতাকে ভক্তি ক'রে—পূজা ক'রেই তুষ্টি লাভ করে না—সে তার ধর্ম্মভাবকে প্রকাশ করবার তরে তার দেবতার মন্দিরটীকে সাজায় এবং তার পূজাকেও সমারোহের মধ্যে ধ্বনিত করে তুলে।

যখন কোনও একটা বিষয় আমাদের হৃদয়ে কোনও একটা ভাবাবেগের সঞ্চার করে অথচ তাঁকে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থাৎ করতে পারে না তখন সেই আবেগ আমাদের উপরেই. ফিরে আসে এবং তারই সেই ভাটার স্রোতে আমাদের ব্যক্তিত্বের ধারণা সজাগ হয়ে উঠে। যখন আমরা দরিদ্র থাকি তখন আমাদের সমস্ত মনোযোগই আমাদের বাহিরে থাকে—আমাদের অভাব পূরণের জন্য যে সব জিনিষের প্রয়োজন তখন আমরা তাদের নিয়েই ব্যাপৃত থাকি। কিন্তু যখন আমাদের ঐশ্বর্য্য আমাদের অভাবকে ছাড়িয়ে উঠে এখন তার আলোক আমাদের উপর প্রতিফলিত হয় এবং তখন আমরা নিজেদের ধনী বলে অনুভব করে আনন্দিত হই। (ক্রমশ)

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এ)

(১০)

কালীঘাটের দক্ষিণে সাহনগরে ইন্দুর শ্বশুরালয়। পিত্রালয় হইতে আসিয়াই সে জ্বরে পড়িল। কিন্তু সেকথা কাহাকেও বলিল না। বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিবে না ইন্দু ইহা বেশ জানিত। আর বলিয়াই বা ফল কি?

জ্বর হইয়াছে বলিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণী তো রেহাই দিলেন না।

আজ কয়েকদিন হইল বীরেনের কনিষ্ঠ ভগ্নী হেমলতা পিত্রালয়ে আসিয়াছে। সে আবার বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। সেও কিছু ইন্দুর জ্বর হইয়াছে বলিয়া ছাড়িয়া দিবে না। সে আরও দু'একবার পূর্ব্বে আসিয়া ইন্দুকে খুব ভাল করিয়াই জানাইয়া দিয়া গিয়াছিল যে, সে একজন উচ্চ শ্রেণীর ননদ, যে সে লোক নহে, বড় একটা 'কেউ কাড়া' লোক নহে—সে বীরেনের ভগ্নী, ইন্দুর ননদ।

যাহাতে ইন্দু একথা জীবনে কখন ভুলিতে না পারে সেই জন্য হেমলতা একবার রন্ধন করিতে করিতে রাগের মাথায় ইন্দুর পৃষ্ঠে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়াছিল সে দাগ এখনও ইন্দুর যায় নাই। ইন্দু, কিন্তু, সে কথা কাহাকেও বলে নাই। তবে একদিন ব্রজবালার নজরে পড়ায় বলিয়াছিল, "মাকড়সা চেটেছিল ব'লে ঘা হ'য়েছিল; ছাল উঠে এমনি দাগ হ'য়ে গ্যাছে।" ব্রজবালা তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিল।

পুত্রের অধঃপতনের কারণ যে একমাত্র তাঁহার পুত্রবধূ, এ ধারণা বীরেনের জননীর বদ্ধমূল হইয়াছিল। ছেলে যে তাঁহার একটু 'কেমন' 'কেমন' ইহা তিনি জানিতেন। তবে তাঁহার বিশ্বাস ছিল বিবাহ দিলেই সারিয়া যাইবে। ও বয়সে অমন একটু আধটু দোষ সকলেরই হইয়া থাকে।

কিন্তু বিবাহের পর পুত্রকে ক্রমশঃ অধঃপাতে যাইতে দেখিয়া তিনি ইহা নিশ্চয় স্থির করিলেন যে, তাঁহার পুত্রবধূ অপয়া, সেই তাঁহার পুত্রকে আরও অধঃপাতের পথে প্রশ্রয় দিতেছে। বৌ ভাল হইলে তাঁহার আদরের বীরেন কখন এত অধঃপাতে যাইতে পারিত না। তাঁহার পুত্রতো নেহাৎ খারাপ নহে। তবে বয়সের দোষে একটু যা বিগড়াইয়া গিয়াছে। বৌ যদি ঠিক মত তাহার কথা শুনিত, তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত তাহা হইলে তাঁহার পুত্র কখনই কুপথে যাইত না, যা তা খাইত না, যেখানে সেখানে রাত্র কাটাইত না।

এইরূপ মনের বিশ্বাস লইয়া কোন শাশুড়ী পুত্রবধূকে আদর যত্ন করিতে পারেন! কাজে কাজেই ইন্দু শাশুড়ির নিকটেও লাঞ্ছনা ভোগ করিত—কম নহে। আর হেমলতা—সে তো অগ্নিতে ইন্ধন দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

রাত্রে জ্বরের প্রকোপটা কিছু বেশী হওয়ায় ইন্দুর উঠিতে একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই যখন দেখিল চারিদিক বেশ

পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, জানালার ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি ঘরে আসিতেছে, ভয়ে ইন্দুর প্রাণ শুকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

পুত্রবধূকে দেখিয়া শাশুড়ি ঠাকুরাণী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রাজরাণীর মত এত বেলা ক'রে যে উঠলে বাছা এখন সংসারের কাজ করে কে? কালকের বাসন গুলো পড়ে আছে, সেগুলোকে মাজতে হবে, রান্নাঘর পরিষ্কার ক'রে উনুনে আগুণ দিতে হবে, গঙ্গা থেকে জল তুলে আনতে হবে—এসব কখন ক'রবে বাছা? ধীরেন আমার ন'টার সময় খেয়ে স্কুল যাবে, রান্নাই বা চড়াবে কখন?

ইন্দু কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘর পরিষ্কার করিতে গেল।

যথার্থইতো এত কাজ যখন তাহাকে করিতে হইবে তখন, এত বিলম্ব করিয়া উঠা তাহার কোন প্রকারেই ভালো হয় নাই। তাহার জ্বর হইয়াছে তো অপরের কি? এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে ইন্দু এদিক-কার সব কাজ সারিয়া বাসী বাসন লইয়া গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গেল।

স্নান করিয়া আসিয়া রান্না চাপাইয়া দিল। হেমলতা তখন শয্যাত্যাগ করিয়া সবে উঠিয়াছিল এবং শাশুড়ী ঠাকুরাণী স্নানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। শয্যায় শুইয়া শুইয়া মায়ের সব কথাই হেমলতা শুনিয়াছিল। ইন্দুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "উনি বোধ হয় মনে ক'রেছিলেন আমি ওঁর হয়ে কাজ করে দেব। আহা কি আমার সোহাগী রে!"

হেমলতার জননী গর্জিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুই-ই বা কেন করবি হেম্? দু'দিন এসেছিস্ এখানে জিরুতে। ও হারামজাদির তুই সাহায্য করবি কেন।"

হেমলতা বলিয়া উঠিল, "তাওতো আমি অনেক সাহায্য করি মা; এই ধরনা কেন ধীরেনের আর দাদার ঠাঁই ক'রে দেওয়া, শুকনো কাপড় গুলো তোলা এই সব।"

উত্তরে গৃহিনী বলিলেন, "তাইবা করবি কেন? ঐ শতেক খোয়ারী ছোট লোকের মেয়েই সব ক'রবে।"

মাতাপুত্রীতে স্নানার্থ গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে, মাষ্টারের বাড়ী হইতে পড়িয়া আসিয়া, ধীরেন, রান্নাঘরের নিকট যাইয়া ইন্দুকে বলিল, "রান্না হয়েছে বৌদি?"

"এই যে হ'ল ঠাকুরপো, ভাতটা নামিয়েই তোমার ঠাঁই ক'রে দিচ্ছি।"

শ্বশুরালয়ে ইন্দুর দুঃখ বুঝিত কেবল মাত্র তাহার এই ছোট দেবরটী। বৌদি'র উপর যে একটা অনর্থক অত্যাচার হইত ইহা ধীরেন বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিত। কিন্তু সে কি করিবে? মাতা এবং ভগ্নী তো বৌদি'কে কষ্ট দেনই, উপরন্তু বড়দা'ও যে লাঞ্ছনা করিতে ছাড়েন না। অন্ততঃ তিনিও যদি বৌদি'র দুঃখ বুঝিতেন তাহা হইলেও ভরসা থাকিত। তিনি নিজেই যে বৌদি'কে যথেষ্ট কষ্ট দেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমি কি করিব?

ধীরেন এই সব ভাবিত এবং বৌদি'র উপর অত্যাচার গুলি নীরবে শুধু দেখিয়া যাইত।

ইন্দুর শুষ্ক মুখ দেখিয়া ধীরেন বলিল, "তোমার কি অসুখ ক'রেছে বৌদি? মুখটা অত শুক্‌নো শুক্‌নো কেন?

ইন্দু ভাবিল সে যদি বলে অসুখ করিয়াছে তাহা হইলে ধীরেন এখনি একটা তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিবে। ইন্দুর পক্ষ হইয়া জননী এবং ভগ্নীর সহিত ঝগড়া করিবে। সুতরাং নিজের অসুখের কথা গোপন রাখিয়া বলিল, "না ঠাকুরপো অসুখ করেনি তো। আমি বেশ ভালই আছি। আজ উঠতে একটু দেরী হ'য়ে গেছে ব'লে রান্নার বিলম্ব হ'য়ে গেল। কিছু মনে করো না ভাই।"

দশটা বাজিয়া গিয়াছে জানা সত্ত্বেও ধীরেন বলিল, "তা হোক্ দেরী, তুমি আস্তে আস্তে রাঁধ বৌদি'।"

ধীরেনের বিশ্বাস হইল না যে ইন্দুর কোন অসুখ করে নাই। যদি কোন অসুখই না করিয়া থাকিবে তাহা হইলে চোখ দুটো অমন লাল কেন? মুখটাই বা অত শুক্‌নো শুকনো কেন? ইন্দু একটু একটু কাঁপিতেছে এটুকুও ধীরেন লক্ষ্য করিল।

রান্নাঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ইন্দুর কপালে হাত দিয়া বলিল, "তোমার যে জ্বর হ'য়েছে বৌদি! এই জ্বরে তুমি নেয়ে এলে? কবে থেকে জ্বর হ'য়েছে?"

গোপন করা আর বৃথা ভাবিয়া একটু হাসিয়া ইন্দু বলিল, "আজ তিনদিন থেকেই হ'য়েছে ঠাকুরপো। লক্ষ্মী-ভাইটী কাউকে যেন ব'লো না। এ জ্বর আজকেই সেরে যাবে।

"আমায় বলনি কেন বৌদি? ওষুধ এনে দিতুম। তুমি যে দেখচি বেঘ'রে মারা যাবে।"

"মলেই তো ভাল ঠাকুরপো। এমন ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই কি ভাল নয়?

"না, না, বৌদি ওকথা ব'লো না। মর্‌তে তোমায় আমি কখনই দেব না।"

ইন্দু ইহা খুব ভাল করিয়াই জানিত যে

এখন মরাই যদিও তাহার মুক্তি কিন্তু এখন মরিলে চলিবে না! তাহার এখন অনেক কাজ বাকী। সে সমস্ত সম্পূর্ণ না করিয়া তাহার মরা হইতেই পারে না।

নীরেন বলিল, "এই জ্বর গা নিয়ে সব কাজ ক'রলে তো বৌদি?" "ক'রতে হ'ল বৈকী ঠাকুরপো।"

এমন সময়ে মাতা-পুত্রীতে হাসিতে কাসিতে গল্প-গুজব করিতে করিতে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। প্রায় এগারটা বাজে এখনও নীরেন স্কুল যায় নাই দেখিয়া জননী চটিয়া আগুন হইয়া গেলেন। বলিলেন, "এখন যে স্কুল যাস্‌নি নীরু?"

ইন্দুকে লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য নীরেন বলিল, "আজ একটু দেরী ক'রে গেলেও কোন ক্ষতি হবে না মা।"

চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।

জননী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কোথাকার ছোট লোকের মেয়ে এনেছিলুম বাপু যে, একটু স্বস্তি পাবার যো নেই। রান্না চড়াবে বেলা আট্‌টায় তো ঠিক সময়ে ভাত দেবে কি করে? ছেলেটার আজ স্কুল যাওয়াই হ'ল না হতভাগী লক্ষ্মীছাড়ীর জন্যে। এমন কপাল নিয়েও আমি জন্মেছিলুম!"

রৌদ্রে কাপড় শুকাইয়া দিতে দিতে হেম-লতা বলিল, "মরে যায় তো আপদ যায়। দাদার আবার একটা বৌ আসে। তা ছুঁড়ীটা মরেও না ছাই।"

জননী বলিলেন, "না বাপু আর আমি পেরে উঠচি না। দেখে শুনে বীরেনের আর একটা বিয়ে না দিলে আর চ'লবে না।"

নীরেন অবাক হইয়া গিয়াছিল, বলিল, "বৌদি'র যে জ্বর হ'য়েছে মা সে খোঁজ তোমরা কেউ রাখ? আজ কোন্ দিদিই বৌদি'কে একটু সাহায্য ক'রেন?"

হেমলতা নাক মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ, দিদি ওঁর বাবার চাকর কিনা তাই রাণী-সাহেবকে সাহায্য ক'রবে। জ্বর হ'য়েচে না হাতি হ'য়েচে। সব মিথ্যা কথা। যাতে না কাজ ক'রতে হয় তারই ফন্দি।"

সমস্ত সকালটা আড্ডা দিয়া পান চর্ব্বন করিতে করিতে বীরেন বাটীতে ফিরিয়া দেখিল যে, একটা বেশ কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে রে হেমু? অত চ্যাঁচা-মেচি ক'চ্ছিস্ কেন?"

নয়নদ্বয় এবং বদনখানি একটু ঘুরাইয়া হেমলতা উত্তর করিল, "তোমার আদরের লোকে নিয়েই যত কাণ্ড বড়'দা। এগারোটা

মেজে গেল দিকি এখন ভাত পেলে না।"

বীরেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল "কেন?"

হেমলতা বেশ একটু রসান দিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "মা, একলা আর কত পেরে উঠবেন বল। সকাল থেকে উঠে পর্য্যন্তই খাটছেন—রান্নাঘর ধুলেন, গোয়াল পরিষ্কার ক'ল্লেন,—আর আমিও মাকে সেই ভোর থেকেই সাহায্য কচ্চি, কুটনো কুটে দিলুম বাসন মেজে দিলুম"—

রাগান্বিত হইয়া বীরেন বলিল, "আর ও কি কচ্ছিল?" "কি আর করবে। রাণীর মত বেলা আট্‌টার সময় উঠে নেয়ে এসে ভাত চড়িয়েচেন।"

বীরেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "জুতো-পেটা ক'র্ত্তে পাল্লিনে সেঝু? ঝাঁটা কোথায় ছিল, পীঠের ওপোর দুঘা বসিয়ে দিলিনি কেন?"

"আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা কি! আমি একটীবার শুধু দোষের মধ্যে ব'ল্লুম, 'বৌদি, একটু তাই হাত চালিয়ে নাও, অনেক বেলা হ'য়ে গেছে।' ওমা! আমায় ব'ল্লে কি জান? ব'ল্লে, আমারই কি যত গরজ প'ড়েচে নাকি? তোমরা সব হাত গুটিয়ে ব'সে থাকবে আর আমি বুক ফেটে মরব? তুমি তো বাপু দিনরাতই ব'সে আছ আর খাচ্চ'।"

অঞ্চল দিয়া চক্ষু দুইটী একবার রগড়াইয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে হেমলতা বলিল, "তা বড়দা' আমি হ'য়েছি যত দোষের দোষী। আমি না হয় আজকেই শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাব। আমায় কিনা বলে, 'ব'সে ব'সে খাচ্চ'।"

আর একবার অঞ্চল দিয়া হেমলতা চক্ষু দু'টী মুছিল।

বীরেন বলিল,—"মা কেন চুলেরমুটিটা ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিলেন না?"

ছলছলনেত্রে হেমলতা বলিল,—"ম'র আর বার বার অপমান হতে সাধ নেই বড়দা'। মা একটু বলেছিলেন—দশটা বেজে গেল বৌমা, একটু শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর কর, ধীরুর স্কুল আছে। ও বাবা! মাকে ঝেঁঝে উঠে বল্লে—অত যদি ছেলের জন্য দরদ হয়, নিজে এসে রাঁধ না বাপু—আমি অত তাড়াতাড়ি কর্ত্তে পারবো না। মা আর কি বলবেন? কাজে কাজেই চুপ করে রইলেন।"

"কি, মাকে এত বড় কথা! আজ আমি ওকে মেরেই ফেলবো"—বলিয়া বীরেন রান্নাঘরের দিকে ছুটিল।

হেমলতার রাতকে দিন করা দেখিয়া ধীরেন অবাক হইয়া গিয়াছিল। কি যে বলিবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। বীরেনকে ক্রোধভরে ধাবমান দেখিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। ইন্দুকে রক্ষা করিবার জন্য সেও বীরেনের অনুসরণ করিল।

ক্রমশঃ

স্বরাজ।

(শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এফ্. টী. এস্।)

(১)

হৃদয়-মাঝারে এভাব কেমন
বন্দী হ'তে আজ কেন আকিঞ্চন
সুখৈশ্বর্য্য ছেড়ে কিসের কারণ
আনন্দে সকলে যেতেছে চ'লে ?
পিতা মাতা ছেড়ে স্নেহের তনয়,
স্বামী-পুত্র ছেড়ে পুরনারীচয়,
জেলে যেতে আর করেনাক ভয়,
চ'লেছে সবাই সংসার ফেলে।

(২)

স্বদেশের শিল্প করিতে বিস্তার,
আরম্ভিল লোকে খদ্দর প্রচার,
তাই ল'য়ে আজ হ'ল কি ব্যাপার,
ভাবিলে পরাণ কাটিয়া যায় !
নারী-ধরে শেষ দিলে কারাগারে,
তিলেক মমতা হ'ল না অন্তরে,
রবে এ কলঙ্ক চিরদিন তরে,
বঙ্গদেশে আজ যা হ'ল হায় !

৩

মধ্যপন্থী এবে চরমে উন্নীত,
রাজার বিচারে হ'য়ে বিচলিত
রাজ সন্নিধানে হ'ল উপনীত,
মরম বেদনা জানাবে ব'লে।
রাজ প্রতিনিধি রাজ্যের ঈশ্বর,
মমতা বর্জ্জিত কঠোর অন্তর,
দয়া মায়া গিয়া শেষে মার ধর,
হ'তেছে বিপ্লব যাহার ফলে।

(৪)

নগরীতে সত্য ছিল হরতাল,
ছিল কিন্তু জেলে আনন্দ বিশাল,
যুবরাজ আজি বঙ্গের এ হাল
দেখিলে ঝরিত নয়নে ধারা!
জানালে না তারে আমাদের ব্যথা
শুনালে না তারে এ মরম গাথা।
বুঝালে না তারে প্রকৃত বারতা
রাখিল গোপনে চাপিয়া সারা।

(৫)

অস্ত্র-শস্ত্র শূন্য অহিংসার বলে,
ভাই ভাই আজ মিলিত সকলে,
বন্দিরূপে হের সবে কৌতূহলে
রাজ-দণ্ড-আজ্ঞা লইতে যায়।
হৃদি মাঝে আজ নব উদ্দীপনা,
দাসত্ব শৃঙ্খল ছিঁড়িতে বাসনা,
এ ছাড়া নাহিক অপর কামনা,
বৃটীশ অধানে "স্বরাজ" চায়।

দান।

(শ্রী———)

দান একটী শ্রেষ্ঠ পুণ্য কর্ম্ম। পরের দুঃখ দেখিলে তাহা দূরীকরণের জন্য স্বতঃই মনে একটী ইচ্ছার উদয় হয় তাহাকে দয়া বলে। সেই দয়া হইতেই দান আসিয়া থাকে। সুতরাং দয়াকে দানের প্রসূতি বলা যাইতে পারে। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন-দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান অর্থহীনকে অর্থ দান, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দান, রোগীকে ঔষধ দান এ সকলই দয়ার কার্য্য। মহৎ লোকেরা এই ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন। দান করিলে লোকের দুঃখ দূর হয়। যিনি লোকের দুঃখ দূর করেন তিনি দান করিয়া অন্তরে অপরিসীম আনন্দ লাভ করেন; আর যিনি উপকৃত হন তিনিও দান পাইয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করেন সুতরাং একবিধ দান কার্য্য দ্বারা দাতা ও গৃহীতা উভয়েই

সুখলাভ করিয়া থাকেন।

দান সকলেরই করা উচিত। যাহার যেরূপ ক্ষমতা তিনি সেইরূপ বুঝিয়া দান করিতে পারেন। নিজের অবস্থার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া অধিক দান করিলে অচিরে নিঃস্ব হইতে হয়। অধিক দান করিয়া নিঃস্ব হওয়া বিধি সঙ্গত নয়। আমাদের এ দরিদ্র প্রধান দেশে ধনশালীর সংখ্যা অধিক নয়। যাঁহারা অর্থবান্ তাঁহারা দয়াবান্ হইলে তবু দেশের দশের অভাব দূর করিতে পারেন। দেশ বিশেষে এরূপ নিয়ম আছে—অর্থশালীর অর্থ লইয়া দরিদ্র-দিগকে দিয়া দেশের অর্থ-সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়। এ বিধি খুব ভাল। কেহ অর্থ লইয়া বিলাসিতায় বহুব্যয় করিবে আর কেহ বা অর্থাভাবে উদর পূরণ করিতে পারিবে না এ প্রথা কোনমতেই পরামর্শ সিদ্ধ নয়।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥"

বঙ্গেশ্বর বল্লালসেন স্বীয় রাজত্বে প্রজাগণের উৎকর্ষ বিধানের জন্য বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থবর্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত নয়টী কুল-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ঐ নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমাজে প্রাধান্য লাভ করিবেন। দেখা যায় এতম্মধ্যে দানকেও একটী স্থান দান করিয়া দানের মহিমা রক্ষা করিয়াছেন।

"ইজ্যাধ্যয়ন দানানি যাজনাধ্যাপনে তথা;
প্রতিগ্রহশ্চ তৈর্যুক্তঃ ষট্‌কর্ম্মা বিপ্র উচ্যতে।"

সমাজের প্রধান ব্রাহ্মণজাতির যে ষট্‌কর্ম্ম লিপিবদ্ধ বিধান আছে তন্মধ্যে দানকেও একটী প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণনা করিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন।

দানের পাত্রকে দান করিলে বিশেষ ফলোদয় হয় অপাত্রে দান করিলে তাদৃশ ফল হয় না। সুতরাং দরিদ্রকে ধন দান করা উচিত।

"দরিদ্রান ভর কৌন্তেয় মাপ্রযচ্ছেশ্বরে ধনং
ব্যাধি তস্যৌষধং পথ্যং নিরুজস্য
কিমৌষধং।"

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যেমন যাহার ব্যাধি আছে তাহাকে ঔষধ দিলে উপকার হয়, যাহার রোগ নাই তাহাকে

ঔষধ দিবার আবশ্যক কি? সেইরূপ ধনীকে ধন দান করিলে কোন ফল হয় না, দরিদ্রকে ধন দান করিলে উপকার হয়।

এই দান কার্য্যের মধ্যে একটী পারলৌকিক অর্থ নিহিত আছে। তাহা হয় ত অনেকে ভাবিয়া দেখেন নাই। নিয়ত দান করিতে করিতে দ্রব্যের উপর মায়ার হ্রাস হয়। মায়াশূন্যতাই জীবের জীবন নাশ সময়ে দুঃখ হ্রাস করে। যখন এই সংসার ত্যাগ করিয়া শেষ প্রয়াণ করিতে হইবে তখন ধনরত্নাদির উপর অধিক মায়া থাকায় জীবের বড় কষ্ট হয়। যদি মায়া ত্যাগ হইল তবে আর শেষের আর সে কষ্ট হইবে কেন? এরূপ স্থলে দানের অর্থ ত্যাগ-স্বীকার বা মায়াহ্রাস বলা যাইতে পারে।

শেষ মায়ার কষ্টের একটী উদাহরণ প্রদান করিতেছি। ঘোর প্রদেশের স্থলতান মামুদ পুনঃ পুনঃ এদেশ—এই স্বর্ণ-প্রসূ দেশ আক্রমণ করিয়া হিন্দুদিগের নানা দেবমূর্ত্তি নষ্ট করিয়া ঘোর প্রদেশে নিজ-রাজধানীতে নানাপ্রকার ধনরত্ন লইয়া যান। বহুবিধ মণিমাণিক্যাদি দ্বারা কোষাগার পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধনের প্রাচুর্য্য দেশ বিখ্যাত হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ ভোগ করিতে পারেন নাই।

কোন লোকই এ লোকে চিরকাল থাকিবে না। স্থলতান মামুদের শেষ সময় উপস্থিত হইল; ধনরত্নাদি ভোগ না করার জন্য মনে বড় কষ্ট হইল। স্থলতান ভাবিলেন—আমার অন্তিম কাল সমাগত হইয়াছে সংগ্রহীত মণিমাণিক্যাদি ভোগ করিতে পারিলাম না; সেই সকল একবার শেষ দেখা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি। তখন তিনি আদেশ করিলেন—আমার সংগৃহীত ধনরত্ন সকল ভাণ্ডার হইতে আমার চক্ষের সম্মুখে হাজির কর। ভৃত্যেরা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিল। স্থলতান তাহা দেখিয়া আঁখির জলে বক্ষঃ ভাসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার প্রাণ প্রয়াণ করিল। ইহাতে বুঝা গেল তাঁহার মায়া কিছুই ত্যাগ হয় নাই সুতরাং ভোগবস্তু ছাড়িয়া মরিতে বড় কষ্ট

হইয়াছিল। তাই বলিতে ছিলাম মায়াত্যাগ না হইলে মরিতে বড় কষ্ট হয়। আমাদের রামায়ণ মহাভারতোক্ত মহাপুরুষগণের বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে জানা যায় তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে মায়াত্যাগ করিয়াছিলেন সুতরাং মরণ সময়ে মায়াজনিত কোন কষ্ট হয় নাই।

মনুষ্যের বহুবিধ সংগুণ আছে। সে সকল গুণ পশুর নাই এজন্য পশু জাতি অপেক্ষা মানবজাতি উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়াছে। আবার হীন মনুষ্য অপেক্ষা মহৎ মানবের অনেকগুলি সংগুণ প্রবল। তাঁহারা ঐ নরাকার পশু অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া নর-সমাজে গণনীয় হইয়াছেন। মহাপুরুষ-দিগের দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণগুলি আছে তাঁহারাই দানকার্য্যে ব্রতী হইয়া মানব নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। একাধারে ধন ও দানের সমবার হইলে মণিকাঞ্চন যোগ হয় তাহা হইলেই সংসারের কল্যাণ হয়।

উত্তম, মধ্যম, অধম ভেদে ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। নিজের অনিষ্ট করিয়াও অপরের উপকারার্থ যে দান তাহাই উত্তম দান। নিজের ইষ্টানিষ্টের সম্ভাবনা না করিয়া অপরের ইষ্ট সাধন জন্য যে দান তাহাই মধ্যম দান। আর নিজের মঙ্গল সাধন জন্য যে দান তাহাই অধম দান। অনেকে সুখ্যাতি, সম্মানাদি লাভের জন্য স্থান বিশেষে প্রভূত দান করিয়া থাকেন তাহা অধম দান মধ্যে গণনীয়।

হিন্দু শাস্ত্র মতে পুনঃ পুনঃ প্রতিদিন দান করিবার ব্যবস্থা আছে। দানে পুণ্য সঞ্চয় হয় ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া দানের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিয়াছেন সুতরাং ইহাতে বিরত হওয়া কাহারও উচিত নহে।

গুরু ও ঋত্বিক করণ বিধি।

(কবিরাজ শ্রীচন্দ্রশেখর রায়)

গুরু কিম্বা পুরোহিত বংশে জন্মগ্রহণ করিতে পারিলে তিনি যে গুরু অথবা পুরোহিত পদে বরণীয় হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গুণ কিছু না থাকিলেও তিনি গুরু এবং "নৈ দে চোতা" শিক্ষা করুন আর না করুন মনসা গাছে জল ঢালিতে পারিলেই তিনি যে একজন পাকা পোক্ত পুরোহিত হইয়া বসেন তাহা বলাই বাহুল্য।

এইরূপ গুরু পুরোহিতের দ্বারা ধর্ম্মকার্য্য কতদূর মঙ্গলজনক হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। এ দোষ যে কেবল গুরু বা পুরোহিত বংশীয়দিগের তাহা নহে যজমান ও শিষ্যরা ইহার জন্য কতক পরিমাণে দায়ী হইবে। যাহাতে ইঁহারা অর্থাভাবে অশিক্ষিত হইয়া না পড়েন সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা যজমান বা শিষ্যাদি একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

পূর্ব্বে এদেশে রাজা জমিদার বা সাধারণ লোকে গুরু পুরোহিত বা বৈদ্য-দিগকে যথেষ্ট সাহায্য ও সমাদর করিয়া থাকিতেন সুতরাং উপজীবিকার নিমিত্ত ইহাদিগকে অপর কোন চেষ্টাই করিতে হইত না। এখন আর সেদিন নাই এখন লোকে জিহ্বা-উপস্থ বা ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে পারিলে আর কিছুই চান না। উপপত্নীর সেবাটা একপ্রকার পরমার্থিক জ্ঞানের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এখন "অসার খলু সংসারে সারং শ্বশুর মন্দিরম্। হিমালয়ে হরশেতে বিষ্ণুশেতে মহাদধৌ দিগেরই সংখ্যা অধিক। কাজেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংবাদ লয় কে? এখন পিতামাতা বা গুরুজনদিগের অন্ন মেলা ভার, ধর্ম্ম অনেকের পক্ষে কাল্পনিক পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, করিতে হয় তাই করা নতুবা ইহার উপর কোনরূপ শুভাশুভ নির্ভর

করে বলিয়া বিশ্বাস আদৌ নাই। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ধর্ম্ম আমাদের প্রকৃতি বা অস্তিত্বের সহিত গাঁথা বিশেষতঃ ভারতীয় ধর্ম্মে কোন অংশে কল্পনার লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। ভারতের আচার ধর্ম্ম, ভারতের ব্যবহার ধর্ম্ম, ভারতের উপাসনা বা ব্রত প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম, প্রত্যেক বিষয়েই ভারতীয় প্রকৃতির অনুমোদিত।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও শাস্ত্রবেত্তাদের অবস্থা হীন হইলেও ইয়ুরোপীয় বা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ইহাদের সম্মান ও অর্থাগমের যথেষ্ট সুবিধা প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম-যাজক বা মিশনরিদিগকে এ দেশীয় রাজা জমিদার প্রভৃতি সকলেই সাধ্যমত সাহায্য করিয়া থাকেন এমন কি মিশনরিগণ অনেকেই রাজকোষ হইতে মাসিক বৃত্তি যাহা পান তাহাতে উপজীবিকার নিমিত্ত অপর কোন চিন্তাই করিতে হয় না; ইহারা কেবল ধর্ম্মালোচনায় জীবন অতি-বাহিত করিবার সুবিধা পাইয়া থাকেন।

এখন আর আমাদের দেশের লোকে বৈদিকগুরুকে (উপনয়নদাতা আচার্য্যকে) গুরু বলিয়াই মনে করেন না। কালের স্রোতে তান্ত্রিক গুরুই গুরুদেব সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। এই তান্ত্রিক বা উপদেষ্টাকেই লোকে গুরু বলিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বা শাস্ত্রসঙ্গত দেখিতে গেলে শূদ্রের সম্বন্ধে তান্ত্রিক গুরুই প্রশস্ত কারণ ইহাদের বৈদিক গুরু নাই। দ্বিজের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে) স্মৃতিকারগণ একমাত্র বৈদিক আচার্য্যকেই গুরু বলিয়া গিয়াছেন, তান্ত্রিক বা অপর কোন গুরু গ্রহণের ব্যবস্থা দেন নাই।

যদুক্তম্ যাজ্ঞবল্ক্যে—

স গুরুর্যঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।
উপনীয় দদেদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ॥

৩৪।১ অঃ।

যিনি জন্ম হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত সমুহ সংস্কার করিয়া বেদমন্ত্রে দীক্ষিত করেন তিনিই গুরু। উপনয়ন দিয়া বেদমন্ত্রে দীক্ষিত করেন বলিয়া কেহ আচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

তথা চোক্তম্ শঙ্খে—

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং বেদমন্ত্রে প্রযচ্ছতি।
ভৃতকাধ্যাপকো যস্তু উপাধ্যায় স উচ্যতে॥

৩।১ অঃ।

গুরু (আচার্য্য) মানবকে উপনয়ন দিয়া বেদপাঠে দীক্ষিত করেন এবং যে গুরু বেতন লইয়া অধ্যয়ন করান তাহাকে উপাধ্যায় বলে।

আচার্য্যস্তুপিতা প্রোক্তঃ সাবিত্রী জননী তথা।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাঞ্চৈব মৌঞ্জিবন্ধন জন্মনি॥

৭।১ অঃ ঐ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মৌঞ্জি এবং উপনয়ন কার্য্যের নিমিত্ত শাস্ত্রকার আচার্য্য গুরুকে পিতা ও সাবিত্রীকে মাতা বলিয়া থাকেন।

তথাহি—

দ্বে জন্মনী দ্বিজাতীনাং মাতুঃ স্যাৎ প্রথমস্তয়োঃ।
দ্বিতীয়ং ছন্দসাং মাতু গ্রহণাদ্বিধিবদ গুরোঃ॥

ব্যাসসংহিতা ২৩।১ অঃ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের দুইটী জন্ম, প্রথম মাতৃগর্ভ হইতে দ্বিতীয় জন্ম, গুরু বা আচার্য্যের নিকট হইতে বেদমাতা সাবিত্রী গ্রহণ।

তথাহি শ্রুতি বিষ্ণু স্মৃতিশ্চ—

এবঃ পুরুষস্যাতি গুরবো ভবন্তি, মাতা পিতা আচার্য্যশ্চ, তেষাং নিত্যমেব শুশ্রূষুনা ভবিতব্যম্, যৎ তে ব্রুয়ুস্তৎ কুর্য্যাৎ, তেষাং প্রিয়হিতমাচরেৎ, নতৈরন-নুজ্ঞাতঃ কিঞ্চিদপিকুর্য্যাৎ।

শ্রুতি বিষ্ণুস্মৃতি বলেন—মাতা পিতা এবং আচার্য্য এই তিন জন পুরুষের মহা-গুরু হন, সর্ব্বদা ইঁহাদের সেবা করিবে। তাঁহাদের প্রিয়তর কার্য্য সাধন করিবে, তাঁহাদের আজ্ঞা ব্যতীত কোন কার্য্য করিবে না, তাঁহারা যাহা অনুমতি করিবেন তাহাই করা কর্ত্তব্য।

এতএব ত্রয়ো বেদ এতএব ত্রয় সূরা।
এতএব ত্রয়ো লোকা এতএব ত্রয়োঽগ্নয়॥

পিতা গার্হপত্যাগ্নি, দক্ষিণাগ্নির্মাতা গুরু বাহবনীয়ঃ।—

ইহারই তিন বেদ, ইহারই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্বরূপ তিন দেবতা, ইহারা ত্রিলোক তুল্য, এবং ইহারই তিন অগ্নি।

পিতা গার্হপত্যাগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি, আচার্য্য আহবনীয় অগ্নি।

সর্ব্বেতস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈ তে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনদৃতাস্তু যস্যৈ তে সর্ব্বাস্তস্যাফলক্রিয়া॥

৩১ অঃ বিষ্ণুস্মৃতি।

মাতা পিতা ও আচার্য্য—ইঁহারা যাহার নিকট আদৃত বা সম্মানিত, তাহাদের সকল কার্য্যই মঙ্গলজনক হয় আর ইঁহারা যাহার নিকট অনাদৃত, তাহার সকল কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।

ক্রমশঃ—

দুইটি দৃশ্য।

(শ্রীমোহিতগোপাল লাহিড়ী লিখিত।)

মা আমার কেউ নেই।

সন্ধ্যার পর মায়ের মন্দিরে আরতি হচ্ছে। দুই ভক্ত তন্ময় হয়ে দেখ্‌ছেন। কত লোক দাঁড়িয়েছে, স্ত্রীপুরুষ বালক যুবতী জোড় হাতে মায়ের মূর্ত্তির পানে চেয়ে আছে। কাঁশর শঙ্খ ঘণ্টা রোলের সঙ্গে ভক্তগণের 'মা মা' ধ্বনি মিশে যেন দূরদূরান্তে, আকাশ অন্তরীক্ষে একটা "ব্যোম—ওম্" ধ্বনি নিনাদিত হচ্ছিল। ধূপধুণা গুগ্‌গুল গন্ধে ও ফুলের সৌরভে এবং সুগন্ধ জাজ্বল্যমান দীপাবলির দীপ্তিতে মা যেন জাগ্রত হয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন! মায়ের কি অপরূপ রূপ! হঠাৎ এক ভক্ত বাষ্পকণ্ঠে চীৎকার করে বলে উঠ্‌লেন—"মা আমার কেউ নেই—বড় দুঃখী আমি, মা আমার কেউ নেই।" পার্শ্বস্থ অপর ভক্ত তখন তার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত করে বল্‌লেন—"কি বল্‌ছ? মার সামনে দাঁড়িয়ে কি বল্‌ছ—মা আমার কেউ নেই! যার মা আছেন, সাক্ষাৎ মা জগদম্বা যার সাম্নে দাঁড়িয়ে, সে কিনা বলছে—মা আমার কেউ নেই! এত ভুল! এতই মোহ!" প্রথম ভক্তের চমক ভাঙ্গিল। তিনি কেঁদে ফেল্‌লেন। "ছি ছি, আমার এতই ভুল! আমরা দেখেও দেখ্‌তে পাই না, বুঝেও বুঝতে পারি না। যার মা আছে, তার তো সবই আছে। ঠিক বলেছেন ঠাকুর আজ

আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হলো।”—এই বলে ঠাকুরের পদধূলি নিলেন। আরতি শেষ হইলে সকলে চলে গেলেন। এমন ভুল জগতে মানুষ নিত্যই করচে।

তোরা মা বলিয়া ডাক।

সে দিন একদল যুবক, প্রায় ২০।২৫ জন, সমকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল—“একবার তোরা মা বলিয়া ডাক। শুনিয়া জগৎ জনের প্রাণ জুড়াক। ত্রিশ কোটী কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে, রোমাঞ্চ উঠিবে, অনন্ত নিখিলে।” কি সুন্দর সে দৃশ্য! সকলের অঙ্গে খদ্দরের পোষাক, গলায় ফুলের মালা, নগ্নপদ, মধুর কণ্ঠ—যুবকগণের প্রফুল্ল কমলের মত মুখকান্তি। পথের দুই ধারে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে সে গান শুনছিল। লাল পাগড়ীওয়ালা পুলিশ ও সার্জ্জন, তাদের পাছে মোতায়েন থেকে, বিচারের জন্য যুবকদের কাছারীতে নিয়ে যাচ্ছিল। দর্শকগণের মধ্যে একজন বলে উঠ্‌লো—‘যারা আগে যাচ্ছে তারাই সাধু। আর পাছের লোক গুলাই ‘চোর।’ কমেষ্টবলেরা কহিল,—‘ঠিক বলেছ বাবু সাহেব।’ সার্জ্জন সাহেবের মুখ লাল হয়ে উঠল। আমাদের কর্ত্তা মহাশয় বল্‌লেন—“কবে সেদিন আস্‌বে, যেদিন এই ত্রিশকোটী নরনারী সমকণ্ঠে মা-মা বলে ডেকে গগন-পবন প্রতিধ্বনিত করবে। সে মাতৃনামে তোমাদের স্বরাজ-স্বাধীনতা আপনি এসে দেখা দেবে। জলস্থল মরুদ্ব্যোম প্রকম্পিত করে, সে মা মা রব যখন ভারত ছেয়ে ফেল্‌বে, তখন পশুশক্তি পরাজিত হবে, তোমার বুকের উপর নিক্ষিপ্ত কামানের গোলাও ফুলের মত তোমার বুকে লাগ্‌বে—সেখানে যমদণ্ডও ব্যর্থ হবে।”

হরিনাম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(কবিরাজ—শ্রী[illegible]কান্ত ঘোষ।)

প্রাণে এ প্রেমের বাঁশী—শ্যামের বাঁশী বাজিলে গুরু শিষ্যকে খুঁজিয়া বেড়ান, শিষ্য গুরুদেবের অন্বেষণে ছুটিয়া যায়, পুত্র বিদ্যাসাগর হইলেও মাতৃ-স্নেহ-সমুদ্রের আকর্ষণে বর্ষার উত্তাল তরঙ্গমালা-সঙ্কুল নদ-নদী সন্তরণ করিয়া অনায়াসে মাতৃ-চরণ প্রান্তে উপনীত হয়। জননী আহার নিদ্রা ভুলিয়া রুগ্ন সন্তানের পার্শ্বে বসিয়া থাকেন—ক্ষুদ্র শিশুর ক্রন্দনে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া যান। পতিপ্রাণা পত্নী পতি-সেবায়, মৃতপতির অনুসরণে (সহমরণে) জ্বলন্ত চিতায় আত্ম-বিসর্জ্জন করেন। বন্ধু বন্ধুর জন্য, পথিক অচেনা পরের জন্য,অকা-তরে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। ইহাই ভগবানের আহ্বান—সাগরের ডাক, মঙ্গলময়ের মঙ্গলশঙ্খের গম্ভীর মধুর নিনাদ। ইহা শ্যামের বাঁশীর প্রাণ উন্মা-দক স্বর্গীয় স্বর! এই বংশীরবে মানুষ বিশ্বপ্রেমে—বিশ্বেশ্বরের মহাধ্যানে মত্ত হয়, পাগল হয়, যমুনা উজান বহে। দস্যু রত্নাকর মহাকবি—সাধু-ভক্ত সাধক ঋষি হন, লম্পট বিল্বমঙ্গল ব্রজের পথে—সাধ-নার রাজ্যে ছুটিয়া যায়। মাতাল জগাই-মাধাই মদ ছাড়িয়া প্রেম-সুধা পানে মত্ত হয়। যবন হরিদাস ঠাকুর হরিদাস হইয়া থাকেন। এ প্রেমামৃত পানে—এ মধুর বংশী-ধ্বনি শ্রবণে মানব-জীবন মধুময় হয়, পাপী তাপী, নীচ, ঘৃণ্য, সব দেবতা হইয়া যায়। এ যে শ্যামের বংশীধ্বনি মঙ্গলময়ের মঙ্গল-শঙ্খ-নিনাদ—সাগরের ডাক!

এই সাগরের ডাক শুনিয়া—এই বংশীরবে মুগ্ধ হইয়াই ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, হাউয়ার্ড, ফাদার ডামিয়েন, ফ্লোরেন্স, নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি মহাপ্রাণ মহাপুরুষেরা পরদুঃখ মোচনে—বিপন্নের বিপদ মুক্তি,

রোগীর পরিচর্য্যা, আহত সৈনিকের সেবা, কারাবাসীর ক্লেশমোচন এবং দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সাড়া পড়েছে; সোণার বঙ্গে আবার শ্যামসুন্দরের প্রেমের বাঁশীর প্রাণ উন্মাদক পবিত্র মধুর স্বর শুনা যাইতেছে। নব্য ভারতের নব অবতার মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগমন্ত্রের ভিতর দিয়া আবার শ্যামের বাঁশীর সেই মধুর স্বর-লহরী আজ সমগ্র ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গের ঘরে ঘরে "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশি' আকুল করিছে প্রাণ।" দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ দেশ-মাতৃকার বর পুত্রগণ সেই বংশীরবে স্বর মিলাইয়া মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইতেছেন—ত্যাগের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সকলকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে—মাতৃ-মন্ত্রের সাধক করিতে প্রাণ-পণে প্রয়াস পাইতেছেন। ঋষিকল্প অরবিন্দ, প্রবীণ সাধক অশ্বিনীকুমার, মহাপ্রাণ লিয়াকৎহোসেন প্রভৃতি এক-নিষ্ঠ সাধক স্বদেশ-প্রেমিকগণ সেই বংশী রবে মুগ্ধ হইয়া কেহবা ধ্যানস্থ যোগীর ন্যায়, আবার কেহ বা তীর্থপর্য্যটক সংসার-নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর মত নিয়ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশ-মাতৃকার পদে প্রেম-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন। আরও কত সাধক কতরূপে সাধনায় সিদ্ধিলাভে প্রয়াস পাইতেছেন, কত নাম করিব?—কাহাকে ছাড়িয়া কাহার কথা কহিব?

বৈষ্ণবচূড়ামণি নিত্যানন্দ দাস নবদ্বীপে মাতৃ-ভবন প্রতিষ্ঠায়, নফরকুণ্ড পথের কুলীর জীবন রক্ষার্থ স্বীয় জীবন দানে, যুবক ইন্দুভূষণ বন্ধুর পবিত্রস্মৃতি রক্ষার্থ প্রাণ উৎসর্গে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্পদষ্ট নমঃশূদ্রের পা হইতে বিষ চুষিয়া লইয়া বঙ্গের নবজীবন প্রবাহ স্বরূপ সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত আত্মোৎসর্গ প্রাণ নবীন যুবকগণ—বিশেষতঃ বেলুড় মঠের নব ঋষিগণ—বঙ্গের এক-নিষ্ঠ সেবকগণ দামোদরের বন্যায়, অর্দ্ধোদয়ে, বিক্রমপুরের ঝড়ে, নানা স্থানের নানা তীর্থের মহামারী-দুর্ভিক্ষে, চাঁদপুরের কুলীপরিচর্য্যায় যে সাধনায়

সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহা অতুলনীয়, অপরিমেয়। তাঁহারা এই সেবাধর্ম্মকে মাথায় বহিয়া লইয়া নরনারায়ণের—বিশেষতঃ দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া কি কঠোর সাধনায়ই না সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—মানব হইয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন।

ঐ দেখ, তাঁহাদের শুভ আদর্শে বঙ্গে কি সুন্দর সেবাধর্ম্ম ফুটিয়া উঠিতেছে। ঘরে ঘরে সেবা-ব্রতের মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিতেছে; আবার যেন সেই পুণ্যভূমি বৃন্দাবনে যমুনা-পুলিনে সর্ব্বমঙ্গলময়ের প্রেমের বংশীধ্বনি শুনা যাইতেছে—শ্যামের বাঁশী বাজিতেছে!

এস, ভাই সকল! এস, সাধক-ভক্ত-মহাজন সব, তোমরা 'হরি হরি বলি ঊ' বাহু তুলি' ত্বরায় ছুটিয়া এস,—পাপী, তাপী, অধম, অভক্ত, নীচ, দুর্জ্জন, যাহাকে পাও, প্রেমভরে তাঁহাকেই আপন কোলে টানিয়া লও; তবেই তোমার হরিপূজা সার্থক হইবে—তুমি সর্ব্বভূতস্থিত নারায়ণ দর্শনে কৃতার্থ হইবে। ভাই! শ্রীভগবানের নাম লইয়া-তাঁহার প্রেমে বিভোর হইয়া—

"যারে কাছে দেখিবে,
তারে ভাল বাসিবে,
দেখিবে হরি বর্ত্তমান।"

ঐ দেখ, প্রেমের ঠাকুর কেমন বিমল হাসি হাসিতেছেন, আর প্রেমের বাঁশী বাজাইতেছেন! তুমি যদি স্বর্গ শান্তি কি মুক্তি চাও, এস, বংশীরব শুনিবে ত শীঘ্র ছুটিয়া এস, এ বাঁশীর ভিতরেই যে সব! ঐ শুন, বাঁশী বাজিতেছে! এস, ভাই! প্রেমভরে হরি হরি বলিয়া ত্বরায় ছুটিয়া এস, বল, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

ব্রত গ্রহণ।

(বঙ্গান্তঃপুর)

(শ্রীধীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু এম, এ, বি, এল্ লিখিত।)

"শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ।"—শঙ্কর।

"ওগো, তুমি না কাজ ছেড়ে, গান্ধী মহারাজের হুজুকে যাচ্ছো?"

অনিন্দ্যসুন্দরী মায়া প্রীতি-প্রফুল্ল ভাবে এই কথা বলিতে বলিতে কক্ষে প্রবেশ করিল। মূর্ত্তিমতী শ্রী যেন জ্যোতিঃ সঙ্গে গলা ধরাধরি করে যোগেশচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইল।

অন্নপ্রাসনের সময় মায়ার নামকরণ, মহামায়া বা মায়ালতা বা মায়ারাণী এমন একটা কিছু হয়েছিল। তাহা আমাদের বিশেষ জানা নাই। তবে বিবাহের পর স্বামী যোগেশচন্দ্র মায়া নামের যে নানা "রং বেরংএর" নিত্য নূতন বিবিধ সংস্করণ করেছিল তাহা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি। মায়া ইহাদের মধ্যে অন্যতম সংস্করণ।

মায়ার পরিধানে একখানি লালপেড়ে গরদের সাড়ী। বস্ত্রাঞ্চল গলদেশে বেষ্টিত; কপালে চন্দন ফোঁটা, যেন আদ্যাশক্তি বিনয়নার অংশ সম্ভূতার বাহ্য প্রকাশ। মায়া উচ্চ শিক্ষিতা, পূর্ণ বিকশিত-যৌবনা। বর্ষার ভরাগাঙের জোয়ারের মত মুখখানি ঢলঢলে। অঙ্গলাবণ্য শান্তস্নিগ্ধ ও নয়নমন তৃপ্তিপ্রদ। একটা কমনীয় দেবভাব যেন মায়ার সর্ব্বাঙ্গে প্রতিভাত হচ্চে। দেখ্‌লে হৃদয়ের সব পশুবৃত্তি দ্রব হয়ে পূত প্রেমধারায় বয়ে যায়।

গৃহের মেঝের উপর নিবিষ্ট মনে যোগেশ হিসাব বহিতে কংগ্রেসের টাকার হিসাব টুকিতেছিল। অন্যমনস্ক ভাবে মায়ার প্রতি দৃষ্টিমাত্র মুগ্ধ হইল। আঁখি-যুগল মুহূর্ত্তে সে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে নিবদ্ধ হইল।

বীণানিন্দিত সুরে মায়া পুনরপি বলিল

—"ওগো, শুনছো, তুমি নাকি চাকরী ছেড়ে গান্ধী মহারাজের কাজে যাচ্ছো ? বল না, অমন করে আমার মুখপানে চেয়ে কি দেখছো ?

যোগেশ।—তোমাকেই দেখছি, মায়া। এই দেবীরূপই তোমার স্বরূপ। রমণীর এই রূপ বুঝি বরাভয়দায়িনী জগদম্বার রূপ। আজ ভারত সন্তান এই মাতৃপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে এতদূর অধঃপাতে হয়েছে।

মায়া।—বলি, ওগো আমার সোণা-পুরুষ! দাসীর কথাগুলি কি কর্ণে প্রবেশ করেছে ?—চাকরী ছেড়ে দিচ্ছ কেন ? কারও কাছে কোন পরামর্শ নিলে না, আমাকেও একবার বল্লে না। হঠাৎ এরূপ কাজ করা কি ভাল হচ্ছে ? ও বাড়ীর জেঠাইমাকে একবার জিজ্ঞাসা না করে এই দুঃসাহসিক কাজ করা কি উচিত ?

যোগেশ।—এখনও কাজ ছাড়ি নাই—তবে আজই ইস্তফা দিয়ে আসবো ঠিক করেছি। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"—বেশী যুক্তিতর্কে পাছে সব পণ্ড হয়, সেজন্য কারও কাছে কিছু প্রকাশ করি নাই।

মায়া।—চাকরী ছাড়লে পোড়াপেট চল্‌বে কি করে ? ছেলেটা মানুষ হবে কি করে ?

যোগেশ।—যেমন করে ভারতের বত্রিশকোটী নরনারীর চল্‌ছে। ঈশ্বর না করুন, আজ যদি আমি মারা যাই বা কিছুদিন ব্যারামে শয্যাগত হয়ে পড়ে থাকি, তাহলে সংসার চলবে কি করে শুনি ? "জীব দিয়েছেন যিনি আহার যোগাবেন তিনি।" চাকরী করে এতদিন যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান করেছি—আর পৈতৃক জমীজমার আয় হতে তিনটে পেট কি আর চলবে না ? দিনান্তে একাহার বা নিরম্ব, করভারপ্রপীড়িত ভারতবাসীর নিত্য নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে! দেশ সেবকদের পক্ষে কি সে প্রতিষ্ঠিত নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া উচিত ?

মায়া।—না খেয়ে, না পরে, দেশের কাজটা যে কি করে হবে সেটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। এরূপ অনাহারী সেবার

পরমায়ু কতক্ষণ? আর ঘড়ার জল ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে কতদিন থাকবে? সাধ করে দারিদ্র্যকে বরণ করা কেন? লক্ষ্মীর এক নাম যে চপলা!

যোগেশ।—তোমার মত প্রসন্না অন্নপূর্ণা যেখানে বিরাজিতা সেখানে অন্নাভাব! ওগো ঠাকরুণ মহাত্মাজী প্রমুখ দেশের নেতাদের স্কন্ধের উপর একটা একটা মস্তক নামে পদার্থ আছে। তাঁহারা বেশ জানেন যে অভাবগ্রস্ত অন্নচিন্তা-কাতর, দেশপ্রাণ স্বদেশ সেবক দ্বারা মাতৃসেবায় বিশৃঙ্খল হয়, সেজন্য কংগ্রেস, দেশ সেবকদের মাত্র দিনগুজরাণের জন্য একটা উপায় নির্দ্ধারণ করে দিয়েছে। বন্ধুপরিজনযুক্ত ভোগ বিলাসে অভ্যস্ত সংসারীদের সারা প্রাণ মন উৎসর্গ করে দেশের সেবা সম্ভবপর নয়। তাহারা নীরবে সাধ্যমত আপন কর্ম্মের মধ্যে আপাততঃ দেশ মাতৃকার সেবা করবার সুযোগ পাইবেন। কাজেই আমাদের মতন লোটা-কম্বলসার প্রভৃত সম্পত্তিশালী সংসারীদের দেশমাতৃকার সেবা করবার এই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত।

মায়া।—কিন্তু এই লোটা কম্বলের খরচা যে মাসিক প্রায় দেড়শত টাকা। বামুন চাকরদের খোরাক পোষাক মাহিনাদি দিয়ে দেড়শত টাকায় কুলায় না। তোমার এই দেড়শত টাকা মাসে মাসে খরচ তোমায় যোগাবে কে?

যোগেশ। মায়া! কংগ্রেস—জরাজীর্ণ ভারতবাসীর রুধির শোষণ করে না, ইচ্ছা করে যে যাহা মায়ের ভিক্ষার ঝুলিতে দান করবে, সেই প্রিয়ংদত্ত অর্থ হতে দেশ-সেবকেরা প্রতিপালিত হবে। কাজে কাজেই চাকর বামুন রাখা, জুড়ীগাড়ী বা মটোর গাড়ী চালান এই ভিক্ষালব্ধ অর্থ থেকে চল্‌তে পারে না। সে আশাও করো না! দেখ, একটা বদনাম অনেক দিন পূর্ব্বে ছিল যে, ভীরু ও বিলাসী বাঙ্গালীর একজন বন্দুক ধরবে, একজন সঙ্গিন ধরবে, একজন গুলী গোলা ভরে দিবে, একজন তামাক টিকে নেবে, আর একজন গুড়গুড়ী হুকা ধরবে, আর একজন একটা বিছানা প্রস্তুত করে রাখবে—

তারপর বাঙ্গালীবীর এই সব অনুচর পরিবৃত হয়ে বন্দুক ছুড়বেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের শব্দ শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়েই শয্যাগ্রহণ করবেন! এরূপ সাহসীবীর দেশসেবক হলে মাতৃপূজা এক অদ্ভুত হাস্যাস্পদ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মায়া, মনে রেখো আজ হ'তে সামান্য শাকান্নে আমাদের জীবন ধারণ করতে হবে। চরকাকাটা "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে'' নিতে হবে। আহার-বিহার ভোগ-বিলাস "ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেসু বর্ত্তন্ত'' এই সনাতন বিধির মধ্যে আনতে হবে। বাসনারূপ রক্তবীজ, দশভুজার প্রসাদে উচ্ছেদ করতে হবে। মায়া, এদেশের লোক যে "অল্পে তুষ্ট, সহে কষ্ট, বাকায় না মুখ অসন্তোষে।" মনে করো আজ হ'তে তুমি ভিখারীর পত্নী হ'য়ে—সন্ন্যাসিনী সাজ্‌তে হবে—আর পুত্রটীকেও ব্রহ্মচারী গড়ে তুল্‌তে হবে।

স্তব্ধ উৎক্ষিপ্ত-নেত্রে মায়া এতক্ষণ যোগেশের মুখের দিকে চেয়েছিল। এখন মায়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—তুমি যদি শাকান্নে সন্তুষ্ট হও, মোটা কাপড় পর আমি পরবো না কেন? তুমি গুরু, আমি শিষ্যা—এতদিন যা শিখিয়েছ তা শিখেছি, আবার যা শিখাবে তাও শিখব। জান না, সর্ব্বসংহা ধরিত্রীদেবী আমাদের মাতা পিতা। উপবেশন করিয়া পরক্ষণে সহাস্যে বলিল—"এখন নূতন সন্ন্যাসীর কাজের প্রোগ্রামটা কি শুনতে পাব?"

যোগেশ। আমাদের কাজের একটা পকেট সংস্করণ তোমায় দিচ্ছি। ভারতের জনসাধারণ দেশের অবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। দেশের কথা তারা জানে না আর জান্‌তে চায় না। অবাধ বাণিজ্য-মন্ত্রে বিদেশী যাদুকর আমাদের এই সাগরাম্বরা হিমগিরি কিরিটী শোভিতা "ধন ধান্য পুষ্পেভরা'' ভারতবর্ষের "ধনরত্ন আদি দেশে যাহা ছিল'' সব "কেমনে উড়াইল কেহ না জানিল রে।" আমাদের "বস শস্যে হয় ত্রিবর্ষ যাপন।'' কিন্তু এই শোষণের ফলে "বসে বসে হয় দুর্ভিক্ষ পীড়ন।'' আমাদের ঘরে সবার প্রচুর অন্ন নাই। কিন্তু তাহারা এমনি দৃষ্টিহীন

যে, তারা "তাই ফেলে ওই সাবান মোজা কিনে করলে ঘর বোঝাই। আজ সমস্ত ভারতবাসী মরবার পথে দাঁড়িয়েছে। দেখ, পেটে ভাত নাই কোমরে কাপড় নাই, শরীরে সামর্থ্য নাই, বুঝি বা জোর করে চেঁচিয়ে কাঁদবারও বল নাই, কিন্তু আজও কি আমাদের মোহ ভেঙ্গেছে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার কোন চেষ্টা করছি? "নিজ বাসভূমে পরবাসী হোয়ে, পরদাস হতে সমুদয় দিয়ে" আমরা ভাই ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ে আছি? "চরকা মোর নাতি, চরকা মোর পুঁতি, চরকার দৌলতে মোর দোরে বাঁধা হাতি।"—এই জনশ্রুতি স্মৃতির বহির্ভূত ক'রে দিয়ে ভাবছি—"বিদেশী কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ।" বন্দেমাতরম্ মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রে আমাদের এই জীবন্মৃত মোহ ঘুমঘোর ভাঙ্গতে হবে।

সাগ্রহে মায়া জিজ্ঞাসা করিল—আর কি করবে?

যোগেশ। ভাস্কর যেমন পৃথিবী হইতে রস শোষণ করিয়া পুনঃ বৃষ্টিরূপে ধরাবক্ষে পাতিত করেন, রাজাও বিধিমত প্রজার নিকট হইতে মৌমাছির মধু আহরণের ন্যায় করগ্রহণ করিয়া প্রজারই কল্যাণার্থে রাজস্ব নিয়োজিত করিবেন। কিন্তু ভারত সরকারের রাজস্বের আয়-ব্যয়ের তালিকা দেখলে আমরা দেখি—ইংরাজ প্রজা পালন অপেক্ষা প্রজারক্ষণেই বেশী টাকা ব্যয় করেন। দেখ, "অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ" নিত্য নানা ব্যাধি কাতর দিগম্বর কাঙ্গাল ভারতবাসীর সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারী দেশী বিলাতী সেনার জন্য রাজস্বের তৃতীয়-পঞ্চমাংস ব্যয়িত করেন। সশস্ত্র ও অস্ত্রহীন ধলাকালা পুলিস ও অসামরিক (c.v.l) কর্ম্মচারীদের বেতন দিতে রাজস্বের প্রায় অবশিষ্টাংশ নিঃশেষ হয়। আর "বাড়তি-পড়তি" যা থাকে, রাজস্বের সেই মহাবিশাল অংশ ভারতসন্তানদের শিক্ষা, দীক্ষা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সু ও কুচিকিৎসার ব্যবস্থা, ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি নিত্যসহচর ব্যাধিমুক্তি আদি নানাবিধ লোকহিতকর জাতীয় জীবন গঠনোপযোগী কার্য্যের

জন্য খরচ হয়। সরকার বাহাদুর যদি "কথামালার" সহিসের প্রতি অত্যধিক সেবাক্লিষ্ট ঘোড়ার কথা মনে করে ভারতবাসীর বেশী "দলাই মলাই" না করে আহার পাবার সুব্যবস্থা করেন, তাহলে আর আমাদের দুঃখ কি থাকে। তাই আজ "ভারত আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" গানে বুক যোহাক্ষ ভারতবাসী জেগে উঠ্ছে।

মায়া। তোমরা যে দিবারাত পাঞ্জাব আর খেলাফৎ শব্দে গগন ফাটাও, সেটা কি তোমাদের কাজের মধ্যে নয়? এদুটা ব্যাপার ছাড়লে তোমাদের নন-কো-অপারেশান, স্বরাজ দাঁড়ায় কোথায়?

যোগেশ। ইংরাজকৃত এই দুই ব্যাপারে ভারত জনসাধারণ প্রচ্ছন্ন যবনিকা ভেদ করে আজ ইংরাজের প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করছে। এজন্য আমার মতে পাঞ্জাব হত্যাকাণ্ড ও খিলাফৎ-সমস্যা উপলক্ষ মাত্র—স্বরাজ লাভই মুখ্য লক্ষ্য। হিন্দু-মুসলমান রক্তে রঞ্জিত জালিয়ানওয়ালাবাগ আমাদের নবজাত ভারতীয় জাতীয়তার সুতিকাগার। চেমস্‌ফোর্ড, ওডায়ার—এই শিশুর প্রসূতি—আর ডায়ার, জনসন আদি ধাত্রী বিশেষ। তীর্থশ্রেষ্ঠ পঞ্চনদের প্রতি সমস্ত ভারতবাসী ভীতি বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া দেখিল পরাধীন ভারতবাসীর প্রাণ, স্বাধীন ইংরাজ রাজকর্মচারী যথেচ্ছভাবে দলিত মথিত বিনাশিত করিতে পারেন। শ্বেতাঙ্গের বন্দুকের গুলিগোলা নির্দ্দয় ভাবে ভারতসন্তান কৃষ্ণাঙ্গের তরল রক্তপাত করিতে পারে। আর, ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট ইংরাজের প্রধান মন্ত্রী স্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পূর্ব্বক মুসলমান প্রধান ইসলামধর্ম্ম তীর্থস্থানগুলি হজরৎ মহম্মদের বংশধর খলিফার হস্তবিচ্যুত করিয়াছেন। এবং ম্যানডেট নামধারী ইংরাজের পরোক্ষ শাসনাধীন করিয়াছেন।

স্থির গম্ভীর স্বরে মায়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আর কি তোমায় করতে হবে? মেরুদণ্ড ছাড়া প্রাণীর দেহ অসম্ভব। ভারতের মেরুদণ্ড ধর্ম্ম। ধর্ম্মবিহীন জাতি গড়ে উঠবে কি করে?

যোগেশ।—পূর্ব্বে আমাদের হিন্দু-রাজা ধর্ম্মরক্ষক ছিলেন। স্বধর্ম্মে নিয়োগ দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালন করা রাজার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। হিন্দুর স্বাধীনতা গৌরব রবি অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শ্রেষ্ঠ কাজ হয়ে দাঁড়াল—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরক্ষা করা এবং বর্ণশঙ্কর উৎপন্ন না হতে দেওয়া। যতদিন সমাজ শাসন দৃঢ় ছিল ততদিন আমরা দাসত্ব বরণ করে নিয়েও ধর্ম্মজ্ঞানে জগতে সদর্পে মস্তকোন্নত করেছিলাম। জগতের কোন্ জাতি জীবে শিবত্বজ্ঞান করে "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহং" ধ্যানে ত্রিভুবন কম্পিত করেছিল? আর আজ আমরা "ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা" এই সর্ব্বভূতে ভগবানের অধিষ্ঠান ভুলে গিয়ে "মমাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তঃ"—পাষণ্ডের ন্যায় দেহস্থিত বন্ধু আত্মাকে দ্বেষ করি। কামভোগই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞান করে কোন জাতি এমন শ্রীভগবানের এই মহৎ-বাণী ভুলে যায়—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ গীতা।

মায়া। আমাদের দেশবাসী এখন অনেকটা হৃদয়বিহীন পশুবিশেষ হয়েছে।

যোগেশ।—ঠিক বলেছ মায়া—এমন ঈশ্বরশূন্য তমাচ্ছন্ন জাতি জগতের কোথায় আছে কি? এমন ভাই ভাইকে হাসতে হাসতে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেয় কোথায়? এমন ভাই ভাইকে নরক যন্ত্রণা দেয় কোথায়? এমন ভাই ভাইএর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেয় কোথায়? এমন ভাই ভাইকে আইনের দোহাই দিয়ে নামমাত্র বিচারের অভিনয় করে কারাবাসে, দ্বীপান্তরে পাঠায় কোথায়? কোথায় তুচ্ছ অর্থ বিনিময়ে অনন্তধর্ম্মকে বিদেশীর চরণকমলে জলাঞ্জলী দেয়? কোথায় আজন্ম দাসত্ব কালিমা বিলিপ্ত-দেহ, দাস নিজেকে প্রভুজ্ঞানে সগর্ব্বে বক্ষ স্ফীত করে বেড়ায়? "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর" কোথায় এই নীতি পরিত্যাগ করে, নিষ্ঠুর বিলাসী ধনী ভাই দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত ভাইকে একমুষ্টি অন্ন পর্য্যন্ত

দেয় না ?—তার দুঃখে এককোঁটা চোখের জল ফেলে না ? দরিদ্র ভাইএর গলা টিপে যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করে।——কোথায় ইহপরত্র-সঙ্গিনী ধর্ম্মপত্নীকে ধর্ম্মবঞ্চিত ঘৃণিত ইন্দ্রিয় চরিতার্থের আধার জ্ঞান করে, মাত্র পুত্রোৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে ? জ্ঞানীগণের নিত্য বৈরি অজ্ঞান মোহ আশ্রয় করে,—"ন কর্ম্মণাম-নারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে" এই তত্ত্ব হারিয়ে এমন কোথায় পুরুষাকার বর্জ্জন করেছে ? কোথায় দৈবায়ত্ত জগৎ এই দৈবং পুরুষকারেন ন শক্যমতি বর্ত্তিতুম্—এই সর্ব্ব উদ্যোগ ক্ষয়কারী ভ্রান্ত অনুশাসনে কোন জাতি হৃষ্টমনে এমন গা ঢেলে দিয়েছে ? আবার সুখদা শুভদা জ্ঞান-গঙ্গার বিমল তরঙ্গে এই বেদপাঠধ্বনিঝঙ্কৃত ঋষিসেবিত হিন্দুস্থানকে প্লাবিত করিতে হইবে। আমাদের দেশ-ভাই মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে এই পূত দ্রবময়ী পতিত নিবারিণী জ্ঞান-জাহ্নবী জলে স্নান করে বহুকাল সঞ্চিত অবিদ্যাকলুষ ধৌত করতে হবে। আবার "আর্ত্তত্রাণ পরায়ণঃ সভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ।" শঙ্করের এই মন্ত্রে সারা ভারতবর্ষকে মুখরিত করিতে হইবে।

আর্দ্র বিজড়িত কণ্ঠে মায়া বলিল—"সর্ব্বাঙ্গে ঘা, তা ঔষধ দেবে কোথায়"—দানা হানা ভারত মাতার দুর্দ্দশার অন্ত নাই! এই দুঃখ কষ্ট অপনোদনের কোন উপায় কি নাই ?

যোগেশ।—মহাত্মা গান্ধীর প্রচলিত নন-কো-অপারেসন দ্বারা ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সমস্ত দুঃখ, সমস্ত-দৈন্য দূর করবার দিব্যাস্ত্র।ভারত—

যোগেশের মুখ কোমল হস্ত দ্বারা চাপিয়া মায়া বলিয়া উঠিল—বেশ, বেশ! কথকঠাকুর, এখন কথকথা বন্ধ কর, বেলা যে বারটা হয়ে গেল। আজই কিছু স্বরাজ হচ্ছে না—এখন নাওয়া খাওয়া শেষ করে যত ইচ্ছা নন-কো-অপারেসানের বক্তৃতা করো! এখন তোমার সঙ্গে কি শুষ্কশুষ্ক পোড়া পেটের সহিত নন-কো-অপারেসান করবে? পাঁজি-পুঁথি খাতা পত্র এখন রেখে দাও।

আর অধিক বাক্যব্যয় বৃথা ভাবিয়া

যোগেশ বলিল—নাগো, রাণী, না,—এখন মুখ ছাড়। তোমাকে শ্রোতা পেলে, জনম জনম বক্তৃতা করিলেও আমার ক্ষিদে পাবে না। তোমার সদা প্রফুল্ল মুখ যে অফুরন্ত সুধার আধার, মায়া!

এই বলিয়া যোগেশ আবেগ ভরে যত্ন-সঞ্চিত অনুরাগের চিহ্ন মায়ার হাস্যোজ্জ্বল মুখে, গণ্ডে ও অধরে গোলাপী বর্ণে অঙ্কিত করিয়া দিল। সুদের সুদ সহ মায়া এই প্রেমের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে ছাড়িল না।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রাজপথ কাঁপাইয়া কে গাহিল—

নিয়েছ যে ব্রত, পালনে বিরত,
থেকোনা, থেকোনা বঙ্গবাসী যত।

* * * *

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।)

সেই মাত্র ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া ইন্দু ফ্যান গালিবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। বীরেন রাগের মাথায় সেই হাঁড়িতে একটী সজোরে লাথি বসাইয়া দিল। পিত্তলের হাঁড়ি ভাঙ্গিল না বটে, তবে সমস্ত গরম ফ্যানটা ইন্দুর দুইটী পায়ের উপর পড়িয়া গেল।

ইন্দু কাঁদিল না, চীৎকার করিল না, আর্ত্তনাদ করিয়াও উঠিল না। কেবল মাত্র দুইটী পায়ে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ইহাতেও বীরেন ক্ষান্ত হইল না; ইন্দুর চুলের মুঠী ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া বাহিরে টানিয়া আনিল এবং পদাঘাত ও প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া দিতে লাগিল।

হেমলতা বলিল, "আরও মার্ বড়দা'; একেবারে মেরে ফ্যাল।"

এততেও ইন্দু কাঁদিল না। সে ভাবিল এসব তো তাকে সহ্য করিতেই

হইবে; আর কাঁদিয়াই বা কি করিবে! এই চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সেই যদি সে সমস্ত চোখের জল খরচ করিয়া ফেলে তাহা হইলে সারা জীবনটা কি লইয়া থাকিবে! ইহাই যে তাহার একমাত্র সম্বল।

ধীরেন না থাকিলে সেদিন হয় তো সত্য সত্যই ইন্দুকে বীরেন মারিয়া ফেলিত। সে জোর করিয়া বীরেনকে সেখান হইতে সরাইয়া দিল। ক্রুদ্ধ মহিষের মত ঘঁৎ ঘৎ করিতে করিতে বীরেন বাহিরে চলিয়া গেল।

ইন্দু মুর্চ্ছিতা হইয়া সেই খানেই পড়িয়া গেল দেখিয়া হেমলতার মাতা বলিয়া উঠিলেন, "ওরে বাপু ছাখ্‌ ছাখ ছুঁড়ীটা যেন মরে টরে না যায়। তাহ'লে আবার পুলিশের টানাটানিতে অস্থির হ'তে হবে।"

ইন্দু এসমস্ত কথা শুনিতে পাইল না, সে তখন এ নরকের বহু ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছিল।

নারিকেল তেলের সহিত চূণের জল মিশাইয়া ইন্দুর দুইটী পায়ের উপর ন্যাকড়া ভিজাইয়া দিয়া ধীরেন সেই খানেই বসিয়া রহিল।

ইন্দুর জ্ঞান হইলে তাহাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে ঘরে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিল।

সকলেই যে যার খাওয়া দাওয়া করিয়া বিশ্রাম করিতে গেল। মাতার কোন কথা না শুনিয়া ধীরেন না খাইয়া স্কুল চলিয়া গেল। যাইবে না ভাবিয়া ছিল কিন্তু সম্মুখে পরীক্ষা, না গেলেও চলে না, তাই সে একরকম ইচ্ছার বিরুদ্ধেই স্কুল গেল।

সমস্ত দিন অজ্ঞানের মত থাকিয়া ইন্দু বৈকালে একটু সুস্থ বোধ করিল। অতি কষ্টে ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া একটু বসিল।

হেমলতা তখন পাড়া বেড়াইয়া বাড়ী ঢুকিতেছিল। ইন্দুকে দেখিয়া বলিল, "কি গো! ব'সচ যে! উনুনে আগুন দিতে হবে না?"

হেমলতার মাতা ওঘর হইতে বলিলেন, "বল বাছা আজ রাঁধতে পারবে কি না,

নইলে আমাকেই মন্তে মন্তে রাঁধতে হবে।"

হেমলতা বলিল, "রাঁধতে আর পারবে না কেন মা? এমনই কি হ'য়েছে? না হয় পাদুটো একটু পুড়েই গ্যাছে। পা পুড়েছে তো হাতে কি হ'য়েছে! রাঁধবে তো হাত দিয়ে।"

ধীরে ধীরে ইন্দু বলিল, "রাঁধবো বৈকী ঠাকুর্ঝী। এই যে উনুনে আগুণ দিতে যাব এবার।"

স্কুল হইতে ধীরেন বরাবর মাষ্টারের বাড়ী পড়িতে যাইত। সেখানকার পড়া শেষ করিয়া ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লইয়া বাটী ফিরিতে ধীরেনের একটু বিলম্ব হইয়া গেল। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ইন্দুকে রাঁধিতে দেখিয়া সে অত্যন্তই বিস্মিত হইয়া গেল! রান্নাঘরের নিকট যাইয়া ইন্দুকে বলিল, "তুমি কেন রাঁধচ বৌদি! দিদি কোথায়?"

"আমি ভালই আছি ঠাকুরপো। এখন তো আমার কোনই কষ্ট নেই। তুমি মুখ হাত পা ধুয়ে এস; ওখানে জলখাবার ঢাকা আছে, খেয়ে নাও।"

ধীরেন সেখান হইতে একপাও না নড়িয়া ইন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইন্দু বলিল, "যাও ভাই শিগ্গীর মুখ হাত পা ধুয়ে এস। জলখাবারটা খেয়ে নাও। এবেলা আর রান্নার দেরী হবে না।" ধীরেন বলিল, "তুমি না আমায় একদিন ব'লেছিলে বৌদি', ছেলেবেলায় কষ্ট কাকে বলে তুমি জানতে না?"

ইন্দু একটু হাসিয়া বলিল, "এখনও তো জানি না ঠাকুরপো।"

"তুমি লুকুতে চেষ্টা ক'ল্লে কি হবে বৌদি'! তোমার মুখে যে সব প্রকাশ পেয়ে যায়। সেটাকে তো লুকুতে পারবে না।"

ইন্দু একটু হাসিল মাত্র।

রাত্রে আহারাদি করিয়া হেমলতা ও তাহার জননী শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন। ইন্দু রান্না ঘরেই আঁচল পাতিয়া শুইল। নড়া চড়ার দরুণ তাহার পায়ের বেদনাটা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহাকে

অত্যন্ত যন্ত্রণা দিতেছিল। সন্ধ্যার পর জ্বরের প্রকোপটাও খুব বাড়িয়াছিল।

অদৃষ্টের একঘেয়ে কথা না ভাবিয়া ইন্দু ভাবিতেছিল তাহার ছোট দেবরটীর কথা। ডাক্তারের বাড়ী হইতে ঔষধ আনিয়া ধীরেন গোপনে তাহা ইন্দুকে দিয়াছিল, পাছে অপর কেহ দেখিতে পাইয়া ঔষধটুকু ফেলিয়া দ্যায়। রাত্রে আহার শেষ করিয়া পড়িতে যাইবার সময় সে অনেক করিয়া ইন্দুকে শুইতে বলিয়া গিয়াছিল। ইন্দুর কষ্ট দেখিয়া তাহার চক্ষে জল আসিয়া গিয়াছিল।

শুইয়া শুইয়া ইন্দু কেবল এই সমস্তই ভাবিতেছিল। শ্বশুর বাড়ীতে এই দেবরটীই তাহার আশা এবং ভরসা। তাহাকে দেখিলেই ইন্দু মনে শান্তি পাইত। সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যাইত। এই আদরের ছোট দেবরটী ইন্দুর হৃদয়ের সমস্ত স্থানটী জুড়িয়া বসিয়াছিল। এই স্নেহের ছোট ভাইটীকে সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল।

পরীক্ষার পড়া শেষ করিয়া রাত্রি বারোটার পর শুইতে যাইবার সময় ধীরেন দেখিল রান্না ঘরে ইন্দু শুইয়া আছে। নিকটে আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, "বৌদি।"

ইন্দু ঘুমায় নাই। ধীরেনকে দেখিয়া উঠিয়া বলিল "এখন শোওনি ঠাকুরপো? অনেক রাত হ'য়ে গ্যাছে যে!"

ইন্দুর কপালে হাত দিয়া, ধীরেন বলিল, "এখন তো তোমার বেশ জ্বর র'য়েছে বৌদি! এখানে বুঝি দাদার জন্যে ব'সে আছ?" ইন্দু চুপ করিয়া রহিল।

ধীরেন বলিল, "দাদার যেমন! একটা বাজতে চল্‌লো এখন পর্য্যন্ত তাঁর দ্যাখা নেই। রুটীগুলো ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢেকে রেখে দাও না বৌদি'।"

"তাহ'লে রুটীগুলো ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে যে ঠাকুরপো। তোমার দাদা ঠাণ্ডা রুটী খেতে পারেন না, জান তো।"

ধীরেন একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ভারী লাট সাহেব রে! ঠাণ্ডা রুটী খেতে পারেন না। তুমি যদি এমনি ক'রে এখানে ব'সে থাক বৌদি, তাহ'লে আমাকেও এখানে

থাকতে হবে। বাড়ীশুদ্ধ লোকে ঘুমুবে আর তুমি যে একলাটি মেজেয় ব'সে থাকবে তা আমি সহ্য ক'র্ত্তে পারবো না।"

ইন্দু হেমলতার মুখে শুনিয়াছিল যে ধীরেন আজ কিছু না খাইয়াই স্কুল চলিয়া গিয়াছিল। ইন্দুর কষ্ট দেখিয়াই কিছু খাইতে পারে নাই।

ইন্দু বলিল, "তুমি যদি ঠাকুরপো আমার জন্যে এমনি ক'রে কষ্ট কর তাহ'লে কিন্তু ভাল হবে না ভাই। শুনলাম সকালে কিছু খাওনি; এবেলাও তেমন ভাল ক'রে খেতে পাল্লে না। আমার জন্যে এত কেন কষ্ট ক'চ্চ ঠাকুরপো? যাও শোওগে যাও। সামনে তোমার পরীক্ষা আসচে। এমন ক'রে কি কষ্ট করে?

"তুমি এত কষ্ট ক'র্ত্তে পার বৌদি আর আমি একবেলা না খেলেই কি মরে যাব। তোমার দুঃখু দেখে আমার মুখে যে কিছু ঢোকে না বৌদি।"

এইবার যথার্থই ইন্দু কাঁদিয়া ফেলিল। এত অত্যাচারেও ইন্দুর চক্ষু দিয়া জল বাহির হয় নাই। কিন্তু ধীরেনের আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়া চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

সহানুভূতি টুকুই ইন্দুকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল এবং এই টুকুই তাহাকে সময়ে সময়ে কাঁদাইয়া অস্থির করিত। সহস্র দুঃখ কষ্টের মধ্যেও মানুষ সহানুভূতির জন্য লালায়িত হয় এবং এইটুকু পাইলেই নিজেকে ধন্য মনে করে। নিজের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যায়।

ইন্দুরও হইয়াছিল তাহাই। সেই জন্য সে দেবরটীকে অত ভালবাসিতে পারিয়াছিল এবং অত আপনার করিয়া লইয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে ধীরেন বলিল, "তোমার সুরেশদা'কে কাল খবর দেব বৌদি? তিনি এসে তোমায় দেখে ওষুধের বন্দোবস্ত ক'রে যাবেন।"

ইন্দু একটু যেন চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিল, "না না ঠাকুরপো তাঁকে খবর দেবার দরকার নেই।"

"তাহ'লে এরকম ক'রে যে তুমি মারা

যাবে বৌদি।"

"ভয় নেই ঠাকুরপো, আমি ঠিক সেরে উঠবো। সুরেশদা'কে কিছু লিখ না, লক্ষ্মীটী। তিনি তাহ'লে ভেবে অস্থির হ'য়ে উঠবেন।"

(ক্রমশঃ)

'প্যারডি'।

(শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ নিয়োগী)

যদি, ভাঁড়ারে লুকায়ে রবে,
রাঁধিয়ে শুকায়ে যাবে,
গলায় দড়িটী কেন দিনু গো!
চরণ বন্দনা তরে,
অঞ্জলি ধরিয়ে করে,
ঘর বার করে' কেন মরি গো!
প্রিয়ে! চায়ের টেবিল তবে,
ফ্যান্ হাওয়া কেন রবে,
তুমি যদি সেথা নাহি এলে গো,

যদি, এ পাপী না পায় গতি,
কেন বল মহামতি,
এ অধমে দাস বলি' নিলে গো।
আনন্দে অনন্ত দুখ,
তবু নাহি হয় সুখ,
তোমার গুণের কথা বলি গো,
সকলিকি বৃথা যাবে,
বুড়ী মায়ে' লীন হবে,
হায়, বুড়ো গুলো কবে শেষ হবে গো,

তোমাতে আমাতে।

(শ্রীবিশ্বনাথ শেঠ।)

কুসুমের মাঝে সৌরভ যথা
কুমুদিনী মুখে হাসি
নীলিমার মাঝে যথা, চাঁদ হতে
ঝরে পড়ে সুধা রাশি,

প্রকৃতির সনে সুন্দর যাহা
মিশাইয়ে মিশিয়ে রে
তোমাতে আমাতে, হে মম সখা
তেমনেই তেমনে রে।

আমেরিকার বাণিজ্য প্রতিযোগিতা।

(শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

যে কেহ অতীব বিচক্ষণতার সহিত বাজারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, যদিচ,—যুদ্ধের সময় জাপানের ব্যবসায় আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ব্যবসায়কে বিশেষরূপে পরাভূত করিয়াছিল, তথাপি, যুদ্ধ স্থগিত কাল হইতেই আমেরিকা বাণিজ্যে জাপানকে অতিক্রম করিয়াছে। বাজারে জাপান এক্ষণে আমেরিকার নিম্ন স্থানে। আমেরিকা যে এক্ষণে বাণিজ্য ব্যাপারে অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। আমেরিকার শিল্পীগণ —অন্ততঃ কোন কোন বিষয়ে—বর্ত্তমান কালে অপেক্ষাকৃত নিম্নহারে এবং অনতি-বিলম্বে মাল সরবরাহ করিতেছে। পক্ষান্তরে, বিলাতী ব্যবসায়ীগণ এক্ষণে যুদ্ধবিপ্লবের পরিণাম বিশৃঙ্খলায় ও শ্রমিক সমস্যায় বিড়ম্বিত হইয়া পড়িয়াছে।

আমেরিকানরা ভারতে বাণিজ্য বিস্তারের যে প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে তাহা হইতে আমাদের অনেক বিষয় শিখিবার আছে। ভারতবর্ষের বাজার পৃথিবীর যাবতীয় প্রদেশের ব্যবসার স্থল। সে বাজার হস্তগত করিতে হইলে যে সুনিপুণ কার্য্যকুশলতা আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। এই মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আমেরিকার বাণিজ্যের তাদৃশ প্রভাব দেখা যায় নাই; পরন্তু, এক্ষণে আমেরিকার অনেক কোম্পানী এদেশে জমীজায়গা ক্রয় করিয়া, কল-কারখানা খুলিয়া দৃঢ়ভিত্তি সহকারে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, এবং দিন দিন সুচারুরূপে উন্নতি লাভ করিতেছে। এ বিষয় আরও দৃঢ় করিবার জন্য ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যপোত যাতায়াতের সুবিধা অধিকতর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ভারতে আমেরিকা-বাণিজ্য বিস্তারের উহা একটী

প্রকৃষ্ট পন্থা। তাহার পর আমেরিকান ব্যাঙ্ক সমূহ তথা হইতে মাল আমদানী করণে অর্থাদির দ্বারা কার্য্যতঃ সাহায্য করিতেছে। ইহা ছাড়া, আরও একটী সামান্য অথচ প্রয়োজনীয় বিষয় আমেরিকার পক্ষে হিতকর হইয়াছে। ইদানীং আমেরিকা হইতে বহু ব্যবসায়ী পর্য্যটক ভারতবর্ষ ভ্রমণে আগমন করিতেছেন। তাঁহারা এদেশ হইতে নানা প্রকার শিল্প-বাণিজ্যের তালিকা ও ব্যবসায় পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশীয় আমদানী কারক ব্যবসায়িদিগের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রচার করিতেছেন। এতদ্দ্বারা ভারতের সহিত ব্যবসায় ব্যাপারে তাহাদের আদান প্রদান ভালই চলিতেছে এবং ভারতের বিষয় অভিজ্ঞতাও জন্মিতেছে। ইহার উপর, আমেরিকার শিল্পিগণ তাহাদের ভারতীয় এজেন্টগণকে বিলাতী ব্যবসাদার অপেক্ষা অধিক হারে কমিশন ও সুযোগ সুবিধা দান করিয়া থাকে। ইহাও বাণিজ্য বিস্তারের এক প্রকার উপায়। আমেরিকার বণিকগণ ভারতে প্রতিভূ পাঠাইয়া অত্রস্থ আমদানী কারকগণের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেছে এবং তাহাদের দ্বারা আপন আপন পণ্যের বিজ্ঞাপনাদি প্রচার কার্য্যের সুবিধা করিয়া কতকটা খরচাও করিয়া থাকে। এরূপ ব্যবস্থাও আমেরিকার ব্যবসাদারদের এক প্রকার ব্যবসায়ী বুদ্ধি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বাণিজ্য ব্যবসায়ের কার্য্যালয় (office) গুলির সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা ও সুবন্দোবস্ত যে একান্ত প্রয়োজন তাহা জাপানী ও আমেরিকার প্রণালীর শক্তি-সাফল্যে দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। এবং আমেরিকাই Office organiser এর পদ, এক নূতন চাকুরী, সৃষ্টি করিয়াছে। কোন ব্যবসায় করিতে হইলে কি কি বস্তুর প্রয়োজন, কোন কোন উপায় অবলম্বন করিলে ব্যবসায় প্রতিযোগিতায় বাজারে ক্ষিপ্র গতিতে প্রসারিত হইবে ও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে, কিরূপ প্রণালীতে হিসাব পত্র করিতে হইবে, কোন পদে কিরূপ ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে হইবে, এই সকল বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা করা উক্ত Office

organiser এর কার্য্য। বিলাতে উক্ত কার্য্য বহুদিন যাবং accountant কর্ম্মচারীর দ্বারাই নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল। ইহাতে একব্যক্তিকে office এর যাবতীয় কার্য্য করিতে হইত বলিয়া সকল বিষয়েই সে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিত; কাজে কাজেই বিশেষ প্রয়োজনীয় ও চিন্তনীয় বিষয়গুলি সুচারুরূপে সমাধা হইত না। ইহাতে ব্যবসায়েরও সমূহ ক্ষতি হইত। ব্যবসায়ের সকল বিষয় শান্ত মস্তিষ্কে তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য স্বতন্ত্র উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকিলে, বিষয় বিশেষে কার্য্য করিবার জন্য বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী থাকিলেও কারবার সুব্যবস্থিত ও ক্রমোন্নত হইতে পারে না। আবার একজনের উপর ভাবিবার ও করিবার ভার থাকিলে উভয় কার্য্যই অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে; অথচ এ দুইটির মধ্যে একটীর পূর্ণতার উপর অপরটির পূর্ণতা নির্ভর করে। আর এই দুইটী কার্য্যের পূর্ণতাপ্রাপ্তির উপর ব্যবসায়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। আমেরিকায় কিন্তু, হিসাব নিকাষের মুহুরীগিরি চাকুরিয়ার কার্য্য বলিয়া, পূর্ব্বেও যেমন বর্ত্তমানেও তেমনই বলিয়া পরিগণিত। ব্যবসায়ে স্বার্থ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ এই প্রকার কার্য্যে লিপ্ত থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায় যাহাতে উন্নতি লাভ করিতে পারে তাহার জন্য উহারা সদাই সচেষ্ট থাকে। ইদানীং ব্যবসায়িদের office organisation এর প্রতি আগ্রহ থাকার দরুণ লোকে যে কেবল ঐ বিষয়ে পারদর্শী হইতেছে এমন নহে, বাণিজ্য প্রচেষ্টার সর্ব্ববিধ শক্তিলাভও করিতেছে।

এই মহাযুদ্ধের পর হইতে যুক্তপ্রদেশবাসীর এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে যে, পোত সম্বন্ধে তাহারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, এবং এতদর্থে তথায় বহুলপরিমাণে জাহাজ নির্ম্মাণ হইতেছে। তাহারা চায়,—তাহাদের নিজের দেশে নির্ম্মিত, স্বজাতীয় পতাকা শোভিত, স্বদেশী নাবিক পরিচালিত এবং দেশজাত দ্রব্য সম্ভারে পূর্ণ নিজস্ব পোত। তাহারা বলে, কোন জাতির আত্মরক্ষার জন্য ও তদীয় আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতির

জন্য এমন সকল সুগঠিত ও সশস্ত্র বাণিজ্য-পোত চাই, যদ্দ্বারা অধিকাংশ ব্যবসায় পরিচালিত হইতে পারে; অপিচ, জাতির সঙ্কট কালে রণতরীরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ এই মর্ম্মে ঘোষণা করিয়াছে যে, উক্ত প্রকার বাণিজ্য তরীর পরিবর্দ্ধন ও সংরক্ষণ করিতে যাহা কিছু করা প্রয়োজন তৎ-সমুদয়ই করা হইবে।

যদিও ভারতের ব্রিটিশ ব্যবসায়িরা অন্যান্য দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর সম্প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন বটে কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহারা অধিক পরিমাণে বিলাতী দ্রব্যেরই কারবার করিতেন। স্বভাবতঃ তাঁহারা এরূপ ব্যবসায় প্রত্যাশা করেন, যাহা সুনিশ্চিত ও অধিক লাভ জনক। কিন্তু ভারতের খরিদ্দারের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে বিলাতী দ্রব্যের পক্ষপাতী এমত নহে, যদিও বিলাতী দ্রব্য ভারতীয়ের পক্ষে এক সাম্রাজ্যজাত এবং যদিও উভয় জাতির মধ্যে পণ্য-বিনিময় উভয় পক্ষেরই উন্নতি বিধায়ক। ভারত বাসীর মন আমেরিকার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে ইচ্ছুক; কেননা জার্ম্মানীর পরই আমেরিকায় অল্পমূল্যে উত্তম জিনিষ পাওয়া যায়। এমনও মনে হয় যে, আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা (বিশেষতঃ এই সকল দ্রব্যে যথা—Iron, Steel, machinery, Tools, Hardware, Electrical supplies and motor vehicles) উত্তরোত্তর ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইবে।

একদিন ভারতের বাণিজ্যপোতও ভারতের পণ্য সম্ভার বহন করিয়া পৃথিবীর সকল দেশে গমন করিত, এবং সকল জাতিই এই সকল পণ্যের উৎকৃষ্টতায় মুগ্ধ হইয়া অধিকমূল্যে সাদরে ক্রয় করিত। তখন ভারত আমেরিকার মত স্বাধীন ছিল। পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-বর্ষের সব গিয়াছে। ব্যবসায়-বুদ্ধি, শিল্পনৈপুণ্য, গভীর-গবেষণা ও প্রচণ্ড উদ্যম, সবই আমেরিকার মত ছিল। এখন গোলামী ব্যতীত আর কিছু নাই। কিছু হবে কিনা কে জানে?

টানে সেই ডোর।

(শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যানিধি সেনাস্থব গীশ।)

(১)

বাল্যে যবে হীন-মম হিতাহিত জ্ঞান।
নাম শু'নে সুখময় সঁপিয়াছি প্রাণ॥
অসার কর্ম্মের তরে
ভুলিতে বলে তোমারে,
লোকে কি জানে না তুমি পরাত্মা মহান্
দীন চির দাস তব
তোমা ছেড়ে কা'র হ'ব
অনাদি অনন্ত তুমি গুরুপরায়ন্॥

(২)

থাকি সদা তব প্রেমে হইয়ে বিভোর।
শ্রীচরণ দাস আমি তুমি প্রভু মোর।
তুমি প্রাণ তুমি মর্ম্ম
তুমি জ্ঞান তুমি ধর্ম্ম
জীবের আমিত্ব তুমি তুমি চিত চোর।
তব পদে জীব প্রাণে
বাঁধা সদা কে না জানে
ছাড়ি বলে মনে হ'লে টানে সেই ডোর॥

হাসি!

(শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী।)

আপনার তুচ্ছ সুখে হাসি আমি যবে
বিশ্বের বিষাদ প্রাণে জাগায় ক্রন্দন
সবার কল্যাণ তরে অশ্রুজলে ভরে
কভু যদি আপনারে করি বিতরণ
অজ্ঞান বিষাদ হরা মধুময় হাসি
ফটে উঠে অচকিতে অন্তর উদ্ভাসি।

অনাহত নাদ।

(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—বি, এ।)

শোন, শোন, ঐ অনাহত নাদ।
বাজে জয় ডঙ্কা প্রাণে অকস্মাৎ।
সাগরের গুরু গম্ভীর গর্জ্জন।
দূর হতে ঐ কররে শ্রবণ।
শরতের মেঘ ডাকে গুড়্ গুড়্,
কাঁপে প্রাণ ভয়ে, করে দুড়্ দুড়্।
সহস্র কামান দাগে বার বার,
ভেঙ্গে ফেলে যেন পাঁজর দেয়াল।

বাজেরে মৃদঙ্গ ঘন করতাল,
মধু ঝিল্লি-রবে কররে মাতাল।
মন-প্রাণ হীন অবশ অধীর,
খসে পড়ে যেন শিথিল শরীর।
মুক্ত আসি শূন্যে ঝলসে ঝমকে,
চমকে চপলা পলকে পলকে।
কোটী সূর্য্য—জিনি' মহাপরকাশ।
লুটি' নিল মোরে করিল উদাস।

সত্যমেব জয়তি নানৃতং।

(শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ।)

জয় যুক্ত হয়—বিজয় মণ্ডিত হয়—সত্য; মিথ্যা কখনও জয়শ্রীকে আলিঙ্গন করতে পারে না। তা সকল কাজে—কি আধ্যাত্মিক রাজ্যে কি ব্যবহারিক জগতে। আত্মার পথে, আত্মার মুখে অগ্রসর হ'তে হলে সত্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রেই বিচরণ করতে হয়। সত্যের পাদক্ষেপে সত্যকামী হয়ে সত্য-সঙ্কুল পথ অতিক্রম করতে করতেই সত্যের মন্দিরে পৌঁছান যায়। যেদিক দিয়ে গেলে মিথ্যার ছবি প্রাণে জাগবে না,

মিথ্যার মাটীতে পদক্ষেপ করতে হবে না, মিথ্যা-দৃশ্য চক্ষে অবভাসিত হবে না, মিথ্যাটা বস্তুতঃ মিথ্যা হয়েই যাবে, অথবা সেটাও সত্য হয়ে দাঁড়াবে—সেই দিকেই সত্যের ভূমা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বিন্দুমাত্র মিথ্যার আভাস যদি প্রাণে জাগে বা জাগবার অবসর পায়, তবে সেই পরিমাণে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হওয়া হ'ল বলতে হবে। কিম্বা যেদিকে সে অবসর জাগে, সে পথটা ভুল পথ স্বীকার করতেই হবে।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের মত বা সুখ দুঃখ প্রীতি দ্বেষের মত সত্য মিথ্যা এ দুটো বোধেরই জিনিষ—বোধের প্রকারান্তর মাত্র। শুধু শব্দ স্পর্শাদি বা সত্য মিথ্যা কেন শব্দ মাত্রের দ্বারায় আখ্যাত যা'কিছু বা যা'কিছু বোধগম্য হয় বা বুঝি, সে সমস্তই আমাদের বোধের উপাদানে গড়া। "বুঝিলাম'' বললে, বোধ উপাদানে গঠিত কিছু পেলুম, এইটেই ঠিক মানে। ব্যবহারিক জগতে বা বাইরে যা কিছু আছে সেগুলো যে ভাবে আমাদের বুকে বোধ ফুটিয়ে দেয়, সেই অনুসারে তাদের নাম-করণ হয়। বাইরের একটা ফুল আমার নাসারন্ধ্রে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে উদ্রিক্ত ক'রে একটা সুগন্ধ বোধ আমাদের বুকের ভেতরে জাগিয়ে দেয় বলে আমরা ফুলটাকে সুগন্ধি ফুল বলি। বাইরের একটা ফল আমার রসনাকে উদ্রিক্ত করে মিষ্টতা বোধ ফুটিয়ে দেয় বলে আমরা সে ফলটাকে সুমিষ্ট বলি। রূপ রস শব্দ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যা কিছু সবটার বেলাতেই ঐ একধারা। আমাতে যেন বোধ বলে একটা সমুদ্র আছে বাইরে থেকে যেমন ঢেউ এসে তাতে লাগ্‌ছে সেই রকমেরই একটা ঢেউ আমাতে উঠছে আর আমরা সেই রকমটার একটা একটা আখ্যা দিচ্ছি বা যে ভাবের ঢেউ উঠছে বাইরের টাকে সেই ভাবের ঢেউ বলে ধরে নিচ্ছি। অর্থাৎ যেটা একটা রূপের ঢেউ তুলছে সেটাকে আমরা নাম দিচ্ছি রূপ, যেটা একটা শব্দের ঢেউ তুল্‌ছে সেটার নাম দিচ্ছি শব্দ।

আর সবগুলোই আমার বোধের ঢেউ

ভুলছে' বলে বাইরের ঐ গুলোও আমরা বোধেরই ঢেউ বলে চিনে নিয়েছি—অর্থাৎ বাইরের জগৎটা একজনের বোধের ঢেউ বলে সিদ্ধান্ত করেছি এবং সেই জন্য তাকে সমস্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কর্ত্তা এই আখ্যা দিয়েছি।

কথাটা আর একবার বলি,—আমি রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ অথবা জগৎ বা জগৎ-ধর্ম্ম বলে যা অনুভব বা বোধ কচ্ছি ও যা কিছু নিয়ে মেতে আছি, সেগুলো আমারই বোধের নানা আকারের ভঙ্গিমা মাত্র—এটা বেশ ভাল করেই আমরা বুঝতে পেরেছি। আমি মেতে আছি আমার বোধ নিয়ে আমি জাগছি ঘুমুচ্ছি জন্মাচ্ছি মরছি—আমার বোধে। আমি আমার বোধে গড়া স্ত্রীতে মত্ত হচ্ছি, পুত্রকে কোলে করতে গিয়ে আমার বোধে গড়া ছেলেকেই আঁকড়ে ধরছি, শত্রুকে মারতে গিয়ে আমার বোধ-গড়া শত্রুকেই তাড়া করছি। মৃত পিতার তর্পণ করতে গিয়ে আমি আমার বোধে গড়া পিতারই তর্পণ করছি। আর বাইরে যে স্ত্রী যে পুত্র যে শত্রু যে পিতা আমার বোধকে স্ত্রী পুত্র শত্রু ও পিতার আকারে গড়ে তুলেছিল অথবা আমার ভিতরে বোধের স্ত্রী বোধের পুত্র বোধের শত্রু বোধের পিতা গড়ে ছিল বলে, বাইরের তারাও যে বোধেতেই গঠিত বোধের পুতুল একজনের বোধের আকার প্রকার মাত্র এটা বুঝে নিয়েছি। তারা স্ত্রীর পুত্রর ফোটায় বলে তাদের যেমন স্ত্রী পুত্র বলি, তেমনই ঐ স্ত্রীর পুত্রর আমার বোধের উপাদানে গড়া বলে জানতে পেরেই ঐ বাইরের স্ত্রী পুত্রও যে বোধের উপাদানে গড়া সেটা বুঝে নিয়েছি।

তাহলে আমার ভেতরে ও বাইরে যা কিছু পেলুম, সেটা একটা জিনিষ—তার নাম বোধ। আর সেই সমগ্র বোধটা যার বোধ বা যে—তিনিই অন্বেষ্য; তিনিই আমাদের প্রাণের ঠাকুর বা আত্মা বা ব্রহ্ম।

কিন্তু একটা কাঠ দিয়ে জলে ঘা মারলে জলে যেমন কাঠের ঢেউ উঠে না জলেরই ঢেউ উঠে যদি তেমনি বাইরের জগৎটার অবস্থা হয় অর্থাৎ আমার বোধ আছে তাই বাইরের জগৎ যে ধাক্কাই দিক না কেন

আমাতেই বোধেরই ঢেউ উঠ্‌চে এই কথা বল্লে বাইরের জগৎটা অমীমাংসিতই পড়ে থাকে। এ আশঙ্কা ঠিক, পরে এটার নিরাকরণ করব। এখন আমাদের বাহিরটা বা অচেতনটা ছেড়ে শুধু আমি যে আমার বোধের লীলাতরঙ্গ নিয়েই মেতে আছি বোধই ভোগ করছি ও বোধকেই মাটী কাঠ আকাশ জল বা শত্রু মিত্র প্রিয় অপ্রিয় বলে দেখতে পাচ্ছি, এটুকু মনে রাখলেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ঠিক সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছাতে পারব।

তা'হলে আমরা এই পেলুম যে সত্য মিথ্যা এদুটা বোধের তারতম্য বা বোধেরই দুরকম আকার। আর একটা কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে। এই যে বাইরের জগৎ আমাদের বোধকে নানা রকমে গড়ছে ভাঙ্গছে কখনও প্রিয় বা ঈপ্সিত বোধ কখনও অপ্রিয় বা অনীপ্সিত বোধ ফুটিয়ে তুলছে এ বোধাবর্ত্তনে যদি আমরা সর্ব্বদা আমাদের প্রিয় বা ঈপ্সিত বোধকেই ফুটিয়ে রাখতে চাই, তাহলে দুরকমে আমাদের তার জন্যে সচেষ্ট থাকতে হবে। প্রথম আমার সেই ঈপ্সিত বোধের ছবিটা সর্ব্বদা বুকে ফুটিয়ে রেখে দিতে হবে, আর দ্বিতীয় বাইরের জগৎ থেকে যেখানে সেই রকম বোধ ফোটাবার তরঙ্গের অনুকূল স্রোত পাব সেইখানে সেইখানেই চোক ফেলতে হবে, তার প্রতিকূল বোধ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে, অথবা যদি সম্ভব হয় তবে বাইরের সকল ঢেউগুলোকেই অনুকূল ঢেউ করে তুলতে হবে। কার্য্যতঃ আমরা চেষ্টার সাহায্যে এইটেই বুঝতে পারি যে যতক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সজীব থাকে, ততক্ষণ তারা তাদের মত ঢেউ আনবেই আনবে অর্থাৎ চোক রূপ-বোধ ফোটাবে কান শব্দ-বোধ ফোটাবে জিহ্বা রসবোধ ফোটাবে ইত্যাদি।

এখন দেখা চাই—আমাদের সত্যবোধ। যতক্ষণ শরীরের বোঝা বইতে হবে ততক্ষণ বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছুটবে না এটা খুব পাকা কথা। আর ততক্ষণ ইন্দ্রিয়-গুলো তাদের স্বভাব মত ঢেউ আনবেই আনবে' যদি আমার প্রিয় বা ঈপ্সিত

সত্যবোধ সর্ব্বদা পেতে হয়, ভোগ করতে হয়, বুকে ধরতে হয়, তবে বাইরের ইন্দ্রিয়-বাহিত ঐ ঢেউগুলোকে "সত্য" ঢেউ বা "সত্যের" ঢেউ বলে ধরে নিতে হবে। যদি মিথ্যা দেখি বা সত্য নয় বলি তা হলেই মিথ্যাবোধ ফুটিয়ে তোলা হল, সত্য-বোধের অপলাপ করা হল বলতে হবে। আর এই সত্য চাওয়া বা সত্য পাওয়া মানেই যে কোনও রকমে সত্যবোধে জেগে থাকা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। বিশেষতঃ সত্য বলে যাকে আমরা ডাকছি খুঁজছি সে ঐ বোধ স্বরূপই বা তারই ধর্ম্ম—বোধ। ইন্দ্রিয় যত কিছু বোধই আমাতে ফোটায় সে সবগুলোই যখন বোধ, আর সেই বোধ-স্বরূপই যখন আমাদের ঈপ্সিত তখন তার উপাদানের দিকে চেয়ে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে করতে যাওয়াই ঠিক পথ। আর নাম-রূপের দিকে চেয়ে সেই নাম-রূপকে মিথ্যা মিথ্যা বলতে গেলে একটা মিথ্যা আকারের আবর্ত্তন রচনা করা হবে। বিশেষতঃ যখন নামরূপ এগুলোও বোধ ভিন্ন আর কিছু নয়।

(ক্রমশঃ)

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১১)

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়—বি, এ প্রণীত।)

একগাল হাসিয়া কিরণময়ী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "একটু উঠে ব'সবি অশ্রু ?"

অশ্রুও হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁমা, বোধ হয় আমি ব'সতে পারবো। রতনদাদাকে ডেকে দুজনে মিলে আমায় একটু বসিয়ে দাও।"

কিরণময়ী রতনের সাহায্যে অশ্রুকে ধীরে ধীরে উঠাইয়া সেই খাটের উপরেই বসাইয়া দিলেন। বালিশে হেলান দিয়া অশ্রু বেশ বসিয়া রহিল। কিরণময়ীও তাহার পাশে বসিয়া রহিলেন।

প্রায় আড়াই মাস ভোগান্তির পর আজ পনের দিন হইল অশ্রুর জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে অশ্রু বলিল, "এখন তো আমি সেরে উঠেচি মা। ওঁদের আর কষ্ট দিয়ে কি হবে!" "সেই কথাই আমি রতনকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছিলুম। দিদি ব'লেচেন, সে যা হয় করব তখন। তোমার মাকে ওসব বিষয়ে মানা কোরো।" রতন এসে আমায় এই কথা ব'ল্লে।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অশ্রু বলিল, "সে রাত্রে যদি ডাক্তারবাবু না আসতেন মা, তা'হলে কি হ'ত?"

"তাহ'লে কি আর তোকে ফিরিয়ে পেতুম অশ্রু? সুরেশই তো যমের হাত থেকে তোকে ছাড়িয়ে এনেচে মা!"

অশ্রুও সেই কথাই ভাবিতেছিল। সে রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সুরেশ যদি না আসিত, তাহলে অশ্রু কি আজ এই রকম করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিত। সুরেশের মনের জোর, আন্তরিক চেষ্টা, অক্লান্ত ও অবিশ্রান্ত সেবা সুশ্রূষাই তো অশ্রুকে মরণের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেক সময়ে সুরেশ হয়তো খাইতে বসিয়াছে কিংবা রাত্রে শয়ন করিবার জন্য ঘরে যাইতেছে, এমন সময়ে রতন গিয়া ডাকিবামাত্র সে কিরণময়ীর বাটী ছুটিয়া আসিয়াছে। অনেক দিন অনেক রাত্রি অনাহারেই অনিদ্রাতেই অশ্রুর পাশে বসিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। নিজের আরাম নিজের বিশ্রাম, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সে অশ্রুকে আরোগ্য করিয়াছে।

অশ্রু জানালার দিকে মুখ করিয়া এই সমস্ত কথাই ভাবিতেছিল।

তাহার এই পুনর্জীবন লাভের জন্য সে যে সুরেশের নিকট কত ঋণী, তাহা অশ্রু বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। কৃতজ্ঞতার ভিতর দিয়া সে যে সুরেশের দিকে আরও অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে, ইহা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল। সেইবার—যেবার সুরেশ কোন কাজের দরুণ দেশে চলিয়া গিয়াছিল এবং দেশ হইতে ফিরিয়া দুই একদিন জ্বরে ভুগিয়াছিল। সে কয়দিন

সুরেশ অশ্রুর কাছে আসিতে পারে নাই। কি চিন্তাতেই, কি ভাবনাতেই না সেদিন কটা অশ্রুর কাটিয়াছিল; সে কথা আজও সে ভুলিতে পারে নাই।

বিন্দুবাসিনীর মায়ের মত স্নেহ, মায়ের মত সেবা শুশ্রূষাও অশ্রু ভুলিতে পারে নাই। তিনি যখন তখন আসিয়া অশ্রুর পাশে বসিতেন; তাহাকে কত বুঝাইতেন, কত ভরসা দিতেন। অশ্রু যখন যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিত, কাঁদিয়া ফেলিত, তিনি অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতেন। অন্যমনস্ক করিবার জন্য কত কথা বলিতেন। কিরণময়ীকে তিনি কত সাহায্য করিতেন। এ সমস্ত অশ্রু কখনও ভুলিতে পারিবে না। এসব কথা তাহার যতই মনে পড়িত, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা অশ্রুর ততই বাড়িয়া যাইত।

কিরণময়ীও বোধ হয় এইরূপ অনেক কথাই ভাবিতেছিলেন। তাঁহার চিন্তার ধারা অশ্রুর চেয়েও দ্রুত, অশ্রুর চেয়েও গম্ভীর, অশ্রুর চেয়েও জটিল। সুদূর অতীতকাল হইতে অন্তহীন ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত তাঁহার চিন্তা বিস্তৃত। তাঁহার চিন্তা একটা নহে, তাঁহার চিন্তা অনেক।

এমন সময়ে ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া লজ্জার সহিত একটা আনন্দের ভাব অশ্রুর মুখে উজ্জ্বল আভায় ফুটিয়া উঠিল।

অশ্রু বলিল, "দেখুন কেমন ব'সেচি।"

সুরেশ সেই খাটেরই একধারে বসিয়া বলিল, "এইবার হাঁটতে শিখলেই হয়। তা কাল থেকে মা তোমার হাত ধ'রে 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করবেন এখন। কেমন মা করবেন তো?"

কিরণময়ী একটু হাসিলেন।

অশ্রু কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া মুখখানাকে রাঙা করিয়া বলিল, "আপনার সব কথাতেই ঠাট্টা। ঠিক বলচি আপনি কাল এসে দেখবেন আমি হেঁটে বেড়াচ্চি।"

সুরেশ বলিল, "দয়া ক'রে কালই আর ও চেষ্টাটা ক'রো না। আরও দুদিন যাক্। তা না হ'লে আবার আড়াই মাসের ধাক্কা।"

প্রফুল্ল মুখে কথোপকথনে নিযুক্ত কন্যা ও সুরেশকে দেখিয়া কিরণময়ীর অত্যন্তই আনন্দ হওয়া সত্বেও মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক জাগিয়া উঠিল। পূর্ণিমার রাত্রে এক খণ্ড মেঘ উঠিয়া স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাকে যেরূপ ঢাকিয়া দেয় কিরণময়ীর সেই বিমল আনন্দকে একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া সেইরূপ ঢাকিয়া দিল।

কিরণময়ী হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "এখন তো অশ্রু বেশ সেরে উঠচে বাবা; তুমি আর রোজ রোজ কষ্ট ক'রে নাই বা এলে।"

কিরণময়ীর দিকে ফিরিয়া একটু গম্ভীর হইয়া সুরেশ বলিল, "শুধু কি ডাক্তার ব'লেই আমি এখানে আসি মা? ডাক্তারী এবং কর্ত্তব্য ছাড়া আরও কিছু কি থাকতে নেই?"

আরও যে কিছু আছে, তাহা কিরণময়ী অনেক দিনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই এই কথাটা তিনি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন।

সুরেশের এবং কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু সুরেশ যে প্রত্যহ একবার করিয়া আসে, ইহাতে তাঁহার কিছুই আপত্তি ছিল না; বরং ইহাই তিনি মনে মনে ইচ্ছা করিতেন। শুধু কর্ত্তব্যের কশাঘাতেই এই কথাটী মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুরেশের ইহাতে কষ্ট হইয়াছে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "একবার কেন বাবা তুমি রোজ দশবার ক'রে এখানে এস। তোমার পাছে কষ্ট হয়, সেই জন্যই বলছিলুম।" সুরেশ বলিল, "এতদিন কোন কষ্ট হ'লনা আর এখনই কষ্ট হবে মা? যেদিন কষ্ট হবে সেদিন থেকে আর আসবো না।"

ইহার উপর কিরণময়ী আর কি বলিবেন? যথার্থইতো যাহার এতদিন কোন কষ্ট হয় নাই হঠাৎ এখনই বা তাহার কষ্ট হইতে যাইবে কেন? তবে তিনি যে কেন একথা বলিয়াছিলেন, তাহা একা তিনিই জানেন এবং জানে তাঁহার বৃদ্ধভৃত্য রতন। রতনই তাঁহাকে এবিষয়ে

সাবধান করিয়া দিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, "গোড়া থেকেই একটু সতর্ক হয়ো মা। কি আর ক'রবে বল, কপালে তো আর তোমার সে সুখ নেই।"

এ কথা সে কথার পর অশ্রু বলিল, "ইন্দুর কাছ থেকে কোন খবর পেয়েচেন কি।"

সুরেশ বলিল, "না। অনেক দিন তার কোন খবর পাইনি। তার কাছে একবার যাব মনে ক'চ্চি।"

"দুদিন বাদে তাহ'লে যাবেন। আমি একটু সেরে উঠি। আমিও আপনার সঙ্গে যাব। তার মনে কোন সুখ নেই, না? তার মুখ দেখলেই বোধ হয় সে বড় দুঃখী।"

বিমর্ষভাবে সুরেশ উত্তর করিল, "যার কোথাও একটা শান্তি নেই তার সুখ হবে কোথেকে? সে দুঃখী হবে না তো কে দুঃখী হবে অশ্রু?"

"ইন্দুর সঙ্গে এক ঘণ্টা কথা ক'য়েই আমি তা বুঝ্‌তে পেরেছিলুম। তার ঠিকানাটা আমায় দিয়ে যাবেন। একখানা চিঠি লিখব। তাকে দেখতে আমার বড্ড ইচ্ছে করে। সে যখন সেই কাঁদ কাঁদ মুখখানা ক'রে আমার কাছ থেকে উঠে গেল, আমার তখন বড্ড কষ্ট হ'য়েছিল।"

ইন্দুর কথা ভাবিলেই সুরেশের অত্যন্ত দুঃখ হইত। তাই সে এ সব কথা বেশী দূর অগ্রসর হইতে না দিয়া বলিল, "যে যেমন কপাল নিয়ে জ'ন্মেচে তাকে তো তেমনি ভোগ ক'ত্তে হবে। যাক্ সে কথা। পরিবর্ত্তনের জন্যে কোথাও যাবে না অশ্রু?"

অশ্রু বলিল, "কোথায় আর যাব? ক'লকাতা ছাড়া আমাদের তো আর যাবার স্থান কোথাও নেই।"

কিরণময়ী একটা কি কাজের জন্য নীচে গিয়াছিলেন। বিন্দুবাসিনী আসায়, তাঁহাকে লইয়া উপরে আসিলেন। বিন্দুবাসিনীকে দেখিয়া অশ্রু বলিয়া উঠিল, "আর আপনার কোন কথা শুনবো না। আজ আমায় পায়ের ধুলো দিতেই হবে।"

বিন্দুবাসিনী একটু হাসিয়া অশ্রুর পার্শ্বে ব'সলেন। অশ্রু ক্ষীণ হাত দুটী বাড়াইয়া

দিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিল। বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "বেঁচে থাক মা। জন্ম এয়োস্ত্রী হও।"

অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তার পর বলিলেন, "অশ্রু আরও একটু বল পেলে চল না মা আমরা সবাই মিলে দেশে যাই। তোমার একটা পরিবর্ত্তন হবে আর আমাদের একবার দেশে যাওয়া হবে।"

অশ্রু বলিয়া ফেলিল, "সেই বেশ হবে। আমার কেমন একটা নূতন যায়গা দেখা হবে। ইন্দুকে কিন্তু সঙ্গে নিতে হবে।"

সুরেশ বলিল, "নিশ্চয়ই, ইন্দুর যে রকম শরীর হয়েচে তাকেও নিয়ে যাব বৈকী। যাবে মা?"

বিন্দুবাসিনী বলিলেন "সেই কথাই আজ ব'লতে এসেছি। যাবে দিদি?"

কিরণময়ী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে সুখ তো আমার কপালে নেই দিদি। ও সুখ থেকে আমি যে অনেক দিন বঞ্চিত হ'য়েচি।"

বলিয়াই তাঁহার চক্ষুদ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিল।

সেই পুরাণ বেদনায় গিয়া আঘাত লাগিয়াছে বিন্দুবাসিনী ইহা বুঝিতে পারিয়া আর সে কথা উত্থাপন করিলেন না। সুরেশও আর কিছু বলিল না। অশ্রুও যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

দাও মা সন্তানে বিমল জ্ঞান। *

(শ্রীযুক্ত [illegible] বিরচিত)।

আজি গো জননী সরোজবাসিনী
পূজিতে তোমারে অধীর প্রাণ।
ভক্তি-সিক্ত কণ্ঠে গাহিতে তোমারি
সরস পূত মহিমা গান॥

প্রকৃতি সুন্দরী সবুজ অঞ্চল
পাতিয়া রেখেছে মাখি পরিমল,
নন্দিতে তোমায়, পাদপ শাখায়
বিহগ গাহিছে মধুর তান॥

---

* সরস্বতী পূজা উপলক্ষে শিক্ষিত যুবকবৃন্দ কর্ত্তৃক গীত।

(কোরস)

চাহিনা জননী বীণাপাণি,
চাহি না তুচ্ছ সম্পদ দান।
এই ভিক্ষা শুধু যাচি মা চরণে
দাও মা সন্তানে বিমল জ্ঞান॥

তোমারই করুণায় একদা ভারত,
লভেছিল বিশ্বে মহৎ মান।
গিয়াছে সেদিন স্বপনের মত
রয়েছে হৃদয়ে স্মৃতির বাণ॥

কি দিয়ে জননী পূজিব তোমায়,
মথিত হৃদয় সহস্র জ্বালায়।
তোমার কার্পণ্যে, গভীর দৈন্যে
ডুবিয়ে রয়েছি নীরস প্রাণ॥

(কোরস)—চাহিনা জননী, বীণাপাণি
ইত্যাদি—

ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য গরিমা,
নিশার অলীক স্বপন মত।
জানিনে জননী কোন মহাপাপে
হয়েছে পরের আয়ত্ব গত॥

গিয়াছে সম্পদ, যাক শতবার,
তোমার করুণা যদি পাই আবার,
জীবন সার্থক মানিয়া লইব,
করিব নিয়ত তোমারি ধ্যান॥

(কোরস)—চাহিনা জননী, ইত্যাদি—

অতীব সঙ্কটে পতিত আমরা
অশান্তি অনলে জ্বলিছে দেশ।
জানিনা জননী কখন কোথায়
সাফল্য হইবে, হবে কি শেষ?

হবে কি প্রভাত এ ঘোর রজনী,
সত্যের আলোক ফুটাও জননী,
দাও মা শান্তিতে করিতে তোমার
মঙ্গল-নিদান পীযুষ পান॥

(কোরস)

চাহিনা জননী বীণাপাণি,
চাহিনা তুচ্ছ সম্পদ দান।
এই ভিক্ষা শুধু যাচি মা চরণে
দাও মা সন্তানে বিমল জ্ঞান॥

হংসবাহনা সরস্বতী।

বঙ্গে আজ আনন্দ উৎসব। কি যেন এক প্রাণের টানে খরস্রোতা নদীর মত বিভিন্ন গতিতে বঙ্গের জীবন নদী ছুটিয়াছে এক মহান্ উদ্দেশ্য বক্ষে লইয়া ভিতর দিয়া এই বিশ্ব জগতের। সুপ্তির অবসানে নবজীবনের মত, ঘনীভূত অন্ধকার বিগলিত করিয়া প্রাচ্যাকাশে ঐ যে তরুণ তপনের রাগরক্তিমচ্ছটা আভাত হইয়া উঠিতেছে। মানস পক্ষিকুলের কলকূজন হৃদয়গগন মুখরিত করিতেছে, মর্ম্মতন্ত্রী ঐক্যতানে ঝঙ্কারিত হইতেছে। কর্ম্ম সমীরণ ঝঙ্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া কলকূজনের তালে তালে ভারতাকাশে প্রবাহিত। নির্ম্মল দিক্, প্রসন্ন সলিল, বিমল আকাশ, শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার অপূর্ব্ব শোভা ফল-ফুলেই প্রকট। আম্রমুকুলে ভ্রমরগুঞ্জন ভাবুকের ভাবব্যঞ্জনা করিয়া যেন কাহার আগমন বার্ত্তা প্রচারের জন্য উদ্‌গ্রীব। প্রশান্ত সাগরের অনন্ত সলিল "সীমান্ত প্রসারিতার" মধ্য হইতে অসীমতার পরিচয় প্রদানে স্থির। জাহ্নবীর কলতান "বিভিন্ন প্রাকৃতিক চিত্তবৃত্তির" যেন আকর্ষক। যেন কি এক আহ্বান "নেপথ্যশ্রুতদৈববাণীর মত" দেশ-প্রাণতার মধ্য হইতে বিশ্ব-প্রাণতাকে ফুটাইতে ভারতগগনে মুখরিত।

তাই আজ বাসন্তী পঞ্চমীর পূজা। এ আহ্বান বাসন্তীরই। দেবী বাসন্তীই হৃদয়ের ঐক্য-বিধানে সমর্থ। নিখিল মানবের প্রতিকূল-গামিনী চিত্তনদীর খর-স্রোতকে বিশ্বের অনুকূলে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতে বাসন্তীই উপযুক্ত। তাই এই সুদূরগগনে বাসন্তীর আহ্বান। তাই আজ প্রতিগৃহে ফলফুল-শোভিনা বাসন্তী পঞ্চমীর অর্চ্চনা।

মা বাণী বসন্ত-শোভাদায়িনী বাগ্দেবী তপ্ত-হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিতে ঐ যে সরোজ-চরণা বীণাপানি ত্রিভঙ্গঠাম-সুন্দরী

নীলবসনা সরস্বতী হংসবাহনে প্রতি-হৃদয়ে প্রকট। এ আহ্বান যে তাঁরই। ঐ যে বিদ্যুদুজ্জ্বলস্মিত চৈতন্যরূপিণী পুঞ্জীভূত হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে বীণা-মুখরমর্ম্মে আনন্দ প্রদান করিতেছে। বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তি যে, ঐ শব্দেই অন্তর্ম্মুখী হইয়া একনিষ্ঠতা লাভ করে। তাই তো 'মা' বীণাপাণী। তিনি হস্তে বীণা ধারণ করিয়া তাহার প্রতি ঝঙ্কারে সুপ্তবিশ্বে নবচেতনা আনয়ন করেন। সে ঝঙ্কার উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে স্থির ও নিয়মিত করিয়া দেয়। অনাদি-কাল-পরম্পরায় প্রবাহিত সে ঝঙ্কার প্রতিনিয়ত প্রতিমর্ম্মে ঝঙ্কারিত। প্রতিক্ষণেই এই কর্ম্মকোলা-হল হৃদয়ের মধ্যে 'সোঽহম্' শব্দে ধ্বনিত হইয়া প্রণবে বিলীন হইতেছে। অনাহত চক্র হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্রার পর্য্যন্ত এ ধ্বনির স্থান। বায়ু-বিতাড়িত সমুদ্রের মত কর্ম্মক্লান্ত হৃদয়ের উদ্বেল নষ্ট করিতে এ ধ্বনিই সমর্থ। এ ধ্বনিই ভ্রান্ত জীবনে ধ্রুব তারা। এ ধ্বনি অশান্তজীবনে শান্তিধারা। এ ধ্বনিই তপ্ত উষর হৃদয়ে আশারবারি। এ ধ্বনি অনন্তের পথে একমাত্র বন্ধু। ইহারই অবলম্বনে অসীমতার দিকে অগ্রসর হইতে হয় এবং আশ্বস্ত হওয়া যায় যে, এবার নিশ্চয়ই যথার্থ গন্তব্যে পৌঁছাইব। তাই তো মনে হয়—

সে ধ্বনি শুনিয়া হৃদয় পাষাণ গলিল রে
দূরে গেল মান অভিমান।

মা সাকারে বীণাপাণি নিরাকারে ঝঙ্কারময়ী অশান্ত ভ্রান্ত সন্তানকুলকে কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্য হইতে স্বান্তর্ম্মুখ করাইবার জন্যই বীণাবাদনে তৎপরা। ঐ শুনায়ে যায়—

জীবন মাঝার, তুলিয়া ঝঙ্কার
বাজে গো বাণীর বীণ।

তাইতো এই—

প্রেমভরে গেছে সারা বিশ্বপ্রাণ
তানের তরঙ্গে কম্পিত বিমান
সুরে পেলে প্রাণ অচল পাষাণ
রাগে মন্ত্রমুগ্ধ স্তব্ধ লোক তিন।

মা আমার জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, ভূধরে, গগনে, তরুলতায়, গুল্মে, সাগর-

বক্ষে, আকাশ-কক্ষে, শষ্পে, উষর-ক্ষেত্রে, ফলে, ফুলে, সর্ব্বত্র সমভাবে চৈতন্যরূপে অবস্থিত। মার অভিব্যক্তি ঐ যে প্রতি-স্পন্দনে সারা বিশ্বের মধ্য হইতে প্রতি-ফলিত হইতেছে। ঐ যে শীহরণ পুলককম্প, ঐ যে ভাব-প্রস্রবণের স্নিগ্ধ-ধারা।

ঐ যে বিশ্বজনীনতার মধ্য হইতে মার আহ্বান—

খঞ্জ উঠে দাঁড়াও, অন্ধ দেখ চেয়ে
বোবা কও কথা গলুক পাষাণ।
মৃত প্রাণ পাও, সুপ্ত জেগে উঠ
হৃদয় যমুনা বহুক উজান॥

আবার উচ্চস্বরে ঐ আসে প্রাণের মধ্য দিয়া ভাবমন্দাকিনীর তরঙ্গে ভাসিয়া ঐ যে—

কিসের ভাবনা, কেন এ দৈন্য
কেন রে তোদের বিষাদ মুখ।
কিসের শ্রান্তি, কেনরে, ক্লান্তি
কিসের মালিন্য কেন এ দুখ্॥
আয় মোর কাছে, আমি যে জননী,
খেলা ছেড়ে আয় পাবিরে সুখ।
পথধূলা ঝেড়ে, সব কোলে তুলে
প্রেমে ভরে যাক হৃদয় বুক্॥

কি আদর মাখা কথা, কি গর্ব্বের কথা, কি আশ্বাসবাণী, ঐ যে মুখর হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত। "সোঽহং তত্ত্বমসি" "সোঽহং তত্ত্বমসি"। মা বাণী অশরীরী চৈতন্যরূপিনী "সোঽহং" অবলম্বনেই হৃদয় বিমানে প্রকট। তিনি তাই সোঽহং জ্ঞানেই অভিব্যক্ত। হৃদয়ের সোঽহং ভাব শ্বাস-প্রশ্বাসেও প্রতিনিয়ত পরিস্ফুট হইতেছে। যাহা বহিঃশ্রবণে হংসধ্বনি, এই হংসরূপ বা অজপামন্ত্রই আন্তর্দৃষ্টিতে সোঽহং তত্ত্বমসি। সমাহিতমনাঃ মানবই এ দর্শনের অধিকারী। সুতরাং অন্তরের গভীর ভাবপুঞ্জ বাহিরে প্রকট করিতে মা বাণী প্রাণরূপিণী হংসজপেও অভিব্যক্তা। তাইতে মা স্থূল দৃষ্টিতে ভারতে ভারতী হংসবাহনা সরস্বতীরূপে লোকচক্ষে প্রতীয়-মান হইয়া অন্তরের ভাব ব্যঞ্জনা করিতে-ছেন। এই জন্য বাহিরে মা হংস-বাহনা। তাই নিশার অবসানে সুপ্তোত্থিত ব্রাহ্মণ সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী ঋগ্বেদরূপা কুশহস্তা

কুমারীকে ব্রহ্মরূপা গায়ত্রীরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন। যেমন ঘনীভূত নৈশ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া প্রাচ্যাকাশে সূর্য্যদেব উদিত হন, সেইরূপ অজ্ঞান অন্ধকার নষ্ট করিয়া সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী মা হৃদয় আকাশে সমুদিত হন, তাঁহার দিব্য প্রভায় হৃদয়-গগন উদ্ভাসিত হয়। সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার চিরতরে অপসৃত হয়। সে আলোকে তখন নিজের বস্তু কুড়াইয়া পাওয়া যায়। তাই মা প্রাতর্ধ্যান-মূর্ত্তি দিব্যালোকপ্রতিমা ব্রহ্মরূপা গায়ত্রী সরস্বতী। তিনি কুশ হস্তে সুপ্ত ভাবকের শিয়রে শিয়রে অবস্থান করিয়া সস্নেহ আহ্বানে আহ্বান করেন।

"বৎসগণ! উঠ, আমি তোমাদের জন্য কুশ আনয়ন করিয়াছি, আমি শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুরূপে তোমাদের শিয়রে উপস্থিত, তোমরা —

"সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং
গুরুমুপসদেৎ,"

এই বাক্যের সার্থকতা রক্ষা কর, আমি তোমাদের গুরু, জন্মের পূর্ব্বেও ছিলাম এবং পরেও আছি, অশরীরী বাণীরূপে তোমাদের জিহ্বাগ্রে অবস্থিত, আবার চৈতন্যরূপে তোমাদের মন বুদ্ধিকে পরিচালিত করি, আমিই সুষুপ্তি সময়ে ছিলাম আবার জাগরণেও নিয়ন্ত্রীরূপে বর্ত্তমান আছি। তোমরা না চাহিলেও আমি কিন্তু তোমাদেরই ভিতরে থাকিয়া ধীরে ধীরে জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়া দেই, এবং গন্তব্যের পথে আলোক ধরিয়া যাবতীয় বিপদ হইতে রক্ষা করি।

"জাগ বৎস! আমি এই যে হৃদয়াকাশে প্রভাত আলোক। এই যে আমি হৃদয় নির্ম্মল করিয়া দিতেছি, ভয় কি! কেন—মলিন কেন, হতে পারে শত অপরাধ, কিন্তু আমি যে জননী। সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিব। তোমরা একবার পুঞ্জীভূত হৃদয়ের ঐকতানে মা বলিয়া ডাক, আমার হৃদয় ভরিয়া যাক।"

এতক্ষণ তো বাণীর বাণী এত আকাঙ্ক্ষার এত স্পৃহার। এত তপ্ত হৃদয়ের শান্তি-প্রস্রবণ। তিনি করুণার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁর করুণার কণা মাত্র

করিলে বোবাও বাগ্মী হয়। মূঢ়ও বিদ্বান্ হয়। পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে। জড় কর্ম্মশীল হয়, পাষাণ পুলকিত হয়। হৃদয়ের সূচীভেদ্য অজ্ঞান অন্ধকার আলোকভয়ে দূরে পলায়ন করে। অশান্ত হৃদয় নির্বাত প্রদীপের মত প্রশান্ত হয়।

জ্বালাজটিল সংসারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ হয়। তাঁহার কৃপা-মন্দাকিনীর বিমল সলিল চিরনির্ব্বেদ প্রদান করে। তিনি কল্যাণবাহিনী জননী "সরস্বতীরূপে" সংসার আবর্ত্তে পতিত মানবের মানস তৃণকে স্বানুকূলে ভাসাইয়া লইয়া যায়। এইজন্য তিনি নামে সরস্বতী।

তিনি রসরূপা। তিনি চিন্ময়ী। তিনি ব্রহ্মাস্বাদসহোদরা। অনুকূল-গামিনী নদী সরস্বতী যেমন বিভিন্ন গথানুবর্ত্তী নদ-নদীকে সঙ্গিনী করিয়া বিবিধ বস্তুকে দৃঢ় স্রোতে ভাসাইয়া তরঙ্গবিহীন প্রশান্ত সাগরের সলিলে মিশাইয়া দেয়, মা কল্যাণবাহিনী জননী সরস্বতী উচ্ছৃঙ্খল জ্বালাজটিল মানবজীবনকেও সেইরূপ বিবিধ রুচির মধ্য হইতে পুঞ্জীভূত করিয়া প্রশান্ত চিৎসাগরের মধ্যে মিশাইয়া দেয়। আর যন্ত্রণা থাকে না। আর শোক তাপ আসিয়া বিহ্বল করিতে পারে না। আর মালিন্য কালিমা হৃদয়কে মলিন করিতে পারে না। আর বাসনাতিক্ত হৃদয়ে বুদ্ধির বিস্বাদ হয় না। কেবল শান্তি। পূর্ণ নির্ব্বাণ। তাই তিনি বাণী, তাই তিনি বীণাপাণি, তাই তিনি সরস্বতী। তাই তিনি হংসবাহনা।

ছুটে এস কোথা আছ কে অশান্ত
প্রেম প্রস্রবণে করিতে স্নান!
মা রবে ডাকিয়ে পাষাণ গলায়ে
জাগায়ে নিখিল ভারত প্রাণ॥
ভেদাভেদ ভুলি বাধা বিঘ্ন ঠেলি
স্ফীত বক্ষে ধরি মিলন তান॥
বিজয়ীর মত এস লক্ষ্য স্থলে
পুলকে ভারত গাউক গান॥

তবে আর চিন্তা কি। এস এ জ্বালাজটিল সংসারের তুচ্ছ মান যশে মুগ্ধ হইয়া অনুবন্ত ভোগলালসায় আর জীবন মন বিক্রীত করিও না। এস মাতৃ আহ্বানে কর্ণপাত কর। ঐ বিশ্বের প্রতি ছন্দে তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী মূর্ত্তির অনুধ্যান কর

আর এই দিব্য মূর্ত্তির চরণপ্রান্তে বসিয়া ভাবাশ্রু-পরিষিক্ত হৃদয়ে কোটি কণ্ঠে বল, সগর্ব্বে বল, নির্ভয়ে বল—

দাও মা শক্তি কিসের মুক্তি
চাইনা অমন থাকিতে ;
ভকতি পূর্ণ বিশ্ব হৃদয়ে
তোমারে পাইব দেখিতে ॥

যম।

(শ্রীমনীন্দ্রনাথ দে।)

আজ সাধারণকে যমের উচ্চপ্রাণত্ব ও সমদর্শিত্বের কথা শুনাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। যমের পুরাতন কাহিনী নূতন করিয়া বলিতে যাইতেছি। যমের সমদর্শিতার কথা কে জানে না? যমের কিছুতেই অরুচি নাই। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ উদ্ভিদ, প্রস্তর, প্রভৃতি স্থাবর ও জঙ্গম কোন পদার্থতেই যমের অরুচি নাই। যম মহাকর্ম্মকারের ন্যায় সকল পদার্থকেই অবিরত রূপান্তরিত করিতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র গ্রহ, নক্ষত্র, ক্ষিতি, জল, বহ্নি, বায়ু—ইহাদের উপরও যমের দংশন আছে। সুশ্রী, কুশ্রী, কোমল কঠিন কোন কিছুরই বাছ বাছি যমের নিকট নাই। কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল সবই যমের মহাক্ষুধার নিকট মধুর; এইত যমের ব্যবহার। তিনি চণ্ড হইতেও চণ্ডতর, হিংস্র হইতে হিংস্রতর।

এত কঠিনপ্রাণ যমকে লোকে ধর্ম্মরাজ বলে কেন? যমের উপর এই উচ্চপ্রাণত্বের আরোপ কেন? বাস্তবিকই যম ধর্ম্মরাজ। যম ত অন্য কেহ নয়—মৃত্যুই যম। সত্যই, মৃত্যুচিন্তা মানুষকে ধর্ম্মের পথে ঠেলিয়া দেয়। মানুষের ভিতর মরিবার ভাবনা জাগিলেই, বিষয়াশক্তি কমিতে থাকে, অন্তর্দৃষ্টি স্ফুরিত হইতে থাকে, বৈরাগ্যবহ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। তখন মানুষের আসল দিকে চোখ পড়ে। তখন মানুষ ঠিক বুঝিতে পারে—"আমি যে আমার আমার করি, আমার

ছেলে, আমার স্ত্রী, আমার বিষয়, আমার বাড়ী বলি; বিদ্যা,ধন, গায়ের বল, লোক-বল প্রভৃতির অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করি;—এসব এক ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে। আমার সকল দম্ভ শ্মশানে চিতা-ভস্মে গিয়া আশ্রয় লইবে। এইরূপে বৈরাগ্যপূর্ণ আত্মচিন্তা জাগিলেই মানুষের জ্ঞানলাভ হয়, মানুষ সচ্চিদানন্দের প্রেমে ডুবিয়া যায়, আনন্দে মাতামাতি করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়ে। যম তখন ছাড়িয়া দেয়। সচ্চিদানন্দের প্রেমে মগ্ন হইলে আর মৃত্যুভয় থাকে না। তখন ভিতরের মানুষটি নিজেকে চিনিতে পারে—শরীরের রূপান্তরে ভয় পায় না। তখন মানুষ বুঝিতে পারে "আমি শরীর নই"। যতক্ষণ আসল দিকে চোখ পড়ে, ততক্ষণ মরণের কথা মনে পড়িলেই বুকটা হিম হইয়া যায়।

মরণ না থাকিলে আমাদের অত্যাচারে পৃথিবী বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িত। দুরন্ত অত্যাচারিদিগকে, যখন আর কেহ শান্ত করিতে পারে না, তখন যমই একমাত্র শাসক। দুর্ব্বলদিগের হৃদয় যখন দুষ্ট-দিগের পীড়নে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হয়, তখন তাহাদের ত্রাস দূর করিতে, তাহাদের কান্নামুখে হাসি আনিতে যমই শেষ শরণ। সকল অহঙ্কারই যমদণ্ডে চূর্ণ হয়।

কালই যম। কালের নিকট কাহারও চালাকি চলে না। কালের শাণে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় না এমন কি আছে? সুরূপ যুবক ও সুন্দরী যুবতী যখন রূপের গর্ব্বে মত্ত হয়, তখন কাল অট্টহাস্য করিতে থাকে,—রূপমূঢ় যুবক যুবতী সে হাসি শুনিতে পায় না। কুঞ্চিত কেশ, নটবর বেশ, মুক্তা দশন, কাঞ্চন-ভূষণ, সমুন্নত বক্ষঃ ও বিলোল কটাক্ষ—সব ঘুচিয়া যায়। কাল প্রতিমুহূর্ত্তে ইঙ্গিত করিতেছে "নেশা ছাড়", কিন্তু কালের সে ইঙ্গিত আমাদের চোখে পড়িয়াও পড়ে না।

কালের ভেরী নিয়ত বাজিতেছে। কালের চণ্ডলীলা অহর্নিশ চক্ষুর সম্মুখে চিত্রিত হইতেছে। এই যাহাকে দেখিলাম, পরক্ষণে আর সে নাই। ধর্ম্ম ঢক্কানিনাদের দ্বারা সর্ব্বদাই জানাইতেছে "সন্ধিক্ষণেই

আর বিলম্ব নাই, বলির জন্য প্রস্তুত হও।” আমরা কিন্তু এম্‌নিই বধির যে, সে ভেরী-ধ্বনি ও ঢক্কানিনাদ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে না। আমরা এম্‌নিই চোখ থাকিতেও অন্ধ যে, কালের চণ্ডলীলা দেখিয়াও দেখি না। সবাই মরিতেছে, কিন্তু আমরা মরিবার কথা একটিবারও ভাবি না—কেবল কামকাঞ্চনের মোহমদিরায় অসাড় হইয়া পড়িয়া আছি।

পাগলের কথা।

(শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

চাটুজ্যে মহাশয় খিঁখিঁয়ে মেজাজের লোক। তিনি হন্ হন্ করিয়া রাস্তায় চলিতেছেন।

আমি।—চাটুজ্যে মশাই—চাটুজ্যে মশাই—ও চাটুজ্যে মশাই! আজ কোথায় যান?

চাটুজ্যে।—যমের বাড়ী, আর কোথায়? শালার আর পেছু ডাক্‌বার সময় হ'লনা। আজ এঁকে পথে-ঘাটে বিপদ, অফিসে সাহেবেরা চোটে লাল হ'য়ে আছে, আর এই আপদ ঘটালে। দুর্গা! দুর্গা! আমি যেখানেই যাইনা রে শালা, তোর বাবার কি?

আমার সঙ্গী মাতাল বলিল—বাবার কিছু না থাক্‌লেও আমার মা, অর্থাৎ তোমার ভার্য্যার কিছু কিছু যায়-আসে বৈকি? এই হরতালের দিনে, দশধর্ম্মের বিরুদ্ধে কাজ করাটা কি ভাল?

চাটুজ্যে।—ওঃ, বেটারা হরতাল করেছে! বেটারা যেন কত নবাব, তাই ওদের হুকুম মেনে আমায় চাক্‌রী ছাড়্‌তে হবে। আমার চাক্‌রী গেলে আমার মাগ-ছেলে যে উপবাসী থাক্‌বে, হরতালওয়ালারা তার কিছু উপায় ক'রে দেবে কি? এক পয়সার মুরোদ নেই, লম্বা-চওড়া চাল আছে। বলনা রে শালা বলনা, চুপ ক'রে রৈলি যে?

আমি।—বাবা, উপবাস করাটা কি তোমার কাছে নূতন ঠেক্‌ছে? ভিক্ষা-জীবিদের পেট কবে ভোরেছে—না

কখনও ভোর্‌বে? তবে এ সময় দুটো জোর উপবাস কর্‌লে হয়তো ভবিষ্যতে আর খাবার ভাবনা নাও থাক্‌তে পারে। তাই বল্‌ছিলাম। যাগ্‌ আর বে-আইনী কর্‌বো না। এ ক্ষেত্রে চুপ ক'রে থাকাই আইন-সঙ্গত। এখন তুমি কাজে যাও। নচেৎ, বেশীক্ষণ চুপ ক'রে থাকা আইনে সৈলেও আমার ধাতে সৈবে না। আর ঈশ্বর করুন, চাক্‌রীর সুখে তোমার বংশ-পরম্পরার একচেটিয়া অধিকার থাক; আর 'মাসকাবারী' ব্যবস্থা তোমার বংশের অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ চিরকাল বজায় থাক।

চাটুজ্যে মহাশয় রাগে গর্‌ গর্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, মানুষ বলিলে যাহা বুঝায় তাহা অতীব বিরল। যাহা দেখিতেছি—তাহা তো মানবাকারের একশ্রেণীর পশুবিশেষ। তবে কেন ইহাদের ভিতর আশা অভিলাষ প্রভৃতি মানবোচিত প্রবৃত্তির লক্ষণ দেখা যায়? এ সকল যদি ভগবান্‌ দিয়াছেন তবে তদুপযুক্ত মানসিক ও শারীরিক বল দেন নাই কেন? তিনি তো দিয়াছেন, কেবল সে সকলের যথাযথ ব্যবহার না হওয়ায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে, দোষ তো আমাদেরই। যাহা পাই, তাহা রাখিতে পারি না বা জানি না। হে ভগবন্‌, যখন মানব করিয়া পাঠাইয়াছ, তখন আর একটু কষ্টস্বীকার করিয়া আমাদের মানুষের পথে পরিচালিত কর! নতুবা আমরা পথ ভুলিয়া পশুর মধ্যে আসিয়া পশুত্বপ্রাপ্ত হইতে বসিয়াছি। তোমার শুভাশীর্ব্বাদ না পাইলে এ হেন নরপশুত্ব যে ঘুচিবে না প্রভু!

সহসা চাহিয়া দেখি, অদূরে চাটুজ্যে মহাশয় যেন একটা ভয়াবহ চিন্তার বোঝা লইয়া ফিরিতেছে এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছে, যদি এক্ষণে আমাদের দেখা পায়, তাহা হইলে সেই বোঝা আমাদের মাথায় সজোরে ছুঁড়িয়া মারিয়া আমাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধের শোধ লইবে। এমত অবস্থায় তাহাকে আসিতে দেখিয়া আমার সঙ্গীটি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "গুরুজি, তোমার চাটুজ্যে মহাশয় বুঝি দম আট্‌কাইয়া গেল। শীঘ্র যাইয়া

কুলার বাতাস দাও।" আমি দেখিলাম, চাটুজ্যে মহাশয়ের মুখে একমুখ পান-দোক্তা ভরা। সেজন্য একদিকের গালটা ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে পানের তত্ত্বাবধান করিবার অনবকাশহেতু দুই কষ বহিয়া রক্তবর্ণ পিচ গড়াইয়া পড়িতেছে। কখনও তাহা হস্তস্থিত বহুপুরাতন রেলির-বাড়ীর ছাতার দ্বারা পুঁছিতেছে, কখনও বা তাহার অজ্ঞাতসারে পিচ গড়াইয়া পড়িয়া মামুলী চাপকানটাকে রঞ্জিত করিতেছে। কুঞ্চিত কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়াছে। নিষ্প্রভ ও কোটরগত চক্ষু দুইটি যেন সুপুষ্ট রক্তাধরদ্বয়েব প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া বহিরাগমনে সচেষ্ট। দড়িবাঁধা চশমাটা ক্রমান্বয়ে নাকের ডগার উপর আসিয়া ঝুঁকিতেছে। ঠেলিয়া তুলিয়া দিবার সুবিধা নাই। কারণ, একহস্ত বেয়াদপ কাছাটাকে সায়েস্তা করিতে ব্যস্ত, অন্যহস্ত সেই শিথিল-যন্ত্র ছাতাটাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। বহুমুচিহস্ত-কারুকার্য্য-চিহ্ন-শোভিত স্ব বৃহদাকার বিধ্বস্ত পেনালা পাদুকা দুইটি চপ্ চপ্ করিয়া রাস্তার উপর সজোরে উঠিতেছে পড়িতেছে, আর একটু একটু করিয়া কোঁচার খুঁট ধরিয়া টান মারিতেছে। বোধ হয়, আর কিছুক্ষণ এইরূপ টানাটানি চলিলেই স্কন্ধস্থিত শত-ছিদ্র উড়ানীর মত কোঁচাটির কতকটা মাটিতে লুটাইতে থাকিবে।

আমি।—চাটুজ্যে মশাই, আবার ফিরলে যে?

চাটুজ্যে।—দূর হ অকালকুষ্মাণ্ডের দল। তোদের মুখ দেখলে কি আর সেদিন সুযাত্রা হয়?

আমি।—হ'লো কি? অত চোট্‌চেন কেন?

চাটুজ্যে। শালাদের কথা শোন। বলে কিনা আমি চোট্‌ছি। আমার সে রকম মেজাজ নয় রে হতভাগা। এর নাম চটা নয়। এ হ'ল—তোমার গিয়ে—রাষ্ট্র-নীতির কথায় বলে—ন্যায়পরায়ণতার অভিব্যক্তি,—কর্ত্তব্যপালনের যুক্তিসঙ্গত অভিনয়।

মাতাল।—চাটুজ্যে, এই দূর থেকেই শ্রীচরণেষু। গুরুজি, পালিয়ে এস।

চাটুজ্যের হাওয়া অধিকক্ষণ গায়ে লাগ্‌লেই তোমারও ঐরকম কর্ত্তব্যবুদ্ধি আর ন্যায়-পরায়ণতা জেগে উঠবে। তখন শান্ত মস্তিষ্কের পরিচয় একটু বেশীরকম দিয়ে ফেল্‌বে। বেটাকে দেখে, আমার তো সেই অবস্থাই হ'য়ে আস্‌ছে।

চাটুয্যে। কি বলিস্ বেয়াকুব! আমি কিন্তু এখনও রাগি নাই!

আমি।—রেগেও কাজ নাই। হয়েছে কি বলুন দেখি?

চাটুজ্যে।—তোর বাপের শ্রাদ্ধ! দেখে এস না, মুচিপাড়ার রাস্তায় কি কাণ্ড হয়েছে। মনে হ'লে গা শিউরে উঠে। দুর্গা দুর্গা! যাই, আমি এখুনি পুলিশে সংবাদ দি'গে।

মাতাল।—কাছাটা সামলে নিয়ে যেও চাটুজ্যে। কাছা না এঁটে পুলিসের কাছে যেও না। ওরা ঐ দিকে বেশী লক্ষ্য রাখে।

চাটুজ্যেমহাশয় কট্‌মট্ করিয়া আমার সঙ্গীর দিকে একবার চাহিল। লজ্জায় কিছু বলিতে না পারিয়া কাছাটা সাম্‌লাইয়া লইল। পরে অস্পষ্ট ভাষায় আমাদের কি একটা গালি দিয়া হন্ হন্ করিয়া থানার দিকে চলিয়া গেল। আমি, আমার সঙ্গী সমভিব্যাহারে মুচিপাড়ার দিকে চলিলাম। তামাসাটা দেখা যাউক। যেখানে মনুষ্যাকৃতি পশুর বাস, সেখানে তামাসার অভাব নাই। নিত্য নূতন রংবিরঙের তামাসা হইতেছে। পাগল, চোখ পাইয়াছ কেবল দেখ, শক্তি পাও নাই, কাজেই তামাসায় যোগদান করা তোমার অসাধ্য।

মুচিপাড়ার নিকট আসিয়া দেখিলাম, সত্যই এক অভিনব তামাসার অভিনয়। রাস্তার দুই ধারে সারি সারি মাটির পুত্তলী দাঁড় করান রহিয়াছে। পুতুলগুলি এক একটা প্রমাণ মানুষের আকারে প্রস্তুত। তাহাদের পরণে খদ্দর কাপড়, গায়ে খদ্দরের জামা, মাথায় গান্ধী টুপী। তাহাদের গায়ে লেখা আছে, "ভারত মাতার সেবাইত অহিংস-অসহযোগী-স্বেচ্ছা-সেবক।" পুতুলগুলির দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত। তাহাতে এক একটী কাগজ

ঝুলান রহিয়াছে। কোন কাগজে লেখা আছে—"স্বরাজ বিনা শান্তি নাই।"

কোনটিতে লেখা আছে—"শরীর পতন কিংবা মন্ত্রের সাধন। তবে স্বরাজ লাভ হয়।"

কোনটীতে লেখা আছে—"ভয় করিও না, ভগবান আছেন।"

কোনটিতে লেখা আছে, —"যে অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পাইতে চাও, নিজেরা সেই অত্যাচার করিতে বিরত হও। তবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে।

কোনটিতে লেখা আছে,—স্বার্থান্ধ দলনকারীর নিকট ক্ষমার প্রত্যাশা করিও, চাহিও না, কখনও পাইবে না।"

কোনটিতে লেখা আছে,—"পরের জিনিষে লোভ করিও না। নিজের জিনিষ নষ্ট করিও না।"

কোনটিতে লেখা আছে,—"তোষামোদ করিও না। তোষামোদে ভুলিও না।"

কোনটিতে লেখা আছে,—"ক্ষণিক সুখের আশায় চির দুঃখবরণ করিও না, ক্ষণিক দুঃখের ভয়ে চিরসুখ হেলায় হারাইও না।"

কোন কাগজে লেখা আছে,—"শান্ত নিরুপদ্রব নির্ভীক কর্ত্তব্যপরায়ণ হও।"

কোনটিতে লেখা আছে,—"আপন আপন ধর্ম্মে মতি স্থির রাখিও। বিপদে ধর্ম্মই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা।"

কোনটিতে আছে,—"উচ্চ চিন্তা আর সহজ সরল জীবন যাপন, মানুষের প্রধান ধর্ম্ম।"

দেখিয়া শুনিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সমস্ত দেহে যেন কি একটা অব্যক্ত, অননুভূত আনন্দের তরঙ্গ বহিয়া গেল। বাহ্যদৃষ্টি ও বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইল। চক্ষু মুদ্রিত হইল। আমি কোথায়? এতকাল, এত দেশ বিচরণ করিয়া কেবল স্থাবর জঙ্গমের নাচ তামাসা দেখিয়াছি। কিন্তু এমন অচল অটল জ্যোতিঃ পুঞ্জের বিশ্বপ্লাবী মধুরিমা তো কখনও দেখি নাই, এমন শক্তিশালী যুধিষ্ঠির তো কখনও দেখি নাই; এমন প্রাণমাতান ইঙ্গিত তো কখনও দেখি

নাই! এ আমি কোথায়? একি দেব দূতের লীলাভূমি; না পাগল আমি, পাগলের মত খেয়াল দেখিতেছি।

মাতাল।—একি গুরুজি অমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন? চাটুজ্যের মত ভয় পেয়েছে নাকি?

আমি। না এদের কাছে ভয় নাই, অভয় আছে।

মাতাল। তবে?

আমি। ভাবছিলাম যে, নিরক্ষর, নিম্নশ্রেণীর মুচিগুলাও শেষে বিদ্যাবুদ্ধির জাহাজ বিচক্ষণ কর্ত্তাদের কাজে এমন উৎকট বিদ্রূপ কর্ত্তে আরম্ভ কর্লে। লজ্জার কথা!

মাতাল। কি রকম।

আমি। এই দেখনা,—কাহারও পরণে খদ্দর আর গান্ধী টুপী দেখ্লেই কর্ত্তারা তাদের ধরে নিয়ে জেলে দিচ্ছে,—তা কিবা খোকা কিবা বোকা, কিবা ছোঁড়া আর কিবা বুড়ো। তা কেবা জানে ছুড়ী আর কেবা জানে বুড়ি। যাকে দেখে তাকেই পাকড়াও করে। এমন কি "খদ্দর" আর "গান্ধী-টুপী" এই দুটো কথা শুন্লেই শিউরে উঠে কামান দেগে বসে। এসবের মাথা-মুণ্ডু কিছুই বোঝে না, বুঝতে চেষ্টাও করে না। ভয়, পাছে কুলের কথা প্রকাশ পায়। ভয়, পাছে হনিকোম্বের দুর্গন্ধ বাহির হয়,—ভয়, পাছে ইন্দ্রত্ব যায়। কর্ত্তারা দেখছেন যে, চারিদিকেই কাড়াকাড়ি আরম্ভ হয়েছে, এখানেও পাছে সেই রকম একটা কিছু হয়ে পড়ে। সেই ভয়ে, নূতন রকমের কিছু দেখ্লেই মারমুখী হয়ে হয়ে পড়েন। অন্যান্য স্থানে জুজুর ভয়, কাজেই বিড়ের মত গালে হাত দিয়ে দাঁত কিড়-মিড়ি করছেন। এখানে বেপরওয়া চাবুক চালাচ্ছেন। এতে ফলে দাঁড়াল দেখ্‌ছি, এই মুচির বিদ্রূপ। যেমন কোন লোক কোন একটা কথায় বা কাজে চোটে গেলে, ক্রমান্বয়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতার দল সেই কথা বোলে বা সেই কাজ কোরে তাকে ক্ষেপায়, আর হাততালি দিয়ে তার পাছু পাছু বেড়ায়, এবং সে ব্যক্তি অধি-কতর চটে, জনতাকে গালি দেয়, দাঁতমুখ

খিঁচিয়ে, মারিতে যায়, এ ব্যাপারও সে রকম মনে হচ্চে। কর্ত্তাদের চোট্‌তে দেখে ছোটলোকেও এইরকম বিদ্রূপ আরম্ভ করেছে। এই পুতুলগুলা পুলিশের নজরে এলেই একটা জমাটী গোচের তামাসার অভিনয় হয়ে যাবে। এরি নাম পাছায় হাততালি দেওয়া।

বলিতে না বলিতে কথায় কাজে এক হইল। দূরে দেখি একদল গোরাপণ্টন বন্দুকসঙ্গীন ঘাড়ে করে কুচ করে এইদিকে আসুছে। একটা ছোট কামানও সঙ্গে আনা হচ্ছে। তাদের দলপতির সঙ্গে চাটুজ্যে মহাশয় কায়ক্লেশে উঠি-পড়ি করে চলেছে, আর কত কি বকছে। আমরা সেখান হতে একটু দূরে আসিয়া একটা গাছতলায় বসিলাম।

পল্টন মুচিপাড়ার নিকট আসিয়াই গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। পরে প্রকৃত ব্যাপার দেখিয়া দলপতির আদেশে গুলি-ছোঁড়া বন্ধ করিল। ক্রোধে ক্ষোভে সবুট লাথি মারিয়া পুতুলগুলা ভাঙ্গিয়া দিল। চাটুয্যে মহাশয় আস্তে-ব্যস্তে একটা গোরাকে বলিতে গেল যে, "বন্দুকের গুঁতো দাও—" তাহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে গোরাটা "চোপরাও শালা" বলিয়া সবুট চরণ তাহার পেটে সজোরে বসাইয়া দিল। (কারণ, গোরা তখন লাথি মারিবার হুকুম পাইয়াছে, সুতরাং নির্ব্বিচারে যত্র তত্র পা চালাইতেছে এবং সোল্লাসে নায়কের হুকুম তামিল করিতেছে।) চাটুজ্যে মহাশয় "কি কর্‌লি রে।" বলিয়া পপাত ধরণীতলে।

আমরা ছুটিয়া গিয়া চাটুজ্যে মহাশয়কে ধরিয়া তুলিলাম। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ শান্তিরক্ষক মহাদশয়দের উত্তম-মধ্যম মোলায়েম আপ্যায়িতও সহ্য করিতে হইল। কি করি বাবা! এখন শান্তিরক্ষার ধুম পড়িয়াছে। এমন সময় কাহারও কোন বেয়াদপী মাপ হইবে না। কাজে কাজেই শত অশান্তির মধ্যেও সুবোধ বালকের মত 'কেয়াবাৎ' বলিয়া তারিফ না করিলে হয়ত পরম শান্তিধাম পাইতে হইবে।]

যাহা হউক, আমি ও আমার সঙ্গী উভয়ে ধরাধরি করিয়া চাটুয্যে মহাশয়কে

সেই গাছতলায় লইয়া গেলাম। আমার সঙ্গী নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া চাটুজ্যে মহাশয়ের চোখে মুখে ছিটাইয়া দিল। পরে চাটুজ্যে হাঁ করিয়া একটু জল খাইতে চাহিল। সঙ্গী মাতাল পুনরায় জল আনিয়া তাহাকে খাওয়াইল। জল খাইয়া চাটুজ্যে যেন একটু সুস্থ হইল। তখন সে মিট্ মিট্ করিয়া তাকাইতে লাগিল এবং দুই হাতে পেট চাপিয়া ধরিয়া নাকিস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, সাহেবরা কি চলিয়া গিয়াছেন ?”

মাতাল।—কেন চাটুজ্যে ? আরও কিছু প্রত্যাশা কর নাকি ?

আমি।—তা—অতখানি রাজভক্তির বিনিময়ে কি এইটুকু সম্মানলাভে মন ওঠে বাবা !

মাতাল।—এখনও বেশী দূর যায়নি। ডাকবো নাকি চাটুজ্যে ?

চাটুজ্যে।—তা——তা——একবার ডাকনা !—উঃ যাইরে বাপ্ !

মাতাল।—বলে কি গুরুজি ? বলি মশাই, আগে পিলের ব্যবস্থাটা না করে আবার তোমার অমুকদের ডাকাডাকি করলে বকৃরিৎলার কি ব্যবস্থা হবে ভেবেছ কি ?

চাটুজ্যে একটু ক্রুদ্ধ হইয়া, থেঁদা নাক কুঁচকাইয়া, গজদন্তের আড়াল থেকে বলিল, “আহা তা নয় গো তা নয় ! এই তোমার গিয়ে—বড়সাহেবকে আমার সেলাম জানান হল না ত, পাছে কিছু মনে করে,—তাই—”

মাতাল।—গুরুজি, ওদের ডাকো, নৈলে তোমার চাটুজ্যে তুষানলে প্রাণত্যাগ করবে।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া চেঁচাইতে লাগিল, “সাহেব ! ও সাহেব ! ও চাটুজ্যের অমুক ! একবার ফের ফের।” কে কাহার কথা শোনে। শান্তিরক্ষকের দল তখন বিদ্রোহ দমন করিয়া বীরদর্পে মেদিনী কম্পমান করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী কামানটা মাঝে মাঝে হুঙ্কার করিয়া প্রত্যাশিত আততায়িগণকে ভয়-প্রদর্শন করিতেছে। সে হুঙ্কার বৃথায় প্রান্তরে প্রতিধ্বনি তুলিয়া দূর-শূন্যে

মিলাইয়া যাইতেছে। এমন সময় আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী বাগান হইতে একটা ছাগশিশু 'ম্যা ম্যা' করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। সেই দিকে চাহিয়া দেখি, একজন শান্তি-রক্ষক গোরা বাগানের মধ্যে অদূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

মাতাল।—যাগ্, বাঁচালে বাবা। তা—এমন যূথভ্রষ্ট কেন?

মাতালের কথা শেষ হইতে না হইতে গোরা একলম্ফে আসিয়া মাতালকে আক্রমণ করিল।

মাতাল।—ওহো—শান্তিরক্ষা—শান্তি-রক্ষা! আমি চাটুজ্যে নৈ, শান্তির প্রত্যাশীও নৈ। চাটুজ্যে ঐখানে পড়ে পড়ে তোমায় সেলাম জানাচ্চে।

'সেলাম' কথা শুনিয়া গোরাটা বোধ হয় ভাবিল যে, লোকটা তাহাকে সেলাম করিতেছে। তখন সে মাতালের উপর কতকটা সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "তবে কেন শালা, তখন চেঁচামেচি করিয়াছিলি? আমি ত চুরি করি নাই। বনের মধ্যে খাসিটাকে একাকী দেখে থানায় জমা দেবো বলে লয়ে যাচ্ছিলাম। খাসিটা পালিয়ে গেল। তাই তোর উপর গোসা হয়েছিল। যা,—কাকেও এ 'কথা বলিস্ না।"

মাতাল।—তাই তুমি খাসির লোভে বনে গমন করেছিলে? তা, তোমরা যা করবে তাতে কি আর দোষ আছে সাহেব! সকলগুলাই আইনসঙ্গত। যেহেতু খাসিটা একাকী চরিয়া বেড়াইতেছিল, সঙ্গে কেহ ছিল না, সেই হেতু উহার তত্ত্বাবধারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য ও আইনসঙ্গত কার্য্য। অতএব, একটা ছাগশিশু, আইন তোমায় উদরের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া দিউক। তা, গুণমণি, তোমায় একটা খাসি চাই কি?

গোরা একগাল হাসিয়া ও মাতালের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "ঠিক্ ঠিক্! তুমি বড় ভাল লোক আছ। একটা খাসি আমায় দিতে পার?

মাতাল।—তার জন্য ভাবনা কি সাহেব? এদিকে আইস?

গোরা। ঠিক্ ঠিক্। চল চল।

মাতাল।—চাটুজ্যে, তোমার 'সবসুখ-দুখমন্থনধন' হাজির। খোস খেঁয়ালে কথা কও। আর একটা খাসি শীঘ্র জোগাড় করে এনে দাও, না হলে এবার বড়গোচের 'বিষ্ণবে নমঃ' হবে।

চাটুজ্যে।—তাড়াতাড়ি উঠিয়া এক লম্বা সেলাম করিল, এবং পেট চাপিয়া ধরিয়া খাসির অন্বেষণে চলিয়া গেল।

আমি।—সাহেব, চাটুজ্যে তোমার খাসি আনিতে গেল। ততক্ষণ, আইস, তোমার সহিত দুটো কথা কৈ।

গোরা।—ঠিক্ ঠিক্। কথা কও কথা কও। আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কৈতে বড় ভালবাসি।

আমি।—হেঁ সাহেব, তোমাদের সবাইকে কি কুকুরে কামড়েছে?

গোরা।—কেন মশাই?

আমি।—তোমাদের অবস্থা ঠিক সেই রকম মনে হচ্চে। তা না হলে কি নগণ্য প্রজাবৃন্দও তোমাদের এমন করে ক্ষেপাতে সাহস করে।

গোরা।—কি কর্‌বো বাবু? শালা লোকরা বজ্জাতি করে দেশের শান্তি ভঙ্গ করবে আর আমরা শান্তভাবে সহ্য করবো? শালা লোকরাই তো হাতিয়ার চালাতে আমাদের (বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও) বাধ্য করেছে।

আমি।—আমরি মরি রে। 'খাবনা খাবনা অনিচ্ছে, এক পাথর ভাত একটা উচ্ছে।' এক্ষেত্রে তোমাদের অনিচ্ছেটা ঠিক ঐরকম। আর বেচারা কালা শালাদের যা ন্যায্য দাবী, তাকেই তোমরা বল 'বজ্জাতি।' বাবা, আঁতে ঘা লাগ্‌লেই ঐরকম সব অনিচ্ছের প্রকাশ স্বভাবতই হয়ে পড়ে। প্রভু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই প্রথম পরিবেশনই যেরূপ 'অনিচ্ছাসত্ত'—পাতে দিয়েছ, সেটাইতো বেজায় তিক্ত। এর পরে কি 'ইচ্ছাসত্ত' পাবার আশা আছে? না জানি সে কি আমসত্তই প্রস্তুত হচ্চে। তা,—প্রভুর ঐ খাসি অপহরণাদি ব্যাপারটাও কি শান্তি-রক্ষা পর্ব্বের অনিচ্ছাসত্ত শ্লোকের আবৃত্তি মাত্র? না উদারনীতির এক একটী ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি?

গোরা।—তুমি কি পাগল আছ? তুমি কি বকিতেছ?

মাতাল।—কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম। কর্ত্তাদের যদি ঐরূপ ইচ্ছাই হয় তবে আমি কেন, আমার চতুর্দ্দশ পুরুষেরও মত্ততা সপ্রমাণ হবে।

গোরা।—ঠিক ঠিক্ বড় ভাল লোক, বড় ভাল লোক। ঐ শালা লোকের দুষ্টামিতেই তো মাথা খারাপ হয়। কেমন বাবু, শান্তি ও আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেই হইবে।

মাতাল।—তা অশান্তি সৃষ্টি করিয়াই হউক আর অত্যাচার করিয়াই হউক। কেমন,—নয় সাহেব?

গোরা।—ড্যাম! (এই সময়ে সাহেবের সবগুলি দন্ত একবার সূর্য্যালোকে চিক দিয়া উঠিল।)

আমি।—দেখ সাহেব, চোটো না।—একটা সদুপদেশ দি। চুপ করে বসে শোন। তোমাদের বড় কর্ত্তাটিকে আমার উপদেশ মত কার্য্য কর্‌তে বোল (অবশ্য, রাউণ্ডটেবলকনফারেন্স নহে), দেখ্‌বে, এক নিমেষে এসব বিদ্রোহ থেমে যাবে।

গোরা।—ঠিক্ ঠিক্ বল "বল"। বেল্লিকদের জব্দ কর্‌তে হবে।

আমি।—দেখ। বড়কর্ত্তাকে গিয়ে বল, এমন একটা আইন জারি কর্‌তে যাতে এদেশের লোক খেতে শুতে বে-আইনী করে ফেলে। তা হলেই তোমাদের পক্ষে সুবিধা হবে। তারপর, ব্যাস, দু পাঁচ দিনের মধ্যেই দেখ্‌তে পাবে, শান্তিদেবী সপরিবারে এসে এদেশে মৌরসীপাট্টা নিয়ে বসে গিয়েছেন। কেমন মতলবটা মন্দ কি সাহেব?

গোরা।—ঠিক ঠিক, কেয়াবাৎ—আয়। কিন্তু,—কি করে হবে।

আমি।—ওআর বেশী কথা কি? এই সব গোড়া থেকেই সুরু কর—দেশী কাপড়টাতো প্রকারান্তরে বে-আইনী করেই ফেলেছ। বিলাতী কাপড় ও সূতায় দেশের সে অভাব পূর্ণ কর্‌বার বেশ সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে আছে। ও ল্যাটা চুকিই গেছে। এখন কথা ভাত। তা দেশী চাউলটাও বে-আইনী করে দাও।

কেউ আর দেশী চালের ভাত খাইতে পারিবে না। বিলাতী চাউল খাইতে হইবে।

গোরা।—বিলাতী চাউল কোথায় পাবে মশাই ?

আমি।—গুলিটানা বিদ্যা কিনা! রাজনীতির ধারধারে না। দেশী চাউলগুলা যে বে-আইনী হিসাবে বর্জ্জিত হইলেই চাউল সস্তা হবে। সেই অবকাশে সমস্ত চাউল ক্রয় করে নিয়ে যাবে। তারপর জর্ডনের জলে সিদ্ধ করে, বিলাতী ছাপ মেরে, এদেশে পাঠিয়ে দিলেই চল্‌বে। নামও বিলাতী হবে. সঙ্গে সঙ্গে দামও বেড়ে যাবে। যেমন সব জিনিষের (বিশেষ, বিলাতী সূতা, কাপড় প্রভৃতির) বেলা হয়ে থাকে। বুঝলে সাহেব? বড় কর্ত্তাকে বোলো; এতে বিদ্রোহ দমন হবে, সঙ্গে সঙ্গে বিলাতের একটা নূতন রকমের আয় দাঁড়াবে।

দেখিলাম, সাহেব বিশেষ মনোযোগের সহিত আমার কথা শুনিতেছে; কারণ এটা এদেশীয়কে জব্দ করিবার হিতোপ-দেশ।

আমি। শুধু ওইতেই হবে না। আর এক কাজ কর্‌তে হবে।

গোরা। হাঁ হাঁ কর্‌তে হবে। বল কি কর্‌তে হবে।

আমি। সেটা হচ্ছে এই—এই আইন জারি হইবার পর হইতে কেহ আর তাহাদের নবজাত সন্তানের নামকরণের সময় "শ্রীযুক্ত" "শ্রীমতী" ইত্যাদি দেশীয় ভাষা প্রয়োগ করিতে পারিবে না। তৎপরিবর্ত্তে "মিষ্টার" "মিস্" প্রভৃতি ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে। আর ঐ সকল পুত্রকন্যার ষষ্ঠীপূজাদি সংস্কার কার্য্য সকল বিলাতী পাদ্রীর দ্বারা করাইতে হইবে। ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে যে, এতদ্দেশীয়-দিগের ধর্ম্মযাজক, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ধর্ম্ম সবই বে-আইনী। তবে এই সকলের মধ্যে যেটুকু তোমাদের খোসখেয়ালে বাধা না দেয়, সেইটুকুই সময় মত বে-আইনী নাও হইতে পারে।

লেখাপড়ার বিষয় কিছু করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ সেটা সম্পূর্ণ

বিলাতী ও বিলাতের করায়ত্ত হইয়াছে। দেশী লেখাপড়া দেশের লোকে কতকটা পেটের দায়ে বে-আইনী করে ফেলেছে। যাগ, সে বিষয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নাই।

আর দেখ, দেশের পুরুষগুলা এখন একরকম বিলাতী ধরণের হয়ে দাঁড়িয়েছে, ওদের দিকটায় ভয় তত বেশী নাই যত আছে এই মেয়েদের জন্য। যদিও গোটাকতক একটু আধ্‌টু ফুর্ ফুর্ কর্‌তে চেষ্টা কচ্ছেন বটে; কিন্তু, সংখ্যায় লেডি-সুর কাটৃতি অপেক্ষাকৃত অনেক কম। ওই জঞ্জালগুলকে বনিয়ে নিতে পারলেই সব ল্যাটা চুকে যায়।........... ব্যস্, ঠিক হয়েছে! দেখ সাহেব বড়কর্ত্তাকে চুপি চুপি বল্‌বে যে, তিনি যেন তোমাদের ঐ খ্রীশুকেষ্টর মমবাতীগুলোকে বলে দেন, তারা যেন আজকাল নেটিবদের অন্ধকার-ময় ঘরে ঘরে খুব ঘন ঘন যাতায়াত করে। ফলে, নৈটিব মেয়েগুলার সম্মুখ হতে আঁধার সরে যাবে, আর চোখে দিব্যদৃষ্টি লেগে যাবে। দেখ্‌বে, সাহেব, দেখ্‌বে, কেমন ধাঁ করে সব অন্ধকার কেটে যায়।

গোরা। কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ! তুমি ভারি হুসিয়ার লোক।

আমি। হুঁ হুঁ। বাঙ্গালীর বাচ্ছা, কাপড়ামে নোচ্চা, বাড়াতা হায় কাচ্ছা-বাচ্ছা, আউর মতলব দেতা হায় আচ্ছা আচ্ছা। তারিফ কর্ত্তেই হবে। বাপের সর্ব্বস্ব—মায় নিজের গতর—খুয়িয়ে এই মাথাখানা তৈয়ারী করেছি। এতে ঝুটো চিজ একদম নাই, বেলকুল সাঁচ্চা।

ইত্যবসরে চাটুজ্যে পাঁটার ছানার দুই কান ধরিয়া টানিতে টানিতে আনিয়া তথায় উপস্থিত হইল। চাটুজ্যে এত হাপাইতেছিল যে, তাহার চাপকানের বাঁধন ছিঁড়িয়া দিয়া বুকের পঞ্জর কখানা যেন ঝিঁকা মারিয়া সেই ছিটাবেড়ার বাহিরে আসিতে চায় মনে হইতেছিল। মুখে হা করিয়া নিশ্বাস লইতে হইতেছে; কথা কহিবার অবকাশ নাই; দুই কষ বহিয়া লাল নির্গত হইতেছে। কপালের ঘাম গালের উপর ধারা প্রবাহিত করিয়াছে। পরণের কাপড়খানা কোন রকমে

কোমরে ঘুনসির সঙ্গে জড়াইয়া আলুথালু ভাবে আটকাইয়া আছে। একপায়ের জুতা খুলিয়া কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। আহা, অনেক সাধের জুতা! তা যাগ্, কিন্তু চাটুজ্যে প্রাণপণ চেষ্টায় পাঁটার সহিত লড়াই করিতে করিতে ওপাড়া হইতে লইয়া আসিয়াছে এখন তাহার জীবন যাইলেও খেদ নাই। একমাত্র ভাবিবার বস্তু ব্রাহ্মণী। পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সেও তিনি যুবতী আছেন, কর্ত্তাগিন্নীর ইহাই ধারণা। তা, ধর্ম্মবাবারা কি শ্রীমতীর উপর নেকনজর রাখিবে না? নিশ্চয় রাখিবে।

খাসি পাইয়া সাহেব আনন্দে আত্মহারা। চাটুজ্যে যে কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়াও কতবার তাগেবাগে তাহার কম্পিত হস্তখানি কপালে তুলিয়াছিল সাহেব তাহা একবারও দেখিল না—চাটুজ্যেকে কৃতকৃতার্থ করিল না। হায় হায়!

চিরবঞ্চিত গো।

(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ)

চির-বাঞ্ছিত ধনে চির-বঞ্চিত গো।
চির কল্পিত মম চির জল্পিত গো।
আসি, যাই, ফিরি,
নিত্য ঘরে ঘরে,
বঞ্চণা করিয়া—
ফিরাও আমারে।
চির বাঞ্ছিত তুমি,—আমি বঞ্চিত গো।

চাহি শান্তি, দেও
অশান্তি জঞ্জাল
অমৃত সাগরে
বদ্ধ মীন, মৃত্যুজাল
কাল ধীবর করে চির লাঞ্ছিত গো।
যে চাহে তোমারে
কর তারে নাশ,
অমৃত সন্ধানে
গলে লয় মৃত্যুপাশ,
চির মরণ মাঝে, তুমি অমৃত গো।

কি আশ্চর্য্য ।

(শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় [illegible] ।)

কি আশ্চর্য্য, চন্দ্র সূর্য্য তারকা নিচয়,
কি আশ্চর্য্য, এ পৃথিবী পত্র পুষ্পময় ;
কি আশ্চর্য্য, কি অসীম গগণ মণ্ডল,
কি আশ্চর্য্য, কি বিশাল, সাগর সকল :
প্রশান্ত গম্ভীর কত মৌন হিমাচল,
বক্ষে কক্ষে ততোধিক তাপস সকল :
কি ধীর, গম্ভীর শান্ত স্তব্ধ উদাসীন,
অসীমের অঙ্কে যেন অসীম বিলীন :
কি আশ্চর্য্য, কি সুন্দর প্রদীপ্ত অনল,
কি ভীম ভীষণ, ক্রুদ্ধ, বায়ু মহাবল ;
কি সুন্দর ঘনঘটা গগণের গায়,
কি আশ্চর্য্য মরি মরি, তড়িত খেলায় ;
কি গুরু গম্ভীর, মরি, মেঘের গর্জ্জন,
পুলকে শিহরে শিখী, কত না নর্ত্তন ।
পেখম ধরিয়া করে শুনিয়া যে ধ্বনি :
আমি মন্দ-ভাগ্য তাহা শুনিয়া না শুনি ;
ভীত সঙ্কুচিত আমি অশনির ভয়ে,
জড়সড় হয়ে থাকি কোনেতে লুকায়ে,
কি দুরন্ত মৃত্যু ভয় গ্রাসিয়াছে মোরে,
মরণ নিশ্চয়, তবু ডরি মরণেরে ।
কি আশ্চর্য্য গ্রাসে কাল তিল তিল করি,
অলক্ষ্যে মরণ, হায় বুঝিতে না পারি ।

"শিবরাত্রি।"

প্রথম প্রহর

এ সংসার একটা ধর্ম্মশালা। পথক্লান্ত পথিক সন্ধ্যার সময় নিশিযাপনের জন্য এখানে আশ্রয় লয়। প্রভাত হইলেই আবার গন্তব্যের দিকে হাঁটিতে থাকে। সম্মুখে অনন্ত প্রসারিত পথ। আদি অন্ত লক্ষ্য হয় না। অবধি নাই, পরিসীমা নাই, কোথা হইতে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারও স্মরণ নাই, কেবল থাকে লক্ষ্য স্থির, অথবা গন্তব্য স্থির। সেই ভাগ্যবান সেই সুচতুর, সেই যথার্থ সুপথিক; যে লক্ষ্যস্থির রাখিয়া হাঁটিতে পারে। নতুবা হাহাকার! আর তপ্তশ্বাস! আর বিমূঢ়তা পশ্চাৎ দর্শন নাই। অগ্রস্থির নাই। কেবল হাঁটিতেছে। কোথা যাইবে পথিক? পথিক নিস্তব্ধ। কোথা হইতে আসিতেছ তাহার ঠিক আছে? পথিক নতমস্তক। একি কিছুরই নিশ্চয় নাই, কোথা হইতে আসিতেছ তাহার ঠিক নাই, আর কোথা যাইবে বলিয়া এ পথের পথিক হইয়াছ, তাহারও নিশ্চয়তা নাই; তবে কি ভ্রান্ত! না উন্মত্ত!

সত্যইতো ভ্রান্ত না উন্মত্ত! এযে কোথারও ঠিক নাই কেবল দেখি সম্মুখে অনন্ত পথ! আর হাহাকার ভরা আর্ত্ত-নাদ! কেন স্মরণ কি হয় না, "যেদিন হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছিলে—সেদিন কার নিষেধ বাণী।" সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের। সনক সনাতন আর সনৎকুমার প্রভৃতির! তাহারা যে নিষেধ করিয়াছিলেন যে, ভাই সব! "তোমরা যাও না! সে বড় কঠিন পথ, অনন্ত! অগম্য! ক্ষুরধারার ন্যায় তীক্ষ্ণ! পথে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। সম্বল ও অনেক সময় হারা হইয়া যায়। ভীষণ দস্যুভীতি! প্রতিপদে কেবল শিহরণ! আর আত্মগ্লানি অবসাদের দারুণ চীৎকার। দেখিতে পাইবে পথের ধারে কত শত সহস্র নিরন্ন আত্মহারা শুষ্ককণ্ঠ পথিকের জীর্ণ শরীর! শুষ্ক

হৃদয়ের জর্জ্জরতা! শুনিতে পাইবে মৃত্যু ভীতির অনুশোচনা! প্রতিমুহূর্ত্তে অবসন্নতার অনুধাবনায় ত্রস্ত হইয়া জড় হইতে জড় হইয়া যাইবে। বিপদের মধ্যে পড়িয়া আর সম্পদের পবিত্র ছায়া লাভ করিতে পারিবে না। আবিল পথের ধূলিরাশি অনাবিল চিত্তগগনের প্রান্ত খুব মলিন করিয়া তুলিবে। সুতরাং সেই চিত্তগগনের নির্ম্মলতার মধ্য দিয়া 'স্বচ্ছদর্পণের প্রতিবিম্ব মত' আর নিজের নিজত্বকে দেখিতে পাইবে না। অতএব যাইও না। ভাই সব। তোমরা এ পথের পথিক হইও না! আমরা জানি। আমরা জানি। সে পথের অবস্থা, তোমরা জ্যেষ্ঠের বাক্যে আস্থা কর! অবহেলিত করিও না।"

কিন্তু কৈ। আর্য্যের বাক্য বৈফল্যের প্রতিফল লাভ করিতেছে কি? স্মরণ কে হয়! অমৃতময়ী বাণী! যাহা প্রতিচ্ছন্দে আমাদের সম্মুখে দীপ্তভাবে অভিব্যক্ত হয়। এখনও শান্ত হৃদয়ে সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে. এখনও নীরবতার মধ্য হইতে সে ধ্বনি ভাসিয়া উঠে, এখনও সুরক্ত-হৃদয়ের উন্মেষ আনাইয়া দেয়, এখনও তাহা মূর্চ্ছনার মত ক্ষুব্ধ হৃদয়ের শান্তত্বা জাগাইয়া তোলে। কৈ পথিক! সে স্থিরতার কি উপাসনা জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছ? কৈ পথিক। সে লিপ্সা কি, হৃদয়ে স্থান পাইবে? সে শান্ততার স্নিগ্ধছায়া কি এ পথে অবিরামগতির মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারিবে? না! তাহা হইলে আর এ হাহাকার কেন? লক্ষ্য-বিহীন জীবনে উদ্‌ভ্রান্তের মত কেনইবা তবে এ পথে অবিরামগতি? কেনইবা এ দীর্ঘনিশ্বাস, কেনইবা অবসন্নতা কেনইবা মুখে বিবর্ণতা।

তখন যে বড় বলিয়াছিলে, "দেখাই যাক, বিশ্বরাজ্যের ধারা" শুনেই বা চুপ করে বসে থাকবো কেন সংসারাপণে বহু পণ্য বিক্রীত হয় দু'টো পাঁচটা কিনেই না হয় আনা যাক।"

কৈ কিছু কেনাকাটা হইল? এ রাজ্যের ধারার খবর কিছু জানিতে পারিলে? বোধ হয় না। জানিতে পারিলে আর এ চাঞ্চল্য কেন? প্রশান্তসাগরে

কি বায়ু না থাকিলে তরঙ্গ উঠে? না— চণ্ডালস্পর্শ না করিলে দ্বিজরাজে কখনও মালিন্য আসিতে পারে? এই যে শোক-দুঃখ দাবানলের তীব্র সন্তাপ প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে হৃদয়ের জ্বালা জটিলতা বুঝাইয়া দিতেছে, এই যে জরাজীর্ণতা প্রতি মর্ম্মের সন্ধিস্থলকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে, এই যে অবসন্নতা স্নায়ুগ্রন্থিকে শিথিলিত করিয়া দিয়াছে। এত অশান্তি কেন? এত আত্মহারা কেন? কিসের জন্য ছুটাছুটি? কিসের জন্য উন্মত্ততা? কিসের জন্য দম্ভ? ভুলিয়াছ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ভুলিয়াছ বটে! ভাল! পথিক! ভোল! চিন্তা নাই! আমরা ভুলিতে পারি, কিন্তু একজন ভুলিবে না। চেনো তাঁহাকে যিনি এ পথের সহায়! যিনি এ পথের সম্বল! যিনি এ পথের আশ্বাস!

যিনি—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি-
শিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোঁকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি—
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।১৬

সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন অসংখ্য চরণে, অনন্ত বাহুতে, কোটি কোটি চক্ষুতে, অজস্র মস্তকে অসীম শ্রবণে এই জগৎ রহস্যের মূলে পরিব্যাপ্ত মূর্ত্তিতে লীলা প্রকট করিতেছেন। যিনি বিশ্বের আদি মধ্য অবসানে একইরূপে বর্ত্তমান।

"অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ
সশৃণোত্যকর্ণঃ"
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।১৭

হাত নাই তবু কিন্তু সবকাজ করে।
পা নাই বেড়ায় ঘুরে প্রতি ঘরে ঘরে॥
চক্ষু নাই তবু দেখে সকলের কর্ম্ম।
সকলের শুনে কথা তথাপি অকর্ণ॥

চেনো পথিকমন! যাহার কথা এইমাত্র হৃদয়কে পবিত্র করিতেছিল। ঐ যে চেনো কিগো উহারে।

(যিনি) সহস্র নয়নে চায় সহস্র বদনে খায়
সহস্র শ্রবণে শুনে কথারে॥
সহস্র শির না থাকিত যদি আমার অবোধ
প্রাণ
সহস্র ধারাতে ওরে কেন সে করিবে স্নান;

সহস্র করেতে স্বরে
অজস্র পায়ে বিচরে
মূর্ত্তিনাই তবু মূর্ত্ত্য এবিৎ জগতে রে॥

তিনি কখনও ভুলিবেন না। তিনি সর্ব্বদা তাঁহার স্নেহময় অঙ্কে আমাদের রক্ষা করিতেছেন। বামে দক্ষিণে উপবি অধঃ পশ্চাৎ অগ্র সর্ব্বদিকে সর্ব্বদা সর্ব্বথা আমরা তাঁহার করুণামাখা রক্ষার মধ্যে অবস্থিত। বুঝিতে না পারি তাঁহার করুণা, বুঝিতে না পারি বিপদের মধ্যে সম্পদ, জানিতে না পারি মঙ্গলময় নামের সার্থক্য, কিন্তু তাই বলে কি তাঁহার করুণাচ্যুত হইতে হইবে। কখনই না—ঐযে তাঁহার অমৃতময়ী আশ্বাসবাণী—

ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র, পাপী হতে পাপী
ঘৃণ্য হতে ঘৃণ্য হওরে মলিন।
দাঁড়াদেখি তোরা মহামন্ত্র স্মরি
বাজিয়ে উঠুক হৃদয়ের বীণ।

চলিয়াছে বাঁশি বাজিয়া। এই কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে বাঁশি অনাবৃত বাজিয়া চলিয়াছে, তুমি শোন আর নাই শোন। হৃদয় যমুনাকে উজানে বহাইয়া বৃন্দি- গোপিনীর উন্মাদনা আনাইয়া চলিয়াছে বাঁশি বাজিয়া। ঐ চলিয়াছে বাঁশি বাজিয়া। যে বাঁশির স্বরে শিব ব্যোম-ভোলা। যে বাঁশির স্বরে যোগিহৃদয় স্তব্ধ। যে বাঁশির স্বরে ধ্রুব 'আত্মহারা।' যে বাঁশির স্বরে প্রহ্লাদ 'প্রহ্লাদ' অর্থাৎ আনন্দময়। চলিয়াছে সে বাঁশি বাজিয়া। কর্ম্ম কোলাহলের মধ্য হইতে সরিয়া আসিতে না পারিলে এ বাঁশি শুনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বাঁশি চলিয়াছে বাজিয়া। তোমার শ্রবণ অপেক্ষা না করিয়াই, তোমার ক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রশান্ততার প্রতীক্ষা না করিয়াই, বাঁশি আপন মনে বাজিয়া চলিয়াছে। এস পথিক! শ্রান্ত হৃদয়ে, পরিক্লান্ত শরীরে সান্ধ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া বিশ্ব পথে হাঁটিবার মধ্যে যে ধর্ম্মশালা বিশ্রামের জন্য আশ্রয় করিয়াছ, বস, স্থির হইয়া অনুভূতির সাহায্যে সে বংশীধ্বনি শ্রবণ কর। এ স্থানই প্রকৃষ্ট স্থান। এখানে বসিয়াই সে স্থানে যাওয়া যায়। চকিতনয়ন হরিণ উদ্ভ্রান্তচিত্তে যেমন বংশীধ্বনির অনুসরণ করে, এখানেও

তাহাই। কর্ম্ম কোলাহলের মধ্য হইতে সে ধ্বনি শুনিতে পাইলেই আত্মহারা হইয়া পথিক গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হয়, সে এই স্থান, ইহারই নাম ধর্ম্মশালা। জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যে সময় সংসারে স্থিতিলাভ করে, সেই স্থিতিকালই বিশ্ব-পথিকের "বিশ্রামাগার" বা ধর্ম্মশালা। যেমন কোন পথিক কাশী যাইবার সময় প্রতিদিন সন্ধ্যায় কোন এক ধর্ম্মশালায় বিশ্রাম করিয়া করিয়া ক্রমশঃ গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হয়, এ সংসারও তাহাই। লক্ষ্য পথিকের—যাইবে "আনন্দময়ীর পবিত্র রত্নবেদীর নিকটে।' গন্তব্য পথি-কের যাইবে' সে আত্মার দীপ্ত জ্যোতিঃর সমীপে।' নিশ্চিত পথিকের—সে উপস্থিত হইবে 'নির্ম্মলতার মধ্যে।' 'স্থির' পথি-কের—যে সে চলিয়াছে জ্বালাজটিল ও দস্যুসঙ্কুল পথভীতির হস্ত অতিক্রম করিয়া পরম নির্ব্বেদ লাভ করিতে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে তো বিশ্রামের জন্য কোন স্থানের আশ্রয় লাভ করিতেই হইবে, সুতরাং সে স্থানই এই, জন্মমৃত্যুর প্রহেলিকার মধ্যে এই সংসার দশাই অনন্তাভিমুখ বিশ্ব-পথিকের রাত্রিযাপনের জন্য ধর্ম্মশালায় আশ্রয়লাভ। এইজন্য ইহার নাম ধর্ম্মশালা। ইহাকেই বলে "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" এই সংসার রণস্থলাতে দৈনন্দিন ইন্দ্রিয়-সংগ্রামের সহিত মন বুদ্ধির অভিনব সংগ্রাম চলিতেছে। এইজন্য ইহাও কুরুক্ষেত্র।

এবং বিশ্বপথিকের রাত্রিযাপনের জন্য এখানে আশ্রয়লাভ করিতে হয় বলিয়া এই সংসার ক্ষেত্রই 'বিশ্বপথে-রাত্রি।' এ রাত্রি কিন্তু মঙ্গলের। যদিও রাত্রিতেই দস্যুভীতি প্রায়ই হইতে পারে, কিন্তু দস্যুভীতি না থাকিলে কখনও আত্মসাবধান আসিতে পারে না। প্রতিযোগিতা না থাকিলে কেহ কখন উন্নত বা প্রকৃত বস্তু অথবা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। সুতরাং এ রাত্রি রাত্রি হইলেও ইহা সুধাধবলিত পীযূষপূরিত ইহা বলিতেই হইবে,। বিপদের মধ্য হইতেই সম্পদ আসে, অন্ধকার থাকিলেই আলোক পায়। সুতরাং এ রাত্রি 'বিশ্বপথে শিবরাত্রি, অর্থাৎ মঙ্গলময়ী রাত্রি' অথবা "শিবরাত্রি।"

যেহেতু জীবনব্যাপি মহারাত্রির মধ্য হইতে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'আত্মজ্ঞান' বা 'আত্মার অপরোক্ষানুভূতি' অথবা প্রকৃত মনুষ্যত্বের উপলব্ধি হয়। এইজন্য ইহার নাম মঙ্গলময়ী রাত্রি। এই জীবনব্যাপী সুদীর্ঘ সংসারপথরূপ ধর্ম্মশালায় যিনি জাগরিত হইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই যথার্থ এ জীবনে শিবরাত্রির অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। নচেৎ দস্যুভীতি অনিবার্য্য।

ইহারই জন্য এ বঙ্গে প্রতি গৃহে শিব-রাত্রির অনুষ্ঠান, এবং জাগরণপ্রথাও চিরন্তনী। শাস্ত্র, বিধি, সমাজও তাহার প্রতিপালনে মুক্তহস্ত এবং ব্যগ্রহৃদয়। করিতে হয় 'শিবরাত্রি' জীবনে তাহার অনুষ্ঠান করিতেছে, জাগিতে হয় সে রাত্রিতে, নরনারী তাস, দাবা খেলাইয়া, অভিনয় শুনিয়া, অথবা কেহ পূজাজপাদি সদনুষ্ঠানের দ্বারা 'জাগরণ প্রথা' প্রতিপালন করিতেছে; কিন্তু কয়জনের হৃদয়ে এ আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ হয়, যে, জাগরণ করি কেন? জাগরণের উদ্দেশ্য কি? কেহ কি তাহার উদ্দেশ্য অবগত হয়, না হইতে চায়।

শ্রীগীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতে-ছেন—

'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥' ২।৬৯।

যে সমস্ত জীব অজ্ঞানতিমিরাবৃতমতি, তাহাদের নিকট এই ব্রহ্মনিষ্ঠার উপায়ীভূত দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবন নিশার স্বরূপ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ তাহাতে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা জাগরিত থাকিতে পারেন। এবং প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠা স্বরূপ দিবায় প্রবোধিত (জাগরিত) থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগিদিগের তাহাই রাত্রি। অর্থাৎ তাহাদের নিকট বিষয় নিষ্ঠা আদৌ স্থান পায় না, এইজন্য তাহা রাত্রিবৎ প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং দেখা যায়, কি গভীর উদ্দেশ্যই লক্ষ্যে করিয়া এ জীবন-শিবরাত্রিতে জাগরণ প্রথা প্রচলিত। যিনি জাগরণশীল, তিনিই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। তিনি সর্ব্বদা জাগরিত

থাকিয়া দস্যুভীতির হস্ত হইতে পরিত্রাত হন, এবং পরিশেষে শিবরাত্রিব্রতের উদ্‌যাপনে পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে পারেন, নতুবা দস্যুহস্তে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া মৃত্যু হইতেও মৃত্যুর করালে পতিত হন ;, এবং পুনরায় বিশ্বপথে ছাটিবার সময় আরও অধিকতর বিপন্ন হইয়া হাহাকারে জীবন পথ অতিবাহিত করেন।

অতএব এই শিবরাত্রিব্রত "পুরাণে নহে—ইহা জীবনে। সেই পুরাণ অতি প্রাচীন অনাদিকাল পরম্পরায় সমাগত জীবনপুরাণে। অথবা পুরাণ জীবনে, এই শিবরাত্রিব্রত স্মৃতিতে নহে ইহা স্মৃতিতে, অথবা স্মরণে।

ইহাই আর্য্যগীতি। ইহাই আর্য্যানুভূতি। ইহা মানবজীবনের অনুভূতির বিষয়। ইহাকে জানিতে হইলে অনুভূতির অপেক্ষা করিতে হয়, জীবনে সাধনা চাই কঠোরতা চাই। হৃদয় থাকা চাই, তীব্র ইচ্ছা, আর চিত্ত-সংযমের সাহায্য চাই। আর তাহার সঙ্গে আত্মনির্ভরতা এবং ত্যাগশীলতার আবশ্যক চাই তবে তাঁহার দয়া আকর্ষণ করিতে পারা যাইবে। তবে মা আনন্দময়ীর করুণাপ্রস্রবণ শতধারায় তপ্তহৃদয়ে নির্ব্বেদ আনাইয়া দিবে॥ শাস্ত্র পড়িলে, শাস্ত্রের বিচার করিলে, জীবনব্যাপী মহাশাস্ত্রের পরিশীলন করিলে কখন ও শুষ্ক হৃদয়ে সরলতা আনিবে না—

"রস্যতে "স্বাদ্যতে" ইতিরসঃ ? আস্বাদ না করিলে রসানুভূতি হইতে পারে না। আইন পড়িয়া যেমন রাজার স্বরূপ অবগতি হয় না, সেইরূপ কেবল মাত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলে কখনও ঈশ্বরের স্বরূপানুভূতি হইতে পারে না। এইজন্য অনুষ্ঠান চাই, ব্যাকুলতা চাই, তবে শাস্ত্রানুশীলনে জীবন মন পবিত্র হইবে তবে সে চিন্তা স্থান পাইবে। তবে হৃদয়ে জাগরনের প্রতিধ্বনি সমুত্থিত হইবে। সেইজন্য এভারতে শিবরাত্রি, সেই জন্য এভারতে শৈবীরাত্রির উপাসনা, আর জাগরণের প্রথা প্রচলন সেই জন্য এভারতে কোটি কণ্ঠে শৈবীগীতি।

(ক্রমশঃ)

গান্ধীর যুগে নারী।

(শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু।)

বছর কয় আগে দেশের রাজনৈতিক রঙ্গ-মঞ্চে রমণীর আবির্ভাব এক অতি রমণীয় বিষয় ছিল। অনেক রমণী প্রতিনিধি স্বরূপে বছর বছর কংগ্রেস-মণ্ডপ অলঙ্কৃত করিতেন বটে কিন্তু সেটা প্রধানতঃ দর্শক বা শ্রোতা ভাবে,—আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের উপায় উদ্ভাবনের বা সাহায্য করিবার জন্য নহে। সুললিত কলকণ্ঠে শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত-বিনোদন করা এখানেও তাহাদের একচেটে অধিকার হয়ে গেল। হোমরাও চোমরাও কংগ্রেসওলারা কংগ্রেস-সভায় বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটাইয়া দিয়া দেশ হিতৈষিতার জ্বলন্ত নিদর্শন দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন; এবং উপস্থিত দর্শকবৃন্দের বাহবা লইয়াই আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। শেষে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া নির্দ্দিষ্ট অংশ যথারীতি অভিনীত হইল কি না ইহার নির্খুত বিচারের জন্য আপন আপন উৎকৃষ্টতর অর্দ্ধাঙ্গিনীর (better half) প্রতি সৌৎসুক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেন। ফলতঃ বক্তৃতাবাগিস উকিল ব্যারিষ্টারগণ বাক্-যুদ্ধে বিজয়ী উৎফুল্লবীর কর্ত্তৃক ঐদিনের রাণী (Queen of the day) ঘোষণা করিবার অধিকারী হইয়া হৃদয়রাণীর হস্ত হইতে জয় মাল্য গ্রহন করা ছাড়া দেশ সেবা করার প্রকাশ্যতঃ অন্য কোন উদ্দেশ্য পোষণ করিতেন না।

তারপর স্বদেশীর যুগ—মৃন্ময়ী-দেশ দেশের লোকের কাছে তখন চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইলেন। ভারত সন্তান মাটীর দেশকে প্রাণময়ী দশপ্রহরণ ধারিণী কমলা কমলদলবিহারিণী বলে একটু একটু চিনতে সুরু করিল। কবির বীণা ঝঙ্কৃত হইল—

না জাগিলে ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা॥

দেশের লোক তখন হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝিল রমণী কেবল দেশের ভূষণ-স্বরূপা নয়—মাথার মণিও নয়—পুরুষের মতন

আত্মশক্তি সম্পন্না। শত সহস্র স্বরে তাই কলকলনিনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল অন্তরের সেই রুদ্ধবাণী—

কে বলে মা তুমি অবলে।

তখন সরলা বালা এলো, সরোজিনী নাইড্ এলো পুরুষ-প্রকৃতির সংমিশ্রণ হইল। নারীশক্তি উদ্বুদ্ধ হইল—দেশের মৃতদেহে প্রাণ আসিল।

এখন গান্ধীর যুগ—ভীষণ ট্রেঞ্চের মধ্যে, গোলার তোপের মাঝখানে, প্রাণহর এসফিনিক্স গ্যাসের দুর্গন্ধের ভিতর নারী কেমন নিঃশব্দে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করিতে পারে পাশ্চাত্য ললনা গত ইউরোপীয় যুদ্ধে জগতকে দেখাইল। ভারতের রমণীও তা দেখিয়া বুঝিল এবং স্বীয় অনন্ত শক্তির পরিচয় পাইয়া উদ্বুদ্ধ হইল। তাই আজ বেগম মহম্মদ আলি, বেগম শলাম আজাদ সাহেবা, বাসন্তী দেবী ও হেমপ্রভা আমাদের এই ধর্ম্মযুদ্ধে জাতীর কল্যাণার্থে নিজ নিজ পতি-ত্যক্ত স্থান সগর্ব্বে দখল করিয়া স্বরাজের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতেছেন এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খ-নিনাদে ইংরাজ আমলা-তন্ত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন। কিন্তু এ মাদকতা, এ উন্মাদনার নিবৃত্তি কোথায়? এ নবশক্তির কি ভাবে স্ফুরণ হইবে, এ নূতন বন্যার জলতরঙ্গ কোন দিকে প্রবাহিত হইবে, কোন পথে গেলে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা করতে পারবে এসব বিচার করবার এখন একটু সময় আসিয়াছে। এখন ভাবিবার সময় আসিয়াছে অনন্ত প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়া গেলেই দেশের প্রকৃত কাজ করা হইবে না। তাই আজ মহাত্মা গান্ধী ক্ষণংতিষ্ঠ, তিষ্ঠ রবে দেশের লোককে পিছু ডাকছেন।

এসব বিষয় বিচার করতে হোলে আমরা দেখতে পাই নারী সমস্যা মীমাংসায় আমাদের দেশে তিনটী দল বেশ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

একদল আছে যারা মুসলমান যুগের প্রাচ্য অবরোধ প্রথা পুরামাত্রায় এই গণ-তন্ত্রের যুগেও রাখতে চান। নারীর আত্মা নাই, নারী পুরুষের ক্রীড়ার সামগ্রী, পুরুষ

নারীকে যথেচ্ছ দান বিক্রয়াদি হস্তান্তর করিতে পারে। ইহারা ভাবেন অবলা সরলা কুললক্ষ্মীদের গৃহের বাহির করিলে, দুষ্ট-লোকে নজর দিবে, সমাজের তাপে গলে যাবে। কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যদেশে নারী শক্তির নববিকাশ তাহাদের অসহ্য হইয়াছে। মনু যাজ্ঞবল্ক্য স্মরণ করিয়া তাঁহারা দিবারাত্র 'হা হতোঽস্মি' করে গালে হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। আর ঊর্ম্মিলা, বাসন্তী, হেমপ্রভার প্রস্তাবে নিজেদের সনাতন মতের পোষকতার প্রমাণ পাওয়া 'এ দেশের হলো কি' বলে মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করছেন।

আর একটা দল আছে যাহারা ভাবেন তাদের গৃহিণীগণ মেমসাহেব সাজিয়া সমাজে চলাফেরা করিবেন, সভা সমিতিতে জোর গলায় বক্তৃতা করিবেন, আর পাশ্চাত্য সাফরেজিষ্টদের মতন ভোটের জন্য দলবদ্ধ হয়ে দেশে একটা তুমুল আন্দোলন পাকিয়ে তুলবেন। পাশ্চাত্য স্ত্রী-স্বাধীনতার আপাত মনোরম আদর্শ তাহারা প্রাচ্যদেশে ফলফুলে শোভিতা দেখতে চান। এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যাহাই বিলাতি তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দোষশূন্য, ঊর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ। স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে শাশুড়ীর প্রেমফাঁস গলায় পরে প্রেম-বিহ্বলে গলে গলে ধরে প্রেমের তুফানে হাবুডুবু খান, পঞ্চাশৎ-বর্ষীয়া স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করে নূতন প্রৌঢ় প্রেমিক নাগরে মন প্রাণ উৎসর্গ করেন—এ বীভৎস দৃশ্য দেখেও তাদের চৈতন্য হয় না, পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার আদর্শ চূর্ণ বিচূর্ণ হয় না।

আর এক দল মধ্যম পথ আশ্রয় করে বলেন নারীর শিক্ষাবিধানকর স্ত্রী-শিক্ষার জন্য দেশে স্কুল কলেজের সংখ্যা দিন দিন বাড়াও, গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীনতা দাও। আমাদের মণ্টেগু সাহেব যেমন ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির মরণ কাঠী বাঁচন কাঠী বৃটিশ পার্লামেণ্টের হাতে রাখতে চান, আমাদের তথা কথিত জননায়ক ও সমাজ-সংস্কারক ও নারীর উন্নতির মাপকাঠী সম্পূর্ণভাবে পুরুষের হাতে রাখতে চান—নারীর আত্মবোধের গতিবিধি তাদের ইচ্ছানুরূপ নির্ণয় করতে চান।

এই তিন দলের দৃষ্টি অল্প বিস্তর লঘু ও স্থূল হইতেছে। তাহারা জানেন না, হয় তাহারা বর্ত্তমান সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার যুগের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছেন, না হয় তাহারা অনেকটা আগে আসিয়াছেন। ঊর্ম্মিলা—বাসন্তী প্রভৃতি বঙ্গ-মহিলার বাঙ্গালার অন্তঃপুরে যে এক অদ্ভুত বিপ্লব বাধাইয়াছেন তাহা সনাতন নাবা-লকের দল দেখেও দেখেন না, আর এই

ঘোরতর বিক্ষোভ নারী এই চরকা ঘুরাইয়া নিজ নিজ সংসারের কাপড় স্বহস্তে প্রস্তুত করবার প্রবল ইচ্ছা যে ঠিক পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে পাশ্চাত্য নারীর আদর্শে হইতেছে না তাহা চরম উন্নতিশীল দলও দেখিতেছেন না। আর বাঁধন যত শক্ত করবার চেষ্টা হবে, বাঁধন তত টুটবার সম্ভাবনা থাকবে এই নারী শক্তি উন্মেষ অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেষ্টা করলেই মাথা তুলে উঠবে, সুক্ষ্মদর্শী শান্তি প্রিয়ের দল তাহা বুঝেও বুঝতে পারছেন না।

আমাদের দেশে পুরুষদের শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব। প্রকৃত শিক্ষা প্রায় কেহ পায় না। বা পাইলেও শিক্ষামত জীবন গঠন করিবার সুযোগ পায় না। দাস জাতি কবে প্রকৃত শিক্ষা পেয়েছে ? শিক্ষা পেলে দাস প্রভুর স্বার্থে বড় আঘাত লাগে যে! কাজেই স্ত্রী চরিত্র কি ভাবে গঠিত হবে তার ঠিক ধারণা করতে আমরা পারি না। হয় আমরা পাশ্চাত্য বদহজম উদ্গার করি, না হয় সনাতন রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। পুরুষের প্রকৃত শিক্ষার সহিত নারীর শিক্ষাবিধান করা হউক—কিন্তু সে শিক্ষাটা কেবল স্কুল কলেজে নয়, আদর্শ দেখে নারীর স্বাভাবিক মানসিক বৃত্তির অনুশীলন, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য করাই পতিত ভারতের পতিত নরনারীর শিক্ষা দীক্ষা। দেশের যা নিজস্ব তা বজায় রেখে তারপর একটু আধটুকুন কাম করে দিলে আমাদের শিক্ষা দেশীধরণেই হবে।

যারা পাশ্চাত্য আদর্শে আকৃষ্ট হয়েছেন তারা একবার দুটী আঁখি মেলিয়া দেখুন ভারত মাতা চিরদিন দীনা হীনা অনাথা ছিলেন না—কত-মনিমাণিক্য মা'র আঁধার কুঁড়েতে লুকান আছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আদর্শ নারী দেখিতে পারেন। দেখতে পাবেন প্রাচীন হিন্দু সমাজে স্ত্রী ধর্ম্মপত্নি, রাজমাতা আবার রাজজায়া। উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয় বিষয়ের নিবৃত্তিমার্গ—আগমোপায় আবার নিগমোপায়। রমণী একাধারে স্ত্রী, মাতা ভগ্নি রূপে সংসারে বটবৃক্ষের ঝুরির মত সারা সংসার ঘিরিয়া রহিয়াছেন—আবার জগদ্ধাত্রী জগন্মাতার অংশরূপিনী হয়ে ভক্তি উপহার পাইতেছেন। নারী অন্তঃপুরে পুত্রের ভাবি চরিত্র গঠনের সর্ব্বের অধিকারিণী। স্বামীর দুঃখ অবসাদে শক্তিরূপা বরাভয়দায়িনী। আবার পুত্রের বিপদে জ্ঞান বুদ্ধিদায়িনী—স্বধর্ম্মভ্রষ্ট পতি-পুত্রের ধর্ম্মে নিয়োগের কারণ স্বরূপা। ভারত যুদ্ধের সময় স্বধর্ম্ম নাশে তৎপর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পুত্রের প্রতি মাতা

কুন্তি দেবীর উপদেশ। পতিপ্রাণা দ্রৌপদীর ঐ মহা যুদ্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সারগর্ভ মত প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই আমাদের প্রাচীন হিন্দু সমাজে আর্য্য রমণীর স্থান কোথায়। তাদের কিরূপ উন্নত শিক্ষা ছিল। তোমরা সব "বারেক ফিরিয়া কি দেখিবি না চাইয়া"?

ত্রিবেণী।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়।)

(১২)

ধীরেনের যত্নে ও চেষ্টায় ইন্দুর পায়ের ঘা অনেকটা শুকাইয়া গিয়াছে। জ্বরও ছাড়িয়া গিয়াছে। তবে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং মন আরও কঠিন হইয়া গিয়াছে।

একদিন রাত্রে বীরেনকে বাতাস করিতে করিতে ইন্দু বলিল, "আমায় কষ্ট দিয়ে তোমার কি খুব সুখ হয়?" হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া বীরেন উত্তর করিল, "তোমার মনে কি আবার কষ্ট হয় নাকি?"

ইন্দু বলিল "কেন হবে না? আমি কি মানুষ নই?"

বীরেন বলিল "তুমি আবার মানুষ কবে হলে? মেয়ে মানুষরা আবার মানুষ নাকি?"

"মেয়ে মানুষদের কি একটা মন ব'লে কিছু নেই? প্রাণ ব'লে একটা কিছু নেই?"

বীরেন তাচ্ছিল্য ভাবেই বলিল, "মেয়েদের আবার মন প্রাণ কি? তারা তো আমাদের খেলার পুতুল। উঠতে ব'ল্লে উঠবে, শুতে ব'ল্লে শোবে। যাক্, তুমি তো আমার সে কথাটার কোন উত্তর দিলে না।"

"কোন্ কথা?"

"সেই যে একদিন তোমায় বাগানে নিয়ে যাব ব'লেছিলুম।"

শিহরিয়া উঠিয়া ইন্দু বলিল, "ছিঃ ছিঃ ওকথা আর ব'লো না।"

"বেশতো চল না। ওখানে আরও সব মেয়েরা আসবে। কেমন নাচ গান হবে! তুমিও নাচবে।"

ভীত হইয়া ইন্দু বলিল, "ওখানে কি ভদ্দর ঘরের মেয়েরা যায় নাকি! যত সব

বেশ্যারাই তো গিয়ে থাকে।"

"তুমি আবার ভদ্দর ঘরের মেয়ে হ'লে কবে থেকে? তুমিও তো বেশ্যা। আমি তো তোমায় বেশ্যা ব'লেই মনে করি। লোকে যেমন মেয়েমানুষ রাঁধা রাখে আমি তো তোমায় তেমনি রেখেচি।"

ইন্দুর তখন মনে হইল একথা শুনিবার পূর্ব্বে কেন সে মরে নাই। ইহা অপেক্ষা মরা কি ভাল ছিল না?

একটু সামলাইয়া লইয়া ইন্দু বলিল, আমায় তুমি মন্ত্র প'ড়ে বিয়ে করনি। একথা ব'লতে মুখে আটকাল না?"

"বিয়ের সময় আমি কি আর কোন মন্ত্র উচ্চারণ ক'রেছিলুম। এ আর এমন কি একটা ভয়ানক কথা ব'লেচি যে মুখে আটকাবে? আমি তো আবার বলচি, যতগুলো মাগী আমি রেখেচি তার মধ্যে তুমি একটা।"

ইন্দু ভাবিল ও নরক ঘাঁটিয়া কদর্য্য করিয়া তুলিবার কোন প্রয়োজন নাই। কাজে কাজেই সে চুপ করিয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে বীরেন বলিল, "চুপ ক'রে গেলে যে? তাহ'লে কথাটা মেনে নিলে তো?"

"সত্যি ক'রে বলদিকি তুমি কি আমায় একটুও দেখতে পার না? মোটে ভালবাস না?

"কি ক'রে তোমায় ভালবাসবো?"

"কেন? আমি কি এতই ঘৃণ্য! এতই নীচ!"

"অনেকটা তাতো নিশ্চয়ই। তুমি আমার কথা শোন না কেন? মানদা, বেদানা, আঙ্গুর—ওরা কেমন আমার কথা শোনে। নাচতে ব'ল্লে নাচে, গান গাইতে ব'ল্লে গান গায়। কেমন তারা গায়ের ওপোর ঢ'লে ঢ'লে পড়ে। তুমি তা কর? তবে আর তোমায় ভালবাসবো কি ক'রে? দেখতে পারবো কি ক'রে? বাগানে যেতে বল্লুম গেলে না, সেদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা কইতে বল্লুম, কথা কওয়া দূরে থাক, তার সামনেই তুমি বেরুলেই না; এত ক'রে নাচ শিখতে বল্লুম নাচ শিখলে না। এতে কি আর কেউ কাউকে ভালবাসতে পারে?"

উত্তরে ইন্দু বলিল, "অনেক রাত্তির হ'য়ে গেছে। ঘুমোও; আমি বাতাস কচ্চি।" মনে মনে বলিল, "তোমায় ভাল না ক'রে আমি কখনই ম'রতে পারবো না।"

ইন্দু জানিত না সে রাত্রে আরও অনেক লাঞ্ছনা তাহার কপালে ছিল।

অধিক রাত্রে একটা শব্দে বীরেনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখিল তাহার মাথার কাছেই ইন্দু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া আবার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। ইন্দুকে ধাক্কা মারিয়া জাগাইয়া বলিল, "আমি বাইরে যাব, আমায় সঙ্গে আলোটা নিয়ে একবার এসতো।"

ইন্দু তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। অভাগিনী তখন বুঝিতে পারিল না যে তাহার বিরুদ্ধে কত বড় একটা ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে। স্বামীর কথায় বিশ্বাস করিয়া নিঃসন্দেহ চিত্তে একটা আলো লইয়া বীরেনের সহিত ঘরের বাহিরে প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রাঙ্গনের একদিককার পাঁচিলের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ইন্দু দেখিল পাঁচছয় জন যুবক সেখানে বসিয়া হাসিতেছে এবং তাহাকে কত কি ইসারা করিতেছে। ইহারা যে বীরেনের বন্ধু এবং তাহারই কথায় এত রাত্রে এখানে আসিয়াছে ইন্দুর ইহা বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

তাড়াতাড়ী আলোটা সেখানে ফেলিয়া দৌড়াইয়া পলাইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেই বীরেন ইন্দুর আঁচল ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল এবং বীরেনের বন্ধুগণ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

আলোটা ইন্দুর হাত হইতে পড়িয়া গিয়া নিবিয়া গিয়াছিল। অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতে গিয়া অন্ধকারে দেখিতে না পাইয়া একটা ইঁটে পা লাগিয়া হোঁচট খাইয়া বীরেন পড়িয়া গেল। সেই অবকাশে ইন্দু পলাইবার চেষ্টা করিতেই একজন যুবক পাঁচিল হইতে লাফাইয়া ইন্দুর হাত ধরিয়া ফেলিল এবং বলিল, "কোথায় যাবে চাঁদ। তোমায় নিয়ে একটু স্ফূর্ত্তি ক'রবো বলে যে এই ফন্দীটা বার ক'রেচি বাপ্।"

ইন্দু আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। "মাগো" বলিয়া সেইখানেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। যুবকেরা ইন্দুর এ অবস্থা দেখিয়া পাঁচিল টপকাইয়া পলায়ন করিল।

এই সব গোলমালে ধীরেনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে একটী লণ্ঠন লইয়া বাহিরে আসিয়া ইন্দুকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া বলিল, "বড়দা' বউদির কি হ'য়েচে? ওখানে ওরকম ক'রে শুয়ে আছেন যে!"

বীরেন যেন কেমন একটু হইয়া গিয়াছিল। সে তো এতটা আশা করে নাই। বন্ধু না হয় ইন্দুর হাতই ধরিয়াছিল; তাহাতে এমন দোষই বা কি হইয়াছে! বেদানা, আঙ্গুর, মানদা— ইহাদের হাত তো সবাই ধরে। ইহারা তো এইরূপ অজ্ঞান হইয়া যায় না! তবে এ সামান্য ব্যাপারে ইন্দু অজ্ঞান হইয়া

পড়িল কেন ?

এই সমস্ত ভাবিয়া বীরেন কেমন যেন একটু অবাক্ ও হতভম্ভ হইয়া গেল। ধীরেনকে বলিল, "ছাখ দিকি বোধ হয় অজ্ঞান হ'য়ে গ্যাছে।" বলিয়া নিজের ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

ধীরেন ইন্দুর মস্তকটা নিজের কোলের উপর রাখিয়া বাতাস করিতে লাগিল এবং মুখে জল দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ডাকিল, "বৌদি,' বৌদি' ও বৌদি'।"

ইন্দু চক্ষু চাহিয়া আবার চক্ষু বন্ধ করিল। বলিয়া উঠিল, "সুরেশদা' আমায় নিয়ে চল ; তানাহলে আমি আর বাঁচবো না। এরা আমায় মেরে ফেলবে।"

ধীরেন আবার ডাকিল, "বৌদি' চেয়ে দেখ আমি ধীরেন।" ইন্দু কাঁপিতেছে দেখিয়া পুনরায় বলিল, 'কাঁপচ কেন বৌদি! এই যে আমি তোমায় ধ'রে আছি। ভয় কি বৌদি'।

ভাল করিয়া চোখ চাহিয়া ইন্দু বলিল "তারা চলে গেছে? এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে ঠাকুরপো? তারা যে আমায়—" ইন্দু আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

বীরেনের জননী সে দিন বাটী ছিলেন না। পাড়ায় কোথায় যাত্রা হইতেছিল তাহাই দেখিতে গিয়াছিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে বীরেন বলিল, "জ্ঞান হ'য়েচেরে ? ধীরেন বলিল, "না।

"মাকে ডেকে আনব ? কি রকম দেখছিস্।

বেশ জ্ঞান হওয়ার পর ইন্দু বলিল—"কালই মার কাছে একটা খবর দিও ঠাকুরপো। তাঁর জন্য আমার বড্ড মন কেমন কচ্চে।" হেমলতাকে দেখিয়া বলিল—"আজ আর আমায় কিছু বলো না ঠাকুরঝি, তোমার পায়ে পড়ি। আজ রাত্রে আমি তোমার কাছে শোব। আবার যদি তারা আসে?" শিহরিয়া উঠিয়া ইন্দু পাঁচিলের দিকে চাহিল।

হেমলতা বলিল—"কি হয়েচে ধীরু? বউ অমন ধারা কচ্চে কেন?"

ধীরেন বলিল—"কি একটা দেখে বৌদি বড় ভয় পেয়েছেন। আজ তোমার কাছেই বউদিকে শুতে দাও দিদি। বলতো আমিও তোমাদের কাছে থাকি।"

ঘর হইতে বীরেন বলিল—"হাঁ হাঁ, তোরা আজ তিন জনেই এক জায়গায় থাক ধীরু। ওকে একা রাখিসনি, আবার ভয় পাবে হয়তো।"

হেমলতা অগত্যা বলিল—"তা এস বউ আমার ঘরেই শোবে এস। তুইও না হয় আয় ধীরু।"

ক্রমশঃ

নামের বল।

(কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।)

"হরিনামের গুণে, গহন বনে
শুষ্ক-তরু মুঞ্জরে।"

ইহা ভক্ত-কবির প্রাণ-কথা। বস্তুতঃ হরিনামের গুণে শুষ্ক-তরু মুঞ্জরিত—শাখা-পত্রও ফুলে-ফলে পরিশোভিত হয়, অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে, মূকের বাক্‌শক্তি পরিস্ফুট হইয়া থাকে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘিতে সমর্থ হয়, মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠে, পাষাণ-কঠিন দস্যুর প্রাণে—ভক্তি-বিশ্বাস হীন নাস্তিকের মনে ভক্তি-গঙ্গার পূত প্রবাহ ছুটে, পতিত পাষণ্ড বিষয়াসক্তের চিত্তে ভগবদ্ভক্তির বাণ ডাকে—বিষয়-তৃষ্ণা টুটে, এ বিশাল বিশ্বে অঘটন ঘটনা ঘটে, বধির শ্যামসুন্দরের প্রেমের বাঁশরী শুনিয়া বিশ্বময় ছুটিয়া বেড়ায়। এ দৃশ্য অভিনব নহে—অসম্ভব নহে, অলীক কল্পনা নহে; ইহা বহুজন-প্রত্যক্ষীভূত মহা সত্য। বিশ্বের ইতিহাসে, শাস্ত্রে-পুরাণে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। একটী সত্য ঘটনামূলক ক্ষুদ্র গল্পের অবতারণা করিয়া আজ আমরা বিষয়টি পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইব।

হরিদাস রায় কলিকাতার একটা বড় হৌসের বড় বাবু। রায় মহাশয় সবল সুস্থ সুশ্রী পুরুষ। তিনি বয়সে এখনও যৌবনের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ের আসন পরিগ্রহ করেন নাই। রায় মহাশয় কাঙ্গালও নহেন, কুলীনও নহেন; পরন্তু তিনি লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র না হইলেও স্নেহ-ভাজন প্রিয়পুত্র বলিয়া ধনী ও বিজ্ঞ সমাজে সমাদৃত এবং আভিজাত্য সমাজেও গৌরবান্বিত। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন এবং দাস-দাসীতে—আনন্দ-কোলাহলে তাঁহার গৃহ নিয়ত মুখরিত। সুখের সংসার। দুঃখ-দুর্গতি-দুর্ব্বিপাক বলিয়া একটা কথাই যেন এ সংসারে নাই। চিরদিনই "মধুরে বহিবে বায়, ভেসে যাব রঙ্গে" এমনি তাঁহার মনের

ভাব—এমনি সুখে তাঁহার জীবনের দিন-গুলি কাটিয়া যায়। ভাবনা নাই, চিন্তা নাই—মর-জগতের কোন বালাই-ই যেন তাঁহার নাই। সুতরাং কোনরূপ আরাধনা-উপাসনা, সন্ধ্যা-আহ্নিক, দান-ধ্যান-পার্ব্বণ প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুষ্ঠানের ধার তিনি জীবনে একদিনও ধারেন নাই। প্রত্যহ যথাসময় আফিসে যাও—উপরওয়ালা সাহেবের সঙ্গত অসঙ্গত আদেশ প্রতি-পালন কর, বৈধ-অবৈধ যে কোনও প্রকারে ভূরি-পরিমাণ অর্থ অর্জ্জন কর, আর খাও দাও মজা কর, ইহাই ছিল জীবন-ধর্ম্ম। পূর্ণিমার পর অমাবশ্যা, আলোর পশ্চাতে আঁধার, সুখের অন্তরালে অকস্মাৎ দুঃখের বিকট আলেখ্য থাকিতে পারে, ইহা তাঁহার সুখ-সাগরে ভাসমান মনের চিন্তার অতীত।

কে জানে, কেমন করিয়া কুসুমে কীট প্রবেশ করে? সুরভি সুন্দর নয়ন-প্রীতিকর পেলব কুসুমের বিমল কান্তি মুহূর্ত্তে কেমন করিয়া বিলয়প্রাপ্ত হয়। সুকোমল সুহৃকায় দেব-শিশুটি কি সুন্দর হাসিতেছে, নাচিতেছে, মনের আনন্দে ধূলায় লুটাইয়া খেলিতেছে, সহসা কালসর্প দংশন করিল—দুইবার ভেদ বমন বা সর্দ্দি-জ্বর হইল, অমনি তাহার জন্য শ্মশান-অনল জ্বলিয়া উঠিল—আনন্দ কোলাহল-পূর্ণ শান্তির গৃহ ভীষণ রোদন-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া চারিদিকে বিষাদের বিষাক্ত বায়ু ছড়াইতে লাগিল। বিবাহ-বাসরের সুখের ফুলশয্যা সহসা কাহার ইঙ্গিতে অনন্ত দুঃখের কন্টক-শয্যায়—'চিতা-বিছানায়' পরিণত হইল! বিবাহ-উৎসব বাটিকার আনন্দ-উল্লাস—হর্ষ-কোলাহল শোক-দুঃখের করুণ বিলাপ-চীৎকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। ফল-পুষ্প-পল্লব সুশোভিত সতেজ সমুন্নত বৃক্ষ কাহার ইচ্ছায় সহসা বজ্রাহত হইয়া শুকাইয়া উঠিল—প্রবল বাত্যা-প্রবাহে ভূতলে অবলুণ্ঠিত হইল! সোণার লঙ্কা জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইল—মহাসাম্রাজ্য পরম সুশোভন ইন্দ্রপ্রস্থে মহাধ্বংসের দাবানল জ্বলিয়া উঠিল! এ সব অঘটন-ঘটনা—এ সব মহা পরিবর্ত্তন সেই মঙ্গলময়েরই

শুভ ইচ্ছাপ্রসূত! ধূলি-কাদা মাখা শিশুকে নির্ম্মল, সুন্দর ও পবিত্র করিবার নিমিত্ত ইহা স্নেহ-করুণাময়ী জননীর কুসুমপেলব শুভ্র হস্তেরই অঙ্গুলী তাড়না। ইহা নিষ্ঠুরতা নহে; দেবতার আশীর্ব্বাদ।

একদিন আফিসের পথে রায় মহাশয় সহসা কঠিন বাত-ব্যাধিতে অচল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আপন ঘরের সাধের 'মটর' যখন গৃহ-দ্বারে উপনীত হইল, তখন তিনি অবতরণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে একটা ভারী বস্তার ন্যায় গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। অমনি চারিদিক হইতে 'হায়! হায়!' রব উঠিল। আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী সকলে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে সযত্নে ঘরে তুলিয়া লইল। অচিরে সহরের নানাস্থানে বড় বড় ডাক্তার কবিরাজের সন্ধানে লোক ছুটিল॥

অচিরে আত্মীয়-স্বজনে, অনুগত জনে এবং ডাক্তার-কবিরাজে রায়-ভবন পরিপূর্ণ হইল। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, চিকিৎসকের পর চিকিৎসক আসিতেছেন, যাইতেছেন, কত লোক দেখিতেছে, কত সেবা-শুশ্রূষা চলিতেছে, কিন্তু রায় মহাশয়ের দারুণ রোগ আর কিছুতেই প্রশমিত হইতেছে না—বন্যার জলের মত ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে! নিষ্ফল প্রয়াসের সুদীর্ঘ শ্বাসের পাষাণ চাপা দিয়া রোগীর ভাঙ্গা বুকে নৈরাশ্যের অন্ধ পসরা তুলিয়া দিয়া বিনিময়ে রজত-কাঞ্চনের এক বোঝা লইয়া ডাক্তার-কবিরাজগণ সব বিদায় হইলেন। মহা বিজ্ঞের ন্যায় সকলে সমস্বরে বলিয়া গেলেন, 'এ রোগ শিবেরও অসাধ্য; রোগী আর আরোগ্য হইবে না। অন্যধিক ছয় মাস কাল মধ্যে ইহার মৃত্যু অনিবার্য্য!'

বড় বাবুর সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিনিময়েও কি যমের যম মিলে না গো? অন্ততঃ ঘুস্-খোর অনাহারী বিচারকের মত, মৃত্যুপতি কিঞ্চিৎ পার্ব্বণীরও আশা—আকাঙ্ক্ষা করে না কি গো? দূর ছাই! দেবতারা বড় নির্ব্বোধ! তাঁহারা পূজা গ্রহণ করেন, কিন্তু ভক্তি-পার্ব্বণীর মর্ম্ম বুঝেন না!

কত রোজা আসিল, হেকিম কত

'বাত-হজ্মীর' বটিকা ও গুড়িকা সেবনের—তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিল, কত পেটেন্ট ঔষধ ওয়ালার শিশি-বোতল শূন্য হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! সব যেন যম-রাজার সহকারী সম্পাদকরূপে নবীন অতিথির জন্য যমপুরী গমনের পথ-ঘাটের-আবর্জ্জনা দূর করিয়াই স্ফীতবক্ষে বিদায় গ্রহণ করিল।

তারপর সহরের যত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত মণ্ডলীর ডাক পড়িল। কত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, কত ঝাড়-ফুৎকার-স্নান, কত ক্ষুদ্র বৃহৎ অষ্ট-ধাতুর কবচ তাবিজ, কত গ্রহ দোষ শান্তির ভ্রান্তি-অভ্রান্তি যোগ-যাগ-যজ্ঞ চলিল, ফল সেই যমপুরী গমনের পথ পরিষ্কার ব্যতীত আর কিছুই হইল না। বিদায় গ্রহণ কালে সকলে স্ফীত বক্ষে উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া গেলেন, "ইহাঁর সবগুলি গ্রহই মন্দ—ত্রিপাপ, সপ্তশূন্য, গুরু, রাহু, কেতু, শনি সব বিরোধী, তাহাতে আবার চন্দ্রশুদ্ধি নাই; সুতরাং ছয় মাস মধ্যে ইহার মৃত্যু—অবধারিত। এ কথা মিথ্যা হইলে এ জগৎ মিথ্যা, আমরা মিথ্যা জ্যোতিষ শাস্ত্র মিথ্যা, ইহার প্রদত্ত রজত-কাঞ্চন সবই মিথ্যা।"

মানবের গর্ব্ব-অভিমান—মনুষ্য-বিদ্যার পরিণাম দেখিয়া অলক্ষ্যে দেবতা হাসিলেন। সকল দিক হারাইয়া রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা সব প্রমাদ গণিলেন—সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেন। রোগী জীবিতাবস্থায়ই যমালয়ের রসায়ন-চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। সুখের সংসার ঘোর বিষাদ কালিমায়—মৃত্যুর বিষম বিভীষিকাপূর্ণ ভীষণ মলিনতায় সমাচ্ছন্ন হইল। লক্ষ্মী পূর্ণিমার বিমল জ্যোৎস্নালোকে কে যেন গাঢ় অমানৈশ-তামস ছড়াইয়া দিল।

বিপদে শ্রীমধুসূদন। বড় অসময়ে প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে চিরমঙ্গলময় শ্রীভগবানের পবিত্র মধুর নাম এই তাঁহার জীবনে প্রথম স্মরণ হইল! অচিরে তিনি স্বীয় কুল-গুরুকে ডাকিয়া তাঁহার স্নিগ্ধ শীতল পদ-ছায়ায় বসিয়া ইষ্ট-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। এত দিনে দেবতার কৃপায় অন্ধের চক্ষু ফুটিল—পথ-ভ্রষ্ট পথিক তাহার লক্ষ্য-

পথের সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইল, অমঙ্গলের ঘরে সর্ব্বমঙ্গলময়ের পবিত্র আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল—মরুভূমে বাণ ডাকিল !

গুরুদেবের অনুগ্রহেও মন্ত্র-শক্তি প্রভাবে দুঃদিনের মধ্যে রুগ্নের দেহে যেন এতটুকু অভিনব শক্তির ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল। তারপর সহসা রায় মহাশয় জন-কোলাহল-মুখরিত মহাসমৃদ্ধ কলিকাতা মহানগরী পরিত্যাগ করিয়া কোন এক সুদূর দেশে—বৃন্দাবনের অজ্ঞাত পল্লী-নিবাসে চলিয়া গেলেন। তাঁহার কলিকাতাস্থ বিরাট ভবনের দ্বার বন্ধ হইল। সেখানে সন্ধ্যার দীপ জ্বালিবার জন্যও কেহ থাকিল না। কালপ্রবাহে ক্রমে ক্রমে সহরের বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহার কথা বিস্মৃতির অতল সলিলে ডুবাইয়া দিলেন। তিনি জীবিত কি মৃত অনেকে আর সে সংবাদ লওয়াও কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না। তাঁহার চিকিৎসক ও জ্যোতির্ব্বিদ বন্ধুগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এত দিনে রায় মহাশয়ের সব শেষ হইয়া গিয়াছে। মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান এমনি সঙ্কীর্ণ—এ জগতের স্বার্থ-ম্লান বান্ধবতা এমনি অসার—এমনি ক্ষণ ভঙ্গুর !

*　　*　　*

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস; এইরূপে সুদীর্ঘ একটী বৎসর মহাকালের বিশাল কুক্ষিগত হইল। বৎসর অন্তে এক দিন কলিকাতায় রায়-ভবন সহসা আনন্দ কোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিল। পরিত্যক্ত বিজন-পুরী আবার উল্লাসে-আলোকে ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ! এত দিন পরে রায় মহাশয় পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। আজ তাঁহারই আগমন উপলক্ষে আনন্দ-ভোজ। তাই পরস্পর প্রীতি-সম্ভাষণের মধুর গুঞ্জনে এবং নিমন্ত্রণ বাটীর কর্ম্ম-কোলাহলে দীর্ঘকাল অন্তে নীরব ভবন আবার মুখরিত হইয়া উঠিল। সুপ্ত পুরীর গুপ্ত কক্ষে কে যেন প্রেমের আলো জ্বালিয়া সজীবতার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সকল আঁধার—সকল নিরবতা-নিরানন্দ দূর করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে—মরুভূমে সুশীতল সুবিমল সুপবিত্র মন্দাকিনী প্রবাহ বহিয়াছে।

বিরাট্ ভোজ-সভায় রায় মহাশয় যখন সমাগত ভদ্র মণ্ডলীর অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইলেন, তখন সকলে—বিশেষতঃ তাঁহার বিদ্যাভিমানী জ্যোতির্ব্বিদও চিকিৎসক বন্ধুগণ রায় মহাশয়ের পূর্ব স্বাস্থ্য, হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ নিরাময় দেহ, পরম সুন্দর নধর কলেবর দর্শনে যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। মুহূর্ত্তে সমবেত জনমণ্ডলীর আনন্দ-কোলাহলে দশ দিক পরিপূর্ণ হইল।

অতঃপর তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কিরূপ চিকিৎসায় সে মুমূর্ষ-দশা হইতে এরূপ সবল-সুস্থ দেহ লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, কোনরূপ বাধা না থাকিলে তাহা প্রকাশ করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"না কিছু মাত্র বাধা নাই। আমার কলিকাতার চিকিৎসক বন্ধুগণ যখন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন আমি জীবনে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া আমার গুরুদেবের শরণ লইলাম; কৃপা করিয়া তিনি আমাকে একটা অভিনব ঔষধের সন্ধান বলিয়া দিলেন। সে ঔষধে সর্ব্বব্যাধি দূরে যায়—রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু সব পালায়। উহা রসনা পীড়া দায়ক তিক্ত-কষায়-কটু ঔষধ নহে, উহা চির মধুর—পরম অমৃত উহা 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশি আকুল করয়ে প্রাণ।' উহা পার্থিব সাধারণ ভেষজ নহে, উহা স্বর্গীয় পীযূষ—উহা চিরমঙ্গলময় শ্রীভগবানের চির পবিত্র চির মধুর নাম—উহা বিশ্ব-প্রাণ হরিনাম। আমি আমার ইহ-পরকালের মূর্ত্তিমান দেবতা গুরুদেবের আদেশে ও উপদেশে প্রত্যহ প্রতিমুহূর্ত্তে ঐ নাম কীর্ত্তন করিয়াই আমার সে কঠোর ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছি।

গুরুদেবের উপদেশে বৃন্দাবনের নির্জ্জন নিবাসে আমি প্রত্যহ প্রতিক্ষণে অনন্যচিত্ত হইয়া অবিরত শুধু হরিনাম করিয়াই অতিবাহিত করিতাম। হরি নামই আমার সে কঠোর ব্যাধিমুক্তির কারণ—হরিনামই জীবের ভবব্যাধি মুক্তির নিদান। ...

এ স্বর্গীয় নাম—এ কল্যাণ-বার্ত্তা বহুল-প্রচার মানসে আমার পরমারাধ্যতম প্রাণ-দেবতা গুরুদেবের ইচ্ছায় ও আদেশে আজ আমি মহাতীর্থ বৃন্দাবনের পবিত্র নিবাস ছাড়িয়া আপনাদের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছি। প্রার্থনা, চিরমঙ্গলময় শ্রীভগবান্ শ্রীহরির কৃপায় গুরুদেবের শুভ আশীর্ব্বাদে আপনাদের সকলের প্রাণে পবিত্র মধুর হরিভক্তির মহা বন্যা প্রবাহিত হউক। হরিনামের গুণে আপনারা সকলে সর্ব্ব-ব্যাধির হাত হইতে মুক্ত—নামের বলে বিশ্ব বিজয়ী ভগবদ্ভক্ত হউন। আপনাদের মধুর কণ্ঠের সুপবিত্র নাম-ধ্বনিতে দশ দিক মুখরিত হউক। এক্ষণে সকলে সমস্বরে প্রেম-ভক্তি ভরে বলুন, হরিবোল! হরিবোল। হরিবোল।

জার্ম্মাণীর বাণিজ্য-প্রণালী।

(শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণী অল্পকাল মধ্যেই পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবসায়ের অধিকাংশই একচেটিয়া করিয়াছিল ইহা সর্ব্বজন বিদিত। কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া জার্ম্মাণ জাতি বাণিজ্য ক্ষেত্রে এতাদৃশ অদ্ভুত উন্নতি লাভ করিল তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে জ্ঞানলাভ হয়। স্থির মস্তিষ্কে তাহাদের সকল ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে নিম্নলিখিত কারণগুলি বাণিজ্যোন্নতির প্রত্যক্ষ হেতু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যথা :—

১। জার্ম্মাণ জাতির শ্রম সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিমত্তা।

২। তাহাদের শিক্ষাদান প্রণালীর উৎকৃষ্টতা ও সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের কার্য্যতঃ অনুশীলন।

৩। ব্যবসায় বাণিজ্য সংরক্ষণের সমীচিন প্রথা।

৪। বাণিজ্য ব্যাপারে রাজার উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান

৫। সাফল্যপ্রদ বাণিজ্য প্রচেষ্টার উন্নতি করণার্থে জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্কসমূহ তদীয় অর্থনীতি অনুসারে সকলের সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে।

এই সকল অবস্থা এতই সুচারু এবং তাহাদের ব্যবহার পদ্ধতি এতই ফলোদায়ক যে, জার্ম্মাণীর বাণিজ্য অদ্যাবধি জগতের ব্যবসায়ী জাতিসমূহের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সময় ও স্থানাভাবে নিম্নে কয়েকটি সংক্ষেপ বিবরণী প্রদত্ত হইল। তাহাতেই উক্ত বিষয় অল্পবিস্তর বোধগম্য হইবে।

কারটেল (Keitell) প্রথা—

কতকগুলি সওদাগর কিম্বা শিল্পকার উৎপন্ন পণ্যের হার ও বিক্রয় মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ধারা নির্ণয় করিবার সর্ত্তে পরস্পরে আবদ্ধ হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এইরূপ সঙ্ঘই কারটেল নামে অভিহিত। বর্ত্তমানকালেও জার্ম্মাণীর ব্যবসায়ীগণ,—এমন কি আমেরিকারও বহু সওদাগর,—উক্ত প্রকার সমিতির সাহচর্য্যে ব্যবসায় করিয়া থাকে।

উক্ত কারটেল প্রথা বা সওদাগরী কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি সকল জার্ম্মাণীর সমস্ত ব্যবসায়ের মুখপাত্র। এক একটী সমিতি এক এক প্রকার বাণিজ্যের কর্ণধার। সেই সেই বাণিজ্য সম্বন্ধীয় স্বতন্ত্র ব্যবসাদারগণকে একটী শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়াছে এবং তাহাদের যাবতীয় বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে। যথা :—

দ্রব্যের বাজার দর স্থিরীকরণ তাহাদের কর্ত্তব্য। যে কারটেল যেরূপ বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট তদুপযোগী দ্রব্য যে সকল স্থানে সুলভ প্রাপ্য সেই সকল স্থান তদ্রূপ কারটেলের করায়ত্ত থাকিবে এবং সেই সকল দ্রব্য ব্যবসাদারগণকে সরবরাহ করিবার একচেটিয়া ক্ষমতা তাহাদের বর্ত্তিবে। ব্যবসায়ের উৎপন্ন দ্রব্যের হার নির্দ্ধারণ তাহারাই করিবে। প্রত্যেক কারটেল নিজ নিজ বাণিজ্য ব্যাপারে সম্মিলিত ব্যবসাদারগণের লাভালাভ অংশীদারগণের মধ্যে যথাযথভাবে বণ্টন করিয়া দিবে।

এইরূপ সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য—ব্যবসাদারগণ যে সকল পণ্য বিক্রয় করিবে তাহার নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্য সস্তার সরবরাহ করা; যে সকল বস্তু খরিদ করিবে তাহার চাহিদা বা Demand পারানিবদ্ধ করা, যে পণ্যের উপর পারতপক্ষে যতটা লাভ করিতে পারা যায়—ততটা বাজার দর চড়াইয়া রাখা।

কারটেলের আইন কানুন প্রবর্ত্তন করিবার জন্য ইহার শাসন পরিষদ ব্যবসায়ীদের কারবারের বহি দলিল ও চিঠি পত্রাদি পরিদর্শন করিতে পারে; এমন কি, ইচ্ছা করিলে মাল সরবরাহ কার্য্যেও আয়ত্ত করিতে পারে। ইহার ফলে খুচরা ব্যবসাদাররা সব Agent কারবারী হইয়া গিয়াছে। তাহারা তাহাদের প্রতিনিধিকেন্দ্র কারটেলের নিকট হইতে মাল খরিদ করে। সে সকল মালের খরিদ এবং বিক্রীর মূল্য নির্দ্ধারিত। উপরন্তু, কোন কোন মাল কোন কোন স্থানে বিক্রয় হইবে তাহারও তালিকা প্রস্তুত করা আছে।

এক প্রকার খনিজ ও নির্ম্মিত দ্রব্যের বাণিজ্যকেন্দ্র স্বরূপ এক একটী কারটেল গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক কারটেল যেমন স্ব স্ব সীমানিবদ্ধ ব্যবসায়ীগণের স্বার্থ রক্ষার্থে সচেষ্ট থাকিবে তেমনি পরস্পরের প্রতিও সাহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া একযোগে জাতীয় বাণিজ্যের স্বার্থ রক্ষার্থে কার্য্য করিয়া থাকে।

এই প্রকার প্রণালীতে বাণিজ্য পরিচালিত হইলে প্রতিযোগিতায় মালের দর ক্রমান্বয়ে অল্প হইতে অল্পতর হইতে থাকে না; কাজেই লাভের পরিমাণও ক্রমে হ্রাস হয় না। অন্যথায় কারবারের ধনীগণ আপনা আপনি প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া খরিদ্দারগণের সুবিধা করিয়া দিয়া থাকে। উক্তরূপ সমিতির সুনিয়মের ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায় সকল বৃহত্তর ব্যবসায়ের সজ্বর্ষে নষ্ট হইয়া যায় না; বরং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রবণ হইয়া থাকে। সওদাগরী সঙ্ঘের স্বদেশজাত মৌলিক দ্রব্যের উপর একচেটিয়া অধিকার থাকায় বিদেশীয়গণ সে সকল বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পায় না।

অসংযত প্রতিযোগিতায় মূল্য অল্প হয় বটে কিন্তু জিনিষ উৎকৃষ্ট হয় না। কারণ ব্যবসায়ীগণ আপন আপন মালের অধিক কাটতি করিবার লোভে যতদূর সম্ভব অল্পমূল্যের অপকৃষ্ট দ্রব্যের দ্বারা মাল প্রস্তুত করে ও বাহিরে চাকচিক্য করিয়া বাজারে বাহির করে। জাপান এইরূপ প্রণালী অনেকটা অবলম্বন করে বলিয়া তাহাদের মাল বাজারে শ্রেষ্ঠ স্থান পায় নাই। এইরূপ ধ্বংসকারী প্রতিযোগিতার উচ্ছেদ করিয়া পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিবার মানসে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি সওদাগর ধনী সর্ব্বপ্রথম মিলিত হয় এবং আমেরিকায় Standard Oil Trust স্থাপিত করে। তাহার পর হইতেই এইরূপ সমিতি গঠন ব্যবসায়ীজাতীগণের মধ্যে প্রচলিত হইয়া পড়ে।

ব্যাঙ্কিং প্রথা (BANKING SYSTEM)

বাণিজ্য যজ্ঞের মূলমন্ত্র অর্থ। সেই অর্থ—ব্যষ্টিভাবে সামান্য কিন্তু সমষ্টিতে পর্ব্বত প্রমাণ। এইরূপ অর্থ-সমষ্টির ভাণ্ডার ব্যাঙ্ক, এবং ব্যাঙ্কই বাণিজ্য ব্যাপারে প্রধান উপকরণ ও সহায়। সেই ব্যাঙ্কই জার্ম্মাণ ব্যাণিজ্যের পৃষ্টপোষক।

জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্ক সমূহের বিধি এইরূপ ভাবে গঠিত যদ্বারা উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। উহাদের সাহায্যে বাণিজ্যনিচয় পরিপুষ্ট, উৎসাহিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জার্ম্মাণীর যে কোন প্রকারের ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ব্যাঙ্কের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলে ব্যাঙ্ক তাহাকে প্রয়োজনীয় মূলধন দান করিয়া থাকে। অবশ্য ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষরা প্রথমতঃ—প্রার্থীর শক্তি ও বুদ্ধির পরীক্ষা করে, দ্বিতীয়ত যে কার্য্য সে করিতে চায় তাহার সাফল্য সম্ভাবনার বিষয় অনুসন্ধান করে। এই দুইটী বিষয়ে যদি সন্তোষজনক লক্ষণ দেখিতে পায় তাহা হইলে ব্যবসায়ীর অর্থের অভাব হয় না। ব্যাঙ্ক সানন্দে, তাহার যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া তাহাকে কার্য্যে প্রণোদিত করে। সে কারণ, জার্ম্মণীর সকল ব্যবসায়ই সর্ব্বতোভাবে উন্নতিশীল ও সুযশপ্রসু, প্রায়শঃ

দেখা যায়।

ভারতবর্ষের মাড়ওয়ারী সওদাগর দিগের মধ্যে এবম্প্রকার অর্থ সাহায্যকরী 'হুণ্ডী' প্রথার প্রচলন থাকায় তাহাদের কারাবারে এ সুবিধা ও উন্নতি।

সস্তায় মাল উৎপাদন প্রণালী।

যাহাতে সস্তায় উৎকৃষ্ট মাল প্রস্তুত হইতে পারে সে বিষয়ে জার্ম্মাণীর বিশেষ লক্ষ। ইহার দ্বারাই প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। ইহার জন্য জার্ম্মাণী সুন্দর প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে।

জার্ম্মাণীর প্রায় সকল কলকারখানায় রসায়ণ বিজ্ঞান বিশারদ ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করা হয়। যে সমস্ত দ্রব্য নগণ্য ও অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হয় সেই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া ঐ সকল রাসায়নিক নিয়ত পরীক্ষা করিতেছেন। এবং বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইতে অতীব প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবন করিতেছেন। এই প্রকারে জার্ম্মাণজাত অনেক উৎকৃষ্ট সামগ্রী অতিশয় সস্তায় প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা জগতের অনেক উপকার সাধিত হয়।

এতদ্ব্যতীত, তাহাদের রাজার চেষ্টায় অনেক মৌলিক পদার্থ জার্ম্মান দেশে বহুল পরিমাণে জন্মায়। সে কারণ, সে সকল পদার্থ ভিন্নদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় না। কাজেই, মূল্যাধিক্য বা বিভিন্ন শুল্কাদি বাবুদে মালের দামও বৃদ্ধি পায় না।

শিক্ষা-প্রণালী—

জার্ম্মাণ দেশে লেখা পড়া শিক্ষার প্রণালী অদ্ভুত। আপামর সাধারণ সকলকেই সামরিক ও সওদাগরী বিদ্যা কিছু না কিছু শিখিতে হইবেই। এদেশের মত বিদ্যাভ্যাস জন সাধারণের ইচ্ছাধীন নহে বা এরূপ ব্যয় সাপেক্ষ ও নহে। ছাত্র-মণ্ডলীকে একরাশী পুস্তক বা যন্ত্রাদি ক্রয় করিতে হয় না। যে সকল বস্তু বিদ্যালয়েই সংগৃহীত থাকে। অধ্যাপকগণ নানা পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞানবাণী সংগ্রহ করতঃ ছাত্রগণকে বিতরণ করেন। ছাত্রগণ

তাঁহাদের মুখনিঃসৃত বক্তৃতা মালা (Lecture) নিজ নিজ খাতায় লিখিয়া রাখিবে এবং তাহাই পাঠ করিবে। তাহাতে যে জ্ঞান সঞ্চার হইবে তাহা কার্য্যতঃ অনুশীলন দ্বারা পরিপক্ক করিতে হইবে। এতদর্থে তত্রত্য কলকারখানা সমূহ সর্ব্বদাই মুক্তদ্বার। রাজার আদেশে সকল শিল্পাগারই শিক্ষানবীসের অনুশীলন গৃহ। এইরূপে জার্ম্মাণ জাতি অল্পব্যয়ে উপযুক্ত কাজের লোক হইবার সুযোগ সুবিধা লাভ করে।

কিন্তু ভারত! 'যা নাই তোমাতে তা নাই জগতে' আজ এ প্রবাদের সার্থকতা কোথায়? আজ কোথায় তোমার সেই মন্ত্রমুখরিত,—হোমানলদীপ্ত, শান্তি-পরিপূরিত তপোবন? যেখানে এক একটী মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব অপার্থিব পদার্থ-নিচয় মুহূর্ত্তে উৎপন্ন হইত! আজ কোথায় সেদিন, যেদিন তুমি স্বীয় সম্পদে মহিমান্বিত হইয়া জগতের শ্রেষ্ঠ স্থানীয় ও বরেণ্য হয়েছিলে? আর কোথায় সে ভাস্করাচার্য্য, বিশ্বকর্ম্মাদি সম্ভবা জাতি, যাঁরা সভ্য জগতে আদর্শ স্বরূপ ছিল? যাহারা নদনদী গিরিপর্ব্বত কানন কান্তার অতিক্রম করে নর পশুদের মধ্যে তাহাদের সভ্যতা বিলাইয়াছিল? আজ তুমি চাকার কত নীচে! আজ তোমার ঘরের আঁধার দূর করিতে, নগ্নদেহ আবৃত করিতে তুমি পরমুখাপেক্ষী! হা ধিক মহত্তের কঙ্কাল!

সমাপ্ত।

আলোচনা সমিতি।

[...]তা আলোচনাই—এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য।]

পরিচালক সভা।

[...] বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযু[...] [...]চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র [...] [...]ল, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত, বি, এল, পণ্ডিত শ্রীসন্তোষ জ্যোতিষার্ণব, পণ্ডিত শ্রীঅতুলচন্দ্র কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীশরদাকান্ত [...], শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিতগোপাল [...]পাধ্যায় প্রভৃতি।

আলোচনা পত্রিকার নিয়মাবলী।

আ[...]র্ষিক মূল্য সহর মফস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ২।৵০ আনা। সাধারণ [...] ।০ অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আবেদন করিলে নমুনা প্রদত্ত [...] বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার নিয়ম—মাসিক একপৃষ্ঠা বা দুই কলম—৮৲, অর্দ্ধপৃষ্ঠা বা এক কলম—৪৷৷০, সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—২৷৷০ সিকি কলম—২৲।

কভারের পৃষ্ঠার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম। ছয় মাস বা তদূর্দ্ধ কালের জন্য বিজ্ঞাপনে স্বতন্ত্র চুক্তির দর দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। চুক্তির বিজ্ঞাপন তিন মাসের মধ্যে পরিবর্ত্তন করা হয় না।

আলোচনার জন্য বিনিময় পত্রিকা ও প্রবন্ধাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে। অন্যান্য চিঠিপত্র ও টাকাক[...] আমার নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, কর্ম্মকর্ত্তা।

কর্ম্মযোগ প্রেস,—৪নং তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া।

(ফোন নং ১১১) হাওড়া

হাওড়া—৪নং তেলকলঘাট [...] "কর্ম্মযোগ প্রেস" হইতে [...]
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Alochona Patrika. Registered No. C. 116.